

বাংলা

প্রথম পত্র

কোর্স কোড : HSC-1851

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

রচনা ও সংকলনে

ড. মো. চেকীশ খান
মেহেরীন মুন্জারীন রত্না
জিয়াউল হাসান
কামাল উদ্দিন শামীম

সম্পাদক

ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

সমন্বয়কারী

ড. মো. চেকীশ খান
মেহেরীন মুন্জারীন রত্না

ওপেন স্কুল



বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

বাংলা

প্রথম পত্র

কোর্স কোড : HSC-1851

এইচএসসি প্রোগ্রাম

প্রথম প্রকাশ : মে, ২০১৬

পুনর্মুদ্রণ- মার্চ, ২০১৭

পুনর্মুদ্রণ- জুন, ২০১৮

পুনর্মুদ্রণ- ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

অনলাইন ভার্সন : জানুয়ারি, ২০২২

পুনর্মুদ্রণ- জানুয়ারি, ২০২৩

পুনর্মুদ্রণ- মার্চ, ২০২৪, পুনর্মুদ্রণ- জুন, ২০২৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : জানুয়ারি-২০২৬

[বাউবি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস বিষয়ক রিভিউ কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিমার্জিত]

প্রচ্ছদ

কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

প্রচ্ছদ গ্রাফিক্স

আব্দুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ

মোঃ টিপু সুলতান

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN 978-984-34-3142-4

প্রকাশনায়

প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গাজীপুর-১৭০৫

মুদ্রণ

সৃষ্টি প্রিন্টার্স

৪৮, হাসেম রোড, ঢাকা।



কোর্সবই অনুসরণ করার নির্দেশনা

কোর্স পরিচিতি (Course Overview)

কোর্সের নাম : বাংলা প্রথম পত্র

কোর্স কোড : (HSC-1851)

এইচএসসি প্রোগ্রামের বাংলা প্রথম পত্র বইটি এক বছরের জন্য পাঠ্য। বইটি দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত হয়েছে। দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথাই হল স্বনির্ভর পাঠ ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে নিজের সুবিধামতো সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হতে পারেন। পাঠসামগ্রী উপস্থাপনার এ পদ্ধতি মড্যুলার পদ্ধতি নামে পরিচিত। এটি একই সাথে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সরাসরি সহায়তা ছাড়া নিজেই পড়াশোনা করতে পারেন। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে এনসিটিবি'র নতুন কারিকুলামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই বইটি স্বশিখন পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বইটিকে অনুসরণ করা হয়েছে। এতে গদ্য, কবিতা, উপন্যাস ও নাটক স্থান পেয়েছে এবং প্রতিটি একক গদ্য বা কবিতাকে এক-একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রতি ইউনিটের শুরুতে ভূমিকা দেয়া হয়েছে। স্বতন্ত্র এ ইউনিটগুলো পড়লে বিশিষ্ট কোন্ দিকগুলো জানা যাবে তা ইউনিটের উদ্দেশ্যে বলা আছে। আবার, প্রতিটি পাঠের শুরুতে ঐ পাঠের শিখনফল/উদ্দেশ্য যুক্ত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী শিখনফল অনুযায়ী জ্ঞান অর্জিত হলো কি না তা যাচাই করতে পারেন। শিক্ষার্থীকে প্রতিটি মূলপাঠ অবশ্যই বুঝে পড়তে হবে এবং এ ক্ষেত্রে নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকাগুলো দেখে নিতে হবে। শব্দার্থগুলো বর্ণানুক্রমিক সাজানো হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীর অভিধান দেখার অভ্যাস গড়ে ওঠে। প্রতিটি পাঠের শেষে সারসংক্ষেপ দেয়া আছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীর স্ব-মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পাঠের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন এবং ইউনিটের শেষে সৃজনশীল প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর কীভাবে লিখতে হবে তার একটি নমুনা উত্তর দেয়া হয়েছে। সবশেষে আছে অ্যাসাইনমেন্ট বা বাড়ির কাজ। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে লেখক কর্তৃক লিখিত বানানের পরিবর্তন করা হয়েছে।

প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন, মানস গঠন, ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং সর্বোপরি সংস্কৃতিবান ও রুচিশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে এই পাঠ্যবইটি সাহায্য করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রায়োগিক ভাষাদক্ষতা অর্জন ও সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এ ছাড়া কল্পনাশক্তি, অনুসন্ধিৎসা, মানবীয় গুণাবলি ও চিন্তাশক্তিকে বিকশিত, সুসংহত ও প্রাথমিক করার সুযোগ পাবে। এই পাঠ্যসূচিকে যথাসম্ভব ভারমুক্ত ও আনন্দদায়ক করে প্রস্তুত করা হয়েছে। ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়তে শিক্ষার্থীদের যোগ্য করে গড়ে তোলা এই পর্যায়ের শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত উন্নতি, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, সমকালীন চাহিদা ও পরিবেশগত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়েছে। পাঠ্যবইটির বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্ব-শিখন পাঠসামগ্রী হিসেবে এটি দূরশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের আনন্দদায়ক পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

শিক্ষার্থীরা যাতে বইটি পড়ে অধিকতর সুফল লাভ করতে পারে সেজন্য নিচে কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হল :

- ইউনিটের শিরোনাম ও ভূমিকা পড়ে সম্ভাব্য বিষয়বস্তু কী হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করুন।
- পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্যগুলো পড়ে এই পাঠ থেকে কী কী শিখতে পারবেন তা জেনে নিন।
- এরপর মূলপাঠ ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়নের পর শিখনফলগুলো অর্জিত হল কিনা তা ভালোভাবে যাচাই করুন। যদি শিখনফল অর্জিত না হয় তাহলে বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- টিউটোরিয়াল সার্ভিসকে কার্যপোযোগী করতে আপনার পাঠ্যপুস্তকটির সকল অধ্যায়কে ততটি অংশে ভাগ করে নিন। প্রথম টিউটোরিয়াল ক্লাসে যাওয়ার আগে আপনার ভাগকৃত অংশটি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। কোনো অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্যোগ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজনে টিউটরের সাহায্য নিন। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে সবগুলো পাঠ অধ্যয়ন শেষ করুন।

- পাঠশেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। ইউনিটের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে এই পাঠটি আবারও ভালো করে পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করুন। এরপর চূড়ান্ত মূল্যায়ন অংশের সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা আছে কি না দেখুন। জানা না থাকলে সংশ্লিষ্ট অংশ আবার পড়ুন।
- ওপেন স্কুলের এই বইটি ছাড়াও স্থানীয় স্টাডি সেন্টারে আপনার জন্য টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনি প্রথমেই আপনার বিষয়ে কতটি টিউটোরিয়াল ক্লাস পাবেন তা আপনার স্টাডি সেন্টার থেকে জেনে নিন এবং আপনার স্টাডি সেন্টারের প্রতিটি টিউটোরিয়াল ক্লাসে অংশগ্রহণ করুন।

মার্জিন আইকন (Margin Icons)

কোর্সটি অধ্যয়ন করার পূর্বে কোর্সটিতে পর্যায়ক্রমে যে সমস্ত আইকন/প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রথমেই পরিচিত হতে হবে। এতে পুরো কোর্স মড্যুলের কোনটি শিখনফল, কোনটি বিষয়বস্তু/মূলপাঠ, কোনটি পাঠোত্তর মূল্যায়ন, কোনটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারবেন। নিম্নে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইকন বা প্রতীকগুলো দেখানো হলো।

					
কোর্স /ইউনিট সমাপ্তির সময়	উদ্দেশ্য	মূলপাঠ	শব্দার্থ	সারসংক্ষেপ	পাঠোত্তর মূল্যায়ন
					
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	অ্যাসাইনমেন্ট	উত্তরমালা	ভিডিও বা দেখা	অডিও বা শোনা	সাহায্য/প্রয়োজনে

	কোর্স সমাপ্তির সময়	কোর্সটি সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩২ সপ্তাহ

	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এইচএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী বন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে।
	শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এসময় বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।
অডিও/ভিডিও	

	সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন— আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটর	
	ড. মো. চেঙ্গীশ খান অধ্যাপক (বাংলা) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ইমেইল : chenggish@bou.ac.bd	মেহেরীন মুনজারীন রত্না সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ইমেইল : meherin2010@bou.ac.bd

সূচিপত্র

গল্প ও প্রবন্ধ	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা ১-১১৫
বাংলা লিখিত-গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ		২
০১. বিড়াল	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫
০২. অপরিচিতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫
০৩. বিলাসী	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩০
০৪. চাষার দুস্কু	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	৪৪
০৫. আহ্বান	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৩
০৬. আমার পথ	কাজী নজরুল ইসলাম	৬১
০৭. জীবন ও বৃক্ষ	মোতাহের হোসেন চৌধুরী	৬৭
০৮. মাসিপিসি	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৩
০৯. সৌদামিনী মালো	শওকত ওসমান	৮৪
১০. রেইনকোট	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	৯৬
১১. মহাজাগতিক কিউরেটর	মুহম্মদ জাফর ইকবাল	১০৮
<u>কবিতা</u>	<u>কবির নাম</u>	<u>১১৭-১৯৪</u>
বাংলা কবিতার উদ্ভব ও বিকাশ		১১৭
০১. বঙ্গভাষা	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১১৯
০২. সোনার তরী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২৫
০৩. সাম্যবাদী	কাজী নজরুল ইসলাম	১৩১
০৪. এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে	জীবনানন্দ দাশ	১৩৭
০৫. কবর	জসীমউদ্দীন	১৪২
০৬. তাহায়েই পড়ে মনে	সুফিয়া কামাল	১৫২
০৭. সেই অস্ত্র	আহসান হাবীব	১৫৮
০৮. আঠারো বছর বয়স	সুকান্ত ভট্টাচার্য	১৬৩
০৯. ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯	শামসুর রাহমান	১৬৯
১০. আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	১৭৫
১১. নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়	সৈয়দ শামসুল হক	১৮৩
১২. লোক-লোকান্তর	আল মাহমুদ	১৮৯
<u>উপন্যাস</u>	<u>লেখকের নাম</u>	<u>১৯৫-২৮৬</u>
লালসালু	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	১৯৫-২৮৬
<u>নাটক</u>	<u>লেখকের নাম</u>	<u>২৮৭-৩৫৮</u>
সিরাজউদ্দৌলা	সিকান্দার আবু জাফর	২৮৭-৩৫৮
নমুনা প্রশ্ন ও মানবন্টন		৩৫৯-৩৬৬

এইচএসসি প্রোগ্রাম
বাংলা প্রথম পত্র : HSC-1851
মানবন্টন : পূর্ণমান : ১০০

১. সৃজনশীল প্রশ্ন (কাঠামোবদ্ধ) :	৬০ নম্বর	(৬×১০ = ৬০)	: সময়- ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট
২. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :	৪০ নম্বর	(৪০×১ = ৪০)	: সময়- ৪০ মিনিট
সর্বমোট = ১০০			

১. সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন : ৬০ নম্বর (৬×১০ = ৬০)

‘ক’ বিভাগ- গদ্য

৩টি উদ্দীপক থাকবে, ২টির উত্তর দিতে হবে- (২×১০ = ২০)।

‘খ’ বিভাগ- কবিতা

৩টি উদ্দীপক থাকবে, ২টির উত্তর দিতে হবে- (২×১০ = ২০)।

‘গ’ বিভাগ- উপন্যাস

২টি উদ্দীপক থাকবে, ১টির উত্তর দিতে হবে- (১×১০ = ১০)।

‘ঘ’ বিভাগ- নাটক

২টি উদ্দীপক থাকবে, ১টির উত্তর দিতে হবে- (১×১০ = ১০)।

২. সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন : ৪০ নম্বর (৪০×১ = ৪০)

বহুনির্বাচনি অংশে দক্ষতার স্তর ঠিক রেখে মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকবে।

সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান ১ নম্বর।

ক. গদ্য থেকে ১৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে, সব কয়টির উত্তর দিতে হবে- (১৫×১ = ১৫)।

খ. কবিতা থেকে ১৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে, সব কয়টির উত্তর দিতে হবে- (১৫×১ = ১৫)।

গ. উপন্যাস থেকে ৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে, সব কয়টির উত্তর দিতে হবে- (০৫×১ = ০৫)।

ঘ. নাটক থেকে ৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে, সব কয়টির উত্তর দিতে হবে- (০৫×১ = ০৫)।

সর্বমোট = ১০০

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্নের শুরুতে একটি দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপক (Stem) থাকবে, যা হতে পারে একটি সাধারণ সূচনা বক্তব্য, চার্ট, সমীকরণ, চিত্র, গ্রাফ ইত্যাদি। দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপকের শেষে ৪টি প্রশ্ন থাকবে।

প্রশ্ন ৪টির নম্বর বন্টন হবে নিম্নরূপ :

ক. জ্ঞান স্তর- ১

খ. অনুধাবন স্তর- ২

গ. প্রয়োগ দক্ষতা স্তর- ৩

ঘ. উচ্চতর দক্ষতা স্তর- ৪

প্রতিটি প্রশ্নের এই ৪টি অংশের মোট নম্বর হবে (১+২+৩+৪) = ১০।



গদ্য

গল্প ও প্রবন্ধ



বাংলা-লিখিত গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ : একটি রূপরেখা

নব্য ভারতীয় আৰ্যভাষা থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব। আনুমানিক সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে আমাদের মাতৃভাষার জন্ম। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ। এগুলো কবিতার আঙ্গিকে রচিত। চর্যাপদ থেকে শুরু করে উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মূলত কাব্যচর্চার ইতিহাস। প্রাচীন ও মধ্যযুগে সহস্রাধিক বছর বাঙালি জনগোষ্ঠী প্রাত্যহিক প্রয়োজনে ভাবের আদান-প্রদান করেছে মৌখিক বাংলায়। বাংলা লিখিত গদ্যের উদ্ভব বিলম্বিত হয়েছে বলেই আঠারো শতক পর্যন্ত বিস্তৃত হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে গদ্য সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল না।

সাহিত্যের বাহন না হলেও প্রাত্যহিক ও সামাজিক প্রয়োজনেই মধ্যযুগের বাংলাদেশে লিখিত গদ্যভাষার প্রাসঙ্গিকতা অনুভূত হয়েছিল। মধ্যযুগে রচিত ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক চিঠিপত্রে এবং দলিল-দস্তাবেজে আদি গদ্যের দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। প্রয়োজনের তাগিদে রচিত বিশৃঙ্খল এই গদ্যভাষার জন্ম মধ্যযুগের সময় পরিসরে হলেও, বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের উদ্ভব হয়েছে আধুনিক যুগে, উনিশ শতকের বাংলাদেশে।

উনিশ শতকে বাংলা লিখিত গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বিদেশিরা। আঠারো শতকের শেষে কয়েকজন ইংরেজ মিশনারি এদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। উইলিয়াম কেরী এবং টমাস ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এঁরাই ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার অদূরে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এ মিশন থেকে বাংলা গদ্যে বাইবেল-এর অনুবাদ এবং ধর্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়। এ-সময়ই ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের পাশাপাশি বাংলা গদ্য পাঠ্যপুস্তকের ভাষার স্তরে উন্নীত হয়। উইলিয়াম কেরী এক্ষেত্রেও পালন করেন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা।

ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির কাজে যে-সব সিভিলিয়ান কর্মচারী এদেশে আসতেন তারা দেশীয় ভাষা সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ঔপনিবেশিক শাসনকে সুদৃঢ় করার স্বার্থেই ইংরেজ সিভিলিয়ানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দেশীয় ভাষা শিক্ষার আবশ্যিকতা অনুভব করেছিলেন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি। তাঁরই উদ্যোগে এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। অন্যান্য দেশীয়-ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের সর্বাধিক গুরুত্ব অনুভব করেই কলেজটিতে শুরুর পরের বছরই (১৮০১) বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। উইলিয়াম কেরী হন বাংলা বিভাগের প্রথম অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ। তিনি নিজে বাংলা গদ্যে দুটি বই রচনা করলেন এবং দেশীয় শিক্ষক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের দিয়েও কিছু পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করালেন।

বাংলা গদ্যকে পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডি থেকে মুক্ত করার কৃতিত্ব যুগপুরুষ রাজা রামমোহন রায়-এর (১৭৭৪-১৮৩৩)। উনিশ শতকের নবজাগরণের অগ্রনায়ক ছিলেন তিনি। তাঁর উদ্যোগ ও চর্চায় বাংলা গদ্য ঐ সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যম হয়ে ওঠে। সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে প্রাণবন্ত তর্ক বিতর্কের লিখিত গদ্যরূপ বিভিন্ন পত্রিকা ও পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়। এভাবেই বাংলা গদ্য বিকাশধারার পথ খুঁজে পায়। রামমোহন রায় রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল : বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫), বেদান্ত সার (১৮১৫), গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮), সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তক সম্বাদ (১৮১৮-১৯)। রামমোহনের সমসাময়িকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেখক হচ্ছেন কলিকাতা কমলালয়, নবাবু বিলাস, নববিবি বিলাস গ্রন্থের রচয়িতা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮)।

আলোচনা বিতর্ক ও মীমাংসা এবং ধর্মতত্ত্বের বাহন হিসেবে বাংলা গদ্যের অমিত সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রামমোহন রায়। আর এ গদ্যকে সাহিত্যের বাহনের মর্যাদায় উন্নীত করলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)। ভাব ও বিষয় অনুসারে বাক্যবিন্যাস এবং ইংরেজি ভাষার আদলে বিভিন্ন বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার করে বাংলা গদ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বও তাঁর। রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে অভিহিত করেছেন বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী অভিধায়। তবে বিদ্যাসাগর সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক ছিলেন না। তিনি প্রধানত অনুবাদক, পাঠ্যগ্রন্থ প্রণেতা এবং শিক্ষা-সমাজ সাহিত্য বিষয়ের প্রবন্ধকার। তাঁর অনূদিত, রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হচ্ছে : বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), শকুন্তলা (১৮৫৪), সীতার বনবাস (১৮৬০), ত্রাণি বিলাস (১৮৬৯), বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮), সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩), বিদ্যাসাগর চরিত (১৮৯১), আত্মচরিত (১৮৯২) ইত্যাদি।

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক এবং লেখক হিসেবে পূর্বে আবির্ভূত অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) এ পর্যায়ের বিশিষ্ট গদ্য রচয়িতা। ‘বিশুদ্ধ ও নির্মোহ বুদ্ধির’ চর্চাকারী হিসেবে বাংলা গদ্যে অক্ষয়কুমারের অবদান সুচিহ্নিত। বিজ্ঞানের জটিল বিষয়ও যে বাংলা গদ্যের বাহন হতে পারে, সে সম্ভাবনা আবিষ্কারের কৃতিত্বও তাঁর। অক্ষয়কুমার দত্তের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল : ভূগোল (১৮৪১), চারুপাঠ (তিনখণ্ড, ১৮৫৩-৫৯), পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬), বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার (প্রথম ও



দ্বিতীয় খণ্ড : ১৮৫১, ১৮৫৩), ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (প্রথম খণ্ড ১৮৭০, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৩) আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ (১৮৫০), আত্মতত্ত্ববিদ্যা (১৮৫২), জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি (১৮৯৩)।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকৃত আধুনিকতার সূচনা ঘটে বাংলা সাহিত্যে। এ সময় থেকেই বাংলা গদ্য বিশুদ্ধ সাহিত্যের বাহন হয়ে ওঠে। সৃষ্টিশীল গদ্য সাহিত্য রচনার সূত্রপাতও হয় এ সময়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশকে সৃষ্টিশীল গদ্য রচয়িতা হিসেবে সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হন প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-৮৩), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-৯৪), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) ও দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩৯-৭৩)। ভূদেব মুখোপাধ্যায় বেশ কটি পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করলেও সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর কথিকাবর্মী রচনা ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৭৭৯ শকাব্দ) বিশেষ তাৎপর্যে চিহ্নিত। এ গ্রন্থের দুই কাহিনী সফল স্বপ্ন ও অঙ্গুরীয় বিনিময়কে কোনো কোনো সমালোচক প্রথম বাংলা উপন্যাস রচনার প্রয়াস হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে বাংলা উপন্যাসের লক্ষণ প্রথম সর্বাধিক পরিস্ফুট হয়ে ওঠে টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে লেখা প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮) গ্রন্থে। আলালের ঘরে দুলালের গুরুত্ব শুধু উপন্যাসের লক্ষণযুক্ত প্রথম রচনা হিসেবে নয় বরং বাংলা গদ্যের পালাবদলের মাইল ফলক হিসেবেই এর সমধিক গুরুত্ব। প্যারীচাঁদ মিত্র আলালের ঘরের দুলাল-এ ব্যবহার করলেন কলকাতার চলতি বুলি ও আঞ্চলিক উপভাষা। এর মাধ্যমে সৃষ্টিশীল সাহিত্যে কথ্যবুলি ও আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহারের অমিত সম্ভাবনা আবিষ্কৃত হল। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে ‘আলালী ভাষা’ তাই এক অমরণীয় মাইল ফলক। ‘আলালী ভাষা’ আলোচনায় ‘হুতোমী ভাষা’র প্রসঙ্গ স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে। কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০) রচিত হুতোম প্যাঁচার নকশাও (১৮৬২-৬৪) কলকাতার চলতি বুলিতে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কালীপ্রসন্নের পূর্বে বাংলা গদ্যে সাধু ও চলিত ভাষারীতির ব্যবধান সুচিহ্নিত ছিল না। তাঁর অনূদিত মহাভারতে এবং হুতোম প্যাঁচার নকশায় ক্লাসিক সাধুভাষা ও অপভাষা মিশ্রিত চলিত বুলির ব্যবধানটি মোটা দাগে চিহ্নিত।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম দশক বাংলা গদ্যে মৌলিক নাট্যসাহিত্য রচনার কারণেও বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। অমরণীয়, বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব হয়েছিল নাট্যকার পরিচয়ে। তাঁর রচিত কৃষ্ণকুমারী নাটক বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক। মধুসূদনের অন্যান্য নাটকের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুটি প্রহসন একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০) ও বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)। তাঁর নাট্যচর্চায় সম্প্রসারিত হল বাংলা গদ্যের সম্ভাবনা। বাংলা গদ্য যে সার্থক নাটকের, বিশেষত গুরুগম্ভীর ট্রাজেডি ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ পূর্ণ প্রহসনের বাহন হতে পারে, মধুসূদনের নাটক তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পাঠ্যপুস্তক ও তর্ক-বিতর্কের বাহন হিসেবে প্রচলিত যে গদ্য বিদ্যাসাগরের চর্চায় শিল্প মাধ্যমের স্তরে উন্নীত হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর (১৮৩৮-৯৪) সাধনায় সে গদ্য শিল্পিত উপন্যাসের ধারক হয়ে উঠল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্র রচিত গদ্যে, যুগপৎভাবে উপন্যাস ও অন্যান্য গদ্যরচনায় বাংলা গদ্যের গভীরতা, ব্যাপ্তি ও ঐশ্বর্য সুপ্রমাণিত হল। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাসের রচয়িতা হিসেবে বঙ্কিম গদ্যচর্চার নতুন যে পথসন্ধান দিলেন, তাকে অনুসরণ করেই সৃষ্টিশীল গদ্যসাহিত্য উত্তরকালে বিকশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), রাজসিংহ (১৮৮২), আনন্দমঠ (১৮৮৪), বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ভাগ ১৮৮৭, ২য় ভাগ ১৮৯২)।

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) এ যুগের একজন বলিষ্ঠ গদ্যলেখক। বিষাদসিন্ধু (১৮৮৫, ১৮৮৭, ১৮৯১) তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ। লেখকের অন্যান্য গদ্যগ্রন্থের নাম উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০), গাজী মিয়ার বস্তানী (১৮৯৯)।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাহিত্যজগতে আবির্ভূত হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর (১৮৬১-১৯৪১) সাহিত্য সাধনার বিস্তার ও সমৃদ্ধি বিশ শতকে। আর বিশ শতকের প্রথমার্ধকে অভিহিত করা হয় ‘রবীন্দ্রযুগ’ নামে। অমরণীয়, উনিশ শতকেই রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বিশেষত ‘গল্পগুচ্ছের’ শ্রেষ্ঠগল্পগুলোর বেশ কটি রচিত হয় এ-সময়ে। তবে গদ্যচর্চায় রবীন্দ্রনাথের শিখরস্পর্শী সাফল্য ঘটেছে বিশ শতকেই। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে, ‘সবুজপত্র’ পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির পালাবদল ঘটে। এ সময় থেকে তিনি সাধুভাষা রীতির গদ্য পরিত্যাগ করে চলিত ভাষারীতির গদ্য গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যু গদ্যচর্চায় ঐ রীতির প্রয়োগ অব্যাহত রাখেন।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যচর্চায় বিকাশমান বাংলা গদ্যভাষা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। মানুষের বহুমুখী আবেগ অনুভূতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন তাঁর সৃজনশীল চর্চায় বাংলা গদ্যের বাহন হয়ে ওঠে। বাংলা গদ্যের যে সম্ভাবনা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গদ্যে তা বিচিত্রমাত্রিক ব্যঞ্জনায় ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠল। বিশ শতকের প্রথমার্ধে নিজের জীবদ্দশায় রবীন্দ্রনাথই ছিলেন বাংলাগদ্যের ‘মধ্যাহ্ন গগনের সূর্য’। রবীন্দ্রনাথের বিপুল গদ্যসম্ভারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হচ্ছে : নাটক-অচলায়তন (১৯১২), ডাকঘর (১৯১২), রক্তকরবী (১৯১৬), মুক্তধারা (১৯২৫), উপন্যাস-চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯০৮), চতুরঙ্গ (১৯১৫), ঘরে বাইরে (১৯১৫), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯)। ছোটগল্প-গল্পগুচ্ছ (তিনখণ্ড), সে (১৯৩৭), তিনসঙ্গী (১৯৪১)। প্রবন্ধ-সভ্যতার সংকট (১৯৪১)। সাহিত্য সমালোচনা-প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৭), সাহিত্য (১৯০৭), আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭)। রাজনীতি ও সমাজ বিষয়ক গ্রন্থ-স্বদেশ (১৯০৮) শিক্ষা (১৯০৮), কালান্তর (১৯৩৭)। ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক



গ্রন্থ-ধর্ম (১৯০৯), শান্তি নিকেতন (১৯০৯-১৬), মানুষের ধর্ম (১৯১৩)। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ-পঞ্চভূত (১৯০৭), বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭), ছিন্নপত্র (১৯১২), জীবনস্মৃতি (১৯১২) রাশিয়ার চিঠি (১৯৩১), ছেলেবেলা (১৯৪০)।

রবীন্দ্র-যুগে আবির্ভূত হয়েও যিনি রবীন্দ্রগদ্য দ্বারা প্রভাবিত হননি এবং রবীন্দ্রনাথকেই প্রভাবিত করেছিলেন, তিনি প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। তাঁর লেখক ছদ্মনাম ‘বীরবল’। নতুন গদ্যরীতির প্রবক্তা হিসেবে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর গদ্য ‘বীরবলী গদ্য’ নামে পরিচিত। তাঁর আর এক অসামান্য কীর্তি সবুজপত্র নামের সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশনা। তিনিই প্রথম কলকাতার প্রমিত চলিত ভাষায় গদ্যসাহিত্য রচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর সম্পাদিত সবুজপত্র পত্রিকাতেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম চলিত ভাষারীতির গদ্য লেখা শুরু করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-বীরবলের হালখাতা, নানা কথা (১৯১৯), রায়তের কথা, গল্পসংগ্রহ।

রবীন্দ্রনাথের সাধনায় বাংলা গদ্য উৎকর্ষের চরম পর্যায়ে পৌঁছালেও কোটি কোটি বাঙালির জীবন্ত ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা আজও বিকাশমান। রবীন্দ্রযুগে এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা গদ্যচর্চায় যাঁরা অসামান্য অবদান রেখেছেন, সেসব সৃষ্টিশীল কথাসাহিত্যিক ও মননশীল প্রাবন্ধিকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম ও কৃতিত্বের পরিচয় নিচের ছকে উপস্থাপন করা হল :

লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম
১. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)	প্রকৃতি(১৩০৩), জিজ্ঞাসা (১৩১০), বিচিত্র জগৎ (১৯২০)।
২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)	বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী (১৯৪৯), ঘরোয়া (১৩৪৮)।
৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৮-১৯৩৮)	পল্লীসমাজ (১৯১৪), শ্রীকান্ত (১৯১৭-৩৩), চরিত্রহীন (১৯১৭), গৃহদাহ (১৯২০)।
৪. রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)	গড্ডলিকা (১৯২৪), কজ্জলী (১৯২৭)।
৫. মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)	আধুনিক বাংলা সাহিত্য, কবি শ্রীমধুসূদন, বঙ্কিম-বরণ।
৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)	পথের পাঁচালী (১৯২৯), আরণ্যক (১৩৪৫), ইছামতী (১৩৫৬)।
৭. কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)	শাস্ত্র বঙ্গ (১৩৫৮), কবিগুরু গ্যোটে (২ খণ্ড), বাংলার জাগরণ (১৯৫৬), কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম (১৯৬৬)।
৮. আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)	আয়না, ফুড কনফারেন্স, আসমানী পর্দা, গালিভারের সফরনামা, জীবন ক্ষুধা, আবেহায়াত, সত্যমিথ্যা, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর এবং আত্মকথা।
৯. তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)	গণদেবতা (১৯৪২), পঞ্চাঙ্গাম (১৯৪৩), কবি (১৯৪২), হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৪৭)।
১০. কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)	বাঁধনহারা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০), ব্যথার দান (১৯২২), যুগবাণী (১৯২২), দুর্দিনের যাত্রী।
১১. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৫৭)	স্বগত, কুলায় ও কালপুরুষ।
১২. মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬)	সংস্কৃতি-কথা (১৩৬৫)।
১৩. সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-৭৪)	দেশে বিদেশে, পঞ্চতন্ত্র, চাচাকাহিনী, শবনম।
১৪. আবুল ফজল (১৯০৫-১৯৮১)	রাঙা প্রভাত (১৯২৭), সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা (১৯৬০), সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন, শুভবুদ্ধি, সমকালীন চিন্তা।
১৫. হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯)	বাংলার কাব্য (১৯৪২)।
১৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬)	পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬), চিহ্ন (১৯৪৭)।
১৭. বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪)	কবি রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য, মহাভারতের কথা, হঠাৎ আলোর ঝলকানি, আমার যৌবন, আমার ছেলেবেলা।
১৮. বিনয় ঘোষ (১৯১৭-৮০)	বাংলার নবজাগৃতি, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি।
১৯. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-৭১)	নয়নচারা, লালসালু, চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো।
২০. মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-৭১)	কবর, মীরমানস, বাংলা গদ্যরীতি, তুলনামূলক সমালোচনা।



বিড়াল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



লেখক-পরিচিতি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটির কাছাকাছি কাঁঠালপাড়া গ্রামে ১৮৩৮ সালের ২৬ জুন জন্মগ্রহণ করেন। হুগলি মোহসিন কলেজ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি লেখাপড়া করেন। ১৮৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট। কর্মজীবনে তিনি প্রথম ভারতীয় ও বাঙালি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং এ-পদে ৩৩ বছর চাকরি করে ১৮৯১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও একজন ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫২ সালে ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকায় কবিতা লিখে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত হয় ইংরেজি উপন্যাস *Rajmohan's wife*। মোগল-পাঠান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নারী-পুরুষের প্রেমকে উপজীব্য করে ১৮৬৫ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী* প্রকাশিত হয় এবং বাংলা সাহিত্যে এটিই প্রথম শিল্পসম্মত সার্থক উপন্যাস। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতঘোষা সাধুরীতির বাংলায় যেটুকু জড়তা ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তা দূর হলো— বাংলা হয়ে উঠল সাহিত্যের উপযোগী ভাষা। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ভাষা, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি উৎকৃষ্টমানের প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এছাড়াও তাঁর অন্যতম কীর্তি *বঙ্গদর্শন* (১৮৭২) পত্রিকার প্রকাশ ও সম্পাদনা। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। বাংলা সাহিত্যে তিনি ‘সাহিত্যসম্রাট’ হিসেবে অধিক পরিচিত। এই কীর্তিমান পুরুষ ১৮৯৪ সালের ৮ এপ্রিল কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থসংখ্যা ৩৪।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম :

- উপন্যাস :** *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫), *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *মৃণালিনী* (১৮৬৯), *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩), *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮), *আনন্দমঠ* (১৮৮২), *রাজসিংহ* (১৮৮২);
- রম্যরচনা :** *কমলাকান্তের দপ্তর* (১৮৭৫);
- প্রবন্ধ :** *লোকরহস্য* (১৮৭৪), *বিজ্ঞানরহস্য* (১৮৭৫), *বিবিধ প্রবন্ধ* (১৮৮৭ ও ১৮৯২), *কৃষ্ণচরিত্র* (১৮৮৬)।

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘বিড়াল’ একটি আকর্ষণীয় রম্যরচনা। প্রবন্ধটি ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। রূপকের মাধ্যমে লেখক আমাদের সমাজের দরিদ্র, বঞ্চিত ও শোষিত মানুষের প্রতি ধনী সমাজের প্রভাবের কথা তুলে ধরেছেন। সমাজে শৃঙ্খলা আনতে হলে মানুষকে যে বিচারবুদ্ধি নিয়ে চলতে হবে এবং বৈষম্য দূর করতে হলে যে মানুষকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে তা লেখক সুস্পষ্টভাবে প্রবন্ধটিতে তুলে ধরেছেন।



সাধারণ উদ্দেশ্য

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিড়াল’ প্রবন্ধটি পাঠের পর আপনি—

- বঙ্কিমচন্দ্রের রম্যরচনার গুণ, মান ও রসবোধের সঙ্গে পরিচিত হবেন।
- লেখকের সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাবেন।
- সাধুরীতির গদ্য যে কতো সহজ এবং আকর্ষণীয় হতে পারে তা বুঝতে পারবেন।

পাঠ-১



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি—

- কিছু ঐতিহাসিক নাম ও স্থান সম্বন্ধে লিখতে পারবেন;
- বিড়াল কোন সমাজের প্রতিনিধি হয়ে কী বলছে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।



মূলপাঠ

আমি শয়ন গৃহে চারপায়ীর উপর বসিয়া হুঁকা হাতে, ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট মিট করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে— দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহা! প্রস্তুত হয় নাই— এ জন্য হুকা হাতে, নিম্নলিখিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটু ক্ষুদ্র শব্দ হইল, “মেও!”

চাহিয়া দেখিলাম— হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিস ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্বে যথোচিত পুরস্কার দেয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভালো নহে। ডিউক বলিল, “মেও!”

তখন চক্ষু চাহিয়া ভালো করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জারসুন্দরী, নির্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, “মেও!” বলিতে পারি না, বুঝি, তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি, মার্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, “কেহ মরে বিল ছেঁচে কেহ খায় কই।” বুঝি সে “মেও” শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব, “তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি— এখন বল কী?”

বলি কী? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়াল দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কী জানি, এই মার্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতিরচিন্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন ষষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বে মার্জারীর প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে ষষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, একটু সরিয়া বসিল। বলিল, “মেও!” প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া ষষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয়্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জারের বক্তব্যসকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে বিড়াল বলিতেছে, “মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারের ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কী? তোমাদের ক্ষুধাপাসা আছে— আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলে তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেস লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্মতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয়সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।



“দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম কী? পরোপকারই পরম ধর্ম। এই দুধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল- অতএব তুমি সেই পরম ধর্মের ফলভাগী- আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্মসম্বন্ধের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্মের সহায়।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অনুসন্ধান- খোঁজ। **অপরিমিত**- পরিমাণ করা হয়নি যার। **অবমাননা**- অপমান। **অভিপ্রায়**- ইচ্ছা। **আইস**- আসো। **আফিঙ্গ**- আফিম বা অহিফেন। পোস্ত বীজ থেকে তৈরি ওষুধ ও মাদকদ্রব্য। **আহরিত**- সংগ্রহ করা হয়েছে এমন। **উদরসাৎ**- খেয়েফেলা। **এক্ষণে**- এখন। **ওয়াটার্লু**- যুদ্ধক্ষেত্রের নাম। নেপোলিয়ন এখানে ডিউক অব ওয়েলিংটনের কাছে পরাজিত হন। **ওয়েলিংটন**- ডিউক অব ওয়েলিংটন (১৭৬৯-১৮৫৪ খ্রি.) নামে সমধিক পরিচিত। ওয়াটার্লু যুদ্ধে ইনি মহাবীর নেপোলিয়নকে পরাজিত করেন। **কাপুরুষ**- ভীতু পুরুষ। **ক্ষুৎপিপাসা**- ক্ষুধা ও পিপাসা। **চতুষ্পদ**- চার পেয়ে প্রাণী। **চারপায়ী**- টুল বা চৌকি। **চিরাগত**- প্রথা, বহুদিন ধরে যা চলে আসছে। **ঠেঙ্গালাঠি**- লম্বা লাঠি। **ডিউক মহাশয়**- ক্ষুদ্র রাজা, অভিজাত ব্যক্তি। **দিব্যকর্ণ**- অলৌকিক ক্ষমতায় শোনার কান। **ধাবমান হইলাম**- ধেয়ে গেলাম। **নিমীলিত লোচনে**- বন্ধ চোখে। **নিঃশেষ**- একেবারে শেষ। **নেপোলিয়ন**- পূর্ণনাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১ খ্রি.) মহাবীর ফরাসি সম্রাট। প্রায় সমগ্র ইউরোপ জয় করেন। ১৮১৫ খ্রি. ওয়াটার্লু যুদ্ধে ডিউক অব ওয়েলিংটন কর্তৃক পরাজিত হন। সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। **পুনরপি**- আবার। **পাষণবৎ**- পাথরের মতো প্রকটিত- প্রকাশ। **প্রভেদ**- পার্থক্য। **প্রেতবৎ**- প্রেতের মতো। **প্রহার**-শরীরে আঘাত। **বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া**- বিড়াল হয়ে। **বাজ্বনীয়**- যা চাওয়া যায় এমন। **বিজ্ঞ**- জ্ঞানী। **ব্যতীত**- ছাড়া। **ব্যূহ রচনা**- যুদ্ধের জন্য সৈন্য সাজানো। **মনুষ্য**- মানুষ। **মার্জার**- বিড়াল। **মূলীভূত**- আসল, গোড়ার। **যথোচিত**- যেমন উচিত। **শয়নগৃহ**- শোয়ার ঘর। **শয্যায়**- বিছানায়। **শাস্ত্রানুসারে**- নিয়ম অনুসারে। **ষষ্ঠি**- লাঠি। **সকাতর চিণ্ডে**- কাতর মনে। **সগর্বে**- অহঙ্কারের সঙ্গে। **সহায়**- সহকারী।



সারসংক্ষেপ

লেখক এখানে নিজেই কমলাকান্ত। চরিত্রটির মুখ দিয়ে বস্তুত লেখক নিজেই তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করেছেন। বিড়াল নিরীহ প্রাণী। সুযোগ পেলেই দুধ চুরি করে খায়। সমাজে ধনী ও দরিদ্রের যে ব্যবধান তা যে মানুষেরই সৃষ্টি এ কথাই লেখক কমলাকান্ত সেজে বলেছেন। তাঁর মতে যারা দরিদ্র অসহায় তারা অনেক সময় বাধ্য হয়ে অন্যায় করে। তখন ধনীরা তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করে। কেন তারা অন্যায় করল তার কারণ কখনো খোঁজা হয় না। বিড়ালকে দরিদ্র সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে দেখানো হয়েছে। কমলাকান্তের সমস্ত কথাবার্তা হচ্ছে রূপকের আশ্রয়ে। আজ সমাজে ধনী ও দরিদ্রের যে পার্থক্য বা বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য দায়ী ধনী মানুষগুলোই। সুতরাং এহেন কাজের জন্য দরিদ্র শ্রেণির মানুষকে শাস্তি দেওয়া অন্যায়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কে চিরাগত প্রথা অবমাননা করতে চায়নি?

ক. কমলাকান্ত

খ. মার্জার

গ. নসীরাম

ঘ. প্রসন্ন

২. কমলাকান্ত ‘পাষণবৎ কঠিন’ হয়েছিল কেন?

ক. লর্ড ওয়েলিংটন আফিং চাওয়ায়

খ. বিড়ালকে সগর্বে তাড়াতে

গ. প্রসন্ন টীকা চাওয়ায়

ঘ. মঙ্গলার কষ্টে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

অঠৈ ঘরের খাবার বেঁচে গেলে নর্দমায় ফেলে দেয়। কিন্তু তার প্রতিবেশী হাসনা বানু পর্যাপ্ত আয় করতে পারে না বলে প্রায়ই অনাহারে থাকে।



৩. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে কোন রচনার মিল রয়েছে?

ক. বিড়াল

খ. অপরিচিতা

গ. বিলাসী

ঘ. আমার পথ

৪. উদ্দীপক ও ‘বিড়াল’ প্রবন্ধে যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে—

ক. ধনীর বৈশিষ্ট্য

খ. দরিদ্রের বৈশিষ্ট্য

গ. ধনী-দরিদ্র বৈষম্য

ঘ. ধনী-দরিদ্র সমঝোতা

পাঠ-২



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি—

- বিড়ালের মতো অসহায় প্রাণীরা তাদের অপরাধের জন্য কী কী যুক্তি দেখায় তার বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- মানুষের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিড়াল কী কী বলেছে তার সার কথাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

“দেখ আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম চোরের নহে— চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনী। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?”

“দেখ আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত নর্দমায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কী প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে, তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মতো দরিদ্রের ব্যথা ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখনো অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না— সকলেই পরের ব্যথা ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?”

“দেখ যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং জোড়হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশি? তা ত নয়— তেলা মাথায় তেল দেয়া মনুষ্যজাতির রোগ— দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর— আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আত্মহানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর— ছি! ছি!”

“দেখ আমাদিগের দশা দেখ, দেখ প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারিদিক দৃষ্টি করিতেছি— কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল— গৃহমার্জার হইয়া, বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্যার সহোদর, বা মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলোয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল— তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয় এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জার কবি হইয়া পড়ে।”

“আর আমাদিগের দশা দেখ— আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে— জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে— অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, “মেও! মেও! খাইতে পাই না!—” আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও



না! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও- নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষক চর্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সর্পণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড নাই কেন? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেন না আফিংখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচ শত লোকের আহার সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।”



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অধীর- অধৈর্য। অসীম- যার সীমা নেই। উপবাস- না খেয়ে থাকা। কস্মিনকালে- কোনো কালে। ক্ষুধানুসারে- কেমন খিদে লাগে তা বিবেচনা করে। জলযোগ- হালকা খাবার বা নাশতা। দণ্ডবিধান- শাস্তির ব্যবস্থা। ধর্মাচরণে- ধর্মের আচার আচরণে। নিউমান- একজন বিখ্যাত লেখক। নির্বিঘ্নে- নিরাপদে। নৈয়ায়িক- যিনি ন্যায়শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। পতিত আত্মা- দুর্দশায় পড়েছে এমন আত্মা। এখানে কথাটা বিড়ালকে বলা হয়েছে। পরাস্ত- পরাজিত। পাঠার্থে- পড়ার জন্য। পুনর্বীর- আবার। প্রধানুসারে- নিয়ম অনুসারে। মহিমা- গুণ। মার্জারী মহাশয়া- স্ত্রী বিড়ালকে সম্বোধনের জন্য মহাশয়-এর সঙ্গে আ- প্রত্যয় যোগ করা হয়েছে। সুতর্কিক- তর্কে পটু। সরিষা ভোর- সর্ষে দানার সমান। সোশিয়ালিস্টিক- এটি ইংরেজি শব্দ, সমাজতান্ত্রিক। সমাজের সবাই সমান- এমন একটি রাজনৈতিক মতবাদ। স্বস্থানে- নিজের জায়গায়।



সারসংক্ষেপ

বিড়াল তার চুরি করে দুধ খাওয়ার কারণ বলতে গিয়ে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার অনিয়মের কথা বলেছে। তার ব্যাখ্যায় ধনী কৃপণদের জন্যই গরিবরা চোর হয়। তাই চোরের শাস্তি হলে যারা চোর তৈরি করে, তাদেরও শাস্তি হওয়া উচিত। বিড়াল তার অভিজ্ঞতা থেকেই বলেছে যে, মানুষ তেলা মাথায় তেল ঢালে- এটা তাদের সবচেয়ে বড় দোষ। যাদের খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, তাদের জন্য মানুষ ভোজের আয়োজন করে। আর শুধু বেঁচে থাকার জন্য যাদের একটু খাবার প্রয়োজন, তাদেরকে কেউ খেতে দেয় না। ভোজের আসরে খেতেও ডাকে না। বরং খাবার বেঁচে গেলে তা ফেলে দেয়া হয়, তবু ক্ষুধার্তদের জন্য রাখা হয় না। ধনীদের এমন নির্দয় আচরণের জন্যই দরিদ্র অসহায়রা চুরি করে। তাই চুরির জন্য দরিদ্রকে শাস্তি দেয়ার কোনো অধিকার নেই ধনীর। বিড়াল বলতে চায় যে, কৃপণ ধনীরাই চোর সৃষ্টি করে। কারণ তারাই ক্ষুধার্তকে চুরি করতে বাধ্য করে। ধনীরা একাই পাঁচশ জনের সম্পদ ভোগ করে, তবু একটু উচ্ছিষ্ট গরিবদের জন্য রাখে না। এসবই সমাজিক অন্যায়। তাই বিড়ালের মতে, চোরের শাস্তি হলে ধন কুক্ষিগত করার অপরাধে ধনীরাও শাস্তি হওয়া উচিত।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. পৃথিবীতে ডকসে বিড়ালের অধিকার রয়েছে?

ক. দুধে-আফিংগে

খ. মৎস্য-মাংসে

গ. মাংসে-দুধে

ঘ. ছানা-দুধে

৬. বিড়াল চোর হয়েছে কেন?

ক. লোভে পড়ে

খ. জাতিভেদে

গ. খেতে না পেয়ে

ঘ. ধনী হবার আশায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

ক্ষুধার তাড়নায় ছেলে রাসু চুরি করেছে। চুরি করার অপরাধে ছেলেকে মারতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো আফাজ আলি।

৭. উদ্দীপকের আফাজ আলির সঙ্গে ‘বিড়াল’ গল্পের কোন চরিত্রের মিল পাওয়া যায়?

ক. কৃপণ ধনী

খ. মার্জারী

গ. কমলাকান্ত

ঘ. বিড়াল



৮. এরূপ সাদৃশ্য যে বিষয়ে—

- শোষণে
- মানবিকতায়
- জাতিপ্রথা উচ্ছেদে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. i ও ii

পাঠ-৩



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি—

- ধনীর প্রতিনিধি হিসেবে কমলাকান্ত বিড়ালকে কী বলতে চেয়েছেন তা বুঝিয়ে লিখতে পারবেন।
- দরিদ্রের দৃষ্টিতে সমাজের উন্নতি বলতে বিড়াল কী বোঝাতে চেয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবেন।



মূলপাঠ

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, “থাম! থাম মার্জারপণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক! সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।”

মার্জার বলিল, “না হইল ত আমার কী? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কী ক্ষতি?”

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, “সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।” বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, “আমি যদি খাইতে না পাইলাম তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কী করিব?”

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কল্পিনকালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জার সুবিচারক এবং সুতार्কিকও বটে, সুতরাং না বুঝার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, “সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদেব বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্তব্য।”

মার্জারী মহাশয়া বলিলেন, “চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নসীরাম বাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।”

বিজ্ঞ লোকের মতো এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জারকে বলিলাম যে, “এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্কারের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দণ্ডের পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে— আর কিছু হউক বা না হউক, আফিণ্ডের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু হানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও উভয়ে ভাগ করিয়া



খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীর হও, তবে পুনর্বীর আসিও, এক সরিষাভোর আফিং দিব।”

মার্জার বলিল, “আফিংগের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।”

মার্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভবিষ্যৎ কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল!

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অবিরত- অনবরত। অস্থি- হাড়। আহ্বান- ডাকা। আহ্ব্য- খাবার। উদর- পেট। কৃশ- রোগা। কার্পণ্য- কৃপণতা। কৃষ্ণচর্ম- কালো চামড়া। কৃপণ- যে শুধু সঞ্চয় করে খরচ করে না। ক্ষীণ- দুর্বল। তদপেক্ষা- তার চেয়ে। দণ্ড- শাস্তি। দূরদর্শী- যার ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা আছে। নির্দয়- নিষ্ঠুর, দয়াহীন। ন্যায়ালঙ্কার- ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত। পরিদৃশ্যমান- দেখা যায় এমন। প্রাক্ষণ- মাঠ। প্রয়োজনাভীত- প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। প্রাসাদ- বিশাল বাড়ি। বঞ্চিত- প্রতারিত, যে ঠেকেছে এমন। বিনত- নম্র। ভার্যা- স্ত্রী, বৌ। ভোজ- খাওয়া-দাওয়া। মান্য- সম্মান পাওয়ার যোগ্য। যুবতী- যৌবনবতী মেয়ে। লাজুল- লেজ। শিরোমণি- সমাজের প্রধান ব্যক্তি। শিহরিয়া- শিউরে ওঠা। শুষ্ক মুখ- শুকনো মুখ। সঙ্করণ- অতি দুঃখপূর্ণ। সতরঞ্চ খেলা- দাবা খেলা। সহোদর- একই উদরে জন্ম অর্থাৎ আপন ভাই।



সারসংক্ষেপ

বিজ্ঞ বিড়ালের কথায় সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রতিফলন লক্ষ্য করে কমলাকান্ত কিঞ্চিৎ বিরক্ত হলেন। যে মতবাদে ধনী এবং নির্ধন সমান। কমলাকান্তের যুক্তি হলো ধনী যদি ধন সঞ্চয় না করে তাহলে সমাজের উন্নতি হবে না। আর বিড়াল মনে করে নির্ধন যদি খেতেই না পায় তাহলে সমাজের উন্নতিতে তার লাভ কী? বিড়ালের মতে, চোরকে শাস্তি দেয়ার আগে একটা নিয়ম করা প্রয়োজন। সেটা হলো, বিচারককে তিন দিন না খেয়ে থাকতে হবে। তখন যদি বিচারকের চুরি করে খেতে ইচ্ছে না করে, তবেই তিনি চোরকে শাস্তি দিতে পারবেন। কমলাকান্ত বিড়ালের সঙ্গে তর্কে না পেরে উপদেশ দিতে চাইলেন। বিড়ালকে ধর্মকর্মে মন দিতে বললেন। জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কিছু বইও দিতে চাইলেন। অবশেষে খাবারের ভাগ দিবেন বলে তর্কিক বিড়ালকে চলে যেতে বললেন। খুব খিদে পেলে সর্ষে পরিমাণ আফিমও দিতে চাইলেন। আপোসের কথা শুনে একটু খুশি হয়ে বিদায় নিলো বিড়াল। কমলাকান্ত বিড়ালকে জ্ঞান দিতে পেরেছেন ভেবে আনন্দিত হলেন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯. কমলাকান্ত বিড়ালকে কিসের ভাগ দিতে চেয়েছে?

ক. ছানা	খ. জলখাবার
গ. আফিং	ঘ. দুধ

১০. কী কারণে চোর অপেক্ষা কৃপণ ধনী শতগুণে দোষী?

ক. দরিদ্রের ধন চুরি করে	খ. দরিদ্রকে কিছুই দেয় না
গ. অন্যের সম্পদ লুট করে	ঘ. সমাজের ধন কুক্ষিগত করে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস ও ব্যঙ্গধর্মী রচনার জন্য বিশেষ খ্যাতিমান। তবে তাঁর এই ব্যঙ্গের পেছনে রয়েছে সাম্যচেতনা, ন্যায়বোধ ও মানবিকতা।

১১. উদ্দীপকের চেতনা ‘বিড়াল’ প্রবন্ধে কার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে?

ক. কমলাকান্ত	খ. প্রসন্ন গোয়ালিনী
গ. ওয়েলিংটন	ঘ. বিড়াল



১২. উদ্দীপক ও ‘বিড়াল’ প্রবন্ধে সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে-

- i. সাম্যচেতনা প্রকাশে
- ii. ডিউক মহাশয়ের বক্তব্যে
- iii. বিড়ালের দ্রোহে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. iii
- ঘ. i ও iii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১৩. আফিংখোর কে ?

- ক. ওয়েলিংটন
- খ. ডিউক
- গ. প্রসন্ন
- ঘ. কমলাকান্ত

১৪. ‘পরোপকার’ বলতে বোঝানো হয়েছে-

- ক. মানবধর্ম
- খ. নৈতিক ধর্ম
- গ. পরম ধর্ম
- ঘ. চরম ধর্ম

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

রাস্তার পাশে দশতলা একটি অবৈধ স্থাপনা ভাঙ্গা হবে। স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের লোকজন প্রস্তুত। এলাকার মানুষের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। ওদিকে অপরপাশে রেলের বস্তিটি উচ্ছেদ করার সময় কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

১৫. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিচের কোন রচনার সাদৃশ্য রয়েছে?

- ক. আমার পথ
- খ. অপরিচিতা
- গ. বিড়াল
- ঘ. জীবন ও বৃক্ষ

১৬. উদ্দীপক ও ‘বিড়াল’ প্রবন্ধের উপজীব্য-

- ক. ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য
- খ. প্রতিবাদী চেতনা
- গ. অন্যায়ের প্রতিরোধ
- ঘ. দরিদ্রের প্রতি মমত্ববোধ

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

বনমালী বাবুর বাড়িতে আজ ভোজের আয়োজন। উপলক্ষ আর কিছুই নয়। তার বড় মেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে। তিনি এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দাওয়াত করেছেন। সমাজসেবায় জড়িত থাকার কারণে ছোট নেতারা পর্যন্ত আমন্ত্রণ থেকে বাদ পড়েনি। আমন্ত্রিত অতিথিরা বিলাস-ব্যসনে সময় কাটিয়ে আনন্দচিহ্নে বাড়ি ফেরেন। এর কয়েকদিন পর বনমালী বাবুর বাড়িতে একজন ভিখারি আসে। অভুক্ত ভিখারি ক্ষুধার তাড়নায় বনমালী বাবুর নিকট খাবার খেতে চায়। কিন্তু তিনি ভিখারিকে খাবার না দিয়ে তিরস্কার করেন।

- ক. নেপোলিয়ন কে ছিলেন?
- খ. ‘তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির রোগ’- কেন? বুঝিয়ে বলুন।
- গ. উদ্দীপকে ‘বিড়াল’ প্রবন্ধের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করুন।
- ঘ. “উদ্দীপক ও ‘বিড়াল’ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু চেতনাগত দিক থেকে এক ও অভিন্ন।” -মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :

ডাকিল পাছ, দ্বার খোলো বাবা, খাইনি তো সাত দিন !
সহসা বন্ধ হলো মন্দির, ভুখারি ফিরিয়া চলে,



তিমির রাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে !

ভুখারি ফুকারি কয়,

ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয় !

ক. মার্জার শব্দের অর্থ কী?

খ. ‘অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।’ –বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের ভিখারির সঙ্গে ‘বিড়াল’ প্রবন্ধে কার মিল রয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপকে ‘বিড়াল’ প্রবন্ধের একটি সমাজ-সত্য ফুটে উঠেছে।” –মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন।

খ.

‘তেলা মাথায় তেল দেওয়া’ বলতে ধনীরা যে শুধু ধনীদেবকেই গুরুত্ব দেয় সে বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে।

‘বিড়াল’ প্রবন্ধে মনুষ্যজাতির একটি রোগ বা বিশেষ প্রবণতার কথা বলা হয়েছে। এই রোগটি হলো তেলা মাথায় তেল দেয়া। অর্থাৎ যার সম্পদের অভাব নেই তাকে আরও সহযোগিতা করা। সমাজে সাধারণত দেখা যায় ধনী ব্যক্তির যদি কখনো ভোজের আয়োজন করেন সেখানে ধনী ব্যক্তিদেরই প্রাধান্য থাকে। তাদের খাবারের অভাব নেই তবুও তারা অন্য ধনী ব্যক্তির বাড়িতে খাবারের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে থাকেন। কিন্তু যারা ক্ষুধার জ্বালায় মরে তারা কিন্তু এসব ভোজসভায় সহসা নিমন্ত্রণ পায় না। এখানে ‘তেলা মাথায় তেল দেওয়া’ বলতে সমাজে ধনিক শ্রেণির এই বিশেষ প্রবণতাকেই বোঝানো হয়েছে।

গ.

উদ্দীপকে বনমালী বাবুর আচরণে অমানবিকতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

সমাজে ধনী ব্যক্তির দরিদ্রদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজেরা বিলাসী জীবন যাপন করে। দরিদ্ররা যে এ সমাজেরই অংশ তা তারা বিবেচনায় আনতে চায় না। অনেক সময় দেখা যায় দরিদ্রদের রক্ত পানি করা পরিশ্রমের অর্থে ধনীরা আরাম আয়েশ করে। ধনীরা মুখে নীতিকথা শোনায়, সুযোগ পেলে ধর্মের বুলি আওড়ায়। কিন্তু দরিদ্রদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। সমাজের উন্নতির নামে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করে।

উদ্দীপকে বনমালী বাবু একজন ধনী ব্যক্তি। তিনি কন্যার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্তি উপলক্ষে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আপ্যায়ন করান। তার আমন্ত্রণ থেকে ছোট-খাট নেতারাও বাদ পড়ে না। কিন্তু কয়েকদিন পরে বাড়িতে একজন ভিখারি এলে তিনি তাকে তাড়িয়ে দেন। বনমালী বাবু সমাজের প্রভাবশালীদের আমন্ত্রণ করে খাইয়েছেন, কিন্তু যে অভুক্ত ও দরিদ্র সে অন্ন ভোগ করতে পারেনি। উদ্দীপকে বনমালী বাবু উপলব্ধি করেননি যে দরিদ্ররাও মানুষ, তাদেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণার যন্ত্রণা আছে। বনমালী বাবুর এ ধরনের আচরণ যেমন অমানবিক তেমনি তা অনৈতিকও বটে। অন্যদিকে ‘বিড়াল’ প্রবন্ধেও দেখা যায়, বিড়াল ও কমলাকান্তের কথোপকথনে দরিদ্রদের প্রতি ধনীদেব এই অবহেলার স্বরূপটি ফুটে ওঠেছে। বলা যায়, বিড়াল প্রবন্ধে ধনীদেবের অমানবিক আচরণের বিষয়টি উদ্দীপকের বনমালী বাবুর আচরণে প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ.

‘বিড়াল’ প্রবন্ধের শ্রেণি-বৈষম্য উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে যা চেতনাগত দিক থেকে এক ও অভিন্ন।

যে সমাজ শ্রেণি চরিত্রকে ধারণ করে সেখানে ধনিক শ্রেণি দরিদ্রদের শোষণ করে অর্থ সঞ্চয় করে। সমাজের উন্নতির কথা বলে তারা নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়। এই ধনিক শ্রেণিটি মুখে ধর্মের কথা শোনায়, আদর্শের কথাও বলে। তাদের এ ধরনের মানসিকতার কারণে সমাজে দরিদ্ররা আরও নিঃস্ব হয়। একটি সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে এটা অন্তরায় সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি বনমালী বাবু তার কন্যার জিপিএ-৫ প্রাপ্তি উপলক্ষে বাড়িতে ভোজের আয়োজন করেছেন। সেখানে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ছোট নেতারা পর্যন্ত আমন্ত্রিত হয়েছেন। কিন্তু এই ভোজ অনুষ্ঠানে দরিদ্রদের আহ্বারের কোনো সুযোগ নেই, অথচ তারা অভুক্ত। বনমালী বাবু এই ভোজ অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পর তার বাড়িতে আসা



একজন ভিখারীকে খাবার না দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে ‘বিড়াল’ প্রবন্ধে দেখি বিড়াল শোষিত শ্রেণি ও কমলাকান্ত ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধি। বিড়াল ও কমলাকান্তের কথোপকথনে উঠে এসেছে ধনীরা কীভাবে দরিদ্রদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করে। সমাজে দরিদ্রদের প্রতিবাদে কোন কাজ হয় না। বরং তারা যেন শোষক শ্রেণির যাঁতাকলে নিয়ত চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। বস্তুত ‘বিড়াল’ প্রবন্ধে কমলাকান্ত ও বিড়ালের আলোচনায় এই চিরকালীন সমাজ সত্যটিই ফুটে উঠেছে।

‘বিড়াল’ প্রবন্ধে বিড়াল দরিদ্র শ্রেণি এবং কমলাকান্ত ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধি। উদ্দীপকের বনমালী চরিত্রেও ধনিক শ্রেণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। উভয়টিতে দেখা যায় দরিদ্ররা বরাবরই শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে। মানুষকে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ধনীরা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থেকেছে। দরিদ্রদের বাঁচার অধিকারটুকুকেও এই ধনিক শ্রেণি স্বীকৃতি দেয় না। যদিও এ শোষণ ও নিপীড়ন একটি মানবিক সমাজ গঠনের পক্ষে বেশ অন্তরায়। সবশেষে বলা যায়, উদ্দীপক ও ‘বিড়াল’ প্রবন্ধ চেতনাগত দিক থেকে এক ও অভিন্ন।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসে হোসেন মিয়া একটি রহস্যময় চরিত্র। উপন্যাসে সে একটি দ্বীপের মালিক, যার নাম ময়না দ্বীপ। ময়না দ্বীপে হোসেন মিয়া সকল শ্রেণির মানুষের আবাস গড়তে চায়। সে স্বপ্ন দেখে এখানে কোনো ধর্মীয় ভেদ থাকবে না, কোনো অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি হবে না। এখানকার সকল মানুষ সমাজে সম অধিকারে বসবাস করবে। এখানে এমন একটি স্বপ্নের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে সকল সময়ে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকবে।

ক. কার দোষে দরিদ্ররা চোর হয়?

খ. ‘খাইতে দাও, নহিলে চুরি করিব।’ –বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘বিড়াল’ রচনাটির মিলগুলো তুলে ধরুন।

ঘ. “হোসেন মিয়ার ভাবনাই ‘বিড়াল’ রচনাটিতে প্রকাশিত হয়েছে।” –উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

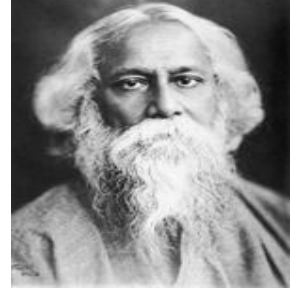


উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. ক ৩. ক ৪. গ ৫. খ ৬. গ ৭. গ ৮. খ ৯. গ ১০. ঘ ১১. ক ১২. ঘ
১৩. ক ১৪. গ ১৫. গ ১৬. ক



অপরিচিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



লেখক-পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ বাবা-মার চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র। তাঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার জন্য পাঠানো হলেও বিদ্যালয়ের পড়ালেখার প্রতি তিনি মনোযোগী ছিলেন না। ঠাকুর বাড়ির অনুকূল পরিবেশে শৈশবেই রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ১৮৭৬ সালে পনের বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ বনফুল। অতঃপর কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, ভ্রমণসাহিত্য, রম্যরচনা, সঙ্গীত ইত্যাদি শাখায় রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন তাঁর অসামান্য শিল্প প্রতিভার স্বাক্ষর। তাঁর হাতেই সম্পন্ন হয় বাংলা ছোটগল্পের ভিত্তি ও প্রতিষ্ঠা। মাত্র ষোল বছর বয়সে ‘ভিখারিনী’ গল্প রচনার মধ্য দিয়ে ছোটগল্প-লেখক হিসেবে তাঁর আবির্ভাব। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন গ্রন্থে মোট ১১৯টি ছোটগল্প লিখেছেন। তাঁর সর্বশেষ গল্পটির নাম ‘মুসলমানির গল্প’। গল্পরচনায় বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও বিশেষ করে শিলাইদহ তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এজন্য তাঁর গল্পে প্রকৃতি একটি বিশেষ চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। গীতিময়তা তাঁর গল্পের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কেবল সাহিত্যিক হিসেবেই নয়, একজন কর্মযোগী মানুষ হিসেবেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্য কীর্তির পরিচয় রেখে গেছেন। ১৯০১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়’। এটিই পরবর্তীকালে ‘বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়’-এ রূপলাভ করে। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতাঞ্জলি (১৯১১) কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে প্রথম কৃষিব্যাংক স্থাপন করেন। বাংলাদেশের শিলাইদহ, পতিসর এবং শাহজাদপুরে জমিদারি তত্ত্বাবধান সূত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত করেন। গীতিকার ও চিত্রশিল্পী হিসেবেও রবীন্দ্রনাথের অবদান অনন্য সাধারণ। ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ) কলকাতায় তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

- কাব্যগ্রন্থ** : মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), ক্ষণিকা (১৯০০), গীতাঞ্জলি (১৯১১) বলাকা (১৯১৬), পুনশ্চ (১৯৩২), জন্মদিনে (১৯৪১), শেষলেখা (১৯৪১);
- উপন্যাস** : চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯১০), ঘরে-বাইরে (১৯১৬), শেষের কবিতা (১৯২৯);
- ছোটগল্প** : গল্পগুচ্ছ (১ম ও ২য় খণ্ড-১৯২৬, ৩য় খণ্ড-১৯২৭), তিনসঙ্গী (১৯৪১), গল্পসল্প (১৯৪১);
- নাটক** : বিসর্জন (১৮৯০), চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২), অচলায়তন (১৯১২), ডাকঘর (১৯১২), রক্তকরবী (১৯২৬);
- প্রবন্ধ** : আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭), কালান্তর (১৯৩৭), সাহিত্যের স্বরূপ (১৯৪৩);
- আত্মজীবনী** : জীবন স্মৃতি (১৯১২), ছেলেবেলা (১৯৪০)।

ভূমিকা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ছোটগল্প ‘অপরিচিতা’ প্রথম প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক ‘সবুজপত্র’ পত্রিকার ১৩২১ বঙ্গাব্দের (১৯১৪) কার্তিক সংখ্যায়। এটি তৎকালীন উচ্চ সমাজের সংকীর্ণ মানসিকতা-বিষয়ক একটি গল্প। গল্পটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় রবীন্দ্র গল্পের সংকলন ‘গল্পসংগৃহ’-এ এবং পরে ‘গল্পগুচ্ছ’ তৃতীয় খণ্ডে (১৯২৭)। যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে এটি একটি প্রতিবাদী গল্প। অন্যদিকে, গল্পকারএখানেনারীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে তাঁর নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় ব্যাখ্যা করেছেন।



সাধারণ উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘অপরিচিতা’ গল্পটি পড়ার পর আপনি–



রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন।



যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের কথা আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

পাঠ-১



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–



ব্যক্তিত্বহীন অনুপমের চরিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।



যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে শম্ভুনাথ বাবুর প্রতিরোধের চিত্র তুলে ধরতে পারবেন।



মূলপাঠ

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না গুণের হিসাবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বৃকের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানে ফলের মতো গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে যাঁহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস বুঝিবেন।

কলেজে যতগুলো পরীক্ষা পাস করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া, বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড়ো লজ্জা পাইতাম; কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সুরূপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রূপ আবার যেন অমনি করিয়াই প্রকাশ পায়।

আমার পিতা এক কালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ভোগ করিবার সময় নিমেষমাত্রও পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তখন বয়স অল্প। মার হাতেই আমি মানুষ। মা গরিবের ঘরের মেয়ে; তাই, আমরা যে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না, আমাকে ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে কোলেই মানুষ— বোধ করি, সেইজন্য শেষ পর্যন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না। আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অল্পপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।

আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়োজোর বছর ছয়েক বড়। কিন্তু ফল্লুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গণ্ডুষও রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো-কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না।

কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সৎপাত্র। তামাকটুকু পর্যন্ত খাই না। ভালোমানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্জাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমানুষ। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে— বস্তুত, না মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি, যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বর হন তবে এই সুলক্ষণটি স্মরণ রাখিবেন।

অনেক বড়ো ঘর হইতে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কিন্তু মামা, যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল ধনীর কন্যা তাঁর পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া



আসিবে, এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তাঁর অস্থিমজ্জায় জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসুর করিবে না। যাহোক শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুড়ির পরিবর্তে বাঁধা হুঁকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না।

আমার বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে। সে ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল, “ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।”

কিছুদিন পূর্বেই এমএ পাস করিয়াছি। সামনে যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধু ধু করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদরি নাই, চাকরি নাই; নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই— থাকিবার মধ্যেও ভিতরে আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।

এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল— আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিঃশ্বাস, তরুর্মর্মে তাহার গোপন কথা।

এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, “মেয়ে যদি বল, তবে—”। আমার শরীর-মন বসন্তবাতাসে বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া বুনিতে লগিল। হরিশ মানুষটা ছিল রসিক, রস দিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল তৃষার্ত।

আমি হরিশকে বলিলাম, “একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখো।”

হরিশ আসর জমাইতে অদ্বিতীয়। তাই সর্বদাই তাহার খাতির। মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি চান তেমনি। এক কালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শূন্য বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছু বাকি আছে। দেশে বংশমর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরিব গৃহস্থের মতোই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই। সুতরাং তাহারই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একেবারে উপুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না।

এসব ভালো কথা। কিন্তু, মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। বংশে তো কোনো দোষ নাই? না, দোষ নাই— বাপ কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খুঁজিয়া পান না। একে তো বরের হাট মহার্ঘ, তাহার পরে ধনুক-ভাঙা পণ, কাজেই বাপ কেবলই সবুর করিতেছেন— কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না।

যাই হোক, হরিশের সরস রসনার গুণ আছে। মামার মন নরম হইল। বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল। কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আভ্যমান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া জানেন। জীবনে একবার বিশেষ কাজে তিনি কোল্লগর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। মামা যদি মনু হইতেন তবে তিনি হাবড়ার পুল পার হওয়াটাকে তাঁহার সংহিতায় একেবারে নিষেধ করিয়া দিতেন। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল, নিজের চোখে মেয়ে দেখিয়া আসিব। সাহস করিয়া প্রস্তাব করিতে পারিলাম না।

কন্যাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য যাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিনুদাদা, আমার পিস্ততো ভাই। তাহার মতো রুচি এবং দক্ষতার পরে আমি ষোলো-আনা নির্ভর করিতে পারি। বিনুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, “মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে!”

বিনুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। যেখানে আমরা বলি ‘চমৎকার’ সেখানে তিনি বলেন ‘চলনসই’। অতএব বুঝিলাম, আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।

২

বলা বাহুল্য, বিবাহ-উপলক্ষে কন্যাপক্ষকেই কলিকাতায় আসিতে হইল। কন্যার পিতা শঙ্কুনাথবাবু হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে, বিবাহের তিন দিন পূর্বে তিনি আমাকে প্রথম চক্ষে দেখেন এবং আশীর্বাদ করিয়া যান। বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে। চুল কাঁচা, গৌফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। সুপুরুষ বটে। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তাঁর উপরে চোখ পড়িবার মতো চেহারা।

আশা করি আমাকে দেখিয়া তিনি খুশি হইয়াছিলেন। বোঝা শক্ত, কেননা তিনি বড়ই চুপচাপ। যে দুটি-একটি কথা বলেন যেন তাহাতে পুরা জোর দিয়া বলেন না। মামার মুখ তখন অনর্গল ছুটিতেছিল— ধনে মানে আমাদের স্থান যে শহরের কারও চেয়ে কম নয়, সেইটেকেই তিনি নানা প্রসঙ্গে প্রচার করিতেছিলেন। শঙ্কুনাথবাবু এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না—



কোনো ফাঁকে একটা হুঁ বা হ্যাঁ কিছুই শোনা গেল না। আমি হইলে দমিয়া যাইতাম, কিন্তু মামাকে দমানো শক্ত। তিনি শম্ভুনাথবাবুর চুপচাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন, লোকটা নিতান্ত নির্জীব, একেবারে কোনো তেজ নাই। বেহাই-সম্প্রদায়ের আর যাই থাক, তেজ থাকাটা দোষের, অতএব মামা মনে মনে খুশি হইলেন। শম্ভুনাথবাবু যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন, গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেলেন না।

পণ সম্বন্ধে দুই পক্ষের পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়া গিয়াছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্তায় কোথাও তিনি কিছু ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অঙ্ক তো স্থির ছিলই, তারপরে গহনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে বাঁধাবাঁধি হইয়া গিয়াছিল। আমি নিজে এসমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না; জানিতাম না দেনা-পাওনা কী স্থির হইল। মনে জানিতাম, এই স্থূল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ, এবং সে অংশের ভার যার উপরে তিনি এক কড়াও ঠকিবেন না। বস্তুত, আশ্চর্য পাকা লোক বলিয়া মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্রী। যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে সেখানে সর্বত্রই তিনি বুদ্ধির লড়াইয়ে জিতিবেন, এ একেবারে ধরা কথা, এই জন্য আমাদের অভাব না থাকিলেও এবং অন্য পক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব, আমাদের সংসারের এই জেদ-ইহাতে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

গায়ে-হলুদ অসম্ভব রকম ধূম করিয়া গেল। বাহক এত গেল যে তাহার আদমশুমারি করিতে হইলে কেরানি রাখিতে হয়। তাহাদিগকে বিদায় করিতে অপর পক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা একযোগে বিস্তর হাসিলেন।

ব্যান্ড, বাঁশি, শখের কন্সট প্রভৃতি যেখানে যতপ্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমস্ত একসঙ্গে মিশাইয়া বর্বর কোলাহলের মত হস্তী দ্বারা সংগীত সরস্বতীর পদবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আংটিতে হারেতে জরি-জহরাতে আমার শরীর যেন গহনার দোকান নিলামে চড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবী জামাইয়ের মূল্য কত সেটা যেন কতক পরিমাণে সর্বাস্থে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম।

মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না। একে তো উঠানটাতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের। ইহার পরে শম্ভুনাথবাবুর ব্যবহারটাও নেহাত ঠাণ্ডা। তাঁর বিনয়টা অজল্ নয়। মুখে তো কথাই নাই কোমরে চাদর বাঁধা, গলা ভাঙা, টাক-পড়া, মিশ-কালো এবং বিপুল-শরীর তাঁর একটি উকিল-বন্ধু যদি নিয়ত হাত জোড় করিয়া মাথা হেলাইয়া, নম্রতার স্নিতহাস্যে ও গদগদ বচনে কন্সট পার্টির করতাল-বাজিয়ে হইতে শুরু করিয়া বরকর্তাদের প্রত্যেককে বার বার প্রচুররূপে অভিব্যক্তি করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই এটা এস্পার-ওস্পার হইত।

আমি সভায় বসিবার কিছুক্ষণ পরেই মামা শম্ভুনাথবাবুকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কী কথা হইল জানি না, কিছুক্ষণ পরেই শম্ভুনাথবাবু আমাকে আসিয়া বলিলেন, “বাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।”

ব্যাপারখানা এই।—সকলের না হউক, কিন্তু কোনো কোনো মানুষের জীবনের একটা কিছু লক্ষ্য থাকে। মামার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তিনি কোনোমতেই কারও কাছে ঠকিবেন না। তাঁর ভয় তাঁর বেহাই তাঁকে গহনায় ফাঁকি দিতে পারেন—বিবাহকার্য শেষ হইয়া গেলে সে ফাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না। বাড়িভাড়া সওগাদ লোক-বিদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরকম টানাটানির পরিচয় পাওয়া গেছে তাহাতে মামা ঠিক করিয়াছিলেন—দেওয়া-খোওয়া সম্বন্ধে এ লোকটির শুধু মুখের কথার উপর ভর করা চলিবে না। সেইজন্য বাড়ির স্যাকরাকে সুদূর সঙ্গ আনিয়াছিলেন। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, মামা এক তক্তপোশে এবং স্যাকরা তাহার দাঁড়িপাল্লা কষ্টিপাথর প্রভৃতি লইয়া মেজেয় বসিয়া আছে।

শম্ভুনাথবাবু আমাকে বলিলেন, “তোমার মামা বলিতেছেন বিবাহের কাজ শুরু হইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা যাচাই করিয়া দেখিবেন, ইহাতে তুমি কী বল।”

আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মামা বলিলেন, “ও আবার কী বলিবে। আমি যা বলিব তাই হইবে।”

শম্ভুনাথবাবু আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, “সেই কথা তবে ঠিক? উনি যা বলিবেন তাই হইবে? এ সম্বন্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই?”

আমি একটু ঘাড়-নাড়ার ইঙ্গিতে জানাইলাম, এসব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার।



“আচ্ছা তবে বোসো, মেয়ের গা হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া আনিতেছি।” এই বলিয়া তিনি উঠিলেন।

মামা বলিলেন, “অনুপম এখানে কী করিবে। ও সভায় গিয়া বসুক।”

শম্ভুনাথ বলিলেন, “না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।”

কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানা গামছায় বাঁধা গহনা আনিয়া তত্ত্বপোশের উপর মেলিয়া ধরিলেন। সমস্তই তাঁহার পিতামহীদের আমলের গহনা— হাল ফ্যাশনের সূক্ষ্ম কাজ নয়— যেমন মোটা তেমনি ভারী।

স্যাকরা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, “এ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ নাই— এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।”

এই বলিয়া সে মকরমুখা মোটা একখানা বালায় একটু চাপ দিয়া দেখাইল তাহা বাঁকিয়া যায়।

মামা তখনই নোটবইয়ে গহনাগুলির ফর্দ টুকিয়া লইলেন, পাছে যাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে। হিসাব করিয়া দেখিলেন, গহনা যে পরিমাণ দিবার কথা এগুলি সংখ্যায় দরে এবং ভারে তার অনেক বেশি। গহনাগুলির মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল। শম্ভুনাথ সেইটে স্যাকরার হাতে দিয়া বলিলেন, “এইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।”

স্যাকরা কহিল, “ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার ভাগ সামান্যই আছে।”

শম্ভুবাবু এয়ারিং জোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, “এটা আপনারাই রাখিয়া দিন।”

মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাঁহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না এই আনন্দ-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি-পাওনা জুটিল। অত্যন্ত মুখ ভার করিয়া বলিলেন, “অনুপম, যাও, তুমি সভায় গিয়ে বোসো গে।”

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, “না, এখন সভায় বসিতে হইবে না। চলুন, আগে আপনাদের খাওয়াইয়া দিই।”

মামা বলিলেন, “সে কী কথা। লগ্ন—”

শম্ভুনাথবাবু বলিলেন, “সেজন্য কিছু ভাবিবেন না— এখন উঠুন।”

লোকটি নেহাত ভালোমানুষ-ধরনের, কিন্তু ভিতরে বেশ একটু জোর আছে বলিয়া বোধ হইল। মামাকে উঠিতে হইল। বরযাত্রীদেরও আহার হইয়া গেল। আয়োজনের আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু রান্না ভালো এবং সমস্ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া সকলেরই তৃপ্তি হইল।

বরযাত্রীদের খাওয়া শেষ হইলে শম্ভুনাথবাবু আমাকে খাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন, “সে কী কথা। বিবাহের পূর্বে বর খাইবে কেমন করিয়া।”

এ সম্বন্ধে মামার কোনো মতপ্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তুমি কী বল। বসিয়া যাইতে দোষ কিছু আছে?”

মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা-স্বরূপে মামা উপস্থিত, তাঁর বিরুদ্ধে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আহারে বসিতে পারিলাম না।

তখন শম্ভুনাথবাবু মামাকে বলিলেন, “আপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। আমরা ধনী নই, আপনাদের যোগ্য আয়োজন করিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কষ্ট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে—”

মামা বলিলেন, “তা, সভায় চলুন, আমরা তো প্রস্তুত আছি।”

শম্ভুনাথ বলিলেন, “তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই?”

মামা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, “ঠাট্টা করিতেছেন নাকি।”

শম্ভুনাথ কহিলেন, “ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।”

মামা দুই চোখ এত বড়ো করিয়া মেলিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

শম্ভুনাথ কহিলেন, “আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।”



আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যিক বোধ করিলেন না। কারণ, প্রমাণ হইয়া গেছে, আমি কেহই নই।

তারপরে যা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ঝাড়লণ্ঠন ভাঙিয়া-চুরিয়া, জিনিসপত্র লুণ্ঠন করিয়া, বরষাত্রেয় দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যান্ড রসনচৌকি ও কম্পট একসঙ্গে বাজিল না এবং অত্রের ঝাড়গুলো আকাশের তারার উপর আপনাদের কর্তব্যের বরাত দিয়া কোথায় যে মহানির্বাণ লাভ করিল সন্ধান পাওয়া গেল না।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অন্তঃপুর— অন্দরমহল, ভেতরবাড়ি। **অন্নপূর্ণা**— অন্নে পরিপূর্ণা, দেবী দুর্গা। **অবকাশের মরুভূমি** এক কালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল— লক্ষ্মী ধন ও ঐশ্বর্যের দেবী। **মঙ্গলঘট** তাঁর প্রতীক। কল্যাণীদের বংশে একসময় লক্ষ্মীর কৃপায় ঐশ্বর্যের ঘট পূর্ণ ছিল। **অভিষিক্ত**— অভিষেক করা হয়েছে এমন। **‘আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।’**— দেবী দুর্গার দুই পুত্র; অথজ গণেশ ও অনুজ কার্তিকেয়। মা দুর্গার কোলে থাকা দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়কে বোঝানো হয়েছে। **ব্যঙ্গার্থে** প্রয়োগ। **আভ্যমান দ্বীপ**— ভারতীয় সীমানাভুক্ত বঙ্গোপসাগরের দ্বীপবিশেষ। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রাজবন্দিদের নির্বাসন শাস্তি দিয়ে আভ্যমান বা আন্দামানে পাঠানো হতো। **উমেদারি**— প্রার্থনা, চাকরির আশায় অন্যের কাছে ধরনা দেওয়া। **‘এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়ো, না গুণের হিসাবে’**— গল্পের কথক চরিত্র অনুপমের আত্মসমালোচনা। পরিমাণ ও গুণ উভয় দিক দিয়েই যে তার জীবনটি নিতান্তই তুচ্ছ সে কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। **কষ্টিপাথর**— যে পাথরে ঘষে সোনার খাঁটিত্ব যাচাই পরীক্ষা করা হয়। **কম্পট**— নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান। **কোল্লগর**— কলকাতার নিকটস্থ একটি স্থান। **গজানন**— গজ আনন যার, গণেশ। **গণ্ডুষ**— একমুখ বা এককোষ জল। **গুড়গুড়ি**— আলবোলা, দীর্ঘ নলযুক্ত হুকাবিশেষ। **তরুর্মর**— গাছের শুকনা পাতার মরমর ধ্বনি। **দক্ষযজ্ঞ**— প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ। এ যজ্ঞে পতিনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করেন। স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ শুনে শিব অনুচরসহ যজ্ঞস্থলে পৌঁছে যজ্ঞ ধ্বংস করে দেন এবং সতীর শব কাঁধে তুলে নিয়ে প্রলয় নৃত্যে মত্ত হন। এখানে প্রলয়কাণ্ড বা হটগোল বোঝাচ্ছে। **দেওয়া-খোওয়া**— বিয়ের যৌতুক ও আনুষঙ্গিক খরচ বোঝাতে কথাটি বলা হয়েছে। **পশ্চিমে**— এখানে ভারতের পশ্চিম অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। **পঞ্চশর**— মদনদেবের ব্যবহার্য পাঁচ ধরনের বাণ। **প্রজাপতি**— জীবের স্রষ্টা, ব্রহ্মা, বিয়ের দেবতা। **ফণ্ডফন্ডু**— ভারতের গয়া অঞ্চলের অন্তঃসলিলা নদী। নদীটির ওপরের অংশে বালির আন্তরণ কিন্তু ভেতরে জলশ্রোত প্রবাহিত। **ফলের মতো গুটি**— গুটি এক সময় পূর্ণ ফলে পরিণত হয়। কিন্তু গুটিই যদি ফলের মতো হয় তাহলে তার অসম্পূর্ণ সারবত্তা প্রকট হয়ে ওঠে। নিজের নিষ্ফল জীবনকে বোঝাতে অনুপমের ব্যবহৃত উপমা। **‘ফন্ডু বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন।’**— অনুপম তার মামার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে কথাটি বলেছে। সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব পালনে তার ভূমিকা এখানে উপমার মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। **‘বর্বর কোলাহলের মত্ত হস্তী দ্বারা সংগীতসরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম’**— অনুপম নিজের বিবাহযাত্রার পরিস্থিতি বর্ণনায় সূরশূন্য বিকট কোলাহলের সঙ্গে সংগীত সরস্বতীর পদ্মবন দলিত হওয়ার তুলনা করেছে। **বাঁধা হুঁকা**— সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য নারকেল-খোলে তৈরি ধূমপানের যন্ত্রবিশেষ। **বিদ্রূপ**— পরিহাস, ঠাট্টা। **বিমর্ষ**— বিষণ্ণ, মনমরা। **মকরমুখো**— মকর বা কুমিরের মুখের অনুরূপ। **মকরমুখো মোটা একখানা বালা**— মকরের মুখাকৃতিযুক্ত হাতে পরিধেয় অলঙ্কারবিশেষ। **মনু**— বিধানকর্তা বা শাস্ত্রপ্রণেতা মুনিবিশেষ। **মনু সংহিতা**— মনু-প্রণীত মানুষের আচরণবিধি সংক্রান্ত গ্রন্থ। **মহানির্বাণ**— সবারকমের বন্ধন থেকে মুক্তি। **মরীচিকা**— বৃথা আশার ছলনা। **মহার্ষ**— মহামূল্যবান। **মাকাল ফল**— দেখতে সুন্দর অথচ ভেতরে দুর্গন্ধ ও শাঁসযুক্ত খাওয়ার অনুপযোগী ফল। বিশেষ অর্থে গুণহীন। **লগ্ন**— উপযুক্ত বা শুভ সময়। **লোক-বিদায়**— পাওনা পরিশোধ। এখানে অনুষ্ঠানের শেষে পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধের কথা বলা হয়েছে। **সওগাদ**— উপঢৌকন, ভেট। **স্বয়ংবরা**— যে মেয়ে নিজেই স্বামী নির্বাচন করে। **স্কুলিঙ্গ**— আগুনের ফুলকি বা কণা। **হিতৈষী**— মঙ্গল করতে ইচ্ছুক।



সারসংক্ষেপ

যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের গল্প ‘অপরিচিতা’— ব্যক্তিত্বহীন এক যুবক অনুপমের জীবনিতো লেখা। গল্পে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী কল্যাণী ও তার পিতা শম্ভুনাথ সেনের চারিত্রিক দৃঢ়তার ফলে সমাজে গেড়ে বসা



ঘণ্য যৌতুক প্রথা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। অনুপমের বয়স যখন অল্প, তার বাবা ওকালতি করে প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়েও ভোগ করার আগেই মারা যান। পিতৃহারা পুত্রকে তার মা এতটুকু কষ্ট করতে দেননি, ফলে সাধারণ ঘরের ছেলেদের মতো অনুপমের মানসিক বয়োবৃদ্ধি ঘটেনি। তার মামাই এখন অভিভাবক হয়ে সমস্ত সংসারটিকে কুক্ষিগত করেছেন। আর্থিক অবস্থা ভালো না হলেও শম্ভুনাথ বাবুর একমাত্র মেয়ে কল্যাণীর সঙ্গে অনুপমের বিয়ের প্রস্তাব এলে তার মামা রাজী হয়ে যান। বিয়ের দিন মামা আকস্মিকভাবেই কন্যাপক্ষের দেওয়া সমস্ত গহনা যাচাই করতে চাইলে শম্ভুনাথ বাবু বিস্মিত ও মনঃক্ষুণ্ণ হন। তিনি কল্যাণীকে আর অনুপমের হাতে সমর্পণ না করেই অতিথিদের যথারীতি আপ্যায়ন করিয়ে বিদায় দিলেন। বিয়েটা এভাবেই ভেঙে গেল।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন অঞ্চল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পলেখাকে প্রভাবিত করেছিল?

ক. কোল্লগর

খ. শিলাইদহ

গ. কানপুর

ঘ. জোড়াসাঁকো

২. স্বয়ংবরা বলতে বোঝায়—

i. যে মেয়ে নিজে স্বামী নির্বাচন করে

ii. যে মেয়ের মামা স্বামী নির্বাচন করে

iii. যে মেয়ের পিতা স্বামী নির্বাচন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

রবীন্দ্র ছোটগল্পকে এক দিক থেকে বাঙালির জীবনভাষ্য বলা চলে। তাঁর গল্পে একদিকে যেমন পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার স্ফুরণ ঘটেছে, তেমনি একইসঙ্গে পুরুষের ভাষ্যে নারীর প্রশস্তিও কীর্তিত হয়েছে।

৩. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু কোন রচনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?

ক. অপরিচিতা

খ. আমার পথ

গ. বিলাসী

ঘ. চাষার দুস্কু

৪. উদ্দীপক ও ‘অপরিচিতা’ গল্পে মিল রয়েছে যে বিষয়ে—

i. বন্ধন থেকে মুক্তিতে

ii. পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতায়

iii. নারীর প্রশস্তিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. ii ও iii

পাঠ-২



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—



বলিষ্ঠব্যক্তিত্বের অধিকারী কল্যাণী চরিত্রটি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।



যৌতুক প্রথা প্রতিরোধে নারীশিক্ষা জোরদারে কল্যাণীর সামাজিক অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

৩

বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আশুন। কন্যার পিতার এত গুমর! কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল! সকলে বলিল, “দেখি, মেয়ের বিয়ে দেন কেমন করিয়া।” কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না এ ভয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কী।

মস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এত বড় সৎপাত্রের কপালে এত বড়ো কলঙ্কের দাগ কোন নষ্ট গ্রহ এত আলো জ্বলাইয়া, বাজনা বাজাইয়া, সমারোহ করিয়া আঁকিয়া দিল? বরযাত্রীরা এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে, “বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল—পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অনুসুদ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফসোস মিটিত।”

বিবাহের চুক্তিভঙ্গ ও মানহানির দাবিতে নালিশ করিব বলিয়া মামা অত্যন্ত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা বুঝাইয়া দিল, তাহা হইলে তামাশার যেটুকু বাকি আছে তাহা পুরা হইবে।

বলা বাহুল্য, আমিও খুব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শম্ভুনাথ বিষম জন্ম হইয়া আমাদের পায়ে ধরিয়া আসিয়া পড়েন, গৌফের রেখায় তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু, এই আক্রোশের কালো রঙের শ্রোতের পাশাপাশি আর একটা শ্রোত বহিতেছিল যেটার রঙ একেবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল—এখনো যে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না। দেয়ালটুকুর আড়ালে রহিয়া গেল গো। কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তিম, হৃদয়ের ভিতরে কী যে তা কেমন করিয়া বলিব। আমার কল্পলোকের কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল। হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দ শুনি—কেবল আর একটিমাত্র পা ফেলার অপেক্ষা—এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দূরত্বটুকু এক মুহূর্তে অসীম হইয়া উঠিল!

এতদিন যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিনুদাদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম! বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফুলিঙ্গের মতো আমার মনের মাঝখানে আশুন জ্বলিয়া দিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য; কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তাহার ছবি, সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল। বাহিরে তো সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না—এইজন্য মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মতো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হরিশের কাছে শুনিয়াছি, মেয়েটিকে আমার ফটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল। পছন্দ করিয়াছে বৈকি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে, সে ছবি তার কোনো একটি বাক্সের মধ্যে লুকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক-একদিন নিরালা দুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না। যখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুই ধার দিয়া এলোচুল আসিয়া পড়ে না। হঠাৎ বাহিরে কারও পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না।

দিন যায়। একটা বৎসর গেল। মামা তো লজ্জায় বিবাহসম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না। মার ইচ্ছা ছিল, আমার অপমানের কথা যখন সমাজের লোকে ভুলিয়া যাইবে তখন বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন।

এদিকে আমি শুনলাম সে মেয়ের নাকি ভালো পাত্র জুটিয়াছিল, কিন্তু সে পণ করিয়াছে বিবাহ করিবে না। শুনিয়া আমার মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গেল। আমি কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম, সে ভালো করিয়া খায় না; সন্ধ্যা হইয়া আসে, সে চুল বাঁধিতে ভুলিয়া যায়। তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন, “আমার মেয়ে দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছে কেন।” হঠাৎ কোনোদিন তার ঘরে আসিয়া দেখেন, মেয়ের দুই চক্ষু জলে ভরা। জিজ্ঞাসা করেন, “মা, তোর কী হইয়াছে বল আমাকে।” মেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলে, “কই কিছুই তো হয়নি বাবা।” বাপের এক মেয়ে যে-বড়ো আদরের মেয়ে। যখন অনাবৃষ্টির দিনে ফুলের কুঁড়িটির মতো মেয়ে একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে তখন বাপের প্রাণে আর সহিল না। তখন অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন আমাদের দ্বারে। তার পরে? তার পরে মনের মধ্যে সেই যে কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে সে যেন কালো সাপের মতো রূপ ধরিয়া ফাঁস করিয়া উঠিল। সে বলিল, “বেশ তো, আর একবার বিবাহের আসর সাজানো হোক, আলো জ্বলুক, দেশ-বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক, তার পরে তুমি বরের টোপের পায়ে



দলিয়া দলবল লইয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া এসো।” কিন্তু, যে ধারাটি চোখের জলের মতো শুভ্র সে রাজহংসের রূপ ধরিয়া বলিল, “যেমন করিয়া আমি একদিন দময়ন্তীর পুষ্পবনে গিয়াছিলাম, তেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া যাইতে দাও— আমি বিরহিণীর কানে কানে একবার সুখের খবরটা দিয়া আসি গে।” তার পরে? তার পরে দুঃখের রাত পোহাইল, নববর্ষার জল পড়িল, স্নান ফুলটি মুখ তুলিল— এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত পৃথিবীর আর সবাই, আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটিমাত্র মানুষ। তার পরে? তার পরে আমার কথাটি ফুরালো।

8

কিন্তু, কথা এমন করিয়া ফুরাইল না। যেখানে আসিয়া তাহা অফুরান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একটুখানি বলিয়া আমার এ লেখা শেষ করিয়া দিই।

মাকে লইয়া তীর্থে চলিয়াছিলাম। আমার উপরেই ভার ছিল। কারণ মামা এবারেও হাবড়ার পুল পার হন নাই। রেলগাড়িতে ঘুমাইতেছিলাম। বাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো স্বপ্নের বুঝবুঝি বাজিতেছিল। হঠাৎ একটা কোন স্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম। আলোতে অন্ধকার মেশা সেও এক স্বপ্ন। কেবল আকাশের তারাগুলি চিরপরিচিত— আর সবই অজানা অস্পষ্ট; স্টেশনের দীপ-কয়টা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আলো ধরিয়া এই পৃথিবীটা যে কত অচেনা এবং যাহা চারিদিকে তাহা যে কতই বহু দূরে তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ির মধ্যে মা ঘুমাইতেছেন; আলোর নিচের সবুজ পর্দা টানা; তোরঙ্গ বাক্স জিনিসপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহারা যেন স্বপ্নলোকের উলট-পালট আসবাব, সবুজ প্রদোষের মিটমিটে আলোতে থাকা এবং না-থাকার মাঝখানে কেমন একরকম হইয়া পড়িয়া আছি।

এমন সময়ে সেই অদ্ভুত পৃথিবীর অদ্ভুত রাত্রি কে বলিয়া উঠিল, “শিগগির চলে আয় এই গাড়িতে জায়গা আছে।” মনে হইল, যেন গান শুনলাম। বাঙালি মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কী মধুর তাহা এমন করিয়া অসময়ে অজায়গায় আচমকা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু, এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা বলিয়া একটি শ্রেণিভুক্ত করিয়া দেওয়া চলে না, এ কেবল একটি মানুষের গলা; শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে, “এমন তো আর শুনি নাই।”

চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য। রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনির্বচনীয়, আমার মনে হয় কণ্ঠস্বর যেন তারই চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানালা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিলাম, কিছুই দেখিলাম না। প্লাটফর্মের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গার্ড তাহার একচক্ষু লণ্ঠন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল; আমি জানলার কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার চোখের সামনে কোনো মূর্তি ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম। সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো সুর, অচেনা কণ্ঠের সুর, এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছ। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণ তুমি— চঞ্চল কালের ক্ষুদ্র হৃদয়ের উপরে ফুলটির মতো ফুটিয়াছ, অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি পাপড়িও টলে নাই, অপরিমেয় কোমলতায় এতটুকু দাগ পড়ে নাই।

গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল; আমি মনের মধ্যে গান শুনিতে শুনিতে চলিলাম। তাহার একটিমাত্র ধূয়া— “গাড়িতে জায়গা আছে।” আছে কি, জায়গা আছে কি। জায়গা যে পাওয়া যায় না, কেউ যে কাকেও চেনে না। অথচ সেই না-চেনাটুকু যে কুয়াশামাত্র, সে যে মায়া, সেটা ছিন্ন হইলেই যে চেনার আর অন্ত নাই। ওগো সুধাময় সুর, যে হৃদয়ের অপরূপ রূপ তুমি, সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়। জায়গা আছে আছে— শীঘ্র আসিতে ডাকিয়াছ, শীঘ্রই আসিয়াছি, এক নিমেষও দেরি করি নাই।

রাত্রি ভালো করিয়া ঘুম হইল না। প্রায় প্রতি স্টেশনে একবার করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, ভয় হইতে লাগিল যাহাকে দেখা হইল না সে পাছে রাত্রি নামিয়া যায়।

পরদিন সকালে একটা বড় স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট— মনে আশা ছিল, ভিড় হইবে না। নামিয়া দেখি, প্লাটফর্মে সাহেবদের আদালি-দল আসবাবপত্র লইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কোন এক ফৌজের বড় জেনারেল সাহেব ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দুই-তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। বুঝিলাম, ফার্স্ট ক্লাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়িলাম। সব গাড়িতেই ভিড়। দ্বারে দ্বারে



উঁকি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময়ে সেকেন্ড ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, “আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন না- এখানে জায়গা আছে।”

আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। সেই আশ্চর্যমধুর কণ্ঠ এবং সেই গানেরই ধূয়া- “জায়গা আছে।” ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। জিনিসপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না। আমার মতো অক্ষম দুনিয়ায় নাই। সেই মেয়েটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি চলতি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র টানিয়া লইল। আমার একটা ফটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়িয়া রহিল- গ্রাহ্যই করিলাম না।

তার পরে- কী লিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটি অখণ্ড আনন্দের ছবি আছে- তাহাকে কোথায় শুরু করিব, কোথায় শেষ করিব? বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য যোজনা করিতে ইচ্ছা করে না।

এবার সেই সুরটিকে চোখে দেখিলাম; তখনো তাহাকে সুর বলিয়াই মনে হইল। মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেয়েটির বয়স ষোলো কি সতেরো হইবে, কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একটুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমা নাই।

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন-কি সে যে কী রঙের কাপড় কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। এটা খুব সত্য যে, তার বেশে ভূষায় এমন কিছুই ছিল না যেটা তাহাকে ছাড়াইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িতে পারে। সে নিজের চারিদিকের সকলের চেয়ে অধিক- রজনীগন্ধার শুভ্র মঞ্জরীর মতো সরল বৃত্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে দুটি-তিনটি ছোটো ছোটো মেয়ে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অন্ত ছিল না। আমি হাতে একখানা বই লইয়া সে দিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। যেটুকু কানে আসিতেছিল সে তো সমস্তই ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানুষি কথা। তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে বয়সের তফাৎ কিছুমাত্র ছিল না- ছোটদের সঙ্গে সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোট হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে কতকগুলি ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই- তাহারই কোনো-একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেয়েরা তাহাকে ধরিয়া পড়িল। এ গল্প নিশ্চয় তারা বিশ-পঁচিশ বার শুনিয়াছে। মেয়েদের কেন যে এত আগ্রহ তাহা বুঝিলাম। সেই সুধাকণ্ঠের সোনার কাঠিতে সকল কথা যে সোনা হইয়া ওঠে। মেয়েটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে। তাই মেয়েরা যখন তার মুখে গল্প শোনে তখন গল্প নয়, তাহাকেই শোনে; তাহাদের হৃদয়ের উপর প্রাণের ঝরনা ঝরিয়া পড়ে। তার সেই উদ্ভাসিত প্রাণ আমার সেদিনকার সমস্ত সূর্যকিরণকে সজীব করিয়া তুলিল; আমার মনে হইল, আমাকে যে প্রকৃতি তাহার আকাশ দিয়া বেষ্টিত করিয়াছে সে ঐ তরুণীরই অক্লান্ত অন্ধান প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিস্তার। পরের স্টেশনে পৌঁছিতেই খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া সে খুব খানিকটা চানা-মুঠ কিনিয়া লইল এবং মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে অসংকোচে খাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেড়া- আমি কেন বেশ সহজে হাসিমুখে মেয়েটির কাছে এই চানা একমুঠা চাহিয়া লইতে পারিলাম না। হাত বাড়াইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্বীকার করিলাম না।

মা ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে দোমনা হইয়াছিলেন। গাড়িতে আমি পুরুষমানুষ, তবু ইহার কিছুমাত্র সংকোচ নাই, বিশেষত এমন লোভীর মতো খাইতেছে, সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতেছিল না; অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়াও তাঁর ভ্রম হয় নাই। তাঁর মনে হইল, এ মেয়ের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই। মা হঠাৎ কারও সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না। মানুষের সঙ্গে দূরে দূরে থাকাই তাঁর অভ্যাস। এই মেয়েটির পরিচয় লইতে তাঁর খুব ইচ্ছা, কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সময়ে গাড়ি একটা বড়ো স্টেশনে আসিয়া থামিল। সেই জেনারেল-সাহেবের একদল অনুসঙ্গী এই স্টেশন হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে। গাড়িতে কোথাও জায়গা নাই। বারবার আমাদের গাড়ির সামনে দিয়া তারা ঘুরিয়া গেল। মা তো ভয়ে আড়ষ্ট, আমিও মনের মধ্যে শান্তি পাইতেছিলাম না।

গাড়ি ছাড়িবার অল্পকাল-পূর্বে একজন দেশি রেলওয়ে কর্মচারী নাম-লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেঞ্চের শিয়রের কাছে লট্কাইয়া দিয়া আমাকে বলিল, “এ গাড়ির এই দুই বেঞ্চ আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ভ করিয়াছেন, আপনাদিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে।”

আমি তো তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। মেয়েটি হিন্দিতে বলিল, “না, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।”



সে লোকটি রোখ করিয়া বলিল, “না ছাড়িয়া উপায় নাই।”

কিন্তু মেয়েটির চলিষ্ণুতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া গিয়া ইংরেজ স্টেশন-মাস্টারকে ডাকিয়া আনিল। সে আসিয়া আমাকে বলিল, “আমি দুঃখিত, কিন্তু—”

শুনিয়া আমি ‘কুলি কুলি করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেয়েটি উঠিয়া দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল, “না, আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বসিয়া থাকুন।”

বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া স্টেশন-মাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, “এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিথ্যা কথা।”

বলিয়া নাম লেখা টিকিটটি খুলিয়া প্লাটফর্মে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ইতিমধ্যে আদালি-সমেত ইউনিফর্ম-পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়িতে সে তার আসবাব উঠাইবার জন্য আদালিকে প্রথমে ইশারা করিয়াছিল। তাহার পর মেয়েটির মুখে তাকাইয়া, তার কথা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া, স্টেশন-মাস্টারকে একটু স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কী কথা হইল জানি না। দেখা গেল, গাড়ি ছাড়িবার সময় অতীত হইলেও আর-একটা গাড়ি জুড়িয়া তবে ট্রেন ছাড়িল। মেয়েটি তার দলবল লইয়া আবার একপত্তন চানা-মুঠ খাইতে শুরু করিল, আর আমি লজ্জায় জানলার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

কানপুরে গাড়ি আসিয়া থামিল। মেয়েটি জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত-স্টেশনে একটি হিন্দুস্থানি চাকর ছুটিয়া আসিয়া ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মা তখন আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কী মা।”

মেয়েটি বলিল, “আমার নাম কল্যাণী।”

শুনিয়া মা এবং আমি দুজনেই চমকিয়া উঠিলাম।

“তোমার বাবা—”

“তিনি এখানকার ডাক্তার, তাঁহার নাম শঙ্কুনাথ সেন।”

তার পরেই সবাই নামিয়া গেল।

মামার নিষেধ অমান্য করিয়া, মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলিয়া, তার পরে আমি কানপুরে আসিয়াছি। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। হাত জোড় করিয়াছি, মাথা হেঁট করিয়াছি; শঙ্কুনাথবাবুর হৃদয় গলিয়াছে। কল্যাণী বলে, “আমি বিবাহ করিব না।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেন।”

সে বলিল, “মাতৃ-আজ্ঞা।”

কী সর্বনাশ। এ পক্ষেও মাতুল আছে নাকি।

তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ-ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই সুরটি যে আমার হৃদয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে— সে যেন কোন ওপারের বাঁশি— আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল— সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর, সেই-যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল “জায়গা আছে”, সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধূয়া হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই।

তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি? না, কোনো কালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই এক রাত্রির অজানা কণ্ঠের মধুর সুরের আশা— জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথায়। তাই বৎসরের পর বৎসর যায় আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কণ্ঠ শুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া দিই— আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অনির্বচনীয়— যাবর্ণনা করা যায় না, বর্ণনাতীত। **অভ্র**— এক ধরনের খনিজ ধাতু। **অভ্রের ঝাড়**— অভ্রের তৈরি ঝাড়বাতি। **একচক্ষু লষ্ঠন**— একদিক খোলা তিনদিক ঢাকা বিশেষ ধরনের লষ্ঠন, যা রেলপথের সংকেত দেখানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। **একপত্তন**— একপ্রস্ত। **কলি**— পুরাণে বর্ণিত শেষ যুগ, কলিযুগ, কলিকাল। **কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল!**— কলিকাল পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করল। **কানপুর**— ভারতের একটি শহর। **ক্রোশ**— এক ক্রোশ দুই মাইলের সমান। **‘গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল।’**— চলন্ত রেলগাড়ির অবিরাম ধাতব ধ্বনি বোঝানো হয়েছে। **জড়িমা**— আড়ষ্টতা, জড়ত্ব। **‘তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে।’**— কল্যাণী যে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, অনুপমের এই আত্মোপলব্ধি এখানে প্রকাশিত। **ধুয়া**— গানের যে অংশ দোহাররা বারবার পরিবেশন করে। **পাকযন্ত্র**— পাকস্থলী। **প্রদোষ**— সন্ধ্যা। **মঞ্জুরী**— কিশলয়যুক্ত কচি ডাল, মুকুল। **মৃদঙ্গ**— মাটির খোলের দুপাশে চামড়া লাগানো এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। **রসনচৌকি**— সানাই, ঢোল ও কাঁসি— এই তিন বাদ্যযন্ত্রে সৃষ্ট ঐকতানবাদন।



সারসংক্ষেপ

অনেকদিন পর অনুপম তার মা'কে নিয়েতীর্থে চলেছে। হঠাৎ কোনো এক অজানা স্টেশনে এক অপরিচিতা মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনে সে মুগ্ধ হয়। তার ভাষায়— “মনে হইল যেন গান শুনলাম।” পরদিন একটি বড় স্টেশনে গাড়ি বদল করার সময় ঐ মেয়েটি অনুপম ও তার মা'কে ডেকে নিয়ে তাদের কামরায় বসতে দেয়। গাড়ি যখন কানপুরে এসে থামে, মেয়েটি তখন জিনিসপত্র গুছিয়ে নামার জন্য প্রস্তুতি নেয়। অনুপমের মা এ সময় তার নাম জিজ্ঞেস করলে সে জানায়, তার নাম কল্যাণী ও বাবার নাম শঙ্কুনাথ সেন। শুনে মা ও অনুপম দুজনেই চমকে ওঠে। অনুপম পরে জানতে পারে চার বছর আগে তার সাথে কল্যাণীর বিয়ে ভেঙে যাবার পর সে আর বিয়ে করেনি। এর অন্যতম কারণ মাতৃভূমির প্রতি তার দায়বদ্ধতা। সে নারীশিক্ষার ব্রত গ্রহণ করেছে। এর পর অনুপমও আর বিয়ে করেনি। মাঝে মাঝে কানপুরে কল্যাণীর কাছে যায়। সুযোগ পেলে তার কাজে সহায়তা করে। এভাবেই অনুপম কল্যাণীকে নিজের করে পায়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. অনুপম মাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিল?

ক. তীর্থে	খ. বিয়েবাড়িতে
গ. কস্টে	ঘ. রেলস্টেশনে

৬. অনুপমের মন ভরে যায় কেন?

ক. মধুর স্বরে	খ. কর্কশ আচরণে
গ. জড়ানো ভঙ্গিতে	ঘ. বাঁজখাই কথায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

ফাল্গুনি বিয়ে ভাঙার পর থেকে পথশিশুদের আলোকিত করার কাজ গ্রহণ করেছে। এটিতেই সে খুব আনন্দ উপভোগ করে।

৭. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ‘অপরিচিতা’ গল্পে কার চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে?

ক. কল্যাণী	খ. অনুপম
গ. হরিশ	ঘ. বিনু

৮. উদ্দীপক ও ‘অপরিচিতা’ গল্পের চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে—

- সাহসিকতা
- অভিমান
- আত্মমর্যাদা



নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও ii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. গজানন কে?

ক. কার্তিক

খ. গণেশ

গ. ব্রহ্মা

ঘ. প্রজাপতি

১০. কল্যাণী কেন বিয়ে করবে না?

ক. মামার নিষেধে

খ. ব্যক্তিত্বের জাগরণে

গ. যৌতুকের কারণে

ঘ. মাতৃ-আজ্ঞায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আশুতোষ মুখার্জি উচ্চশিক্ষিত ও রুচিবান একজন মানুষ। তিনি কনের পিতা। বিয়ের অনুষ্ঠানে বরের মামা কনের গহনা পরীক্ষা করতে চাইলে আশুতোষ বাবু ঠাণ্ডা মাথায় তা করতে দেন।

১১. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘অপরিচিতা’ গল্পের যে চরিত্রের মিল রয়েছে—

ক. গজানন

খ. হরিশ

গ. শম্ভুনাথ

ঘ. বিনু

১২. উদ্দীপক ও ‘অপরিচিতা’ গল্পের পিতা চরিত্রে মিল রয়েছে যে বিষয়ে—

i. সৌজন্যবোধ

ii. সহনশীলতা

iii. নির্মমতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii.

গ. iii

ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

এমনকি, কন্যার দর্শন সেও অতি সসংকোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং সময়বিশেষে নিরাশ হইলে দ্বিতীয় কথাটি কহিবার মুখ থাকে না। কিন্তু মেয়ে আপনি বাড়ি আসিতে চাহিলে বাপ তাহাকে না আনিয়া কেমন করিয়া থাকে, তাই, বেহাইয়ের নিকট সে সম্বন্ধে দরখাস্ত পেশ করিবার পূর্বে রামসুন্দর কত হীনতা, কত অপমান, কত ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে তিনটি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো।

ক. অনুপমের বন্ধু হরিশ কোথায় কাজ করে?

খ. শম্ভুনাথ কন্যাকে পাত্রস্থ করলেন না কেন?

গ. উদ্দীপকের রামসুন্দরের সঙ্গে ‘অপরিচিতা’ গল্পের শম্ভুনাথ বাবুর অমিলগুলো তুলে ধরুন।

ঘ. “উদ্দীপকে লোকাচারকে মান্য করা হলেও ‘অপরিচিতা’ গল্পে তাকে অস্বীকার করা হয়েছে।” –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :

লিটন ও রুবির বিয়ে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিয়েতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে পাত্রপক্ষের সাধ্যাতীত যৌতুক দাবি। ফলে একসময় বিয়ে ভেঙ্গে যায়। অথচ রুবিকে লিটনের ভাল লাগে। পরবর্তী সময়ে লিটনের পরিবার বিয়েতে সম্মত হলেও



রুবি তাতে অস্বীকৃতি জানায়। কিছুদিনের মধ্যে সে মেয়েদের পড়ানোর জন্য একটি স্কুল গড়ে তোলে। রুবি এখন দেশমাতৃকার সেবায় মগ্ন, বিয়ের স্বপ্ন সে আর দেখে না। স্কুলের মেয়েদের জীবন-স্বপ্নই এখন তার স্বপ্ন।

ক. কল্যাণীর সঙ্গে কয়টি মেয়ে ছিল?

খ. ‘ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন।’ – কথাটি কে কাকে এবং কোন প্রসঙ্গে বলেছে?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘অপরিচিতা’ গল্পের কাদের মিল রয়েছে? – আলোচনা করুন।

ঘ. “রুবি ও কল্যাণীর জীবন মূলত একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।” – উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

অনুপমের বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে।

খ.

বরপক্ষের নিচ মানসিকতার পরিচয় পেয়ে শম্ভুনাথ তার কন্যা কল্যাণীকে পাত্রস্থ করেননি।

কল্যাণীর বিয়ের দিন পাত্রপক্ষ কনেপক্ষের উপহার দেয়া গহনাগুলো পরখ করার জন্য একজন সেকরাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। বর অনুপমের মামা সেকরাকে দিয়ে কল্যাণীর গহনাগুলো পরীক্ষা করান। এতে কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথ নিজেকে অপমানিত বোধ করেন। আর এইসঙ্গে তিনি পাত্রপক্ষের নিচ মানসিকতারও পরিচয় পান। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পিতা শম্ভুনাথের মন ভেঙ্গে যায়। ফলে তিনি বিয়ের দিন কন্যাকে পাত্রস্থ না করে বরপক্ষকে ফিরিয়ে দেন।

গ.

আত্মমর্যাদার দিক থেকে উদ্দীপকের রামসুন্দর আর ‘অপরিচিতা’ গল্পে কনের পিতা শম্ভুনাথের অমিল রয়েছে।

আমাদের সমাজে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কনের বাবা বিয়ের অধিকাংশ দায়িত্ব পালন করেন। বরপক্ষের খাবার-দাবার থেকে শুরু করে তাদের যত্ন করা, মনরক্ষা ইত্যাদি কাজও তাকেই সামাল দিতে হয়। এছাড়া বিয়েতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতিবিশেষে নানা আচার এবং রুচির প্রয়োগে বৈচিত্র্য দেখা যায়। ফলে অনেক সময় কনের পিতাকে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় রামসুন্দর মেয়ের বিয়ের পণের তিন হাজার টাকা অনেক ক্ষতি স্বীকার করে সংগ্রহ করেছেন। আর প্রচলিত লোকাচারের কারণে তিনি তার বেহাইয়ের নিকট অবনত। রামসুন্দর মেয়ের সুখের কথা চিন্তা করে বরপক্ষের অপমানকে নীরবে সহ্য করেছেন। অন্যদিকে ‘অপরিচিতা’ গল্পে কনের পিতা শম্ভুনাথ বাবু মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দিতে সম্মত হয়েছেন। কিন্তু যখন বরপক্ষ গহনাগুলো যাচাই করার জন্য কল্যাণীর শরীর থেকে খুলে নিয়ে আসে তখন তিনি অপমানিত বোধ করেন। তিনি মেয়ের বিয়ে ভেঙ্গে দেন। বরপক্ষের নিকট মাথা নত করেননি। এখানেই উদ্দীপকের রামসুন্দরের সঙ্গে ‘অপরিচিতা’ গল্পের শম্ভুনাথ বাবুর অমিল রয়েছে। বস্তুত বাংলাদেশের গত শতকের রক্ষণশীল, অনুদার ও যৌতুকের অভিধানে জর্জরিত সমাজ ব্যবস্থা উভয় গল্পেরই পটভূমি।

ঘ.

‘উদ্দীপকে লোকাচারকে মান্য করা হলেও ‘অপরিচিতা’ গল্পে তা অস্বীকার করা হয়েছে।’ – মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

যৌতুকপ্রথা আমাদের সমাজে একটি মারাত্মক ব্যাধি। পুরুষপ্রধান সমাজে যৌতুকপ্রথা নারীকে হেয় করে, অপদস্ত করে। এর ফলে কখনো কখনো নারীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। তবুও আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ আছেন যারা এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। তারা সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে চান এই মরণ ব্যাধিকে নির্মূল করতে।

উদ্দীপকে একজন কন্যাদায়িত্র পিতা রামসুন্দরের বর্ণনা রয়েছে। তার অনেক টাকা-পয়সা নেই। কন্যার বিয়েতে তাকে তিন হাজার টাকা পণ দিতে হয়েছে। এর জন্য তাকে অনেক অপমান, অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। মেয়ের সুখের জন্য তাকে বেহাইয়ের নিকট অবনত হতে হয়েছে। ‘অপরিচিতা’ গল্পেও দেখা যায়, পিতা শম্ভুনাথ মেয়ের বিয়েতে পণ দিয়েছেন। কিন্তু কল্যাণী তার একমাত্র মেয়ে বলেই তিনি পণ দিতে রাজি হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বরপক্ষের সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় পেয়ে বিয়েটি ভেঙ্গে দেন। এমনকি, কল্যাণীও প্রতিজ্ঞা করে যে, সে আর কোনোদিন বিয়ে করবেনা।

উদ্দীপকে লোকাচারের বলয়ে একজন অসহায় পিতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তিনি মেয়ের সুখের কথা চিন্তা করে সাহসী হয়ে উঠতে পারেননি। আর ‘অপরিচিতা’ গল্পে বাবা শম্ভুনাথ বাবু ও তার কন্যা কল্যাণী যৌতুকের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছে।



বস্তুত উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে যৌতুকপ্রথার নিষ্ঠুরতা ও ব্যক্তিজীবনে এর প্রভাব এবং ‘অপরিচিতা’ গল্পে প্রকাশিত হয়েছে যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে একটি পরিবারের সুদৃঢ় অবস্থান। ওপরের আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে লোকাচারকে মান্য করা হলেও ‘অপরিচিতা’ গল্পে তাকে অস্বীকার করা হয়েছে।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গেছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেইজন্যই তাড়া।

ক. কন্যাকে আশীর্বাদ করেছিলেন কে?

খ. অনুপম তার মামাকে ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট বলেছে কেন?

গ. উদ্দীপকের কন্যা ‘অপরিচিতা’ গল্পের কোন চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপকে যৌতুকের প্রতি লোভী মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু ‘অপরিচিতা’ গল্পে যৌতুকের বিরুদ্ধে পারিবারিক প্রতিরোধ পরিলক্ষিত হয়।” –মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।



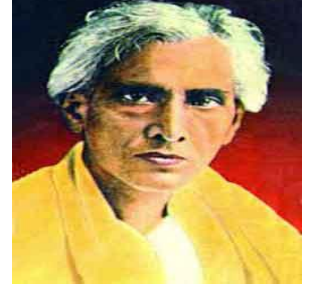
উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. ক ৩. ক ৪. ঘ ৫. ক ৬. ক ৭. ক ৮. গ ৯. খ ১০. ঘ ১১. গ ১২. ক



বিলাসী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



লেখক-পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে এফএ শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁর ছাত্রজীবনের ইতি ঘটে। তিনি জীবনের প্রথমদিকে একটি জমিদারী এস্টেটে সামান্য চাকরি করেন। চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাসীর বেশে বেরিয়ে পড়েন, কিন্তু এ-বৈরাগ্যময় জীবনে তাঁর মন টেকেনি। ১৯০৩ সনে তিনি সমুদ্র পথে বার্মা (বর্তমানে মায়ানমার) যান এবং রেঙ্গুনে রেল-অফিসে কেরানি পদে চাকুরি করেন। সেখানেই তাঁর সাহিত্য-সাধনার শুরু। ১৯০৩ সালে প্রথম মুদ্রিত রচনা ‘মন্দির’ গল্পের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার লাভ করেন। ১৯১৬ সনে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন ও সাহিত্য-সাধনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২১ সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। বাঙালি ঔপন্যাসিকদের মধ্যে জনপ্রিয়তার দিক থেকে তাঁর স্থান শীর্ষে। বাঙালি জীবনের সুখ-দুঃখ বেদনার ভাষাকে তিনি অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে অংকিত করেছেন। সাধারণ মানুষের জীবনের কথাকে সাবলীল ও মর্মস্পর্শী ভাষায় উপস্থাপনার কৌশলে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মানুষের মনুষ্যত্বকেই শরৎচন্দ্র বড় করে দেখেছেন। বেদনালাঞ্ছিত মানবতার রূপ অঙ্কনে তিনি ছিলেন অসাধারণ। সাধারণ বাঙালি জীবনের দৈনন্দিন হাসি-কান্নার উপাখ্যান প্রীতি ও করুণার রসে সিক্ত করে তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক এবং ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি কলকাতার পার্ক নার্সিং হোমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

উপন্যাস : বড়দিদি (১৯১৩), পরিণীতা (১৯১৪), পল্লীসমাজ (১৯১৬), দেবদাস (১৯১৭), চরিত্রহীন (১৯১৭), শ্রীকান্ত (৪ পর্ব, ১৯১৭-১৯৩৩), গৃহদাহ (১৯২০), দেনা পাওনা (১৯২৩), পথের দাবী (১৯২৬), শেষ প্রশ্ন (১৯৩১);
গল্প গ্রন্থ : রামের সুমতি (১৯১৪), মেজদিদি (১৯১৫), বিলাসী (১৯১৮), ছবি (১৯২০), হরিলক্ষ্মী (১৯২৬)।

ভূমিকা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘বিলাসী’ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘ভারতী’ পত্রিকার ১৩২৫ বঙ্গাব্দের (১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ) বৈশাখ সংখ্যায়। এই গল্পে লেখক ন্যাড়া নামের যুবকের জবানিতে তাঁর নিজের প্রথম জীবনের ছায়াপাত ঘটিয়েছেন। এই গল্পে জাতিগত বিভেদের সংকীর্ণ সীমা অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের নিষ্ঠুর আচরণের উর্ধ্বে দুই মানব মানবীর প্রেমের মহিমা ফুটে উঠেছে। দেশ, কাল, পাত্র, সমাজ সব কিছুর উর্ধ্বে মানুষের হৃদয়ের ভালোবাসার আবেদন এই গল্পের মূল বিষয়।



সাধারণ উদ্দেশ্য

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিলাসী’ গল্পটি পড়ার পর আপনি-

- জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- হিন্দুসমাজের বর্ণপ্রথার চিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঠ-১



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি—

- গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা করতে পারবেন।
- পল্লিগ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাথমিক পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- সেবাপরায়ণা বিলাসীর চরিত্রের বর্ণনা করতে পারবেন।
- গ্রামের মানুষের সাধারণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই। আমি একা নই— দশ-বারোজন। যাহাদেরই বাটা পল্লিগ্রামে, তাহাদের ছেলেদের শতকরা আশিজনকে এমনি করিয়া বিদ্যালয় করিতে হয়। ইহাতে লাভের অঙ্কে শেষ পর্যন্ত একেবারে শূন্য না পড়িলেও, যাহা পড়ে, তাহাতে হিসাব করিবার পক্ষে এ কয়টা কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে ছেলেদের সকাল আটটার মধ্যে বাহির হইয়া যাতায়াতের চার ক্রোশ পথ ভাঙিতে হয়— চার ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, ঢের বেশি— বর্ষার দিনে মাথার ওপর মেঘের জল পায়ের নিচে এক হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য এবং কাদার বদলে ধূলার সাগর সাঁতার দিয়া স্কুল-ঘর করিতে হয়, সেই দুর্ভাগা বালকদের মা-স্বরস্বতী খুশি হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কোথায় যে তিনি লুকাইবেন, ভাবিয়া পান না।

তারপরে এ কৃতবিদ্য শিশুর দল বড় হইয়া একদিন গ্রামেই বসুন, আর ক্ষুধার জ্বালায় অন্যত্রই যান— তাঁদের চার ক্রোশ হাঁটা বিদ্যার তেজ আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। কেহ কেহ বলেন গুনিয়াছি, আচ্ছা, যাদের ক্ষুধার জ্বালা, তাদের কথা না হয় নাই ধরিলাম, কিন্তু যাঁদের সে জ্বালা নাই, তেমন সব ভদ্রলোকই বা কী সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন? তাঁরা বাস করিতে থাকিলে তো পল্লির দুর্দশা হয় না।

ম্যালেরিয়ার কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম। সে থাক, কিন্তু ঐ চার ক্রোশ হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকেই যে ছেলে-পুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া শহরে পালান তাহার আর সংখ্যা নাই। তারপরে একদিন ছেলে-পুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু শহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।

কিন্তু থাক এ-সকল বাজে কথা। স্কুলে যাই— দুক্রোশের মধ্যে এমন আরও তো দুই তিনখানা গ্রাম পার হইতে হয়। কার বাগানে আম পাকিতে শুরু করিয়াছে, কোন বনে বঁইচি ফল অপরিপাক ফলিয়াছে, কার গাছে কাঁঠাল এই পাকিল বলিয়া, কার মর্তমান রম্ভার কাঁদি কাটিয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র, কার কানাচে ঝোপের মধ্যে আনারসের গায়ে রঙ ধরিয়াছে, কার পুকুর-পাড়ের খেজুরমেতি কাটিয়া খাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প, এই সব খবর লইতেই সময় যায়, কিন্তু আসলে যা বিদ্যা-কামস্কাটকার রাজধানীর নাম কী, এবং সাইবেরিয়ার খনির মধ্যে রূপা মেলে, না সোনা মেলে— এ সকল দরকারি তথ্য অবগত হইবার ফুরসতই মেলে না।

কাজেই একজামিনের সময় এডেন কী জিজ্ঞাসা করিলে বলি পারশিয়ার বন্দর, আর হুমায়ূনের বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগলক খাঁ। এবং আজ চল্লিশের কোঠা পার হইয়াও দেখি, ও-সকল বিষয়ের ধারণা প্রায় এক রকমই আছে— তারপরে প্রমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কখনো বা দল বাঁধিয়া মতলব করি, মাস্টারকে ঠ্যাঙানো উচিত, কখনো বা ঠিক করি, অমন বিশ্রী স্কুল ছাড়িয়া দেয়াই কর্তব্য।

আমাদের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝেই স্কুলের পথে দেখা হইত। তাহার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের চেয়ে সে বয়সে অনেক বড়। থার্ড ক্লাসে পড়িত। কবে সে যে প্রথম থার্ড ক্লাসে উঠিয়াছিল, এই খবর আমরা কেহই জানিতাম না— সম্ভবত তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়— আমরা কিন্তু তাহার ঐ থার্ড ক্লাসটাই চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছি।



তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাসও কখনো শুনি নাই, সেকেন্ড ক্লাসে উঠিবার খবরও কখনো পাই নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের বাপ-মা, ভাই-বোন কেহই ছিল না, ছিল শুধু গ্রামের একপ্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান, আর তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পোড়ো-বাড়ি, আর ছিল এক জ্ঞাতি খুড়া। খুড়ার কাজ ছিল ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম রটনা করা— সে গাঁজা খায়, সে গুলি খায়, এমনি আরও কত কী! তাঁর আর একটা কাজ ছিল বলিয়া বেড়ানো, ঐ বাগানের অর্ধেকটা তাঁর নিজের অংশ, নালিশ করিয়া দখল করার অপেক্ষা মাত্র। অবশ্য দখল একদিন তিনি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জেলা-আদালতে নালিশ করিয়া নয়— উপরের আদালতের হুকুমে। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয় নিজে রাঁধিয়া খাইত এবং আমের দিনে ঐ আম-বাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বৎসরের খাওয়া-পরা চলিত এবং ভালো করিয়াই চলিত। যেই দিন দেখা হইয়াছে, সেইদিনই দেখিয়াছি ছেঁড়া-খোঁড়া মলিন বইগুলি বগলে করিয়া পথের এক ধার দিয়া নীরবে চলিয়াছে। তাহাকে কখনো কাহারও সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে দেখি নাই— বরঞ্চ উপযাচক হইয়া কথা কহিতাম আমরাই। তাহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, দোকানের খাবার কিনিয়া খাওয়াইতে গ্রামের মধ্যে তাহার জোড়া ছিল না। আর শুধু ছেলেরাই নয়। কত ছেলের বাপ কতবার যে গোপনে ছেলেকে দিয়া তাহার কাছে স্কুলের মাহিনা হারাইয়া গেছে, বই চুরি গেছে ইত্যাদি বলিয়া টাকা আদায় করিয়া লইত তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ঋণ স্বীকার করা তো দূরের কথা, ছেলে তাহার সহিত একটা কথা কহিয়াছে, এই কথাও কোনো বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত না— গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।

অনেক দিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই। একদিন শোনা গেল সে মর-মর। আর একদিন শোনা গেল, মালাপাড়ার এক বুড়া মালা তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এই যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে। অনেকদিন তাহার মিষ্টানের সদ্ব্যয় করিয়াছি— মনটা কেমন করিতে লাগিল, একদিন সন্ধ্যায় অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। তাহার পোড়োবাড়িতে প্রাচীরের বালাই নাই। স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সুমুখেই তক্তাপোষের ওপর পরিষ্কার ধবধবে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে, তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায়, বাস্তবিক যমরাজ চেষ্টার ক্রটি কিছু করেন নাই, তবে যে শেষ পর্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সে কেবল ঐ মেয়েটির জোরে। সে শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল, অকস্মাৎ মানুষ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ সেই বুড়া সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী। তাহার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না। কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, বয়স যাই হোক, খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই। ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসী ফুলের মতো। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।

মৃত্যুঞ্জয় আমাকে চিনিতে পারিয়া বলিল, কে, ন্যাড়া?

বলিলাম, হুঁ।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, বসো।

মেয়েটা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃত্যুঞ্জয় দুই-চারিটি কথায় যাহা কহিল, তাহার মর্ম এই যে, প্রায় দেড়মাস হইতে চলিল সে শয্যাগত। মধ্যে দশ-পনেরো দিন সে অজ্ঞান অচেতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল, এই কয়েকদিন হইল সে লোক চিনিতে পারিতেছে এবং যদিচ এখনো সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু আর ভয় নাই।

ভয় নাই থাকুক। কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও এটা বুঝিলাম, আজও যাহার শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার ক্ষমতা হয় নাই, সেই রোগীকে এই বনের মধ্যে একাকী যে মেয়েটি বাঁচাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছিল, সে কত বড় গুরুভার। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তাহার কত সেবা, কত শুশ্রূষা, কত ধৈর্য, কত রাতজাগা। সে কত বড় সাহসের কাজ! কিন্তু যে বস্তুটি এই অসাধ্য-সাধন করিয়া তুলিয়াছিল তাহার পরিচয় যদিচ সেদিন পাই নাই, কিন্তু আর একদিন পাইয়াছিলাম।

ফিরিবার সময় মেয়েটি একটি প্রদীপ লইয়া আমার আগে আগে ভাঙা প্রাচীরের শেষ পর্যন্ত আসিল। এতক্ষণ পর্যন্ত সে একটি কথাও কহে নাই, এবার আস্তে আস্তে বলিল, রাস্তা পর্যন্ত তোমায় রেখে আসব কি?

বড় বড় আমগাছে সমস্ত বাগানটা যেন একটা জমাট অন্ধকারের মতো বোধ হইতেছিল, পথ দেখা তো দূরের কথা, নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। বলিলাম, পৌছে দিতে হবে না, শুধু আলোটা দাও।

সে প্রদীপটা আমার হাতে দিতেই তাহার উৎকণ্ঠিত মুখের চেহারাটা আমার চোখে পড়িল। আস্তে আস্তে সে বলিল, একলা যেতে ভয় করবে না তো? একটু এগিয়ে দিয়ে আসব?



মেয়েমানুষ জিজ্ঞাসা করে, ভয় করবে না তো! সুতরাং মনে যাই থাক, প্রত্যুত্তরে শুধু একটা ‘না’ বলিয়াই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সে পুনরায় কহিল, ঘন জঙ্গলের পথ, একটু দেখে পা ফেলে যেয়ো।

সর্বাপেক্ষে কাঁটা দিয়া উঠিল, কিন্তু এতক্ষণে বুঝিলাম, উদ্বেগটা তাহার কিসের জন্য এবং কেন সে আলো দেখাইয়া এ বনের পথ পার করিয়া দিতে চাহিতেছিল। হয়ত সে নিষেধ শুনিত না, সঙ্গেই যাইত, কিন্তু পীড়িত মৃত্যুঞ্জয়কে একাকী ফেলিয়া যাইতেই বোধ করি তাহার শেষ পর্যন্ত মন সরিল না।

কুড়ি-পঁচিশ বিঘার বাগান। সুতরাং পথটা কম না। এ দারুণ অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক পদক্ষেপই বোধ করি ভয়ে ভয়ে করিতে হইত, কিন্তু পরক্ষণই মেয়েটির কথাতেই সমস্ত মন এমনি আচ্ছন্ন হইয়া রহিল যে, ভয় পাইবার আর সময় পাইলাম না। কেবল মনে হইতে লাগিল, একটা মৃতকল্প রোগী লইয়া থাকা কত কঠিন। মৃত্যুঞ্জয় তো যে-কোন মুহূর্তেই মরিতে পারিত, তখন সমস্ত রাত্রি এ বনের মধ্যে মেয়েটি একাকী কী করিত। কেমন করিয়া তাহার সে রাতটা কাটিত।

এ প্রসঙ্গের অনেকদিন পরের একটা কথা আমার মনে পড়ে। এক আত্মীয়ের মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। অন্ধকার রাত্রি— বাটীতে ছেলেপুলে, চাকর-বাকর নাই, ঘরের মধ্যে শুধু তাঁর সদ্য-বিধবা স্ত্রী আর আমি। তাঁর স্ত্রী তো শোকের আবেগে দাপাদাপি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিলেন যে, ভয় হইল তাহারও প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায় বা! কাঁদিয়া কাঁদিয়া বার বার আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কী? তাঁর যে আর তিলার্থ বাঁচিতে সাধ নাই, এ কি তাহারা বুঝিবে না? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই? তাহারা কি পাষণ্ড? আর এ রাত্রেই গ্রামের পাঁচজন যদি নদীর তীরের কোনো একটা জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সহমরণের যোগাড় করিয়া দেয় তা পুলিশের লোক জানিবে কী করিয়া? এমনি কত কী। কিন্তু আমার তো আর বসিয়া বসিয়া তাঁর কান্না শুনিলেই চলে না। পাড়ায় খবর দেয়া চাই— অনেক জিনিস যোগাড় করা চাই। কিন্তু আমার বাহিরে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, “ভাই, যা হবার সে তো হইয়াছে, আর বাইরে গিয়া কী হইবে? রাতটা কাটুক না।”

বলিলাম “অনেক কাজ, না গেলেই যে নয়।”

তিনি বলিলেন, “হোক কাজ, তুমি বসো।”

বলিলাম, “বসলে চলবে না, একবার খবর দিতেই হইবে”, বলিয়া পা বাড়াইবামাত্রই তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, “ওরে বাপরে। আমি একলা থাকতে পারব না।”

কাজেই আবার বসিয়া পড়িতে হইল। কারণ, তখন বুঝিলাম, যে স্বামী জ্যান্ত থাকিতে তিনি নির্ভয়ে পঁচিশ বৎসর একাকী ঘর করিয়াছেন, তাঁর মৃত্যুটা যদি-বা সহ্যে তাঁর মৃতদেহটা এ অন্ধকার রাত্রে পাঁচ মিনিটের জন্যও সহিবে না। বুক যদি কিছুতে ফাটে তো সে এই মৃত স্বামীর কাছে একলা থাকিলে।

কিন্তু দুঃখটা তাহার তুচ্ছ করিয়া দেখানও আমার উদ্দেশ্য নহে। কিংবা তাহা খাঁটি নয় এ কথা বলাও আমার অভিপ্রায় নহে। কিংবা একজনের ব্যবহারেই তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল তাহাও নহে। কিন্তু এমন আরও অনেক ঘটনা জানি, যাহার উল্লেখ না করিয়াও আমি এ কথা বলিতে চাই যে শুধু কর্তব্যজ্ঞানের জোরে অথবা বহুকাল ধরিয়া একসঙ্গে ঘর করার অধিকারেই এই ভয়টাকে কোনো মেয়েমানুষই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা আর একটা শক্তি, যাহা বহু স্বামী-স্ত্রী একশ বৎসর একত্রে ঘর করার পরেও হয়ত তাহার কোনো সন্ধান পায় না।

কিন্তু সহসা সে শক্তির পরিচয় যখন কোনো নরনারীর কাছে পাওয়া যায়, তখন সমাজের আদালতে আসামী করিয়া তাহাদের দণ্ড দেয়ার আবশ্যক যদি হয় তো হোক, কিন্তু মানুষের যে বস্তুটি সামাজিক নহে, সে নিজে যে ইহাদের দুগ্ধে গোপনে অশ্রু বিসর্জন না করিয়া কোনো মতেই থাকিতে পারে না।

প্রায় মাস-দুই মৃত্যুঞ্জয়ের খবর লই নাই। যাহারা পল্লিগ্রাম দেখেন নাই, কিংবা ওই রেলগাড়ির জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাহারা হয়ত সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিবেন, এ কেমন কথা? এ কি কখনো সম্ভব হইতে পারে যে, অতবড় অসুখটা চোখে দেখিয়া আসিয়াও মাস-দুই আর তার খবরই নাই। তাহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, এ শুধু সম্ভব নয়, এ-ই হইয়া থাকে। একজনের বিপদে পাড়াশুদ্ধ ঝাঁক বাঁধিয়া উপড় হইয়া পড়ে, এ যে একটা জনশ্রুতি আছে, জানি না তাহা সত্যযুগের পল্লিগ্রামে ছিল কিনা, কিন্তু একালে তো কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে তাহার মরার খবর যখন পাওয়া যায় নাই, তখন সে যে বাঁচিয়া আছে এ ঠিক।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অভিপ্রায়— ইচ্ছা। **অচৈতন্য**— অজ্ঞান। **এডেন**— লোহিতসাগর ও আরব সাগরের প্রবেশপথে আরব দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বিখ্যাত বন্দর। সামুদ্রিক লবণ তৈরির জন্য বিখ্যাত। **এমনি সুনাম**— দুর্নাম বোঝাতে বিদ্রূপ করা হয়েছে। **ওপরের আদালতের হুকুমে**— শ্রুতার নির্দেশে। **কানাচ**— ঘরের পেছন দিককার লাগানো জায়গা। **কামচাটকা**— প্রকৃত উচ্চারণ কামচাটক (Kamchatka) রাশিয়ার অন্তর্গত সাইবেরিয়ার উত্তর পূর্বে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে ওখটক সাগর ও উত্তর-পূর্বে বেরিং সাগর। উপদ্বীপটি পার্বত্য তুন্দ্রা ও বনময়। বহু উষ্ণ প্রস্রবণ ও সতেরোটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে এখানে। প্রচুর স্যামন মাছ পাওয়া যায় বলে দ্বীপটি স্যামন মাছের দেশ নামে পরিচিত। রাজধানী শহরের নাম— পেত্রোপাভলভোভস্‌। **কৃতবিদ্য**— বিদ্যা অর্জন করেছেন এমন পণ্ডিত, বিদ্বান। **ক্রোশ**— এক ক্রোশ দুই মাইলের সমান। **খেজুরমেতি**— খেজুর গাছের মাথার কাছে নরম মিষ্টি অংশ বা রস। **গুলি**— আফিঙের তৈরি একরকম মাদক যা বড়ির মতো গুলি পাকিয়ে ব্যবহার করা হয়। **চল্লিশের কোঠা**— এখানে চল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত বয়সসীমা। **জনশ্রুতি**— লোকে বলে এমন। **জ্যাস্ত**— জীবন্ত। **তক্তপোষ**— খাট। **তোগলক খাঁ**— ভারতবর্ষের ইতিহাসে তোগলক খাঁ নামে কোনো সম্রাট ছিলেন না। ইতিহাসে যে তিনজন বিখ্যাত তোগলক সম্রাটের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন : গিয়াসউদ্দিন তোগলক, মুহাম্মদ তোগলক ও ফিরোজ তোগলক। **থার্ড ক্লাস**— বর্তমান অষ্টম শ্রেণি। সেকালে মাধ্যমিক শিক্ষার শ্রেণি হিসাব করা হতো ওপর থেকে নিচের দিকে। দশম শ্রেণি তখন ছিল ফার্স্ট ক্লাস। **দণ্ড**— শাস্তি। **পারশিয়া**— পারস্য বা ইরান দেশ। **প্রকৃতিস্থ**— স্বাভাবিক অবস্থা। **প্রদীপ**— বাতি, আলো। **প্রত্নতাত্ত্বিক**— পুরাতত্ত্ববিদ। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, মুদ্রা, লিপি ইত্যাদি থেকে ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের বিদ্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি। **ফোর্থ ক্লাস**— এখনকার সপ্তম শ্রেণি। **বঁইচি**— কাঁটায়ুক্ত একরকম ছোট গাছ ও তার ফল। **বাটীতে**— বাড়িতে। **মালো**— সাপের ওঝা, অনগ্রসর শ্রেণিবিশেষ। এরা সাপ ধরতে, সাপের কামড়ের চিকিৎসায় ও সাপের খেলা দেখাতে পটু। এসব করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। **মা-সরস্বতী**— হিন্দু পুরাণ অনুসারে বিদ্যা ও কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাপাণি। **যমরাজ**— মৃত্যু দেবতা। **রম্ভার কাঁদি**— কলার ছড়া। **শিয়রে**— মাথার নিকটে। **সহমরণে**— একত্রে বা এক সংগে মরণ। **সাইবেরিয়া**— এশিয়ার উত্তরাঞ্চলের রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ। এশিয়া মহাদেশের এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল এর মধ্যে পড়েছে। তুন্দ্রা, সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য, স্তেপ তৃণভূমি ও পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ 'বৈকাল' এখানে অবস্থিত। পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ ট্রান্স-সাইবেরিয়ান চালু হওয়ার পর এখানে বহু শহর গড়ে উঠেছে। **সেকেন্ড ক্লাস**— এখনকার নবম শ্রেণি। **সদ্ব্যয় করিয়াছি**— অপব্যয় করেছি বোঝাতে ব্যঙ্গ ভরে বলা হয়েছে। **হুমায়ূন**— মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের পুত্র এবং দ্বিতীয় মোগল সম্রাট। তিনি মোগল সম্রাট আকবরের পিতা।

তারপর একদিন ছেলেপুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু শহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।—

সমাজের সচ্ছল অভিভাবকগণ লেখাপড়ার প্রতি সব সময়ই সজাগ থাকেন। বিদ্যালয়ের দূরত্ব ও পথ দুর্গম হওয়ার কারণে বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে যাওয়াত করা কষ্টকর। তাছাড়া, দীর্ঘ পথযাত্রায় ক্লান্ত শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রয়োজনীয় পাঠ্যভাষ্য করা সম্ভব হয় না। ফলে, অনিয়মিত পাঠ্যভাষ্যের কারণে পড়ালেখার প্রকৃত মান অর্জনে শিক্ষার্থীগণ সাফল্য লাভ করে না। সন্তানের লেখা-পড়ার প্রতি আগ্রহী ও ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদগ্রীব অভিভাবকগণ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসতেন। শহরের সুযোগ-সুবিধা ও স্বাভাবিক জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত অভিভাবক ও সন্তান-সন্ততিগণ পুনরায় গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন না। প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও অবকাঠামো সৃষ্টির অভাবে গ্রাম বাংলার এ করুণ চিত্র যেন চিরকালের।



সারসংক্ষেপ

পল্লিগ্রামের বিদ্যার্থীদের শিক্ষায় সাফল্য লাভ করা অত্যন্ত কষ্টকর। শতকরা প্রায় আশি জন শিক্ষার্থীকে জীবনে এ দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। দুর্গম প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য একটি গ্রাম থেকে দূরবর্তী অবস্থানের বিদ্যালয়ে যাওয়াতের জন্য শিক্ষার্থীর অধিকাংশ শক্তি ব্যয় করতে হয়। ফলে, বিদ্যাভাসের জন্য প্রয়োজনীয় সময় শ্রমক্লান্ত অবসন্ন শরীর প্রদান করতে পারে না। কিশোর বয়সের শিক্ষার্থীর নিকট বিদ্যালয়ে যাত্রাপথের দু'পাশে ছড়িয়ে থাকা নানান ধরনের আকর্ষণের উপকরণ এত বেশি প্রলুব্ধ করে যে, শিক্ষা লাভের জন্য আবশ্যিক তথ্যগুলি বড় বেশি অনাবশ্যক বলে মনে হয়। মৃত্যুঞ্জয় লেখকের একই গ্রামের ছেলে। নিরীহ, পরিজনহীন মৃত্যুঞ্জয় গ্রামের প্রান্তে একটি বিশাল পোড়ো বাড়িতে একাকী বসবাস



করত। বাড়ি সংলগ্ন প্রকাণ্ড আম কাঁঠালের বাগান থেকে প্রতি বৎসর বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ের ভালোভাবেই চলত। এ বাগানটির প্রতি মৃত্যুঞ্জয়ের একমাত্র দূর সম্পর্কের খুড়া একজন ভাগীদার বলে সকলের নিকট বলে বেড়াত। কিন্তু এ দাবীর প্রতি সত্যনিষ্ঠ কোনো প্রমাণ না থাকায় মৃত্যুঞ্জয়ের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় কোনো প্রকার বিঘ্ন ঘটেছে বলে শোনা যায়নি। মৃত্যুঞ্জয় থার্ড ক্লাস অর্থাৎ ৮ম শ্রেণির ছাত্র হিসেবেই সকলের নিকট পরিচিত। কিন্তু এ ক্লাসের ছাত্র হিসেবে কত দিন ধরে অধ্যয়ন করে আসছে সে ইতিহাস অনেকেরই অজানা। স্বল্পভাষী মৃত্যুঞ্জয় প্রতিদিন জীর্ণ মলিন পুস্তক বগলে করে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করত। কারো সংগে সে নিজে থেকে আলাপ না করলেও অনেকেই উপযাচক হয়ে আলাপ করতে উৎসাহী ছিল। কারণ, অন্যকে খাওয়ানো এবং গোপনে অর্থ সাহায্য করতে মৃত্যুঞ্জয়ের কার্পণ্য ছিল না। কিন্তু এহেন পরোপকারী, নিরহংকার মানুষটির প্রতি গ্রামবাসী যে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ ছিল তা নয়। দীর্ঘদিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা না পেয়ে লেখক খোঁজ খবর নিতে গিয়ে লোকমুখে তার অসুস্থতার সংবাদ জানতে পারেন। একদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে সন্ধ্যার অন্ধকারে লেখক তাকে দেখতে যান। মরণব্যাপির সংগে দীর্ঘ সংগ্রামের পর বেঁচে ওঠা, জীর্ণ কংকালসার শরীর দেখে লেখক বুঝতে পারেন, অপরিস্রব সেবা ও যত্নে এ যাত্রায় মৃত্যুঞ্জয় রক্ষা পেয়েছে। দিবারাত্র অনলস সেবা ও অবিরাম রাত্রি জাগরণের ছাপ নিয়ে রোগীর শয্যাপাশে দাঁড়ানো নারীই যে দরিদ্র সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী একথা লেখক বুঝতে পারেন। সেবা, শুশ্রূষা, মমতা ও হৃদয়ের অপরিস্রব প্রাণশক্তি নিয়ে পাশে না দাঁড়ালে এমন রোগীকে বাঁচানো দুঃসাধ্য। অসম গোত্রের এক নারী সমাজের সকল ক্ষুণ্ণ উপেক্ষা করে নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলার এমন উদাহরণ সংসারে অত্যন্ত বিরল। অথচ মৃত্যুঞ্জয়ের নিত্য সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো গ্রামবাসী তার রোগশয্যা পার্শ্বে এ সময়ে উঁকি মেয়ে দেখে নাই। পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি পল্লিগ্রামের মানুষের বিপদে আপদে ঔদাসীণ্যের পরিচয় লেখক আলোচ্য অংশে অত্যন্ত তির্যক ভাষায় প্রকাশ করেছেন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বইটি কী?

ক. কাঁটায়ুক্ত ছোট গাছ	খ. কাঁটাবিহীন ছোট গাছ
গ. কাঁটায়ুক্ত বড় গাছ	ঘ. কাঁটাবিহীন বড় গাছ

২. ‘সম্ভবত তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়’ বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে—

ক. প্রত্যাশা	খ. হতাশা
গ. বিষাদ	ঘ. ব্যঙ্গ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

‘শেষ পরিচয়’ উত্তম পুরুষের জীবনিত লেখা গল্প। গল্পের কথক অমূল্য বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের যুদ্ধসংলগ্ন সময়ের সেই বাঙালি যুবক, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি অর্জন করেও ব্যক্তিত্বরহিত, পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুলমাত্র।

৩. উদ্দীপকের অমূল্যর সঙ্গে ‘বিলাসী’ গল্পে কার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. ন্যাড়া	খ. খুড়া
গ. বিলাসী	ঘ. বিলাসীর বাবা

৪. উদ্দীপকে ‘বিলাসী’ গল্পের কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে?

- ছোটগল্পের আঙ্গিকগত দিক
- ছোটগল্পের নামকরণ
- ছোটগল্পের বিষয়বস্তু

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. ii ও iii

পাঠ-২



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি—

- হিন্দু ধর্মের বর্ণপ্রথার চিত্রটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সবলের উপরে দুর্বলের অত্যাচারের বিবরণ প্রদান করতে পারবেন।
- সুবিধাভোগীর শ্রেণিচরিত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অসহায়ক্লিষ্ট মানুষের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয়ের করুণ পরিণতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- মৃত্যুঞ্জয়ের জীবনের পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভালোবাসার শক্তি যে সকল প্রতিকূলতাকে জয় করতে পারে মৃত্যুঞ্জয়ের জীবন থেকে প্রাপ্ত ঘটনার আলোকে তার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সমাজে প্রচলিত অমানবিক আচরণের চিত্র অংকন করতে পারবেন।



মূলপাঠ

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন কানে গেল, মৃত্যুঞ্জয়ের সেই বাগানের অংশীদার খুড়া তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছেন যে, গেল গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল। নালতের মিত্তির বলিয়া সমাজে আর তাঁর মুখ বাহির করিবার যো রহিল না— অকালকুস্মাণ্টা একটা সাপুড়ে মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক, তাহার হাতে ভাত পর্যন্ত খাইতেছে। গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে তো বনে গিয়া বাস করিলেই তো হয়। কোড়োলা, হরিপুরের সমাজ একথা শুনিলে যে— ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন ছেলে বুড়ো সকলের মুখেই ঐ এক কথা— অঁ্যা এ হইল কী? কলি কি সত্যই উল্টাইতে বসিল।

খুড়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এ যে ঘটবে, তিনি অনেক আগেই জানিতেন। তিনি শুধু তামাশা দেখিতেছিলেন, কোথাকার জল কোথায় গিয়া পড়ে। নইলে পর নয়, প্রতিবেশী নয়, আপনার ভাইপো। তিনি কি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিতেন না? তাহার কি ডাক্তার-বৈদ্য দেখাইবার ক্ষমতা ছিল না? তবে কেন যে করেন নাই, এখন দেখুন সবাই। কিন্তু আর তো চুপ করিয়া থাকা যায় না। এ যে মিত্তির বংশের নাম ডুবিয়া যায়। গ্রামের যে মুখ পোড়ে।

তখন আমরা গ্রামের লোক মিলিয়া যে কাজটা করিলাম, তাহা মনে করিলে আমি আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। খুড়া চলিলেন নালতের মিত্তির-বংশের অভিভাবক হইয়া, আর আমরা দশ-বারোজন সঙ্গে চলিলাম গ্রামের বদন দক্ষ না হয় এজন্য।

মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়ো বাড়িতে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। মেয়েটি ভাঙা বারান্দায় একধারে রুটি গড়িতেছিল, অকস্মাৎ লাঠি-সোটা হাতে এতগুলি লোককে উঠানের ওপর দেখিয়া ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল।

খুড়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। চট করিয়া শিকলটা টানিয়া দিয়া সেই ভয়ে মৃতপ্রায় মেয়েটিকে সম্ভাষণ শুরু করিলেন। বলা বাহুল্য, জগতের কোনো খুড়া কোনো কালে বোধ করি ভাইপোর স্ত্রীকে ওরূপ সম্ভাষণ করে নাই। সে এমনি যে মেয়েটি হীন সাপুড়ের মেয়ে হইয়াও তাহা সহিতে পারিল না, চোখ তুলিয়া বলিল, বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকা দিয়াছে জানো?

খুড়া বলিলেন, তবে রে! ইত্যাদি ইত্যাদি এবং সঙ্গে দশ-বারোজন বীরদর্পে হুঙ্কার দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। কেহ ধরিল চুলের মুঠি, কেহ ধরিল কান, কেহ ধরিল হাত—দুটো এবং যাহাদের সে সুযোগ ঘটিল না তাহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল না।

কারণ, সংগ্রাম-স্থলে আমরা কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে এত বড় দুর্নাম রটনা করিতে বোধ করি নারায়ণের কর্তৃপক্ষেরও চক্ষু লজ্জা হইবে।



এখানে একটা অবাস্তব কথা বলিয়া রাখি। শুনিয়াছি নাকি বিলাত প্রভৃতি স্বেচ্ছ দেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে, স্ত্রীলোক দুর্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই। এ আবার একটা কী কথা! সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না। আমরা বলি যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়। তা সে নরনারী যাই হোক না কেন। মেয়েটি প্রথমই সেই যা একবার আত্ননাদ করিয়া উঠিয়াছিল, তারপর একেবারে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু আমরা যখন তাহাকে গ্রামের বাহিরে রাখিয়া আসিবার জন্য হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম, তখন সে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, “বাবুরা, আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও, আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি। বাইরে শিয়াল-কুকুরে খেয়ে যাবে— রোগা মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না।”

মৃত্যুঞ্জয় রুদ্ধ ঘরের মধ্যে পাগলের মতো মাথা কুটিতে লাগিল, দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং শ্রাব্য-অশ্রাব্য বহুবিধ ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা তাহাতে তিলার্থ বিচলিত হইলাম না। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম।

চলিলাম বলিতেছি, কেননা, আমিও বরাবর সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু কোথায় আমার মধ্যে একটুখানি দুর্বলতা ছিল, আমি তাহার গায়ে হাত দিতে পারি নাই। বরঞ্চ কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল। সে যে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে এবং তাহাকে গ্রামের বাহির করাই উচিত বটে, কিন্তু এটাই যে আমরা ভালো কাজ করিতেছি সেও কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার কথা থাক।

আপনারা মনে করিবেন না; পল্লিগ্রামে উদারতার একান্ত অভাব। মোটেই না। বরঞ্চ বড় লোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য প্রকাশ করি যে, শুনিলে আপনারা অবাক হইয়া যাইবেন।

এই মৃত্যুঞ্জয়টাই যদি না তাহার হাতে ভাত খাইয়া অমার্জনীয় অপরাধ করিত তাহা হইলে তো আমাদের এত রাগ হইত না। আর কায়েতের ছেলের সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ের নিকা— এতো একটা হাসিয়া উড়াইবার কথা! কিন্তু কাল করিল যে ঐ ভাত খাইয়া। হোক না সে আড়াই মাসের রোগী, হোক না সে শয্যাশায়ী। কিন্তু তাই বলিয়া ভাত! লুচি নয়, সন্দেশ নয়, পাঁঠার মাংস নয়। ভাত খাওয়া যে অন্ন-পাপ। সে তো আর সত্য সত্যই মাপ করা যায় না। তা নইলে পল্লিগাঁয়ের লোক সংকীর্ণচিত্ত নয়। চার ক্রোশ হাঁটা বিদ্যা যেসব ছেলের পেটে, তারাই তো একদিন বড় হইয়া সমাজের মাথা হয়। দেবী বীণাপাণির বরে সংকীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কী করিয়া।

এই তো ইহারই কিছুদিন পরে, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূ মনের বৈরাগ্যে বছর-দুই কাশীবাস করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন নিম্নদুকেরা কানাকানি করিতে লাগিল যে, অর্ধেক সম্পত্তি ঐ বিধবার এবং পাছে তাহা বেহাত হয়, এই ভয়েই ছোটবাবু অনেক চেষ্টা, অনেক পরিশ্রমের পর বৌঠানকে যেখান হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, সেটা কাশীই বটে। যাই হোক, ছোটবাবু তাহার স্বাভাবিক ঔদার্যে গ্রামের বারোয়ারি পূজাবাদ দুইশত টাকা দান করিয়া, পাঁচখানা গ্রামের ব্রাহ্মণের সদক্ষিণা-উত্তর ফলাহারের পর, প্রত্যেক সদব্রাহ্মণের হাতে যখন একটা করিয়া কাঁসার গেলাস দিয়া বিদায় করিলেন, তখন ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এমন কী, পথে আসিতে অনেকেই দেশের এবং দশের কল্যাণে নিমিত্ত কামনা করিতে লাগিলেন, এমন সব যারা বড়লোক তাদের বাড়িতে বাড়িতে, মাসে মাসে এমন সদানুষ্ঠানের আয়োজন হয় না কেন? কিন্তু যাক। মহত্ত্বের কাহিনী আমাদের অনেক আছে। যুগে যুগে সন্ধিত হইয়া প্রায় প্রত্যেক পল্লিবাসীর দ্বারেই স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। এ দক্ষিণ বঙ্গের অনেক পল্লিতে অনেকদিন ঘুরিয়া গৌরব করিবার মতো অনেক বড় বড় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চরিত্রেই বল, ধর্মেই বল, সমাজেরই বল, আর বিদ্যাতেই বল, শিক্ষা একেবারেই পুরা হইয়া আছে; এখন শুধু ইংরাজকে কষিয়া গালিগালাজ করিতে পারিলে দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।

বৎসর-খানেক গত হইয়াছে। মশার কামড় আর সহ্য করিতে না পারিয়া সবেমাত্র সন্ন্যাসীগিরিতে ইন্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি। একদিন দুপুর বেলা ক্রোশ-দুই দূরের মালোপাড়ার ভিতর দিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ দেখি, একটা কুটিরের দ্বারে বসিয়া মৃত্যুঞ্জয়। তাহার মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, বড় বড় দাড়ি-চুল গলায় রুদ্রাক্ষ ও পুঁতির মালা— কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়। কায়স্থের ছেলে একটা বছরের মধ্যে জাত দিয়া একেবারে পুরাদস্তুর সাপুড়ে হইয়া গিয়াছে। মানুষ কত শীঘ্র যে তাহার চৌদ্ধ-পুরুষের জাতটা বিসর্জন দিয়া আর একটা জাত হইয়া উঠিতে পারে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। ব্রাহ্মণের ছেলে মেথরানী বিবাহ করিয়া মেথর হইয়া গেছে এবং তাহাদের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, এ বোধ করি আপনারা সবাই শুনিয়াছেন। আমি সদব্রাহ্মণের ছেলেকে এন্ট্রাস পাশ করার পরেও ডোমের মেয়ে বিবাহ করিয়া ডোম হইতে দেখিয়াছি। এখন সে ধুচনি কুলো বুনিয়া বিক্রয় করে, শূয়ার চরায়। ভালো কায়স্থ-সন্তানকে কসাইয়ের মেয়ে বিবাহ করিয়া কসাই হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি। আজ সে স্বহস্তে গরু কাটিয়া বিক্রয় করে— তাহাকে দেখিয়া কাহার সাধ্য বলে, কোন কালে সে কসাই



ভিন্ন আর কিছু ছিল। কিন্তু সকলেরই ওই একই হেতু। আমার তাই তো মনে হয়, এমন করিয়া এত সহজে পুরুষকে যাহারা টানিয়া নামাইতে পারে তাহারা কি এমনিই অবলীলাক্রমে তাহাদের ঠেলিয়া উপরে তুলিতে পারে না? যে পল্লিগ্রামের পুরুষদের সুখ্যাতিতে আজ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছি, গৌরবটা কি একা শুধু তাহাদেরই? শুধু নিজেদের জোরেই এত দ্রুত নিচের দিকে নামিয়া চলিয়াছে। অন্দের দিক হইতে কি এতটুকু উৎসাহ, এতটুকু সাহায্য আসে না?

কিন্তু থাক। ঝাঁকের মাথায়, হয়ত বা অনধিকার চর্চা করিয়া বসিব। কিন্তু আমার মুশকিল হইয়াছে যে, আমি কোনোমতেই ভুলিতে পারি না, দেশের নব্বইজন নরনারীই ঐ পল্লিগ্রামেরই মানুষ এবং সেই জন্য কিছু একটা আমাদের করা চাই-ই। যাক। বলিতেছিলাম যে, দেখিয়া কে বলিবে এ সেই মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আমাকে সে খাতির করিয়া বসাইল। বিলাসী পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সেও ভারি খুশি হইয়া বার বার বলিতে লাগিল, “তুমি না আগলালে সে রাত্তিরে আমাকে তারা মেরেই ফেলত। আমার জন্য না জানি কত মার তুমি খেয়েছিলে।”

কথায় কথায় শুনলাম, পরদিনই তাহারা ওখানে উঠিয়া আসিয়া ক্রমশ ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে এবং সুখে আছে। সুখে যে আছে একথা আমাকে বলার প্রয়োজন ছিল না, শুধু তাহাদের মুখের পানে চাহিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম।

তাই শুনলাম আজ কোথায় নাকি তাহাদের সাপ-ধরার বায়না আছে এবং তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে, আমিও অমনি সঙ্গে যাইবার জন্য লাফাইয়া উঠিলাম। ছেলেবেলা হইতেই দুটা জিনিসের ওপর আমার প্রবল শখ ছিল। এক ছিল গোখরো সাপ ধরিয়া পোষা, আর ছিল মন্ত্র-সিদ্ধ হওয়া।

সিদ্ধ হওয়ার উপায় তখনও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে ওস্তাদ লাভ করিবার আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। সে তাহার নামজাদা শ্বশুরের শিষ্য, সুতরাং মন্ত্র লোক। আমার ভাগ্য যে অকস্মাৎ এমন প্রসন্ন হইয়া উঠিবে তাহা কে ভাবিতে পারিত?

কিন্তু শক্ত কাজ এবং ভয়ের কারণ আছে বলিয়া প্রথমে তাহারা উভয়েই আপত্তি করিল, কিন্তু আমি এমনি নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিলাম যে, মাস খানেকের মধ্যে আমাকে সাগরেদ সমেত মাদুলি বাঁধিয়া দিয়া দস্তুরমত সাপুড়ে বানাইয়া তুলিল।

মন্ত্রটা কী জানেন? তার শেষটা আমার মনে আছে—

—ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন—

মনসা দেবী আমার মা—

ওলটপালট পাতাল-ফোঁড়—

টোড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ টোড়ারে দে—

—দুধরাজ, মণিরাজ।

কার আজ্ঞা— বিষহরির আজ্ঞা।

ইহার মানে যে কী তাহা আমি জানি না। কারণ, যিনি এ মন্ত্রের দৃষ্টা ঋষি ছিলেন— নিশ্চয় কেহ না কেহ ছিলেন— তাঁর সাক্ষাৎ কখনও পাই নাই।

অবশেষে একদিন এই মন্ত্রের সত্য মিথ্যার চরম মীমাংসা হইয়া গেল বটে, কিন্তু যতদিন না হইল, ততদিন সাপধরার জন্য চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ হইয়া গেলাম। সবাই বলাবলি করিতে লাগিল, হ্যাঁ, ন্যাড়া একজন গুণী লোক বটে। সন্ধ্যাসী অবস্থায় কামাখ্যায় গিয়া সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। এতটুকু বয়সের মধ্যে এত বড় ওস্তাদ হইয়া অহঙ্কারে আমার আর মাটিতে পা পড়ে না, এমনি যো হইল।

বিশ্বাস করিল না শুধু দুইজন। আমার গুরু যে, সে তো ভাল মন্দ কোনো কথাই বলিত না। কিন্তু বিলাসী মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত, ঠাকুর, এসব ভয়ঙ্কর জানোয়ার, একটু সাবধানে নাড়াচাড়া করো। বস্ত্রত বিষদাঁত ভাঙা, সাপের মুখ হইতে বিষ বাহির করা প্রভৃতি কাজগুলো এমনি অবহেলার সহিত করিতে শুরু করিয়াছিলাম যে, সেসব মনে পড়িলে আমার আজও গা কাঁপে।

আসল কথা হইতেছে এই যে, সাপধরাও কঠিন নয় এবং ধরাসাপ দুই চারিদিন হাঁড়িতে পুরিয়া রাখার পরে তাহার বিষদাঁত ভাঙাই হোক আর নাই হোক, কিছুতেই কামড়াইতে চাহে না। চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভান করে, ভয় দেখায়, কিন্তু কামড়ায় না।

মাঝে মাঝে আমাদের গুরু-শিষ্যের সহিত বিলাসী তর্ক করিত। সাপুড়ের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা হইতেছে শিকড় বিক্রি করা, যা দেখাইবামাত্র সাপ পালাইতে পথ পায় না। কিন্তু তার পূর্বে সামান্য একটু কাজ করিতে হইত। যে সাপটা শিকড় দেখিয়া পলাইবে, তাহার মুখে একটা লোহার শিক পুড়াইয়া বার কয়েক ছাঁকা দিতে হয়। তারপর তাহাকে শিকড়ই দেখান



হোক বা একটা কাঠিই দেখান হোক, সে কোথায় পালাইবে তা ভাবিয়া পায় না। এ কাজটার বিরুদ্ধে বিলাসী ভয়ানক আপত্তি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বলিত, দেখ, এমন করে মানুষ ঠকাইয়ো না।

মৃত্যুঞ্জয় কহিত, সবাই করে— এতে দোষ কী?

বিলাসী বলিত, করুক গে সবাই। আমাদের তো খাবার ভাবনা নেই, আমরা কেন মিছামিছি লোক ঠকাইতে যাই।

আর একটা জিনিস আমি বার বার লক্ষ করিয়াছি। সাপ ধরার বায়না আসিলেই বিলাসী নানাপ্রকারে বাধা দিবার চেষ্টা করিত— আজ শনিবার, আজ মঙ্গলবার, এমনি কত কী। মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিত না থাকিলে সে তো একেবারেই ভাগাইয়া দিত, কিন্তু উপস্থিত থাকিলে মৃত্যুঞ্জয় নগদ টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না। আর আমার তো এক রকম নেশার মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নানাপ্রকারে তাহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টার ক্রটি করিতাম না। বস্তুত ইহার মধ্যে মজা ছাড়া ভয় যে কোথায় ছিল, এ আমাদের মনেই স্থান পাইত না। কিন্তু এ পাপের দণ্ড আমাকে একদিন ভাল করিয়াই দিতে হইল।

সেদিন ক্রোশ-দেড়েক দূরে এক গোয়ালার বাড়িতে সাপ ধরিতে গিয়াছি। বিলাসী বরাবরই সঙ্গে যাইত, আজও সঙ্গে ছিল। মেটে-ঘরের মধ্যে খানিকটা খুঁড়িতেই একটা গর্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। আমরা কেহই লক্ষ করি নাই, কিন্তু বিলাসী সাপুড়ের মেয়ে— সে হেঁট হইয়া কয়েক টুকরা কাগজ তুলিয়া লইয়া আমাকে বলিল, ঠাকুর, একটু সাবধানে খুঁড়ো। সাপ একটা নয় এক-জোড়া তো আছে বটেই, হয়ত বা বেশি থাকিতে পারে।

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, এরা যে বলে একটাই এসে ঢুকেছে। একটাই দেখতে পাওয়া গেছে।

বিলাসী কাগজ দেখাইয়া কহিল, দেখছ না বাসা করেছিল?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, কাগজ তো ইঁদুরেও আনতে পারে।

বিলাসী কহিল দুই-ই হতে পারে। কিন্তু দুটো আছেই আমি বলছি।

বাস্তবিক বিলাসীর কথাই ফলিল এবং মর্মান্তিকভাবেই সেদিন ফলিল।

মিনিট-দশেকের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড খরিস গোখরো ধরিয়া ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় আমার হাতে দিল। কিন্তু সেটাকে ঝাঁপির মধ্যে পুরিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই মৃত্যুঞ্জয় উঃ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের উল্টা পিঠ দিয়ে ঝর্ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

প্রথমটা যেন সবাই হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কারণ সাপ ধরিতে গেলে সে পালাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া বরঞ্চ গর্ত হইতে একহাত বাহির করিয়া দংশন করে, এমন অভাবনীয় ব্যাপার জীবনে এই একটিবার দেখিয়াছি। পরক্ষণেই বিলাসী চিৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া আঁচল দিয়া তাহার হাতটা বাঁধিয়া ফেলিল এবং যত রকমের শিকড়-বাকড় সে সঙ্গে আনিয়াছিল সমস্তই তাহাকে চিবাইতে দিল। মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের মাদুলি তো ছিলই, তাহার উপরেও আমার মাদুলিটাও খুলিয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া দিলাম। আশা, বিষ ইহার উর্ধ্বে আর উঠিবে না, বরং সেই “বিষহরির আজ্ঞা” মন্ত্রটা সতেজে বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। চতুর্দিকে ভিড় জমিয়া গেল এবং এ অঞ্চলের মধ্যে যেখানে যত গুণী ব্যক্তি আছেন সকলকে খবর দিবার জন্য দিকে দিকে লোক ছুটিল। বিলাসীর বাপকে সংবাদ দিবার জন্য লোক গেল।

আমার মন্ত্র পড়ার বিরাম নাই, কিন্তু ঠিক সুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। তথাপি আবৃত্তি সমভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু মিনিট পনের কুড়ি পরেই যখন মৃত্যুঞ্জয় একবার বমি করিয়া দিল, তখন বিলাসী মাটির উপরে একবারে আছাড় খাইয়া পড়িল। আমিও বুঝিলাম বিষহরির দোহাই বুঝি বা আর খাটে না।

নিকটবর্তী আরও দুই-চারজন গুস্তাদ আসিয়া পড়িলেন এবং আমরা কখনও বা একসঙ্গে কখনও বা আলাদা তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর দোহাই পাড়িতে লাগিলাম। কিন্তু বিষ দোহাই মানিল না, রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। যখন দেখা গেল ভালো কথায় হইবে না, তখন তিন-চারজন ওঝা মিলিয়া বিষকে এমনি অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করিতে লাগিল যে, বিষের কান থাকিলে সে মৃত্যুঞ্জয় তো মৃত্যুঞ্জয়, সেদিন দেশ ছাড়িয়া পলাইত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আরও আধঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তির পরে রোগী তাহার বাপ-মায়ের দেয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম তাহার শ্বশুরের দেয়া মন্ত্রোষধি সমস্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া ইহলোকের লীলা সাজ করিল। বিলাসী তাহার স্বামীর মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়াছিল, সে যেন একেবারে পাথর হইয়া গেল। যাক, তাহার দুঃখের কাহিনিটি আর বাড়াইব না। কেবল এটুকু বলিয়া শেষ করিব যে, সে সাতদিনের বেশি বাঁচিয়া থাকাটা সহিতে পারিল না। আমাকে শুধু একদিন বলিয়াছিল, ঠাকুর আমার মাথার দিব্যি রইল, এসব তুমি আর কখনও করো না। আমার মাদুলি-কবচ তো মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে কবরে গিয়াছিল, ছিল শুধু বিষহরির আজ্ঞা। কিন্তু সে আজ্ঞা যে ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা নহে এবং সাপের বিষ যে বাঙালির বিষ নয়, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।



একদিন গিয়া শুনলাম, ঘরে তো আর বিষের অভাব ছিল না, বিলাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে এবং শাস্ত্রমতে সে নিশ্চয় নরকে গিয়াছে। কিন্তু যেখানেই যাক, আমার নিজের যখনই যাইবার সময় আসিবে, তখন ওইরূপ কোনো একটা নরকে যাওয়ার প্রস্তাবে পিছাইয়া দাঁড়াইব না, এইমাত্র বলিতে পারি।

খুড়া মশাই ষোলআনা বাগান দখল করিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের ন্যায় চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ওর যদি না অপঘাত-মৃত্যু হবে, তো হবে কার? পুরুষ মানুষ অমন একটা ছেড়ে দশটা করুক না, তাতে তো তেমন আসে যায় না- না হয় একটু নিন্দাই হত। কিন্তু হাতে ভাত খেয়ে মরতে গেলি কেন? নিজে মলো, আমার পর্যন্ত মাথা হেঁট করে গেল। না পেলে এক ফোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হল একটা ভুজি উচুগু।

গ্রামের লোক একবাক্যে বলিতে লাগিল, তাহাতে আর সন্দেহ কী! অনুপাপ। বাপ রে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে।

বিলাসীর আত্মহত্যার ব্যাপারটা অনেকের কাছে পরিহাসের বিষয় হইল। আমি প্রায় ভাবি, এ অপরাধ হয়ত ইহারা উভয়েই করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় তো পল্লিগ্রামেরই ছেলে, পাড়াগাঁয়ের তেলে-জলেই তো মানুষ। তবু অত বড় দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করিয়াছিল তাহাকে যে বস্তুটা সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল না?

আমার মনে হয়, যে দেশের নরনারীর মধ্যে পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে দেশে নরনারী আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাঙ্ক্ষা করিবার ভয়ঙ্কর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ব, পরাজয়ের ব্যথা কোনোটাই জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ, আর ভুল না করিবার আত্মপ্রসাদ, কিছুরই বালাই নাই, যাহাদের প্রাচীন এবং বহুদর্শী বিজ্ঞ সমাজ সর্ব প্রকারের হাস্যামা হইতে অত্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাৎ করিয়া, আজীবন কেবল ভালোটি হইয়া থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাই বিবাহ ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিছক document তা সে যতই কেননা বৈদিক মন্ত্র দিয়া Contract পাকা করা হোক, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই মৃত্যুঞ্জয়ের অনু-পাপের কারণ বোঝে। বিলাসীকে যাঁহারা পরিহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা সাধু গৃহস্থ এবং সাধ্বী গৃহিণী-অক্ষয় সতীলোক তাঁহারা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি কিন্তু সেই সাপুড়ের মেয়েটি যখন একটি পীড়িত শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সেই গৌরবের কণামাত্র হয়ত আজিও ইহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় হয়ত নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহাদের হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নহে, সে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নহে।

এ বস্তুটাই এ দেশের লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি ভূদেব বাবুর পারিবারিক প্রবন্ধেরও দোষ দিব না এবং শাস্ত্রীয় তথা সামাজিক বিধি-ব্যবস্থারও নিন্দা করিব না। করিলেও মুখের ওপর কড়া জবাব দিয়া যাঁহারা বলিবেন, এ হিন্দু-সমাজ তাহার নির্ভুল বিধিব্যবস্থার জোরেই অত শতাব্দীর অতগুলো বিপ্লবের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, আমি তাঁহাদেরও অতিশয় ভক্তি করি, প্রত্যুত্তরে আমি কখনই বলিব না, টিকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয়, এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে। আমি শুধু এই বলিব যে, বড়লোকের নন্দগোপালটির মতো দিবারাত্রি চোখে চোখে এবং কোলে কোলে রাখিলে যে সে বেশটি থাকিবে, তাহাতে কোনোই সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে তেলাপোকাটির মতো বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক-আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মতো দু-এক পা হাঁটিতে দিলেই প্রায়শ্চিত্ত করার মতো পাপ হয় না।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অকালকুস্মাণ্ড- অপদার্থ। **এন্ট্রান্স**- এস.এস.সি পাশের সমতুল্য। **কালি**- আধুনিক কাল অর্থে। **তিলার্ধ**- বিন্দুমাত্র, সামান্যমাত্র। **দক্ষিণা**- ব্রাহ্মণকে ভোজন করানোর পর প্রদত্ত অর্থ। **পিণ্ডি**- শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে মৃতের উদ্দেশে উৎসর্গ করা গোলাকার চালের ডেলা। **প্রায়শ্চিত্ত**- চিত্তের বিশুদ্ধতা সাধন। **ফলাহার**- ফল-ভোজন, নিরামিষ দ্রব্য দ্বারা ভোজন বা আহার। **বদনদক্ষ**- লজ্জায় মুখ দেখাতে না পারা অর্থে। **বারওয়ানী**- সমবেতভাবে যে অনুষ্ঠান বা উৎসব করা হয়। **সম্ভাষণ**- সম্বোধন। **শ্লেচ্ছদেশে**- অনার্য, অস্পৃশ্যদের দেশ। **মনসা**- সাপের দেবী। **সাগরেদ**- শিষ্য।



সারসংক্ষেপ

মৃত্যুঞ্জয়ের বিয়ের সংবাদ এবং বিলাসীর হাতে ভাত খাওয়ার অপরাধে খুড়া সকল গ্রামবাসীকে জড়ো করে এরূপ সামাজিক অনাচার ও গর্হিত কাজের জন্য বিচার জানায়। গ্রামের অনেকে সোৎসাহে বিলাসীকে নির্দয় প্রহার করে। মৃত্যুঞ্জয়ের অপরাধ অমার্জনীয়, সে অনুপাপী। দীর্ঘদিন ন্যাড়ারূপী শরৎচন্দ্রের মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসীদের সংগে কোনো প্রকার যোগাযোগ ছিল



না। শরৎচন্দ্র সন্ন্যাস জীবন থেকে অব্যাহতি নিয়ে নিজগ্রামে চলে আসেন। মৃত্যুঞ্জয় লেখাপড়ায় ইন্তফা দিয়ে বিলাসীর সংগে দাম্পত্য জীবন যাপন করছে। নিজ জাত-ধর্ম ত্যাগ করে বিলাসীর পিতৃপেশা গ্রহণ করে মৃত্যুঞ্জয় সাপুড়ে হিসেবে এখন পরিচিত। সাপ ধরাই এখন তার একমাত্র পেশা। ন্যাড়া মৃত্যুঞ্জয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মহা উৎসাহে সাপ ধরার কাজে নিয়োজিত। বিলাসী ন্যাড়া ও মৃত্যুঞ্জয়কে এ পেশা ত্যাগ করার জন্য বহুভাবে অনুরোধ জানিয়ে ব্যর্থ হয়। অবশেষে একদিন সাপ ধরতে গিয়েই মৃত্যুঞ্জয় মারা যায়। ওবা, বৈদ্যের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। বিলাসী জীবনের সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও একনিষ্ঠ ভালোবাসার বিনিময়ে যে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করেছিল- তার পক্ষে মৃত্যুঞ্জয়বিহীন জীবনযাপন করা আর সম্ভব ছিল না। এক সপ্তাহের মধ্যেই বিলাসী বিষপানে আত্মহত্যা করে। ছোটজাত, নিম্নবর্ণের বিলাসীর মহৎপ্রেমের এ একনিষ্ঠতার প্রকাশ পাঠক মনকেও ভারাক্রান্ত করে তোলে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. ন্যাড়ার সন্ন্যাসগিরিতে ইন্তফা দেয়ার কারণ কী?

ক. বাঘের ভয়	খ. সাপের ভয়
গ. মশার কামড়	ঘ. সাধনায় কষ্ট

৬. ‘কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়’- ‘বিলাসী’ গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের এই পরিবর্তন কোথায় ঘটেছে?

ক. অন্নপাশে	খ. জাতবিসর্জনে
গ. স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ায়	ঘ. সম্পদ হারানোয়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা মনীষা নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে আশিককে পরিবারের অমতে বিয়ে করে। বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে আজ সে আটপৌরে জীবনযাপন করছে।

৭. উদ্দীপকের মনীষা ‘বিলাসী’ গল্পে কাকে প্রতিনিধিত্ব করে?

ক. মৃত্যুঞ্জয়	খ. বিলাসী
গ. ন্যাড়া	ঘ. পুত্রবধূ

৮. উদ্দীপকে ‘বিলাসী’ গল্পের কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে?

- শ্রেণিবৈষম্য
- কুসংস্কার
- মূল্যবোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. ii ও iii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. বিলাসী কার মেয়ে?

ক. পুরোহিত	খ. সাপুড়ে
গ. কৃষক	ঘ. পুলিশ

১০. ‘গেল গেল গ্রামটা রসাতলে গেল’ -কেন?

ক. মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসীর বিবাহে	খ. ন্যাড়া বিলাসীকে সহমর্মিতা দেখানোয়
গ. মৃত্যুঞ্জয়কে সাপে কেটেছে	ঘ. বিলাসী মৃত্যুঞ্জয়কে ভাত খাওয়ানোয়।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

‘অচলায়তন’ নাটকে অচলায়তন বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা দাদাঠাকুর। এর শিক্ষার্থীরা প্রথা, বিধান ও সংস্কারের দাস। পাশের গ্রামে নীচু জাতের লোকেরা বাস করে। দাদাঠাকুর এদের সঙ্গে মেশার জন্য আর বিদ্যামন্দিরে অবস্থান করেন না।



বাংলার হিন্দু সমাজ চিরকালীন বা সনাতন। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ সমাজব্যবস্থা আচারসর্বস্ব ও সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন। কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতা কখনো কখনো এ সমাজের মানবিক চেতনাকে সংকুচিত করে রাখে। এছাড়া জাতিগত বিভেদের ফলে সমাজে অনেক সময় দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে না।

উদ্দীপকে গৌরাজ্জ রায় উদার মানবিকতায় বিশ্বাসী। কিন্তু সমাজের প্রচলিত রীতিকে উপেক্ষা করে একটি কিশোরী মেয়েকে রক্ষা করার মত দৃঢ়তা তার মধ্যে নেই। অন্যদিকে ‘বিলাসী’ গল্পে দেখা যায়, গল্পকথক ন্যাডার মানসিকতাও উদার কিন্তু সে বিলাসীকে গ্রামের মানুষের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি তার দৃঢ়চিত্ত মানসিকতার অভাবে। উদ্দীপকের গৌরাজ্জ রায় ও ‘বিলাসী’ গল্পের ন্যাডা কারোর মনই সংকীর্ণ কিংবা গোঁড়া নয় কিন্তু যথেষ্ট সাহসের অভাবে তারা কেউই সমাজের অন্যায়কে রুখে দিতে পারেনি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের গৌরাজ্জ রায় ও ‘বিলাসী’ গল্পের ন্যাডা চরিত্র দুটো পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ.

ধর্মীয় গোঁড়ামি মানুষের সহজাত বিকাশের অন্তরায়। আর এই অনাচারের শিকার হয় সাধারণ মানুষ।

প্রাচীনকাল থেকে সনাতন সমাজের আচার-রীতিগুলো মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। এই রীতির অনেকগুলো মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পথে অন্তরায়। অবশ্য অনেকগুলো সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজ অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। তবুও যা রয়ে গেছে তার কারণেই আজও সাধারণ মানুষ অনেকক্ষেত্রেই নিগ্রহের শিকার হচ্ছে।

উদ্দীপকে ধর্মীয় গোঁড়ামির কথা বলা হয়েছে। এর শিকার হয়েছে এক কিশোরী নারী। তাকে মৃতপ্রায় এক কুলীনের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে ‘বিলাসী’ গল্পে সমকালীন আচারসর্বস্ব হিন্দুসমাজের অনেক অনাচার স্থান পেয়েছে। এই অনাচারের শিকার হয়েছে মূলত মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসী। ‘বিলাসী’ গল্পে পুরুষরা বিলাসীর মত নিরীহ নারীকেও বেদম প্রহার করতে কুণ্ঠিত হয়নি। আবার মৃত্যুঞ্জয়কে সমাজচ্যুত করা হয় অল্পপাপের অপরাধে। ফলে করুণ মৃত্যু হয় মৃত্যুঞ্জয়ের আর আত্মহনন করে বিলাসী।

উদ্দীপকে ধর্মীয় বাতাবরণে হরণ করা হয়েছে একটি কিশোরীর জীবন। ‘বিলাসী’ গল্পেও দেখা যায় ধর্মীয় অনাচার ও কুসংস্কার নিঃশেষ করেছে বিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয়কে, আর তাদের স্বপ্নকে। উদ্দীপক এবং ‘বিলাসী’ গল্পের চরিত্রগুলো আমাদের সমাজের নিতান্তই সাধারণ মানুষ, আর তারাই ধর্মীয় গোঁড়ামির শিকার হয়েছে সবচেয়ে বেশি। তাই বলা যায়, ধর্মীয় গোঁড়ামি মানুষের স্বাভাবিক বিকাশকে অস্বীকার করে আর ধ্বংস করে তাদের স্বপ্নকে।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

আমি নারী। আমি হৃদয় দিয়ে বিশ্ব জয় করবো। ইব্রাহিম কার্দিকে মুক্ত করবো। তাকে এই হৃদয়ের রক্ততলে বন্দী করবো। আপনি কেন আমাকে সংকল্পচ্যুত করতে চেষ্টা করছেন?

ক. কামস্কাটকা কোথায় অবস্থিত?

খ. ‘আমার মাথার দিব্যি রইল, এসব তুমি আর কখনও করো না।’ –কেন? ব্যাখ্যা করুন।

গ. বিলাসী চরিত্রে প্রেমের যে গভীরতা ফুটে উঠেছে তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

ঘ. ‘হৃদয়ের অপরিমেয় ভালবাসাই জগতের অশুভ ও অকল্যাণকে দূর করতে পারে।’ –উদ্দীপক ও ‘বিলাসী’ গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।



উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. ঘ ৩. ক ৪. ক ৫. গ ৬. খ ৭. খ ৮. ক ৯. খ ১০. ক ১১. খ ১২. ঘ



চাষার দুক্ষু

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন



লেখক-পরিচিতি

মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও রক্ষণশীল মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী জহীবুদ্দিন আবু আলী হায়দার সাবের ও মাতার নাম রাহাতুল্লাহ সাবেরা চৌধুরানী। তাঁর পৈতৃক নাম রোকেয়া খাতুন এবং বিয়ের পর নাম হয় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। ষোলো বছর বয়সে উর্দুভাষী ও বিপত্নীক সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে রোকেয়ার বিয়ে হয়। সেকালে নানা কুসংস্কারের কারণে রোকেয়ার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন সম্ভব হয়নি। তবে বাড়িতে বড় বোন করিমুন্নেসার নিকট বাংলা, বড় ভাই ইব্রাহিম সাবেরের তত্ত্বাবধানে ইংরেজি ও বিয়ের পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বামীর উৎসাহে লেখাপড়া ও সাহিত্যচর্চা করেন। তাঁর সমগ্র সাহিত্যচর্চাই নারী মুক্তির জন্য নিবেদিত। মুসলমান মেয়েদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তৃত না হলে তাদের মনের প্রসার কিছুতেই সম্ভব হবে না এবং মুসলমান সমাজও কিছুতেই গড়ে উঠবে না—একথা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। সেজন্য নিজেই মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম সমাজ-মনের জড়তা ও কুসংস্কার দূর করার জন্য কলমযুদ্ধ চালিয়েছিলেন। তাঁর ভাষায় ও বলার ভঙ্গিতে কুসংস্কার ও অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ ও দীপ্ত রসিকতার সুর সহজেই চোখে পড়ে। নারী মুক্তির পথ হিসেবে নারী শিক্ষা প্রসারে তিনি অগ্রণী জন। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ও মুসলমান বাঙালি নারীদের সংগঠন আঞ্জুমানে খাতয়াতিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে তিনি মুসলমান নারীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেন। ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা—

গদ্যগ্রন্থ : মতিচূর (১ম খণ্ড-১৯০৫ ও ২য় খণ্ড-১৯২২), অবরোধবাসিনী (১৯৩১);

উপন্যাস : সুলতানার স্বপ্ন (১৯০৮), পদ্মরাগ (১৯২৪)।

ভূমিকা

‘চাষার দুক্ষু’ প্রবন্ধটি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ‘রোকেয়া রচনাবলী’ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে লেখক তৎকালীন সভ্যতার নামে এক শ্রেণির মানুষের বিলাসিতা ও অন্যদিকে দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকদের বঞ্চনার কথা ব্যক্ত করেছেন। কৃষকদের এই মুমূর্ষু অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য তিনি শিক্ষা বিস্তারে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার উপর এবং গ্রামীণ কুটির শিল্পের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।



সাধারণ উদ্দেশ্য

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ‘চাষার দুক্ষু’ প্রবন্ধটি পড়ার পর আপনি—

- ✚ তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকদের বঞ্চনার কথা জানতে পারবেন।
- ✚ লেখক কৃষকদের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য সভ্যতার নামে মানুষের বিলাসিতাকে কেন দায়ী করেছেন তা বুঝতে পারবেন।
- ✚ কৃষকদের দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য করণীয় কী, তা জানতে পারবেন।



পাঠ-১



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সভ্যতার তথাকথিত রূপ বর্ণনা করতে পারবেন।
- সভ্যতা ও সামাজিক উন্নতির উল্টো পিঠে কৃষকদের দারিদ্র্য বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মানুষের বিলাসিতা কীভাবে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধির কারণ হয়েছে তা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ



“ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরি, রে ভাই
পাছায় জোটে না ত্যানা।
বৌ-এর পৈছা বিকায় তবু
ছেইলা পায় না দানা।”

শুনিতে পাই, দেড় শত বৎসর পূর্বে ভারতবাসী অসভ্য বর্বর ছিল, -এই দেড় শত বৎসর হইতে আমরা ক্রমশ সভ্য হইতে সভ্যতর হইতেছি। শিক্ষায়, সম্পদে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ও জাতির সমকক্ষ হইতে চলিয়াছি। এখন আমাদের সভ্যতা ও ঐশ্বর্য রাখিবার স্থান নাই। -সত্যই তো, এই যে অদ্রভেদী পাঁচতলা পাকা বাড়ি, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, স্টিমার, এরোপ্লেন, মোটর লরি, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, পোস্টাফিস, চিঠিপত্রের সুনিয়মিত ডেলিভারি, এখানে পাটকল, সেখানে চটকল, অটালিকার চুড়ায় বড় বড় ঘড়ি, সামান্য অসুখ হইলে আট দশ জন ডাক্তারে টেপে নাড়ী, চিকিৎসা, ঔষধ, অপারেশন, ইনজেকশন, ব্যবস্থা-পত্রের ছড়াছড়ি, থিয়েটার, বায়স্কোপ, ঘোড়দৌড় জনতার হুড়াহুড়ি; লেমলেড জিঞ্জারেড, বরফের গাড়ি, ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান, অনারেবলের গড়াগড়ি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় খাদ্য-দ্রব্যে ভেজালের বাড়াবাড়ি) -এসব কি সভ্যতার নির্দশন নহে? নিশ্চয়! যে বলে ‘নহে’, সে ডাহা নিমকহারাম।

কিন্তু ইহার অপর পৃষ্ঠাও আছে- কেবল কলিকাতাটুকু আমাদের গোটা ভারতবর্ষ নহে এবং মুষ্টিমেয়, সৌভাগ্যশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি সমস্ত ভারতের অধিবাসী নহে। অদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়, চাষার দারিদ্র্য। চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড। তবে আমার ‘ধানভানিতে শিবের গান’ কেন? অবশ্যই ইহার কারণ আছে। আমি যদি প্রথমেই পল্লিবাসী কৃষকের দুঃখ-দুর্দশার কান্না কাঁদিতে বসিতাম তবে কেহ চট্ করিয়া আমার চক্ষে আঙুল দিয়া দিয়া দেখাইতেন যে, আমাদের মোটরকার আছে, গ্রামোফোন আছে ইত্যাদি। ভালোর ভাগ ছাড়িয়া কেবল মন্দের দিকটা দেখা কেন? সেইজন্য ভালোর দিকটা আগে দেখাইলাম। এখন মন্দের দিকে দেখা যাউক।

ঐ যে চটকল আর পাটকল; -এক একটা জুট মিলের কর্মচারীগণ মাসিক ৫০০-৭০০ (পাঁচ কিম্বা সাত শত) টাকা বেতন পাইয়া নবাবি হালে থাকে, নবাবি চাল চালে, কিন্তু সেই জুট (পাট) যাহারা উৎপাদন করে, তাহাদের অবস্থা এই যে, -‘পাছায় জোটে না ত্যানা!’ ইহা ভবিষ্যতের বিষয় নহে কি? আল্লাহতা’লা এত অবিচার কিরূপে সহ্য করিতেছেন?

সমগ্র ভারতের বিষয় ছাড়িয়া কেবল বঙ্গদেশের আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। একটি চাউল পরীক্ষা করিলেই হাঁড়িভরা ভাতের অবস্থা জানা যায়। আমাদের বঙ্গভূমি সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা, -তবু চাষার উদরে অন্ন নাই কেন? ইহার উত্তর শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়াছেন, “ধান্য তার বসুন্ধরা যার”। তাই তো, অভাগা চাষা কে? সে কেবল “ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরিবে”, হাল বহন করিবে, আর পাট উৎপাদন করিবে। তাহা হইলে চাষার ঘরে যে “মোরাই-ভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল, উঠান ভরা মুরগি ছিল”, এ কথার অর্থ কী? ইহা কি শুধুই কবির কল্পনা? না, কবির কল্পনা নহে, কাব্য উপন্যাসও নহে, সত্য কথা। পূর্বে ওসব ছিল, এখন নাই। আরে! এখন যে আমরা সভ্য হইয়াছি! ইহাই কি সভ্যতা? সভ্যতা কী করিবে, ইউরোপের মহাযুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে, তা’ বঙ্গীয় কৃষকের কথা কী?



আমি উপর্যুক্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারি না, কারণ ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ তো এই সাত বৎসরের ঘটনা। ৫০ বৎসর পূর্বেও কি চাষার অবস্থা ভালো ছিল? দুই একটি উদাহরণ দেখাই- বাল্যকালে শুনিতাম, টাকায় ৮ সের সরিসার তৈল ছিল, আর টাকায় ৪ সের ঘৃত। যখন টাকায় ৮ সের সরিসার তৈল ছিল, তখনকার একটা গল্প এই:

“কৃষক কন্যা জমিরনের মাথায় বেশ ঘন ও লম্বা চুল ছিল, তার মাথায় প্রায় আধ পোয়াটাক তেল লাগিত। সেইজন্য যেদিন জমিরন মাথা ঘষিত, সেদিন তাহার মা তাকে রাজবাড়ি লইয়া আসিত, আমরা তাকে তেল দিতাম” হা অদৃষ্ট! যখন দুই গণ্ডা পয়সায় এক সের তৈল পাওয়া যাইত, তখনও জমিরনের মাতা কন্যার জন্য এক পয়সার তেল জুটাইতে পারিত না।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অর্থানশন- অর্ধেক উপবাস বা অনাহারে থাকা। **অব্রভেদী**- অব্র অর্থ আকাশ। অব্রভেদী অর্থ আকাশ বা মেঘ ভেদকারী, আকাশচুম্বী। **উদরে**- পেটে। **কণিকা**- কণা, ক্ষুদ্র। **কলাই**- এক প্রকার ডাউল। **ক্লেশ**- দুঃখ, কষ্ট। **চরকা**- সুতা কাটার হস্তচালিত যন্ত্রবিশেষ। **চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড**- বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। প্রাচীন কাল থেকে অন্য কুটির শিল্পের মতো সামান্য বৃত্তি থাকলেও কৃষিই এদেশের মানুষের জীবনযাপনের প্রধান বৃত্তি। এমনকি বিশ শতকে পৃথিবীর কিছু দেশ যখন শিল্পে অসাধারণ সমৃদ্ধি লাভ করেছে আমাদের দেশ তখনও কৃষির বিকাশকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। সুতরাং কৃষি যে এদেশের মেরুদণ্ড এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। **ছেইলা**- ছেলে, সন্তানসন্ততি অর্থে। **ট্রামওয়ে**- ট্রাম চলাচলের রাস্তা। রেলওয়ের মতো রাস্তা দিয়ে ট্রাম চলে। তবে তা অধিকতর হালকা, বাস চলাচলের রাস্তার ভিতরেও ট্রামওয়ে থাকতে পারে। **দানা**- খাদ্য অর্থে, ছোলা, মটর। **“পাছায় জোটে না ত্যানা”**- পাট উৎপাদনকারী কৃষকদের চরম দারিদ্র্যের পরিচয় দিতে গিয়ে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন। চটকল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পাটের চাহিদা ও কদর বেড়ে যায়। পাটকল শ্রমিকগণও পর্যাপ্ত মাসোহারা পেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে থাকেন। কিন্তু যারা পাট উৎপাদন করতেন সেই কৃষকদের অবস্থা ছিল মানবেতর। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের জীবন শেষ হতো। প্রবাদটির ভিতর দিয়ে কৃষকদের সেই করুণ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। **পৈছা**- স্ত্রীলোকদের মণিবন্ধনের প্রাচীন অলঙ্কার। **বায়োকোপ**- চলচ্চিত্র, ছায়াছবি, সিনেমা। **ব্যঞ্জন**- রন্ধন করা তরকারি। **মরাই ভরা**- ধানের গোলা ভরা। **মসলিন**- অতি কোমল ও সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রবিশেষ। সম্ভবত প্রাচীন ব্যাবিলনের মমৌলে নির্মিত সূক্ষ্ম মসৃণ বস্ত্রের মতো টাকায় তৈরি বস্ত্রের নাম মসলিন। **সর্বস্বান্ত**- সর্বহারার, সর্বসহায় হারা।



সারসংক্ষেপ

প্রাবন্ধিক এখানে তৎকালীন দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকদের দুঃখদুর্দশা ও তার কারণ বর্ণনা করেছেন। তিনি ভারতবর্ষের সভ্যতার বর্ণনা দিয়ে বলতে চেষ্টা করেছেন যে, সভ্য মানুষদের খাবার ফলানোর জন্য যারা রোদে পোড়ে আর বৃষ্টিতে ভেজে সেই কৃষকদের অবস্থা কত শোচনীয়। ভারতবর্ষ আজ সভ্যতায়, শিক্ষায়, সম্পদে পৃথিবীর উন্নত দেশের সমকক্ষ হতে চলেছে। কিন্তু এই ভারতবর্ষেই কৃষকদের পেটে খাদ্য জোটে না। তারা পোশাক পায় না, অসুস্থ হলে চিকিৎসা পায় না। চটকল প্রতিষ্ঠার পর কর্মচারীদের জীবন নবাবী হালে কাটলেও পাট উৎপাদনকারী কৃষকরা মানবেতর জীবন-যাপন করছে। যখন টাকায় ৮ সের সরিসার তৈল পাওয়া যেত তখনও কৃষক-কন্যারা মাথায় দেয়ার জন্য এক পয়সার তৈল জোটাতে পারত না। কৃষকদের এই চরম দারিদ্র্যের জন্য তিনি এক শ্রেণির মানুষের চরম বিলাসিতাকে দায়ী করেছেন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বায়োকোপ কাকে বলে?

ক. চটকল

গ. কর্মবিমুক্ততা

খ. বিলাসিতা

ঘ. চলচ্চিত্র

২. ‘এন্ডি’ বলতে বোঝায়-

ক. মোটা রেশমি কাপড়

গ. সুতা পাকাবার যন্ত্র

খ. স্বচ্ছ কাচের চুড়ি

ঘ. মণিবন্ধনের অলঙ্কার



নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

শের শাহের আমলে বাংলায় টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। সন্দেহ নেই তথ্যটি বাংলার সমৃদ্ধির পরিচায়ক। কিন্তু তখনও এদেশে কৃষকদের জীবনে দুর্দশার অন্ত ছিল না।

৩. উদ্দীপকে ‘চাষার দুষ্ক’ প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে?

ক. চাষির অনুকরণপ্রিয়তা	খ. কৃষকের ঐতিহ্য
গ. কৃষকের দারিদ্র্য	ঘ. চাষির গৌরব

৪. উদ্দীপক ও ‘চাষার দুষ্ক’ প্রবন্ধের উপজীব্য-

- বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা
- ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সংকট
- রংপুরের চাষির অন্তর বেদনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-২



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষকদের জীবনের করুণ অবস্থার কথা বর্ণনা করতে পারবেন;
- সভ্যতার সাথে দারিদ্র্য বৃদ্ধির সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেন;
- আমাদের দেশে রেশম শিল্পের বিলুপ্তির ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- কৃষকদের দারিদ্র্য মুক্তির উপায় সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

এই তো ৩০/৩৫ বৎসর পূর্বে বিহার অঞ্চলে দুই সের খেসারি বিনিময়ে কৃষক-পত্নী কন্যা বিক্রয় করিত। পঁচিশ বৎসর পূর্বে উড়িষ্যার অন্তর্গত কণিকা রাজ্যের অবস্থা এই ছিল যে, কৃষকেরা ‘পখাল’ (পান্তা) ভাতের সহিত লবণ ব্যতীত অন্য কোনো উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিত না। গুঁটকি মাছ পরম উপাদেয় ব্যঞ্জন বলিয়া পরিগণিত হইত। তখন সেখানে টাকায় ২৫/২৬ সের চাউল ছিল। সাত ভায়া নামক সমুদ্র-তীরবর্তী গ্রামের লোকেরা পখাল ভাতের সহিত লবণও জুটাইতে পারিত না। তাহারা সমুদ্র-জলে চাউল ধুইয়া ভাত রাধিয়া খাইত। রংপুর জেলার কোনো কোনো গ্রামের কৃষক এত দরিদ্র যে, টাকায় ২৫ সের চাউল পাওয়া সত্ত্বেও ভাত না পাইয়া লাউ, কুমড়া প্রভৃতি তরকারি ও পাট শাক, লাউ শাক ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়া খাইত। আর পরিধান করিত কী, শুনিবেন? পুরুষেরা বহু কষ্টে স্ত্রীলোকদের জন্য ৮ হাত কিম্বা ৯ হাত কাপড় সংগ্রহ করিয়া দিয়া নিজেরা কৌপিন ধারণ করিত। শীতকালে দিবা ভাগে মাঠে মাঠে রৌদ্রে যাপন করিত; রাত্রিকালে শীত অসহ্য বোধ হইলে মাঝে মাঝে উঠিয়া পাটখড়ি জ্বালিয়া আগুন পোহাইত। বিচালি (বা পোয়াল খড়) শয্যায় শয়ন করিত। অথচ এই রংপুর ধান্য ও পাটের জন্য প্রসিদ্ধ। সুতরাং দেখা যায়, ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সহিত চাষার দারিদ্র্যের সম্পর্ক অতি অল্পই। যখন টাকায় ২৫ সের চাউল ছিল, তখনও তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই, এখন টাকায় ৩/৪ সের চাউল হওয়ায়ও তাহারা অর্ধানশনে থাকে:-

এ কঠোর মহীতে
চাষা এসেছে শুধু সহিতে;
আর মরমের ব্যথা লুকায়ে মরমে
জঠর-অনলে দহিতে।



পঁচিশ, ত্রিশ বৎসর পূর্বের চিত্র তো এই, তবে “মরাই-ভরা ধান ছিল, গোয়াল-ভরা গরু ছিল, ঢাকা-মসলিন কাপড় ছিল” ইত্যাদি কোন সময়ের অবস্থা? মনে হয়, অন্তত শতাধিক বৎসর পূর্বের অবস্থা। যখন—

কৃষক-রমণী স্বহস্তে চরকায় সুতা কাটিয়া বাড়িসুদ্ধ সকলের জন্য কাপড় প্রস্তুত করিত। আসাম এবং রংপুর জেলায় এক প্রকার রেশম হয়, স্থানীয় ভাষায় তাহাকে ‘এন্ডি’ বলে। এন্ডি রেশমের পোকা প্রতিপালন ও তাহার গুটি হইতে সুতা কাটা অতি সহজসাধ্য কার্য। এই শিল্প তদ্দেশবাসিনী রমণীদের একচেটিয়া ছিল। তাহারা এ উহার বাড়ি দেখা করিতে যাইবার সময় টেকো হাতে লইয়া সুতা কাটিতে কাটিতে বেড়াইতে যাইত। এন্ডি কাপড় বেশ গরম এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ইহা ফ্লানেল হইতে কোনো অংশে ন্যূন নহে, অথচ ফ্লানেল অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী। একখানি এন্ডি কাপড় অবাধে ৪০ (চল্লিশ) বৎসর টেকে। ৪/৫ খানি এন্ডি চাদর থাকিলে লেপ, কম্বল, কাঁথা— কিছুই প্রয়োজন হয় না। ফল কথা, সেকালে রমণীগণ হাসিয়া খেলিয়া বস্ত্র-সমস্যা পূরণ করিত। সুতরাং তখন চাষা অন্নবস্ত্রের কাঙাল ছিল না। তখন কিন্তু সে অসভ্য বর্বর ছিল। এখন তাহারা সভ্য হইয়াছে, তাই—

শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ
ঢেকে রাখে টাক্।

কিন্তু তাহাদের পেটে নাই ভাত। প্রশ্ন হইতে পারে— সভ্যতার সহিত দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইবার কারণ কী? কারণ— যেহেতু আপাত সুলভ মূল্যে বিবিধ রঙিন ও মিহি কাপড় পাওয়া যায়, তবে আর চড়ি রকা লইয়া ঘরঘর করিবে কেন? বিচিত্র বর্ণের জুট ফ্লানেল থাকিতে বর্ণহীন এন্ডি বস্ত্র ব্যবহার করিবে কেন? পূর্বে পল্লিবাসিনীগণ ক্ষার প্রস্তুত করিয়া কাপড় কাচিত; এখন তাহাদের কাপড় ধুইবার জন্য হয় ধোপার প্রয়োজন, নয় সোড়া। চারি পয়সার সোডায় যে কার্য সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য আর কষ্ট করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে কেন? এইরূপে বিলাসিতা শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বিষে জর্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে। ঐ যে “পাছায় জোটে না ত্যানা” কিন্তু মাথায় ছাতা এবং সম্ভবত পায়ে জুতা আছে তো! “বৌ-এর পৈছা বিকায়” কিন্তু তবু “বেলোয়ারের চুড়ি” থাকে তো! মুটে মজুর ট্রাম না হইলে দুই পদ নড়িতে পারে না। প্রথম দৃষ্টিতে ট্রামের ভাড়া পাঁচটা পয়সা অতি সামান্য বোধ হয়— কিন্তু এ যাঃ, যাইতে আসিতে দশ পয়সা লাগিয়া গেল! এইরূপে দুইটি পয়সা, চারি পয়সা করিয়া ধীরে ধীরে সর্বস্বহারা হইয়া পড়িতেছে।

নিজ অন্ন পর কর পণ্যে দিলে,
পরিবর্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে!

বিলাসিতা ওরফে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ‘অনুকরণপ্রিয়তা’ নামক আর একটা ভূত তাহাদের স্বন্ধে চাপিয়া আছে। তাহাদের আর্থিক অবস্থা সামান্য একটু সচ্ছল হইলেই তাহারা প্রতিবেশী বড়লোকদের অনুকরণ করিয়া থাকে। তখন চাষার বৌ-ঝির যাতায়াতের জন্য সওয়ারি চাই; ধান ভানিবার জন্য ভারানি চাই, ইত্যাদি। এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে :

সর্ব অঙ্গেই ব্যাথা,
ঔষধ দিব কোথা?

আর—

এ বহির শত শিখা
কে করিবে গণনা?

অতঃপর শিবিকাবাহকগণ পাক্কি লইয়া ট্রামে যাতায়াত করিলেই সভ্যতার চূড়ান্ত হইবে।

আবার মজা দেখুন, আমরা তো সুসভ্য হইয়া এন্ডি কাপড় পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু ঐ এন্ডি কাপড়ই ‘আসাম সিল্ক’ নামে অভিহিত হইয়া কোট, প্যান্ট ও স্কার্ট রূপে ইউরোপীয় নর-নারীদের বর-অঙ্গে শোভা হইতে লাগিল! ত্রমে পল্লিবাসিনীর সভ্যতার মাত্রাধিক্য হওয়ায় (অর্থাৎ আর এন্ডি পোকা প্রতিপালন করা হয় না বলিয়া) এখন আর ‘হোয়াইট এ্যাণ্ডয়ে লেডল’র দোকানে ‘আসাম সিল্ক’ পাওয়া যায় না। কেবল ইহাই নহে, আসাম হইতে এন্ডি গুটি বিদেশে চালান যায়— তথা হইতে সূত্ররূপে আবার আসামে ফিরিয়া আইসে। এই তো সেদিনের কথা— বঙ্গের গভর্নর লর্ড কারমাইকেল একখানি দেশি রেশমি রুমালের জন্মস্থানের অনুসন্ধান করেন, কেহই বলিতে পারিল না, সেরূপ রুমাল কোথায় প্রস্তুত হয়। কিন্তু লর্ড কারমাইকেল ইংরাজ বাচ্চা— সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি রুমালটার জন্মভূমি আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। পূর্বে মুর্শিদাবাদের কোনো



গ্রামে ঐরূপ রেশমি রুমাল প্রস্তুত হইত, এখন আর হয় না, কারণ সে গ্রামের লোকেরা সুসভ্য হইয়াছে! ফল কথা, সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশি শিল্পসমূহ ক্রমশ বিলুপ্ত হইয়াছে।

সুখের বিষয়, সম্প্রতি পল্লিগ্রামের দুর্গতির প্রতি দেশবন্ধু নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কেবল দৃষ্টিপাতই যথেষ্ট নহে, চাষার দুস্কু যাহাতে দূর হয়, সেজন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ চেষ্টা যত্ন করিতে হইবে। আবার সেই “মরাই-ভরা ধান, ঢাকা মসলিন” ইত্যাদি লাভ করিবার একমাত্র উপায় দেশি শিল্প- বিশেষত নারী শিল্পসমূহের পুনরুদ্ধার। জেলায় জেলায় পাটের চাষ কম করিয়া তৎপরিবর্তে কার্পাসের চাষ প্রচুর পরিমাণে হওয়া চাই এবং চরকা ও এন্ডি সুতার প্রচলন বহুল পরিমাণে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আসাম এবং রংপুরবাসিনী ললনাগণ এন্ডি পোকা প্রতিপালনে তৎপর হইলে সমগ্র বঙ্গদেশের বস্ত্র-ক্লেশ লাঘব হইবে। পল্লিগ্রামে সুশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হওয়া চাই। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আর ঘরে ঘরে চরকা ও টেকো হইলে চাষার দারিদ্র্য ঘুচিবে।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

এন্ডি- মোটা রেশমি কাপড়। কৌপিন- ল্যাঙ্গট, চীরবসন, লজ্জা নিবারণের জন্য পরিধেয় সামান্য বস্ত্র। চালাঘর- তৃণ বা কড়ের দ্বারা নির্মিত ছাদবিশিষ্ট ঘর। চেটাই- আঞ্চলিক শব্দ, মাদুর। টেকো- সুতা পাকাবার যন্ত্র। বেলোয়ারের চুড়ি- উৎকৃষ্ট স্বচ্ছ কাচে প্রস্তুত চুড়ি। ভিটি- পৈতৃক বাস্তুভূমি। মহীতে- পৃথিবীতে।



সারসংক্ষেপ

অভাব অনটনের কারণে কৃষক-পত্নী মাত্র দুই সের খেসারির বিনিময়ে কন্যা বিক্রি করত- লেখক এখানে এমন হৃদয় বিদারক ঘটনার কথা বলেছেন। কৃষকের পাশ্চাত্য ভাতের সাথে জুটত কেবল লবণ। গুঁটকি ছিল তাদের উপাদেয় খাদ্যের তালিকায়। রংপুরের কৃষকেরা ভাত না পেয়ে লাউ, কুমড়া, শাক প্রভৃতি সিদ্ধ করে খেত। পুরুষেরা বহু কষ্টে স্ত্রীলোকদের জন্য ৮ হাত কাপড় সংগ্রহ করে দিত। গ্রামের কৃষকদের দারিদ্র্যের নেপথ্যে গ্রামীণ কুটির শিল্পের বিপর্যয়কে অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা রেশমের এন্ডি শিল্পকে ধ্বংসের কারণে আত্মনির্ভরশীল গ্রাম্যসমাজ চরম সংকটের মধ্যে পড়েছে। এ দুরবস্থার জন্য লেখক এক শ্রেণির মানুষের বিলাসিতা ও বিদেশি সভ্যতার অন্ধ অনুকরণকেও দায়ী করেছেন। কৃষকদের এই সংকটজনক অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য লেখক দেশি শিল্পের পুনরুদ্ধার ও গ্রামে গ্রামে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. শিবিকাবাহকগণ কিসে যাতায়াত করলে সভ্যতার চূড়ান্ত হবে?

ক. ট্রামে	খ. রেলওয়েতে
গ. স্টিমারে	ঘ. মোটরে

৬. ‘আসাম সিল্ক’ বলা হয়েছে-

ক. এন্ডি	খ. ফ্লানেল
গ. জুট	ঘ. মসলিন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

গণি মিয়া একজন কৃষক। তার নিজের জমি নেই। পরের জমি চাষ করে সে সংসার চালায়। নিজের কাছে টাকা না থাকলেও ছেলের বিয়েতে ঋণ করে সে অনেক ধূমধাম করেছে।

৭. উদ্দীপকের গণি মিয়া ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে কার প্রতিনিধি?

ক. পাটকল শ্রমিক	খ. জুটমিলের কর্মচারী
গ. বাংলার কৃষক	ঘ. বিহারের প্রজা

৮. উদ্দীপক এবং ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে-

ক. বিলাসিতা	খ. অনুকরণপ্রিয়তা
গ. সভ্যতা	গ. শিক্ষা বিস্তার



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

৯. চাষির উদরে অন্ন নেই কেন?

ক. শোষণের ফলে

খ. বঞ্চনার ফলে

গ. শাসনের ফলে

ঘ. বিলাসিতার ফলে

১০. চাষিদের সভ্য হওয়া বলতে বোঝানো হয়েছে—

ক. বিলাসি হওয়া

খ. সমৃদ্ধি লাভ করা

গ. অলস হওয়া

ঘ. ঐতিহ্য রক্ষা করা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা

দেশ মাতারই মুক্তিকামী দেশের সে যে আশা—

১১. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের কোন বাক্যটির সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড।

খ. ধান ভানিতে শিবের গান।

গ. মরাই ভরা ধান ছিল।

ঘ. চাষা এসেছে শুধু সহিতে।

১২. উদ্দীপক ও ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে —

i. চাষির সৌভাগ্য

ii. চাষির হতাশা

iii. চাষির বন্দনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

বাংলাদেশের সমাজ জীবনের মূলে রয়েছে গ্রাম। এদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে এদেশে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে শহরকেন্দ্রিক জীবনধারা গড়ে উঠলেও গ্রামীণ সমাজ তিরোহিত হয় নি। তবে গ্রামীণ সমাজ তার ঐতিহ্য হারিয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে আজ বাংলাদেশের গ্রামীণ হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প প্রভৃতি ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়েছে। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশি শিল্পসমূহ ক্রমশ বিলুপ্ত হয়েছে। ফলে পল্লিবাংলা আজ শ্রীহীন, তার অঙ্গে শোভা নেই। আজকের পল্লিবাংলার এই ক্লেদ ও বঞ্চনা ঘুচাতে হলে বাংলার গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আর ঘরে ঘরে কুটির শিল্পের বিস্তার ঘটাতে হবে।

ক. রবীন্দ্রনাথের মতে ধান্য কার?

খ. ‘পাছায় জোটে না ত্যানা।’ –কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের বৈসাদৃশ্য আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপকটি বেগম রোকেয়ার সমাজভাবনাকে ধারণ করেছে।” –মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :

দিন কেটে যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। গ্রামের সেই উচ্ছল কুমোরপাড়ার এখন বেহাল দশা। তাঁতিরাও দিন আনে দিন খায়। বাঁশ-বেতের শিল্প এখন আর তৈরি হয় না। কৃত্রিম আঁশের জিনিসপত্র বাজার দখল করায় পাট চাষিরা আর আগের মতো নেই। বাজারে নেই পাটশিল্পজাত অন্য দেশীয় পণ্য। দেশের এক শ্রেণির মানুষ সম্পদের মালিক হলেও অনেকেই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে।

ক. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন পল্লিগ্রামে কী বিস্তারে সচেষ্টিত হতে বলেছেন?

খ. ‘আসাম সিদ্ধ’ হারিয়ে যাওয়ার কারণ কী? –ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকটি ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপকটিতে ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধের মূলভাব প্রতিফলিত হয়েছে।” –মন্তব্যটি বিচার করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে বসুন্ধরা যার ধান্য তার।

খ.

‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে পাট উৎপাদনকারী কৃষকদের চরম দারিদ্র্যের কথা বলা হয়েছে।

বাংলায় পাটকল প্রতিষ্ঠিত হলে এদেশে ক্রমে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে পাটকল শ্রমিকরা জীবনধারণের জন্য পর্যাপ্ত মজুরি পেয়ে আনন্দচিন্তে দিনযাপন করে। কিন্তু পাটচাষিরা যারা পাট উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত তারা অর্থাভাবে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। ‘পাছায় জোটে না ত্যানা’ কথাটি দিয়ে প্রাবন্ধিক কৃষকদের এ হীন অবস্থারই চিত্র তুলে ধরেছেন।

গ.

কৃষকের শোষিত হওয়ার বিষয়টিতে ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধ ও উদ্দীপকের মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

বাংলার কৃষক এদেশের সমাজের চালিকাশক্তি। কিন্তু নানা কারণে তারা শোষিত ও বঞ্চিত হয়। এদেশের চাষিরা সারাদিন রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে কঠোর পরিশ্রম করে সোনার ফসল ফলায়। কিন্তু কৃষকের উৎপাদিত ফসলে নিজেদের সমৃদ্ধ করে শোষক সম্প্রদায়। এই কৃষকের দিন কাটে অনাহারে, অর্ধাহারে কিংবা বস্ত্রহীন অবস্থায়।

‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে পাটকল আর চটকল মালিকদের কৃষকদের শোষণের কথা বর্ণিত হয়েছে। বাংলার কৃষকরা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে কঠোর পরিশ্রম করে ফসল ফলায়। কিন্তু তারা তাদের ফসলের ন্যায্য দাম পায় না। অথচ তাদের পরিশ্রমের ফসলই দেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখে। অন্যদিকে, উদ্দীপকে দেখা যায় এদেশের গ্রামীণ সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইউরোপীয় যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ইউরোপীয় ঘরানার বিলাসিতার কারণে এদেশের কুটির শিল্প ধ্বংসের পথে। ফলে গ্রামের মানুষ আজ অনাহারী, তাদের পরনে বস্ত্র নেই। পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাবে তাদের কাছে জীবনের মানেও আজ ভিন্নতর। উদ্দীপকটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলার অর্থনীতি ধ্বংসের মৌল কারণ শোষণের বিষয়টি এখানে উল্লেখিত হয়নি। তাই বলা যায়, শোষণের বিষয়টিতে আলোচ্য প্রবন্ধ ও উদ্দীপকটিতে বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ.

রোকেয়ার সমাজ ভাবনা বিস্ময়কররূপে সমকালীন, কেননা বাংলাকে বাঁচাতে হলে কুটির শিল্প তথা শিল্প বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুশিক্ষারও বিস্তার ঘটাতে হবে।

বাংলার সাধারণ কৃষকেরা সারা দিন কঠোর পরিশ্রম করে জীবনধারণের জন্য মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে না। কিন্তু কিছু কৃষক ইউরোপীয় সভ্যতার অনুকরণে বিলাসী জীবন যাপন করে। অবশ্য তারা একসময় চরম দারিদ্র্যেরও শিকার হয়। বাংলার চাষিদের এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিলাসিতা ত্যাগ করার পাশাপাশি শিল্পের বিকাশ ও সুশিক্ষার বিস্তার প্রয়োজন। তা হলেই তারা মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করে সমৃদ্ধ হতে পারবে।

‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে বাংলার কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে দেখা যায়, তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই করুণ। তারা কঠোর পরিশ্রম করে মাঠে ফসল উৎপাদন করে ঠিকই কিন্তু এর ন্যায্যমূল্য পায়না। কৃষকদের মধ্যে আবার একটি শ্রেণি বিলাসিতায় মগ্ন থাকে। অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণে এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য কুটির শিল্প ধ্বংস হওয়ার পথে। আলোচ্য প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া স্বপ্ন দেখেছেন বাংলার কৃষকরা একদিন আত্মনির্ভরশীল হবে। এজন্য তিনি এদেশের গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করেন বাংলার আনাচে কানাচে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে পারলেই এদেশের কুটির শিল্প বেঁচে থাকবে এবং কৃষকরা সমৃদ্ধ হতে পারবে। উদ্দীপকেও গ্রামবাংলার মানুষের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকে বলা হয়েছে এখানকার কুটির শিল্পের একসময় বিশ্বজুড়ে খ্যাতি ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে তা আজ ধ্বংসের মুখে। গ্রামবাংলাকে রক্ষা করতে হলে এই প্রাচীন শিল্প তথা কুটির শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। এজন্য পল্লিবাংলায় শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন। তবেই গ্রামবাংলার মানুষ যে শ্রীহীনতায় রয়েছে তা কেটে যাবে।

উদ্দীপক এবং ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধ উভয়টিতেই পল্লিবাংলাকে বাঁচানোর স্বপ্ন দেখা হয়েছে। উভয়টির মূলকথা এদেশের কৃষকদের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন। এজন্য প্রয়োজন বাংলার চাষিদের একাংশের বিলাসিতা ত্যাগ করা। আর পল্লিবাংলার



আনাচে-কানাচে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। তবেই সুখী ও সমৃদ্ধ হবে বাংলার কৃষক সমাজ। তাই বলা যায়, ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে বর্ণিত সমাজভাবনা উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

গাহি তাহাদের গান—

ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।

শ্রম-কিণাক্ষ-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি তলে

ত্রস্তা-ধরণী নজরানা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।

ক. ‘চাষার দুস্কু’ রচনায় কৃষককন্যার নাম কী?

খ. সভ্যতার সঙ্গে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায় কেন?

গ. ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধে কৃষকের সঙ্গে উদ্দীপকটি কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘চাষার দুস্কু’ প্রবন্ধ উভয়টিতেই শ্রমের বন্দনা গীত হয়েছে।” –স্বীকার করেন কী? বিশ্লেষণ করুন।



উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ ২. ক ৩. গ ৪. খ ৫. ক ৬. ক ৭. গ ৮. ক ৯. খ ১০. ক ১১. ক ১২. গ



আহ্বান

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়



লেখক-পরিচিতি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার মুরারিপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস একই জেলার ব্যারাকপুর গ্রাম। তাঁর পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা মৃণালিনী দেবী। দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর বাল্য ও কৈশোরকাল কাটে। অত্যন্ত মেধাবী বিভূতিভূষণ ১৯১৪ সালে ম্যাট্রিকে ও ১৯১৬ সালে আইএ-তে প্রথম বিভাগে এবং ১৯১৮ সালে ডিস্টিংশনসহ বিএ পাস করেন। তিনি দীর্ঘদিন বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করেন এবং পাশাপাশি সাহিত্যসাধনা করেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনচরণের সজীব ও নিখুঁত চিত্র তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখায় প্রকাশ করেছেন। সাহিত্যে তিনি প্রকৃতি ও মানবজীবনকে অখণ্ড সত্তায় ধারণ করেছেন। শুধু প্রকৃতির বর্ণনাই নয়, বরং তাঁর সাহিত্যে রয়েছে গভীর জীবনদৃষ্টি। তাঁর ভাষা মধুর, কাব্যধর্মী ও চিত্রাত্মক বর্ণনায় সমৃদ্ধ। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি পথের পাঁচালী ও অপরাজিত যুগল উপন্যাস বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫০ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঘাটশিলায় মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা-

গল্পগ্রন্থ : মেঘমল্লার (১৯৩১), মৌরীফুল (১৯৩২), যাত্রাবদল (১৯৩৪), কিন্নরদল (১৯৩৮);

উপন্যাস : পথের পাঁচালী (১৯২৯), অপরাজিত (১৯৩১), দৃষ্টিপ্রদীপ (১৯৩৫), আরণ্যক (১৯৩৮), দেবযান (১৯৪৪), ইছামতী (১৯৪৯)।

ভূমিকা

‘আহ্বান’ গল্পটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলি থেকে সংকলিত হয়েছে। এই গল্পে লেখক দুটি ভিন্ন ধর্ম-বর্ণ ও আর্থিক অবস্থানে বেড়ে ওঠা চরিত্রের মধ্যে সংকীর্ণতা ও সংস্কারমুক্ত উদার মানবিক সম্পর্কের মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। মানুষের লেহ-মমতার কাছে যে, ধনী দরিদ্রের শ্রেণিবিভাগ ও ধর্মের বৈষম্য গুরুত্বহীন তা এই গল্পের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।



উদ্দেশ্য

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আহ্বান’ গল্পটি পড়ার পর আপনি-

-  গ্রামীণ পরিবেশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
-  লেখকের (কথক) সাথে গল্পে বর্ণিত বৃদ্ধার সম্পর্ক গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
-  সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ যে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মিক বন্ধন সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না, তা উপলব্ধি করে সে-সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
-  অসহায় বৃদ্ধার চরিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

দেশের ঘরবাড়ি নেই অনেকদিন থেকেই। পৈতৃক বাড়ি যা ছিল ভেঙেচুরে ভিটিতে জঙ্গল গজিয়েছে। এ অবস্থায় একদিন গিয়েছি দেশে কিসের একটা ছুটিতে।

গ্রামের চক্কোত্তি মশায় আমার বাবার পুরাতন বন্ধু। আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। বললেন— কতকাল পরে বাবা মনে পড়ল দেশের কথা? প্রশ্ন করে পায়ের ধূলা নিলাম। বললেন— এসো, এসো, বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও। বাড়িঘর করবে না?

—আজ্ঞে সামান্য মাইনে পাই—

—তাতে কী? গ্রামের ছেলে গ্রামে বাস করবে, এতে আর সামান্য মাইনে বেশি মাইনে কী? আমি খড় বাঁশ দিচ্ছি, চালাঘর তুলে ফেল, মাঝে মাঝে যাতায়াত করো।

আরও অনেকে এসে ধরল, অন্তত খড়ের ঘর ওঠাতে হবে। অনেক দিন পরে গ্রামে এসে লাগছে ভালোই। বড় আমবাগানের মধ্য দিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছি, আমগাছের ছায়ায় একটি বৃদ্ধার চেহারা, ডান হাতে নড়ি ঠক্কু করতে করতে— বোধ হয় বাজারের দিকে চলেছে।

বুড়িকে দেখেই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাবে?

—বাজারে বাবা।

বুড়ি আমায় ভালো না দেখতে পেয়ে কিংবা না চিনতে পেরে ডান হাত উঁচিয়ে তালু আড়ভাবে চোখের ওপর ধরল। বলল, কে বাবা তুমি? চেনলাম না তো?

—চিনবে না। আমি অনেক দিন গাঁয়ে আসি নি।

—তা হবে বাবা। আমি আগে তো এপাড়া-ওপাড়া যাতাম আসতাম না। তিনি থাকতি অভাব ছিল না কোনো জিনিসের। গোলাপোরা ধান, গোয়ালপোরা গরু।

—তোমাকে তো চিনতে পারলাম না, বুড়ি?

—আমার তো তেনার নাম করতে নেই বাবা। করাতে কাজ করতেন।

বললাম, তোমার ছেলে আছে?

—কেউ নেই বাবা, কেউ নেই। এক নাত-জামাই আছে তো সে মোরে ভাত দেয় না। আমার বড্ড কষ্ট। ভাত জোটে না সবদিন।

বুড়িকে পকেট থেকে কিছু পয়সা বার করে দিলাম।

—ব্যাপারটা এখানেই চুকে যাবে ভেবেছিলাম। কিন্তু তা চুকল না।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেছি, এমন সময় সেই বুড়ি লাঠি ঠক্কু করতে করতে হাজির উঠানে। থাকি এক জ্ঞাতি খুড়োর বাড়ি। তিনি বললেন, ও হলো জমির করাতির স্ত্রী। অনেকদিন আগে মরে গিয়েছে জমির।

বুড়ি উঠানে দাঁড়িয়ে ডাকল, ও বাবা।

বোধহয় চোখে একটু কম দেখে।

বললাম, এই যে আমি এখানে।

আমার খুড়োমশায় বুড়িকে বুঝিয়ে দিলেন আমি কে। সে উঠানের কাঁঠালতলায় বসে আপন মনে খুব খানিকটা বকে গেল।

পরদিন কলকাতা চলে গেলাম, ছুটি ফুরিয়ে গেল।

কয়েক মাস পরে জ্যৈষ্ঠ মাসে গরমের ছুটিতে আমার নতুন তৈরি খড়ের ঘরখানাতে এসে উঠলাম। কলকাতাতে কর্মব্যস্ত এই ক'মাসের মধ্যে বুড়িকে একবারও মনে পড়েনি বা এখানে এসেও মনে হঠাৎ হয়ত হতো না, যদি সে তার পরের দিনই সকালে আমার ঘরের নিচু দাওয়ায় এসে না বসে পড়ত।



বললাম, কী বুড়ি, ভালো আছ?

ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের প্রান্ত থেকে গোটাকতক আম খুলে আমার সামনে মাটিতে রেখে বলল, আমার কি মরণ আছে রে বাবা।

জিজ্ঞাসা করলাম, ও আম কিসের।

দন্তহীন মুখে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, অ গোপাল আমার, তোর জন্য নিয়ে আলাম। গাছের আম বেশ কড়া মিষ্টি, খেয়ে দেখ এখন।

বড় ভালো লাগল। গ্রামে অনেকদিন থেকে আপনার জন কেউ নেই। একটা ঘনিষ্ঠ আদরের সম্বোধন করার লোকের দেখা পাই নি বাল্যকালে মা-পিসিমা মারা যাওয়ার পর থেকে।

বুড়ি বললে, খাও কোথায় হ্যাঁ বাবা?

—খুড়ো মশায়ের বাড়ি।

—বেশ যত্ন করে তো ওনারা?

—তা করে।

—দুধ পাচ্ছ ভালো?

—ঘুঁটি গোয়ালিনী দেয়, মন্দ না।

—ও বাবা, ওর দুধ! অর্ধেক জল— দুধ খেতি পাচ্ছ না ভালো সে বুঝেচি।

পরদিন সকাল হয়েছে সবে, বুড়ি দেখি উঠোনে এসে ডাকছে, অ গোপাল।

বিছানা ছেড়ে উঠে বললাম, আরে এত সকালে কী মনে করে। হাতে কী?

বৃদ্ধা হাতের নড়ি আমার দাওয়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে বলল, এক ঘটি দুধ আনলাম তোর জন্য।

—সে কী! দুধ পেলে কোথায় এত সকালে?

আমায় মা বলে ডাকে ওই হাজরা ব্যাটার বউ। তারও কেউ নেই। মোর চালাঘরের পাশে ওর চালাঘর। ওরে কাল রাঙিরে বলে রেখে দিয়েছিলাম, বলি বউ আমার, গোপাল দুধ খেতি পায় না। তাই আজ ভোরে উঠে দেখি আমারে ডাকচে, মা ওঠো, তোমার গোপালের জন্য দুধ নিয়ে যাও।

—আচ্ছা কেন বলতো তোমার এসব! এ রকম আর কখনও এনো না। কত পয়সা দাম দিতে হবে বল। কতটা দুধ?

বুড়ি একটু ঘাবড়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বলে, কেন বাবা, পয়সা কেন?

—পয়সা না তো তুমি দুধ পাবে কোথায়?

—ওই যে, বললাম বাবা, আমার মেয়ের বাড়ি থেকে।

—তা হোক, তুমি পয়সা নিয়ে যাও। সেও তো গরিব লোক।

বুড়ি পয়সা নিয়ে চলে গেল বটে কিন্তু সে যে দমে গিয়েছে তার কথাবার্তার ধরনে বেশ বুঝতে পারলাম। মনে একটু কষ্ট হলো বুড়ি চলে গেলে। পয়সা দিতে যাওয়া ঠিক হয়েছে কি? বুড়ির কী রকম হয়ত মন পড়ে গিয়েছে আমার ওপর, স্নেহের দান— এমন করা ঠিক হয়নি। বুড়ি কিন্তু এ অবহেলা গায়ে মাখল না আদৌ। প্রতিদিন সকাল হতে না হতেই সে এসে জুটবে।

—অ গোপাল, এই দুটি কচি শসার জালি মোর গাছের, এই ন্যাও। নুন দিয়ে খাও দিকিন মোর সামনে?

—বুড়ি তোমার চলে ডকসে?

—ওই যারে মেয়ে বলি, ও বড্ড ভালো। লোকের ধান ভানে, তাই চাল পায়, আমায় দুটো না দিয়ে খায় না।

—একা থাক?

—তা একদিন মোর ঘরখানা না হয় দেখতি গেলে, অ মোর গোপাল! আমি নতুন খাজুর পাতার চোটাই বুনে রেখে দিয়েছিলাম তোমারে বসতি দেবার জন্য।



সেবার বুড়ির বাড়িতে আমার যাওয়া ঘটে উঠল না। নানাদিকে ব্যস্ত থাকি। অনেক দিন পরে গ্রামে এসেছি তো? যে কদিন গ্রামে থাকি বুড়ি রোজ সকালে আসতে ভুলবে না। কিছু না কিছু আনবেই। কখনো পাকা আম, কখনো পাতি লেবু, কখনো বা একছড়া কাঁচকলা কি এক-ফালি কুমড়া।

পুনরায় গ্রামে এলাম পাঁচ-ছয় মাস পরে, আশ্বিন মাসের শেষে। কয়েকদিন পরে ঘরে বসে আছি, বাইরের উঠানে দাঁড়িয়ে কে যেন জিজ্ঞাসা করলে; বাবু ঘরে আছেন গা?

বাইরে এসে দেখি গত জ্যৈষ্ঠ মাসে যাকে বুড়ির সঙ্গে দেখেছিলাম সে মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকটি। আমায় দেখে সলজ্জভাবে মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে দেবার চেষ্টা করে সে বললে, বাবু কবে এসেছেন?

—দিন পাঁচ-ছয় হলো।

—কেন?

—আমার সেই মা পেটিয়ে দিলে, বলে দেখে এসো গিয়ে।

—কে?

—ও সেই বুড়ি— এখানে যিনি আসত। তেনার বড্ড অসুখ। এবার বোধ হয় বাঁচবে না। গোপাল কবে আসবে, গোপাল কবে আসবে— অস্থির, আমরা রোজ শুধায়। একবার দেখে আসুন গিয়ে, বড্ড খুশি হবে তাহলি।

বিকেলের দিকে বেড়াতে যাবার পথে দেখতে গেলাম বুড়িকে। বুড়ি শুয়ে আছে একটা মাদুরের ওপর, মাথায় মলিন বালিশ। আমি গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই বুড়ি চোখ মেলে আমার দিকে চাইল। পরে আমাকে চিনে ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠবার চেষ্টা করতেই আমি বললাম, উঠো না, ও কী?

বুড়ি অহ্লাদে আটখানা হয়ে বলল, ভালো আছ অ মোর গোপাল? বসতে দে গোপালকে। বসতে দে।

—বসবার দরকার নেই, থাক।

—গোপালেরে ওই খাজুরের চটখানা পেতে দে।

পরে ঠিক যেন আপনার মা কি পিসিমার মতো অনুযোগের সুরে বলতে লাগল, তোর জন্য খাজুরের চটখানা কদিন আগে বুনে রেখেলাম। ওখানা পুরনো হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে। তুই একদিনও এলি না গোপাল। অসুখ হয়েছে তাও দেখতে এলি না।

বুড়ির দুচোখ বেয়ে জল বেয়ে পড়ছে গড়িয়ে। আমায় বলল, গোপাল, যদি মরি, আমার কাফনের কাপড় তুই কিনে দিস।

আসবার সময় বুড়ির পাতানো মেয়েটির হাতে কিছু দিয়ে এলাম পথ্য ও ফলের জন্য। হয়ত আর বেশি দিন বাঁচবে না, এই অসুখ থেকে উঠবে না।

বুড়ি কিন্তু সে যাত্রা সেরে উঠল।

বছরখানেক আর গ্রামে যাইনি। বোধ হয় দেড় বছরও হতে পারে। একবার শরতের ছুটির পর তখনও দুইদিন ছুটি হাতে আছে। গ্রামেই গেলাম এই দুইদিন কাটাতে। গ্রামে ঢুকতেই প্রথমে দেখা পরশু সর্দারের বউ দিগম্বরীর সঙ্গে। দিগম্বরী অবাক হয়ে বলে, ওমা আজই তুমি এলে? সে বুড়ি যে কাল রাতে মারা গিয়েছে। তোমার নাম করলো বড্ড। ওর সেই পাতানো মেয়ে আজ সকালে বললেন।

আমি এসেছি শুনে বুড়ির নাতজামাই দেখা করতে এল। আমার মনে পড়ল বুড়ি বলেছিল সেই একদিন— আমি মরে গেলে তুই কাফনের কাপড় কিনে দিস বাবা। ওর স্নেহাতুর আত্মা বহু দূর থেকে আমায় আহ্বান করে এনেছে। আমার মন হয়ত ওর ডাক এবার আর তাচ্ছিল্য করতে পারেনি।

কাপড় কিনবার টাকা দিলাম। নাতজামাই বলে গেল, মাটি দেওয়ার সময় একবার যাবেন। বেলা বারোটা আন্দাজ যাবেন।

শরতের কটুতিক্ত গন্ধ ওঠা বনঝোপ ও মাকাল-লতা দোলানো একটা প্রাচীন গাছের তলায় বৃদ্ধাকে কবর দেওয়া হচ্ছে। আমি গিয়ে বসলাম। আবদুল, শকুর মিঞা, নসর, আমাদের সঙ্গে পড়ত। আবেদালি, তার ছেলে গনি এরা সকলে গাছের ছায়ায় বসে।



প্রবীণ মুকুর মিয়া আমায় দেখে বলল, এই যে বাবা, এসো। বুড়ির মাটি দেওয়ার দিন তুমি কনে থেকে এলে, তুমি তো জানতে না? তোমায় যে বড্ড ভালোবাসত বুড়ি।

দুজন জোয়ান ছেলে কবর খুঁড়ছে। কবর দেওয়ার পর সকলে এক এক কোদাল মাটি দিল কবরের উপর। শুকুর মিঞা বলল, দ্যাও বাবা- তুমি দ্যাও।

দিলাম এক কোদাল মাটি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠতো, -অ মোর গোপাল।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অন্ধের নড়ি- অসহায়ের একমাত্র অবলম্বন। **করাতের কাজ-** কাঠ চেরাই করার পেশা। **করাতি-** করাত দিয়ে কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করে যে। **গোলাপোরা-** গোলাভরা। **গোয়ালপোরা-** গোয়ালভরা। **চক্কোত্তী-** 'চক্রবর্তী' উপাধির আঞ্চলিক রূপ। **পূজারী ব্রাহ্মণের উপাধি** বিশেষ। **দাওয়া-** রোয়াক, বারান্দা। **নড়ি-** লাঠি।



সারসংক্ষেপ

'আহ্বান' একটি উদার মানবিক সম্পর্কের গল্প। এ গল্পটিতে কথক ও গ্রামের এক দরিদ্র অসহায় বৃদ্ধার আত্মিক বন্ধনের চিত্র প্রতিভাত হয়েছে। দরিদ্র হলেও বৃদ্ধা কখনো কথকের কাছে খালি হাতে যান না। বৃদ্ধার স্নেহের টান যেন তার আত্মার টানকেই প্রকাশ করে। জাতিগত বিভেদ ও চিহ্নের বৈষম্য উভয় হৃদয়ের সম্পর্কের পথে বাধা হতে পারে না। স্নেহবশে বৃদ্ধা তার জন্য কখনো আম, কখনো শসা, জালি, দুধ প্রভৃতি নিয়ে আসে। এভাবে বৃদ্ধার প্রতি কথকের হৃদয়ের বন্ধন দৃঢ় হয়।

একদিন অসুস্থ হলে বৃদ্ধাকে কথক দেখতে যান। বৃদ্ধা সনাতন ধর্মানুসারী কথককে বসতে দেয়ার জন্য একটি খেজুর পাতার চাটাই বুনে রেখেছিল। অশ্রুসিক্ত বৃদ্ধা মৃত্যুর পর তাকে দাফনের জন্য কাফনের কাপড়টি কিনে দিতে কথককে অনুরোধ করে। বৃদ্ধার মৃত্যুর পর কথক এক প্রকার মনের টানেই যেন গ্রামে আসে। বৃদ্ধার কাফনের কাপড় কেনার জন্য কথক তার আত্মীয়ের হাতে টাকা দেন। ধর্মবর্ণবিশিষ্ট প্রভৃতিকে ছাপিয়ে মানুষের মহিমাই প্রকাশ পেয়েছে এ গল্পটিতে। লেখক এতে লোকাযত গ্রামীণ জীবনধারা যে শাস্ত্রীয় কঠোরতা থেকে অনেকটা মুক্ত তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বুড়ির স্বামীর নাম কী?

- ক. আবেদালি
গ. জমির

- খ. শুকুর আলি
ঘ. পরশু সর্দার

২. গোপালের বুড়িকে ভাল লাগার কারণ কী?

- ক. একই গ্রামে বসবাস
গ. মা বলে ডাকায়

- খ. রক্ত সম্পর্ক
ঘ. আদরের সম্বোধনে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

শমি দীর্ঘদিন ধরে বিলাত প্রবাসী। দেশের সঙ্গে তার নাড়ীর টান ছিন্ন হয়নি। ছুটি পেলেই সে একেবারে গ্রামের বাড়ি চলে আসে। গ্রামের মানুষের সঙ্গে তার উদার মানবিক সম্পর্ক। তারা শমিকে কাছে পেয়ে গর্ববোধ করে।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে আপনার পঠিত কোন রচনার মিল রয়েছে?

- ক. অপরিচিতা
গ. আমার পথ

- খ. বিড়াল
ঘ. আহ্বান

৪. উদ্দীপক ও পঠিত গল্প অনুসারে মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠে-

- ক. গ্রামীণ পরিবেশে
গ. দান-ধ্যানের কারণে

- খ. যোগাযোগের কারণে
ঘ. পারস্পরিক সহমর্মিতায়



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. গোপাল গ্রামে এলে কার বাড়িতে থাকে?

- ক. শুকুর মিশ্র
- গ. বন্ধু

- খ. চকোন্টি মশায়
- ঘ. বুড়ি

৬. বুড়ি ঘাবড়ে গিয়েছিল কেন?

- ক. দুধের দাম দেওয়ায়
- গ. দুধের দাম না চাওয়ায়

- খ. দুধের দাম চাওয়ায়
- ঘ. দুধের দাম না দেওয়ায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ছোট খালার উপর অভিমান ছিল। তাই বড় অসুখ করলেও তাকে দেখতে যাওয়া হয়নি। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবার তাকে দেখতে গেলাম। আমাকে দেখেই তিনি বিছানা থেকে ওঠে বসলেন। বললেন, “বাবারে, এতদিন পর এলি?”

৭. উদ্দীপকের খালার সঙ্গে ‘আহ্বান’ গল্পের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?

- ক. বুড়ি
- গ. গোপাল

- খ. দিগম্বরী
- ঘ. শুকুর আলি

৮. এরূপ সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে—

- i. কষ্টবোধ
- ii. অনুযোগ
- iii. অভিমান

নিচের কোনটি ঠিক?

- ক. i
- গ. ii ও iii

- খ. ii
- ঘ. iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

অকাল বার্ষিক্যে নত কদম আলী

তার ক্লান্ত চোখের আঁধার—

আমি চিনি, আমি তার চিরচেনা স্বজন একজন।

আমি জমিলার মা’র

শূন্য খাঁ খাঁ রান্নাঘর শুকনো থালা সব চিনি

সে আমাকে চেনে।

ক. ‘আহ্বান’ গল্পে গল্পকথক কোন মাসে দ্বিতীয়বার গ্রামে এসেছিলেন?

খ. ‘স্নেহের দান এমন করা ঠিক হয়নি’—বাক্যটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের জমিলার মা’র সঙ্গে ‘আহ্বান’ গল্পে কার মিল রয়েছে?

ঘ. “নিবিড় স্নেহ ও উচ্ছল ভালোবাসা উদ্দীপক এবং ‘আহ্বান’ গল্পের উপজীব্য।”—বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :

বাল্যবন্ধু রাজিব হালদারের মৃত্যুর সংবাদ শুনে গ্রামে ছুটে এসেছে সাইদ মাহমুদ। শেষবারের মত বন্ধুর মুখ দেখার জন্য তার আকুলতা। বাড়ি এসে দেখে লাশ পোড়ানোর জন্য সকলে মিলে শ্মশান ঘাটের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছে। সাইদ মাহমুদ কাল বিলম্ব না করে শবযাত্রায় জনতার সঙ্গে শরিক হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের স্নেহ-মমতা-প্রীতির যে বন্ধন তা ধনসম্পদে নয়, হৃদয়ের নিবিড় আন্তরিকতার স্পর্শেই গড়ে ওঠে।

ক. বৃদ্ধার কোন হাতে নড়ি ছিল?



- খ. ‘আমার তো তেনার নাম করতে নেই বাবা।’ –কোন প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে?
- গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ‘আহ্বান’ গল্পে কার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?
- ঘ. “আহ্বান’ গল্পের উদার মানবিক চেতনা উদ্দীপকেও অনুরণিত হয়েছে।” –বিশ্লেষণ করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

‘আহ্বান’ গল্পে গল্পকথক জ্যৈষ্ঠ মাসে দ্বিতীয়বার গ্রামে এসেছিলেন।

খ.

‘স্নেহের দান এমন করা ঠিক হয়নি’ – বাক্যটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, বুড়ির স্নেহের দান অর্থ দিয়ে পরিশোধ করতে যাওয়া গল্পকথকের উচিত হয়নি।

‘আহ্বান’ গল্পে জমির করাতির স্ত্রী অশীতিপর বৃদ্ধা। দেখাশোনা করার জন্য তার নিকটাত্মীয় কেউ নেই। গল্পকথকের সঙ্গে তার মমতার বন্ধন গড়ে উঠে। এ কারণে জমির করাতির স্ত্রী বুড়ি গল্পকথকের জন্য প্রতিদিন সকালে কিছু না কিছু নিয়ে আসত। বুড়ি একদিন জানতে পারে গল্পকথক খাঁটি দুধ খেতে পাচ্ছেন না। তাই সে একদিন গল্পকথকের জন্য দুধ জোগাড় করে নিয়ে আসে। এ নিয়ে লেখক বেশ বিবর্তবোধ করেন।

গ.

উদ্দীপকে উল্লিখিত জমিলার মা ‘আহ্বান’ গল্পে বুড়ি চরিত্রটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আবহমানকাল থেকে বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। গ্রামবাংলায় প্রাচীনকাল থেকে যেমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধি বিরাজিত ছিল তেমনি এর বিপরীতে দারিদ্র্যের করালগ্রাসও দুর্লভ নয়। কৃষিপ্রধান দেশ হওয়াতে এখানকার মানুষকে জীবননির্বাহের জন্য কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে পরিবারে পুরুষ সদস্যের অবর্তমানে নেমে আসে অভাব, কখনোবা বিপর্যয়।

উদ্দীপকে জমিলার মা বাংলার গ্রামীণ সমাজের দরিদ্র শ্রেণির প্রতিনিধি। তার রান্নাঘর প্রায় সময়ই শূন্য থাকে। ঘরে রান্না হয়না, তাই থালা- বাসনও শুকনো থাকে। উদ্দীপকের কবি মূলত এখানে একটি চিত্রকল্পের সাহায্যে জমিলার মায়ের আর্থিক দূরবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। ‘আহ্বান’ গল্পেও লেখক তার গ্রামের এক দরিদ্র বুড়ির কথা বলেছেন। বুড়ি জমির করাতির স্ত্রী। তাকে মা ডাকে এমন এক মহিলার সঙ্গে সে থাকে। বিধবা বুড়ির নাতজামাই আছে, সে তাকে খেতে দেয় না। তার যত্ন করে না। বুড়ির তাই ভারি কষ্ট। একমুঠো ভাতের জন্য তাকে সারাদিন এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়াতে হয়। এভাবে দেখা যায়, উদ্দীপকের জমিলার মায়ের সঙ্গে ‘আহ্বান’ গল্পের বুড়ি চরিত্রের সামঞ্জস্য রয়েছে।

ঘ.

নিবিড় স্নেহ ও উচ্ছল মানবিক সম্পর্ক উদ্দীপক এবং ‘আহ্বান’ গল্প উভয়টির পরতে পরতে চিত্রিত হয়েছে।

মানুষের পারস্পরিক স্নেহ ও মমতার বন্ধন বিষয়টি আত্মিক। মানুষ মানবিক চেতনায় একে অন্যকে ভালবাসে। কোন কারণে সহানুভূতির প্রশ্রয় পেলে মানুষের হৃদয়ে জমে থাকা কষ্টগুলো দূর হয়ে যায়। মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়াবে, একজন আরেক জনের সঙ্গে গভীর সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলবে, এটাই স্বাভাবিক। এভাবে পরস্পরের সঙ্গে গড়ে উঠে নিবিড় স্নেহ ও উচ্ছল মানবিক বন্ধন।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি জন্মভূমির সাথে তাঁর নিজের সম্পৃক্ততার কথা তুলে ধরেছেন। গ্রামে বসবাসকারী মানুষ একে অপরের সাথে রক্ত, আত্মীয়তা, পড়শী ও আন্তরিকতার সূত্রে পরস্পর নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। উদ্দীপকে একজন অকালবৃদ্ধ ও অভাবগ্রস্ত নারীর পরিচয়ের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ জনপদের সঙ্গে মানবিক ভালবাসায় আবদ্ধ মানুষের জীবনাচরণ ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে ‘আহ্বান’ গল্পে এক অসহায় বুড়ির গভীর মাতৃস্নেহের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। গ্রামে বুড়ির আপন বলতে কেউ নেই। তার খোঁজ-খবর কেউ তেমন একটা নেয় না। প্রতিবেশী যে স্ত্রীলোকটিকে বুড়ি মেয়ে বলে ডাকে সে অন্যের বাড়িতে কাজ করে উপার্জন করে বুড়িকে নিয়ে খায়। এমনি এক পর্যায়ে লেখকের সঙ্গে বুড়ির পরিচয় হয়। বুড়ি লেখককে সন্তানের মত স্নেহ করে। লেখকও তার প্রতি যতটা সম্ভব মমত্ববোধ প্রকাশ করেন।

উদ্দীপক ও ‘আহ্বান’ গল্পে উদার মানবিকতা প্রকাশিত হয়েছে। উদ্দীপকে গ্রামীণ জীবনে একে অপরের আন্তরিকতাপূর্ণ চেনাজানার মধ্য দিয়ে ভালোবাসার উচ্ছলতা ফল্লুধারার মতো প্রবাহিত হয়েছে। ‘আহ্বান’ গল্পেও লেখক দীর্ঘদিন পর গ্রামে



ফিরে আসায় নিবিড় লেহ তার জীবনে প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। বস্তুত এই লেহ নিবিড়তাই ‘আহ্বান’ গল্পের মূল সুর যা উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

বাল্যকালে বাবা-মাকে হারিয়ে ফুফুর নিকট বড় হয় রোকন। আজ সে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত। ব্যস্ততার কারণে গ্রামের বাড়িতে খুব একটা আসা হয়ে উঠে না। সংসারে যশ, খ্যাতি, অর্থ সকলই তার করায়ত্ত্ব। শুধু সময় হয়ে উঠে না ফুফুকে এক নজর দেখার। রোকনের ফুফু একসময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনাদর, অবহেলা এবং চিকিৎসার অভাবে ফুফু গত বছর চলে গেছেন না ফেরার দেশে। রোকন তখন বাড়ি গিয়েছিল কেবল সামাজিকতা রক্ষার্থে।

ক. করাতি কাকে বলে?

খ. ‘কেউ নেই বাবা, কেউ নেই।’ –উক্তিটি বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে ‘আহ্বান’ গল্পের সাদৃশ্য কিংবা বৈসাদৃশ্য যুক্তিসহ আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপকে রোকন ও ‘আহ্বান’ গল্পে গোপাল চরিত্রের মধ্যে চেতনাগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।” –আলোচনা করুন।



উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. খ ৩. খ ৪. খ ৫. ক ৬. ঘ ৭. ঘ ৮. ঘ



আমার পথ

কাজী নজরুল ইসলাম



লেখক-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৫ মে (বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম দুখু মিয়া। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। নজরুল অল্প বয়সেই পিতামাতা দুজনকেই হারান। শৈশব থেকেই দারিদ্র্য আর দুঃখ-কষ্ট ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। স্কুলের ধরাবাধা জীবনে কখনোই তিনি আকৃষ্ট হননি। ছেলেবেলায় তিনি লেটো গানের দলে যোগ দেন। পরে বর্ধমানে ও ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার দরিরামপুর হাইস্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ১৯১৭ সালে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে করাচি যান। যুদ্ধশেষে নজরুল কলকাতায় ফিরে আসেন ও সাহিত্যসাধনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি কিছুদিন মসজিদে ইমামতিও করেন। সাপ্তাহিক বিজলি পত্রিকায় ‘বিদ্রোহী’ কবিতা প্রকাশের পর সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত হন। তাঁর লেখায় তিনি বিদেশি শাসক, সামাজিক অবিচার ও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নজরুল সাহিত্য রচনা ছাড়াও কয়েক হাজার গানের রচয়িতা। তিনি বেশ কয়েকটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। তিনি গজল, খেয়াল ও রাগপ্রধান গান রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক ব্যবহার তাঁর কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের তৈরি করা পথে না চলে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে নিজেকে বিকশিত করেছেন। সাহিত্যে এনেছেন সাম্যবাদ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা। গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রচনায়ও তিনি কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। সম্পাদক এবং সমালোচক হিসেবেও নজরুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নজরুলের উপন্যাসগুলোর পটভূমি গড়ে উঠেছে বিপ্লব ও স্বাধীনতা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। দেশপ্রেম এবং নির্যাতিত মানুষের কথা উপন্যাসগুলোতে বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। নজরুলের ছোটগল্প বেশিরভাগই প্রেমকেন্দ্রিক। তিনি মূলত যৌবনের কবি। যৌবনের ধর্মই হল একদিকে যেমন বিদ্রোহ এবং প্রতিবাদ, অন্যদিকে প্রেম। এ দুটো অনুভূতিরই সূচনা হয় আবেগের প্রাবল্য থেকে। নজরুলের ভাষণ, সম্পাদকীয়, সমালোচনা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভাষার কাব্যিক ব্যঞ্জনা এবং বলিষ্ঠতায় পূর্ণ। তিনি দৈনিক নবযুগ, ধূমকেতু ও লাঙল পত্রিকায় সম্পাদকের কাজ করেছেন। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তিনি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ১৯৭২ সালে কবিকে ঢাকায় আনা হয় এবং তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করে জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। কবিকে ঢাকা ও রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ডিলিট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ‘জগত্তারিণী স্বর্ণপদক’, ভারত সরকার ‘পদ্মভূষণ’ ও বাংলাদেশ সরকার ‘একুশে পদক’ প্রদান করে। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। কাজী নজরুল ইসলামের প্রধান সাহিত্যকর্ম :

- কাব্যগ্রন্থ** : অগ্নিবীণা (১৯২২), বিষের বাঁশী (১৯২৪), ছায়ানট (১৯২৪), সাম্যবাদী (১৯২৫), সর্বহারা (১৯২৬), সিন্ধু-হিন্দোল (১৯২৭), চক্রবাক (১৯২৯), ফণি-মনসা (১৯২৯), প্রলয়-শিখা (১৯৩০);
- উপন্যাস** : বাঁধনহারা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০), কুহেলিকা (১৯৩১);
- গল্পগ্রন্থ** : ব্যথার দান (১৯২২), রিক্তের বেদন (১৯২৫), শিউলিমালা (১৯৩১);
- প্রবন্ধগ্রন্থ** : যুগবাণী (১৯২২), রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩), দুর্দিনের যাত্রী (১৯২৬), রুদ্রমঙ্গল (১৯২৬)।

ভূমিকা

‘আমার পথ’ প্রবন্ধটি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত ‘রুদ্র-মঙ্গল’ প্রবন্ধগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। এ প্রবন্ধে লেখক এমন এক ‘আমি’র প্রত্যাশা করেছেন যে সত্য প্রকাশে নির্ভীক ও অসংকোচ। একই সঙ্গে, এক মানুষকে আরেক মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে ‘আমরা’ করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি পরনির্ভরতা ও সংকোচ থেকে বের হয়ে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে এক্যবদ্ধ হয়ে সম্প্রীতি স্থাপনের মধ্যে দিয়ে উৎকৃষ্ট মানব সমাজ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।



উদ্দেশ্য

কাজী নজরুল ইসলামের ‘আমার পথ’ প্রবন্ধটি পড়ার পর আপনি—

- ✚ ‘আমার পথ’ প্রবন্ধ অনুসরণে নজরুলের ধর্মীয় চেতনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ✚ নজরুল ‘আমার সত্য’ বলতে কী বুঝিয়েছেন তা আলোচনা করতে পারবেন।
- ✚ দেশ উদ্ধার করতে হলে আত্মনির্ভরতার প্রয়োজন কেন হয় সে-সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- ✚ ‘মানবধর্মই যে সবচেয়ে বড় ধর্ম’ প্রবন্ধটির আলোকে তা বিশদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

আমার কর্ণধার আমি। আমার পথ দেখাবে আমার সত্য। আমার যাত্রা-গুরুর আগে আমি সালাম জানাচ্ছি— নমস্কার করছি আমার সত্যকে। যে-পথ আমার সত্যের বিরোধী, সে পথ আর কোনো পথই আমার বিপথ নয়। রাজভয়-লোকভয় কোনো ভয়ই আমার বিপথে নিয়ে যাবে না। আমি যদি সত্যি করে আমার সত্যকে চিনে থাকি, আমার অন্তরে মিথ্যার ভয় না থাকে, তাহলে বাইরের কোনো ভয়ই আমার কিছু করতে পারবে না। যার ভিতরে ভয়, সে-ই বাইরে ভয় পায়। এতএব যে মিথ্যাকে চেনে, সে মিছামিছি তাকে ভয়ও করে না। যার মনে মিথ্যা, সে-ই মিথ্যাকে ভয় করে। নিজেকে চিনলে মানুষের মনে আপনা-আপনি এত বড় একটা জোর আসে যে, সে আপন সত্য ছাড়া আর কাউকে কুর্নিশ করে না— অর্থাৎ কেউ তাকে ভয় দেখিয়ে পদানত রাখতে পারে না। এই যে, নিজেকে চেনা, আপনার সত্যকে আপনার গুরু, পথপ্রদর্শক কাণ্ডারি বলে জানা, এটা দম্ব নয়, অহংকার নয়। এটা আত্মকে চেনার সহজ স্বীকারোক্তি। আর যদিই এটাকে কেউ ভুল করে অহংকার বলে মনে করেন, তবু এটা মন্দের ভালো— অর্থাৎ মিথ্যা বিনয়ের চেয়ে অনেক বেশি ভালো। অনেক সময় খুব বেশি বিনয় দেখাতে গিয়ে নিজের সত্যকে অস্বীকার করে ফেলা হয়। ওতে মানুষকে ক্রমেই ছোট করে ফেলে, মাথা নিচু করে আনে। ও রকম বিনয়ের চেয়ে অহংকারের পৌরুষ অনেক-অনেক ভালো।

অতএব এই অভিশাপ-রথের সারথির স্পষ্ট কথা বলাটাকে কেউ যেন অহংকার বা স্পর্ধা বলে ভুল না করেন।

স্পষ্ট কথা বলায় একটা অবিনয় নিশ্চয় থাকে; কিন্তু তাতে কষ্ট পাওয়াটা দুর্বলতা। নিজেকে চিনলে, নিজের সত্যকেই নিজের কর্ণধার মনে জানলে নিজের শক্তির ওপর অটুট বিশ্বাস আসে। এই স্বাবলম্বন, এই নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস করতেই শেখাচ্ছিলেন মহাত্মা গান্ধীজি। কিন্তু আমরা তাঁর কথা বুঝলাম না, “আমি আছি” এই কথা না বলে সবাই বলতে লাগলাম “গান্ধীজি আছেন”। এই পরাবলম্বনই আমাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেললে। একেই বলে সবচেয়ে বড় দাসত্ব। অন্তরে যাদের এত গোলামির ভাব, তারা বাইরের গোলামি থেকে রেহাই পাবে কী করে? আত্মকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে। এই আত্মনির্ভরতা যেদিন সত্যি সত্যিই আমাদের আসবে, সেই দিনই আমরা স্বাধীন হব, তার আগে কিছুতেই নয়। নিজে নিষ্ক্রিয় থেকে অন্য একজন মহাপুরুষকে প্রাণপণে ভক্তি করলেই যদি দেশ উদ্ধার হয়ে যেত, তাহলে এই দেশ এতদিন পরাধীন থাকত না। আত্মকে চেনা নিজের সত্যকে বড় মনে করার দম্ব— আর যাই হোক ভগুমি নয়। এ-দম্ব শির উঁচু করে, পুরুষ করে, মনে একটা ‘ডোন্ট কেয়ার’—ভাব আনে। আর যাদের এই তথাকথিত দম্ব আছে, শুধু তারাই অসাধ্য সাধন করতে পারবে।

যার ভিত্তি পচে গেছে, তাকে একদম উপড়ে ফেলে নতুন করে ভিত্তি না গাঁথলে তার ওপর ইমারত যতবার খাড়া করা যাবে, ততবারই তা পড়ে যাবে। দেশের যারা শত্রু, দেশের যা-কিছু মিথ্যা, ভগুমি, মেকি তা সব দূর করতে প্রয়োজন হবে আগুনের সম্মার্জনী! আমার এমন গুরু কেউ নেই, যার খাতিরে সে আগুন-সত্যকে অস্বীকার করে কারুর মিথ্যা বা ভগুমিকে প্রশংসা দেবে। আমি সে-দাসত্ব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমি কোনো দিনই কারুর বাণীকে বেদবাক্য বলে মনে নেব না, যদি তার সত্যতা প্রাণে তার সাড়া না দেয়। না বুঝে বোঝার ভগুমি করে পাঁচ জনের শ্রদ্ধা আর প্রশংসা পাবার লোভ আমি কোনো দিনই করব না।

ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়। কোনো ভুল করছি বুঝতে পারলেই আমি প্রাণ খুলে তা স্বীকার করে নেব। কিন্তু না বুঝেও নয়, ভয়েও নয়। ভুল করছি বা করেছি বুঝেও শুধু জেদের খাতিরে বা গৌঁ বজায় রাখবার জন্যে



ভুলটাকে ধরে থাকব না। তাহলে আমার আগুন সেই দিনই নিভে যাবে। একমাত্র মিথ্যার জলই এই শিখাকে নিভাতে পারবে। তাছাড়া কেউ নিভাতে পারবে না।

মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা আমার এ পথের অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, আদত সত্যের মিল, সেখানে ধর্মের বৈষম্য, কোনো হিংসার দুশ্মনির ভাব আনে না। যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না। দেশের পক্ষে যা মঙ্গলকর বা সত্য, শুধু তাই লক্ষ্য করে এই আগুনের ঝাড়া দুলিয়ে পথে বাহির হলাম।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অভিশাপ-রথের সারথি— সমাজের নিয়ম পাল্টাতে গেলে বাধার সম্মুখীন হতে হয়, সমাজরক্ষকদের আক্রমণের শিকার হতে হয়। এ কথা জেনেও নজরুল তাঁর বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি অভিশাপ হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। নিজেই বসেছেন রথচালক তথা সারথির আসনে। **আগুনের ঝাড়া**— অগ্নিপতাকা, আগুনে সব শুদ্ধ করে নিয়ে সত্যের পথে ওড়ানো নিশান। **কর্ণধার**— প্রধান নেতা, যিনি হাল ধরেন। **কুর্নিশ**— অভিবাদন, সম্মান প্রদর্শন। **মেকি-মিথ্যা**, কপট। **সম্মার্জনা**— মেজে ঘষে পরিষ্কার করা।



সারসংক্ষেপ

‘আমার পথ’ প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম এমন এক ‘আমি’র আগমন প্রত্যাশা করেছেন যার পথ সত্যের পথ, সত্য প্রকাশে তিনি নির্ভীক, অসংকোচ। তিনি প্রতিটি মানুষকে পূর্ণ ‘আমি’ করতে চেয়েছেন, আর এভাবে প্রত্যেককে সংযোগ করে ‘আমরা’ হয়ে উঠতে চেয়েছেন। তাঁর এ ভাবনা সত্যপথের পথিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। নজরুলের এই ‘আমি সত্তা’ মিথ্যার ভয়কে জয় করে সত্যের আদলে নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে। নজরুল বলেছেন সুস্পষ্টভাবে নিজের বিশ্বাস আর সত্যকে প্রকাশ করতে না জানলে তৈরি হয় পরনির্ভরতা। কবি ভগ্ন আত্মবিশ্বাসের পরিবর্তে দাম্ভিক হতে চান। কারণ তাঁর বিশ্বাস সত্যের দৃষ্ট যাদের আছে তাদের জন্য অসাধ্য সাধন করা কঠিন কাজ নয়। তিনি ভুল করতে রাজি আছেন, কিন্তু ভণ্ডামি করতে রাজি নন। তাঁর কাছে নিজেকে জানাই হল সত্যকে জানা, আর এই সত্যকে জানার মাধ্যমে মানুষ দাঁড়াতে পারে তার অস্তিত্বের ভিত্তিমূলে। নজরুল বলেছেন, মানুষের মাঝে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করতে পারলেই ধর্মের প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হবে, এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের বিরোধ মিটে যাবে। সমগ্র মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার মূল শক্তি হলো সম্প্রীতি।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মহাত্মা গান্ধী আমাদের কী শিখিয়েছিলেন?

ক. আত্মপ্রত্যয়

খ. স্বাবলম্বন

গ. নিষ্ঠুরতা

ঘ. বিনয়

২. মানুষের অমর্যাদা হয় কিসে?

ক. অন্তরের ভয়ে

খ. মিথ্যা বিনয়ে

গ. বাইরের ভয়ে

ঘ. আত্ম-অহংকারে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আপন খবর আপনার হয় না

একবার আপনারে চিনলে

যায় অচেনারে চেনা

ও যার আপন খবর আপনার হয়না।



৩. উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে যে রচনার—

ক. বিড়াল	খ. আহ্বান
গ. আমার পথ	ঘ. জীবন ও বৃক্ষ

৪. উদ্দীপকে ‘আমার পথ’ প্রবন্ধের যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে—

- i. সত্যকে জানা
- ii. নিজেকে জানা
- iii. অজানাকে জানা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. i ও ii	ঘ. iii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. ‘কুর্নিশ’ শব্দের অর্থ কী?

ক. শুভেচ্ছা জানানো	খ. ছোট হওয়া
গ. অভিবাদন	ঘ. অসম্মান প্রদর্শন

৬. সকল ভয়কে কীভাবে দূর করা যায়?

ক. সত্যকে অর্জন করে	খ. আত্মনির্ভরশীল হয়ে
গ. ক্ষমতা দখল করে	ঘ. সাহস অর্জন করে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

সত্য যে কঠিন,
কঠিনেই ভালোবাসিলাম
সে কখনো করে না বঞ্চনা।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘আমার পথ’ রচনার যে ভাবটির মিল রয়েছে –

- i. সত্য বিভ্রান্ত করে
- ii. সত্য আলোর দিশারী
- iii. সত্যের পথ অন্ধকার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. i ও iii

৮. উদ্দীপকে ‘আমার পথ’ প্রবন্ধের যে বৈশিষ্ট্যটি উপস্থাপিত হয়েছে—

- i. আত্মপ্রত্যয়
- ii. সত্যানুসন্ধান
- iii. দাম্ভিকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. i ও ii



সৃজনশীল প্রশ্ন :

পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল কিছু নিয়ম- কানুন, বাঁধন- শৃঙ্খল, মানা- নিষেধের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহ করতে হলে সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে, বুক ফুলিয়ে বলতে হবে- ‘আমি আপনাকে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।’

ক. মানুষের মধ্যে কখন নির্ভরতা আসে?

খ. ‘আমার কর্ণধার আমি।’ –উক্তিটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের ভাবনা ‘আমার পথ’ প্রবন্ধের সঙ্গে কীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. “আত্মশক্তির জাগরণই স্বাধীনতা অর্জনের পাথর।” –উদ্দীপক ও ‘আমার পথ’ প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

‘আমার পথ’ প্রবন্ধ অনুযায়ী আত্মাকে চিনলেই মানুষের মধ্যে নির্ভরতা আসে।

খ.

নিজের উপর নিজের আস্থা থাকলে যে কোন কাজ সহজে করা যায় বলে আলোচ্য মন্তব্যটি করা হয়েছে।

আমরা সমাজে বাস করি। সমাজে চলতে গিয়ে আমাদের অনেক সময় এককে অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। তখন আমাদের নিজেদের উপর কর্তৃত্ব থাকেনা। এই নির্ভরশীলতা স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে। এক সময় এই নির্ভরতা অন্যের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে। বস্তুত ‘আমার পথ’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কাজী নজরুল ইসলাম ‘আমার কর্ণধার আমি।’ বলতে মানুষের আত্মনির্ভরতা তথা আত্মশক্তিকে বুঝিয়েছেন।

গ.

আত্মশক্তি উন্মোচনের বিষয়ে উদ্দীপক ও ‘আমার পথ’ প্রবন্ধটি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মানুষ যখন আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সত্যশক্তিতে উদ্দীপিত হয় তখন সে যে কাজে অগ্রসর হবে তাতেই সাফল্য লাভ করবে। আত্মবিশ্বাসী মানুষ নিজের উপর আস্থা রাখতে পারে। সে সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারে। একজন মানুষ আত্মবিশ্বাস, সত্যশক্তি ও মহৎ চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হয়ে যে কাজ করে তা দ্বারাই সে স্বাধীনতা ও মুক্তির পথ দেখাতে পারে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে বিদ্রোহ করতে হবে। এই বিদ্রোহ হচ্ছে সমাজে প্রচলিত নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বাধা- নিষেধের বিরুদ্ধে। কিন্তু নিয়ম ভাঙার এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করতে আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির প্রয়োজন। এই আত্মশক্তি অর্জন করতে হলে আগে নিজেকে জানতে হবে। আর এই সঙ্গে অপরকে ব্যক্তিত্বহীনভাবে কুর্নিশ করার মত নিচু মানসিকতাকে ত্যাগ করতে হবে। ‘আমার পথ’ প্রবন্ধেও মানসিক শক্তির উদ্বোধনের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে সত্যের অমিত শক্তি মানুষকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে। এর ফলে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে, সুন্দর ও মঙ্গলকে কামনা করতে পারে।

ঘ.

মানুষ যখন আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয় তখন স্বাধীনতার স্পৃহা তার চেতনায় জাগ্রত হয়।

মানুষের চেতনায় আত্মসত্তা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এর ভেতর লুকিয়ে থাকে অপরিমেয় শক্তি। মানুষের মধ্যকার এই আত্মসত্তার জাগরণ ঘটলে সমাজে যে কোন পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব। এভাবে আত্মশক্তিতে আস্থাবান হয়ে একসময় পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতাও অর্জন করা যেতে পারে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হচ্ছে আর্মিত্বের জাগরণ। কারণ এত বড় একটি প্রাপ্তি অর্জন করতে হলে অপরিমেয় শক্তি থাকতে হবে। একারণে আপনাকে চিনতে হবে। আর আত্মশক্তির সন্ধান করে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে হবে। মনে আত্মবিশ্বাস থাকলে অন্যকে কুর্নিশ করার প্রবণতা থাকে না, এর বদলে থাকে আত্মমর্যাদাবোধ। মানুষ যদি এই আত্মমর্যাদাবোধের সত্য উপনীত হতে পারে তাহলে একসময় স্বাধীনতা আসবে। ‘আমার পথ’ প্রবন্ধেও বলা হয়েছে



আমাদের আত্মনির্ভরতা যেদিন আসবে কেবল সেদিনই আমরা স্বাধীন হব। সেইসঙ্গে প্রাবন্ধিক প্রত্যাশা করেছেন সব বাধা অতিক্রম করে পরাধীনতা থেকে দেশকে মুক্ত করার সম্মিলিত প্রয়াস।

উদ্দীপক এবং ‘আমার পথ’ প্রবন্ধ উভয়টিতে আত্মবিশ্বাসের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। নিজেকে জানা ও চেনা, নিজের অন্তরের সত্যকে কর্ণধার হিসেবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই দৃঢ়তা ও আমিত্বে রয়েছে অপরিমেয় শক্তি। এভাবে আমিত্বের জাগরণে আসে আত্মবিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস নিয়ে আসে স্বাধীনতা। এই ধারাক্রম অর্জনের প্রথম ধাপ হল আমিত্বের জাগরণ। তাই বলা যায়, আমিত্ব তথা আত্মশক্তির জাগরণই হল স্বাধীনতা অর্জনের পাথর।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

বাস্তবিক, ভুল আছে বলেই পৃথিবীটা এত সুন্দর। ভুল না থাকলে পৃথিবীর দয়া, মায়া, ক্ষমা, ভালোবাসা প্রভৃতি কোমল গুণগুলির এত অবকাশ ও বিকাশ হতো কিনা সন্দেহ। তাছাড়া ভুল না থাকলে এত দিন মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা এবং অগ্রগতি কবে রুদ্ধ হয়ে সমস্ত অসাড়় নিষ্পন্দ হয়ে যেত। এখানেই ভুলের মূল্য।

ক. ‘আমার পথ’ প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?

খ. ‘মানুষ-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম।’ –ব্যখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপক ও ‘আমার পথ’ প্রবন্ধের ‘ভুলের ব্যঞ্জনা’র সাদৃশ্য আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘আমার পথ’ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আলোকিত পৃথিবীর স্বপ্ন।” –স্বীকার করেন কি? বিচার করুন।



উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. খ ৩. খ ৪. ক ৫. ঘ ৬. ক ৭. গ ৮. গ



জীবন ও বৃক্ষ

মোতাহের হোসেন চৌধুরী



লেখক-পরিচিতি

মোতাহের হোসেন চৌধুরী নোয়াখালি জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আব্দুল মজিদ ও মাতা ফতেমা খাতুন। শৈশবেই তাঁর পিতা মারা যাওয়ায় কুমিল্লায় নানবাড়িতেই তিনি বেড়ে ওঠেন। কুমিল্লার ইউসুফ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে তিনি আইএ ও বিএ পাশ করেন। ১৯৪৩ সালে বহিরাগত হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে চট্টগ্রাম কলেজে চাকরি করেন। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা হয় ১৯২৬ সালে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও শিখা গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে। এ কারণে তাঁর রচিত প্রবন্ধসমূহে যুক্তিনিষ্ঠা এবং মুক্তবুদ্ধির পরিচয় বিশেষভাবে বিধৃত। মুক্তবুদ্ধিমনা বিশেষ ব্যক্তিত্ব কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, আবদুল কাদির প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি কাজ করেছিলেন। একজন সংস্কৃতিবান ও মার্জিত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি যুক্তিনিষ্ঠ ও মুক্তবুদ্ধিদীপ্ত সরস প্রবন্ধ রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর জীবন ও সাহিত্য প্রভাবিত হয়েছিল ক্লাইভ বেল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাটাভ রাসেলের দ্বারা। ক্লাইভ বেল-এর *Civilization* গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত ‘সভ্যতা’ (১৯৬৫) এবং বাটাভ রাসেলের *Conquest of Happiness* গ্রন্থের অনুবাদ ‘সুখ’ (১৯৬৮) তাঁর দুটি বিশিষ্ট রচনা। তিনি তাঁর রচনায় সংস্কৃতি, ধর্ম, মানবতাবোধ ও মানুষের জীবনাচরণের মৌলিক বিষয়গুলো সংজ্ঞায়িত ও উন্মোচিত করতে চেয়েছেন এবং বিচিত্র ও সুন্দরভাবে বাঁচার মধ্য দিয়ে মহত্তম জীবনের সন্ধান করেছেন। তাঁর গদ্যশৈলীতে প্রমথ চৌধুরীর এবং মননে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব লক্ষণীয়। তিনি ছিলেন মূলত প্রবন্ধকার। গুণগ্রাহী বন্ধুরা মৃত্যুর পর তাঁর রচনাবলি সংকলিত করে *সংস্কৃতি কথা* (১৯৫৮) নামে একটি প্রবন্ধগ্রন্থ সংকলন বের করেন। মোতাহের হোসেন চৌধুরী ছিলেন যুক্তিবাদী। তবে একই সাথে তিনি ছিলেন জীবনরসের রসিক। এ কারণেই বলা হয় তাঁর গদ্যরচনা ‘বুদ্ধির দীপ্তিতে পরিচ্ছন্ন এবং স্মিতরসে স্নিগ্ধ’। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ভূমিকা

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধটি ‘সংস্কৃতি কথা’ গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে লেখক বৃক্ষের পরিপূর্ণ বিকাশের সঙ্গে মানব জীবনের তুলনা করেছেন। অঙ্কুরোদগমের পর্যায় থেকে নানা রূপান্তর ও বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে বৃক্ষের মতো মানব জীবনও পূর্ণতা পায়। শুধু বেঁচে থাকাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয়। অন্যের প্রেমে ও সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেবার মাঝেই জীবনে যেমন পূর্ণতা আসে তেমনি বৃক্ষও ফল, ফুলে পরিপূর্ণ হয়ে তার জীবন সার্থক করে। এভাবেই লেখক এই প্রবন্ধে জীবনের সাথে বৃক্ষের তুলনা করেছেন।



উদ্দেশ্য

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধটি পড়ার পর আপনি—

- ✚ বৃক্ষের জীবনের সঙ্গে কীভাবে মানুষের জীবনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ✚ বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি করা কেন সহজ হয়, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ✚ বৃক্ষ ও নদীর জীবনের তুলনামূলক আলোচনা করে বৃক্ষকে মানুষের জীবনাদর্শের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করতে পারবেন।



মূলপাঠ

সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা, বিকশিত জীবনের জন্য মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেয়া। স্বল্পপ্রাণ ঝুলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহঙ্কার। তারই চরণে তারা নিবেদিত-প্রাণ। ব্যক্তিগত অহঙ্কার, পারিবারিক অহঙ্কার, জাতিগত অহঙ্কার— এ সবার নিশান ওড়ানোই এদের কাজ। মাঝে মাঝে মানবপ্রেমের কথাও তারা বলে। কিন্তু তাতে নেশা ধরে না, মনে হয় আন্তরিকতাহীন, উপলব্ধিহীন বুলি।

এদের স্থানে এনে দিতে হবে বড় মানুষ— সূক্ষ্মবুদ্ধি উদারহৃদয় গভীরচিন্তা ব্যক্তি, যাদের কাছে বড় হয়ে উঠবে জীবনের বিকাশ, কেবল টিকে থাকা নয়। তাদের কাছে জীবনাদর্শের প্রতীক হবে প্রাণহীন ছাঁচ বা কল নয়, সজীব বৃক্ষ— যার বৃদ্ধি আছে, গতি আছে, বিকাশ আছে, ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হয়ে অপরের সেবার জন্য প্রস্তুত হওয়া যার কাজ। বৃক্ষের জীবনের গতি ও বিকাশকে উপলব্ধি করা দরকার, নইলে সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার ছবি চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে না। বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। তাই, বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন। মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়। তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। নইলে তার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সজীবতা ও সার্থকতার এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর নেই।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ অন্য কথা বলেছেন। ফুলের ফোটা আর নদীর গতির সঙ্গে তুলনা করে তিনি নদীর গতির মধ্যেই মনুষ্যত্বের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। তাঁর মতে মনুষ্যত্বের বেদনা নদীর গতিতেই উপলব্ধি হয়, ফুলের ফোটায় নয়। ফুলের ফোটা সহজ, নদীর গতি সহজ নয়— তাকে অনেক বাধা ডিঙানোর দুঃখ পেতে হয়। কিন্তু ফুলের ফোটার দিকে না তাকিয়ে বৃক্ষের ফুল ফোটানোর দিকে তাকালে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ভালো করতেন। তপোবন-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ কেন যে তা করলেন না বোঝা মুশকিল।

জানি, বলা হবে : নদীর গতিতে মনুষ্যত্বের দুঃখ যতটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বৃক্ষের ফুল ফোটানোয় তা তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। তাই কবি নদীকেই মনুষ্যত্বের প্রতীক করতে চেয়েছেন।

উত্তরে বলব : চর্মচক্ষুকে বড় না করে কল্পনা ও অনুভূতির চক্ষুকে বড় করে তুললে বৃক্ষের বেদনাও সহজে উপলব্ধি করা যায়। আর বৃক্ষের সাধনার যেমন একটা ধীর স্থির ভাব দেখতে পাওয়া যায়, মানুষের সাধনায়ও তেমনি একটা ধীরস্থির ভাব দেখতে পাওয়া যায়, আর এটাই হওয়া উচিত নয় কি? অনবরত ধৈর্যে চলা মানুষের সাধনা হওয়া উচিত নয়। যাকে বলা হয় গোপন ও নীরব সাধনা তা বৃক্ষেই অভিব্যক্ত, নদীতে নয়। তাছাড়া বৃক্ষের সার্থকতার ছবি যত সহজে উপলব্ধি করতে পারি, নদীর সার্থকতার ছবি তত সহজে উপলব্ধি করা যায় না। নদী সাগরে পতিত হয় সত্য, কিন্তু তার ছবি আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই না। বৃক্ষের ফুল ফোটানো ও ফল ধরানোর ছবি কিন্তু প্রত্যহ চোখে পড়ে। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সে অনবরত নতি, শান্তি ও সেবার বাণী প্রচার করে।

সাধনার ব্যাপারে প্রাপ্তি একটা বড় জিনিস। নদীর সাগরে পতিত হওয়ায় সেই প্রাপ্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। সে তো প্রাপ্তি নয়, আত্মবিসর্জন। অপরপক্ষে বৃক্ষের প্রাপ্তি চোখের সামনে ছবি হয়ে ফুটে ওঠে। ফুলে ফলে যখন সে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন আপনা থেকেই বলতে ইচ্ছা হয় : এইতো সাধনার সার্থকতা। বৃক্ষে প্রাপ্তি ও দান। সৃজনশীল মানুষেরও প্রাপ্তি ও দানে পার্থক্য দেখা যায় না। যা তার প্রাপ্তি, তাই তার দান।

বৃক্ষের পানে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অন্তরের সৃষ্টিধর্ম উপলব্ধি করেছেন। বহু কবিতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু গদ্যে তিনি তা স্পষ্ট করে বলেননি। বললে ভালো হতো। তাহলে নিজের ঘরের কাছেই যে সার্থকতার প্রতীক রয়েছে, সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন হতে পারতাম।

নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। প্রকৃতির যে ধর্ম মানুষের সে ধর্ম; পার্থক্য কেবল তরুণতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির ওপর তাদের নিজেদের কোনো হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির ওপর তার নিজের হাত রয়েছে। আর এখানেই মানুষের মর্যাদা।



মানুষের বুদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। মানুষকে আত্মা সৃষ্টি করে নিতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না। সুখ-দুখ-বেদনা উপলব্ধির ফলে অন্তরের যে পরিপক্বতা, তাই তো আত্মা। এই আত্মারূপ ফল স্রষ্টার উপভোগ্য। তাই মহাকবির মুখে শুনতে পাওয়া যায় : Ripeness is all- পরিপক্বতাই সব। আত্মাকে মধুর ও পুষ্ট করে গড়ে তুলতে হবে। নইলে তা স্রষ্টার উপভোগের উপযুক্ত হবে না। বিচিত্র অভিজ্ঞতা, প্রচুর প্রেম ও গভীর অনুভূতির দ্বারা আত্মার পরিপুষ্ট ও মাধুর্য সম্পাদন সম্ভব। তাই তাদের সাধনাই মানুষের শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু। বস্তু-জিজ্ঞাসা তথা বিজ্ঞান কখনো শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে না। কেননা, তাতে আত্মার উন্নতি হয় না- জীবনবোধ ও মূল্যবোধে অন্তর পরিপূর্ণ হয় না; তা হয় সাহিত্য-শিল্পকলার দ্বারা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের এতো মূল্য।

উপরে যে বুদ্ধির কথা বলা হলো বৃক্ষের জীবন তার চমৎকার নিদর্শন। বৃক্ষের অঙ্কুরিত হওয়া থেকে ফলবান হওয়া পর্যন্ত সেখানে কেবলই বৃদ্ধির ইতিহাস। বৃক্ষের পানে তাকিয়ে আমরা লাভবান হতে পারি- জীবনের গূঢ় অর্থ সম্বন্ধে সচেতন হতে পারি বলে।

বৃক্ষ যে কেবল বৃদ্ধির ইশারা তা নয়- প্রশান্তিরও ইঙ্গিত। অতি শান্ত ও সহিষ্ণুতায় সে জীবনের গুরুভার বহন করে।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অনুভূতিরচক্ষু- সংবেদনশীল মনের চক্ষু। **অন্তরায়**- বাধা। **অভিব্যক্ত**- প্রকাশিত। **আত্মিক**- আত্মা সম্বন্ধীয়। **আত্মবিসর্জন**- পরের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন। **উপলব্ধি**- গভীর অনুভূতি। **গভীরচিন্তা**- গভীর চিন্তাচেতনা সম্পন্ন। **গূঢ় অর্থ**- প্রচ্ছন্ন গভীর তাৎপর্য। **চর্মচক্ষু**- দৈহিক চক্ষু (মানসিক বা দিব্যদৃষ্টির বিপরীত)। **জবরদস্তি প্রিয়**- যে অন্যের ওপর জোর খাটাতে ভালবাসে। **জীবনবোধ**- জীবনের স্বরূপ সম্পর্কিত উপলব্ধি। **জীবনাদর্শ**- জীবনে অনুকরণের উপযুক্ত মহৎ ও শ্রেষ্ঠ দিকগুলো। **ডিঙানো**- লাফিয়ে পার হওয়া। **তপোবন**- তপস্যার জন্য যে বন। **তাৎপর্য**- অন্তর্নিহিত অর্থ, অন্তর্গূঢ় ভাব, মর্ম। **ধেয়ে চলা**- এগিয়ে চলা। **নতি**- আনত, নম্র, নিচের দিকে নিবদ্ধ। **নিশান**- পতাকা। **পতিত**- পড়ে যাওয়া, ঝরে যাওয়া। **পরিপক্বতা**- পূর্ণ পরিণতি। **প্রতীক**- কোনো কিছুকে বা জিনিসকে বোঝানোর জন্য যে চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। **প্রশান্তি**- ধীর ও শান্ত ভাব। **বিকৃত বুদ্ধি**- অসংবুদ্ধি। **বস্তুজিজ্ঞাসা**- বস্তুজগতের রহস্য উন্মোচন-অন্বেষণ, বস্তুজগৎ সম্পর্কে জানার আগ্রহ। **বিকশিত জীবন**- উন্নত ও অগ্রগতিময় জীবন। **বুলি**- গৎ-বাঁধা, যথাযথ অর্থ বহন করে না এমন কথা যা অভ্যাসের বশে বলা হয়ে থাকে। **বৃক্ষে প্রাপ্তি ও দান**- বৃক্ষের অর্জন হচ্ছে তার ফুল ও ফল, এগুলো সে অন্যের হাতে তুলে দেয়, ফলে বৃক্ষ যুগপৎ প্রাপ্তি ও দানের আদর্শ। **মনুষ্যত্ব**- দয়া, ধর্ম, প্রেম ইত্যাদি মানবোচিত গুণ বা বৈশিষ্ট্য। **মূল্যবোধ**- জীবনের মূল মর্যাদা সম্বন্ধে ধারণা। **স্বল্পপ্রাণ**- ক্ষীণজীবী। **ছলবুদ্ধি**- যাদের বুদ্ধি কম বা বোকা। **সূক্ষ্মবুদ্ধি**- তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা জ্ঞানসম্পন্ন, সূক্ষ্ম বিচার বিবেচনা আছে এমন জ্ঞান। **সাদৃশ্য**- মিল, অনুরূপ বৈশিষ্ট্য। **সাধনা**- সাফল্য বা সিদ্ধি অর্জনের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা। **সৃজনশীল**- নির্মাণ সৃষ্টিতে তৎপর। **সৃষ্টিধর্ম**- সৃষ্টি বা সৃজনের বৈশিষ্ট্য। **সহিষ্ণুতা**- সহ্য করতে পারার গুণ, সহনশীলতা। **এদের প্রধান দেবতা অহংকার**- যথাযথ বিচার-বিবেচনা ও চিন্তাচেতনাহীন লোকেরা এত গর্বোদ্ধত হয়ে থাকে যে মনে হয় যেন অহংকারই তাদের প্রধান উপাস্য বা দেবতা।

তপোবন প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ :

প্রাচীন ভারতে মুনি-ঋষিরা বনের মাঝে আশ্রম তৈরি করে থাকতেন। সেখানেই সাধনা করতেন। আবার সেই আশ্রমে গুরুর শিষ্যদের (ছাত্র, শিক্ষার্থী) বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিষয় শিক্ষা দেয়া হত। কবি রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন ভারতের তপোবন-জীবনের প্রতি যে আকর্ষণ তা তার বহু রচনায় বহুভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক নগর সভ্যতা থেকে দূরে প্রকৃতির সান্নিধ্য পাবার উদ্দেশ্যে তিনি বোলপুরে শান্তি নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে প্রথম অবস্থায় আশ্রমের মতোই পড়াশোনা হত। তাই লেখক বলেছেন ‘তপোবন প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ’।



সারসংক্ষেপ

মানুষকে বিকশিত হতে সাহায্য করাই সমাজের কাজ। পৃথিবীতে বেশির ভাগ মানুষই কেবল নিজের জন্য চিন্তা করে। তাই তারা নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তো তোলেন না, বরং অন্যের সার্থকতার পথে বাধা সৃষ্টি করে। এ সমস্ত মানুষ সব সময় অহঙ্কারে মত্ত থাকে। মাঝে মাঝে তারা মানব প্রেমের কথাও বলে, কিন্তু তা আন্তরিকতাশূন্য। পৃথিবীতে



এমন মানুষের সংখ্যা কমিয়ে এদের জায়গায় আনতে হবে উদার হৃদয়ের ব্যক্তি। যাদের উদ্দেশ্য সমাজে কেবল টিকে থাকা নয়, বরং জীবনকে সুন্দরভাবে বিকশিত করা। লেখকের মতে, এদের জীবনাদর্শের প্রতীক হবে সজীব বৃক্ষ। কারণ মানব জীবনের আদর্শ হিসেবে বৃক্ষের মতো জীবন্ত উপমা আর নেই। বৃক্ষের কাজ শুধু মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলা নয়, বৃক্ষকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। এ প্রবন্ধে বৃক্ষ মানুষের জীবনাদর্শের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফুলের ফোটা আর নদীর গতির সঙ্গে তুলনা করে নদীর গতির মধ্যেই মনুষ্যত্বের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন নদীকে অনেক বাধা ডিঙানোর দুঃখ পেতে হয়, যা মানুষের জীবনের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু লেখকের মতে, নদীর মতো অনবরত ধেয়ে চলা মানুষের সাধনা হওয়া উচিত নয়। মানুষের জীবন গোপন ও নীরব সাধনা দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত, যা আমরা বৃক্ষের মধ্যে দেখতে পাই। পরের কল্যাণে নিজেকে গড়ে তোলার সাধনা ও চেতনার জন্য বৃক্ষের উদাহরণ দিয়ে লেখক বলেছেন, বৃক্ষের ন্যায় মানুষকেও জগতের কল্যাণে নীরবে ধূপের গন্ধের ন্যায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার সাধনা করতে হবে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে বৃক্ষকে কিসের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে?

ক. সার্থকতার	খ. প্রশান্তির
গ. সজীবতার	ঘ. সৌন্দর্যের

২. জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয় কীভাবে?

ক. প্রকৃতির দিকে তাকালে	খ. নদীর দিকে তাকালে
গ. বৃক্ষের দিকে তাকালে	ঘ. সমুদ্রের দিকে তাকালে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মানুষের জীবনে বৃক্ষের অবদান অপরিমিত। বৃক্ষ আমাদের অকাতরে ফুল-ফল দান করে, সুশীতল ছায়া দেয়। কিন্তু মানুষ পরিণাম চিন্তা না করে অবাধে বৃক্ষনিধন করে। ফলে আজ তা পরিবেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে কোন রচনাটির সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. জীবন ও বৃক্ষ	খ. বিড়াল
গ. আমার পথ	ঘ. রেইনকোট

৪. এরূপ সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে—

- বৃক্ষের কল্যাণ সাধনে
- বৃক্ষের সাধনায়
- মানুষের বৃক্ষপ্রেমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. ii ও iii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'তপোবন- প্রেমিক' কে ছিলেন?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. মোতাহের হোসেন চৌধুরী	ঘ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন



৬. আত্মার উন্নতি কীভাবে সম্ভব?

ক. আত্মার পরিতৃপ্তিতে

খ. ত্যাগের মাধ্যমে

গ. মূল্যবোধের সহায়তায়

ঘ. জীবনে সৌন্দর্যচর্চায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

নিমগাছ আমাদের অনেক উপকার করে। এ থেকে আমরা ছাল-পাতা-ডাল নিয়ে নানা ঔষধ তৈরি করি। কিন্তু গাছটি আমাদের থেকে কোন যত্ন পায় না।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে যে রচনার সাদৃশ্য রয়েছে—

ক. আমার পথ

খ. জীবন ও বৃক্ষ

গ. রেইনকোট

ঘ. বিড়াল

৮. এরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় যে বিষয়ে—

i. সাধনায়

ii. প্রাপ্তিতে

iii. দানে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

ভিক্ষু নিষ্ঠুর ও বিকৃতরুচির মানুষ। তার একমাত্র দেবতা অহংকার। সে কখনো বৃক্ষের দিকে তাকায়নি। বৃক্ষের দিকে তাকালে তার জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হতো। বৃক্ষ কত নিশ্চুপ সাধনায় নিজেেকে সজ্জিত করে দানের পরমানন্দ ভোগ করে। আর দানের মাধ্যমেই সে তার সাধনার সার্থকতা অর্জন করে।

ক. কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনকেকিসের প্রতীক করতে চেয়েছেন?

খ. জীবনের সার্থকতার গান কীভাবে শুনতে হয়?

গ. উদ্দীপকের ভিক্ষু চরিত্রে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপক এবং ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধটি মনুষ্যত্ববোধের একই তাৎপর্যকে ধারণ করে।” –মন্তব্যটি বিচার করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনকে নদীর প্রতীক করতে চেয়েছেন।

খ.

মানুষকে পরিশুদ্ধ অন্তরে জীবনের গান শুনতে হয়।

বৃক্ষ নীরব ভাষায় আমাদের জীবনের সার্থকতার গান শোনায়। এই গান সকলে শুনতে পায় না। মানুষকে নিজের উপলব্ধি দিয়ে এই গান শুনতে হয়। নীরব ভাষার গান শুনতে হলে আগে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে হয়। পরিশুদ্ধ মনে গভীর অভিনিবেশে জীবনের সার্থকতার গান শুনতে হয়।

গ.

উদ্দীপকে ভিক্ষুর যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তা ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে বর্ণিত কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

সমাজে বিভিন্ন ধরনের মানুষ থাকে। তাদের আচরণেও ভিন্নতা রয়েছে। সমাজে এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা নিষ্ঠুর ও অহমিকাপূর্ণ হয়। এরা সবসময় অন্যের কল্যাণের পথে অন্তরায়। নিজেদের সংকীর্ণ মানসিকতায় এরা সমাজের স্বাভাবিক বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে।



উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে ভিক্ষু নিষ্ঠুর, লোভী। আত্মঅহংকার ও লোভ তাকে সমাজে শুধু টিকে থাকতে শিখিয়েছে, জীবনকে কীভাবে বিকশিত করতে হয় তা শেখায়নি, শেখায়নি কীভাবে মানুষকে ভালবাসতে হয়। অপরদিকে মোতাহের হোসেন চৌধুরী ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে বলেছেন, স্বল্পপ্রাণ ও জ্বরদস্তিপ্রিয় মানুষে জগৎ পূর্ণ হয়ে আছে। অপরের বিকশিত হওয়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করাই এদের কাজ। নিষ্ঠুরতা ও স্থূলবুদ্ধি এদের ঘিরে রেখেছে। এরা নিজেদের জীবনকে পূর্ণরূপে পরিস্ফুটিত করতে ব্যর্থ। প্রাবন্ধিকের মতে তাদের এই ব্যর্থতার মূলে রয়েছে প্রেমহীন একটি হৃদয়। বস্তুত এখানেই উদ্দীপকের ভিক্ষুর সঙ্গে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে বর্ণিত স্বার্থান্বেষী মানুষদের সাদৃশ্য ধরা পড়ে।

ঘ.

উদ্দীপক এবং ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধটি মনুষ্যত্ববোধের তাৎপর্যকে ধারণ করেছে।

পরার্থে আত্মনিবেদন করতে পারাটাই মানবজীবনে সার্থকতা। বৃক্ষের অর্জন হচ্ছে ফুল ও ফল। ফুলে- ফলে পরিপূর্ণতা অর্জন করে বৃক্ষ সেসব অন্যকে বিলিয়ে দিয়ে সার্থকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। মানুষেরও উচিত বৃক্ষের মত সাধনা করে মানবজীবনে সার্থকতা অর্জন করা। অন্যকথায়, মানবিক মূল্যবোধে জীবনকে মহত্তম পর্যায়ে উন্নীত করা।

উদ্দীপকে ভিক্ষু একজন নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। সে সমাজে শুধু টিকেই আছে, তার জীবনের কোন বিকাশ নেই। তার মনে অপরের জন্য কোন করুণা নেই। তবে সে যদি একটি বৃক্ষের দিকে তাকাত তবে বুঝতে পারত জীবনের অর্থ, খুঁজে পেত বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য। মানবপ্রেমে উৎসাহিত হয়ে সে অপরের কল্যাণে নিজেকে প্রস্তুত করত। এভাবেই সে বুঝতে পারত জীবনের তাৎপর্য। অন্যদিকে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধে মানব জীবনকে সফল ও সার্থক করে গড়ে তোলার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে পরার্থে আত্মনিবেদিত জীবনই প্রকৃত মানুষের জীবন। প্রাবন্ধিক জীবনের এই কাঠামোকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন বৃক্ষের বিকাশ, পরিপূর্ণতা ও সার্থকতার পেছনে রয়েছে তার নীরব সাধনা।

উদ্দীপকে বৃক্ষের নীরব সাধনার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ও পরহিত ব্রতের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে। ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধেও বৃক্ষের ফুল ফোটা ও ফলে সজ্জিত হওয়ার মধ্যে মনুষ্যত্বের স্থান নির্ধারিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপক এবং ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধটি মনুষ্যত্ববোধের তাৎপর্য বহন করে।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

বৃক্ষের ভিতর আরও একটি শক্তি নিহিত আছে যাহা দ্বারা যুগে যুগে সে আপনাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছে। বাহিরের কত পরিবর্তন ঘটতেছে কিন্তু অদৃষ্টবৈগুণ্যে সে পরাহত হয় নাই। বাহিরের আঘাতের উত্তরে পুনর্জীবন দ্বারা সে বাহিরের পরিবর্তনের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে। যে পরিবর্তন আবশ্যিক তাহা গ্রহণ করিয়াছে, যাহা অনাবশ্যক জীর্ণপত্রের ন্যায় সে তাহা ত্যাগ করিয়াছে। এইরূপে বাহিরের বিভীষিকা সে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ক. গোপন ও নীরব সাধনা কিসে অভিব্যক্ত হয়?

খ. অনবরত ধৈর্যে চলা মানুষের সাধনা হওয়া উচিত নয় কেন?

গ. উদ্দীপকে ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের যে বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে তা আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপকটি ‘জীবন ও বৃক্ষ’ প্রবন্ধের মূলভাবকে পরিপূর্ণভাবে ধারণ করেনি।” –মূল্যায়ন করুন।



উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. গ ৩. ক ৪. খ ৫. ক ৬. ঘ ৭. খ ৮. ঘ



মাসিপিসি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়



লেখক-পরিচিতি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৮ সালের ১৯ মে ভারতের বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দুমকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতার চৌদ্দ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন অষ্টম। তাঁর ডাকনাম মানিক এবং পিতার দেয়া নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা নীরদাসুন্দরী দেবী। তাঁর আদিনিবাস ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। পিতার সরকারি চাকরির কারণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন স্কুল-কলেজে কৃতিত্বের সঙ্গে পড়াশোনা করেন। এরপর অংকশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। এ সময়েই বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে লিখে ফেলেন প্রথম গল্প ‘অতসী মামী’, যা ছাপা হয় ‘বিচিত্রা’ পত্রিকার ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায়। বিচিত্রা-য় গল্প প্রকাশের পর থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে ওঠেন সার্বক্ষণিক লেখক। ফলে উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করে বিজ্ঞানী হওয়ার বাসনা পরিত্যাগ করতে হয় তাঁকে। শেষ অবধি সার্বক্ষণিক সাহিত্যিক রূপেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন। মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমশ মার্ক্সবাদের প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। এরই ক্রমধারায় ১৯৪৪ সালে তিনি লাভ করেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ। তাঁর রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতা, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, নিয়তিবাদ ইত্যাদি। তিনি ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ ও মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্ব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, যা তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছে। সর্বমোট ৩৯টি উপন্যাস ও প্রায় তিনশো ছোটগল্প রচনা করেছেন। তাঁর পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬) ও পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬) বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলোর অন্যতম। মনোবিশ্লেষণ, বাস্তববাদী জীবনদৃষ্টি, সাম্যবাদে আস্থা এবং মানুষের মধ্যকার সম্ভাবনার প্রতি বিশ্বাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের মূল প্রেরণা। ১৯৫৬ সনের ৩ ডিসেম্বর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম :

- উপন্যাস :** জননী (১৯৩৫), দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), অহিংসা (১৯৪১), চিহ্ন (১৯৪৭), হরফ (১৯৫৪);
ছোটগল্প : প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), সরীসৃপ (১৯৩৯), বৌ (১৯৪৩), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩), হলুদ পোড়া (১৯৪৫), আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬), ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫০);
প্রবন্ধ : লেখকের কথা (১৯৫৭)।

ভূমিকা

‘মাসিপিসি’ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘পূর্বাশা’ পত্রিকায় ১৩৫২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় (মার্চ-এপ্রিল ১৯৪৬), পরে এটি সংকলিত হয় ‘পরিস্থিতি’ (অক্টোবর ১৯৪৬) নামক গল্পগ্রন্থে। বর্তমান পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে ‘ঐতিহ্য’ প্রকাশিত মানিক রচনাবলির পঞ্চম খণ্ড থেকে। নিঃস্ব ও বিধবা দুই নারী স্বামীর নির্যাতনের শিকার পিতৃমাতৃহীন এক তরুণীর অস্তিত্ব রক্ষায় যে সাহসী ভূমিকা পালন করেছে তা এই গল্পটিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের লালসা, দুর্ভিক্ষের স্মৃতি ও জীবিকা নির্বাহের কঠিন সংগ্রাম এ গল্পের বৈচিত্র্যময় দিক।



সাধারণ উদ্দেশ্য

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মাসিপিসি’ গল্পটি পড়ার পর আপনি-

- ✚ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ✚ পিতৃমাতৃহীন এক তরুণীর জীবন কীভাবে স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছিল তা জানতে পারবেন।
- ✚ সামাজিক নির্মমতা থেকে আল্লাদিকে রক্ষার জন্য তার বিধবা ও নিঃস্ব মাসিপিসি’র বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী ভূমিকার কথা জানতে পারবেন।

পাঠ-১



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৈলাশ ও মাসিপিসির কথোপকথনের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- আত্মাতির নির্ঘাতনকারী স্বামী জগুর সংসার ছেড়ে চলে আসার কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

শেষবেলায় খালে এখন পুরো ভাটা। জল নেমে গিয়ে কাদা আর ভাঙা ইটপাটকেল ও ওজনে ভারি আবর্জনা বেরিয়ে পড়েছে। কংক্রিটের পুলের কাছে খালের ধারে লাগানো সালতি থেকে খড় তোলা হচ্ছে পাড়ে। পাশাপাশি জোড়া লাগানো দুটো বড় সালতি বোঝাই আঁটিবাঁধা খড় তিনজনের মাথায় চড়ে গিয়ে জমা হচ্ছে ওপরের মন্ত গাদায়। ওঠানামার পথে ওরা খড় ফেলে নিয়েছে কাদায়। সালতি থেকে ওদের মাথায় খড় তুলে দিচ্ছে দুজন। একজনের বয়স হয়েছে, আধপাকা চুল, গোরা শরীর। অন্যজন মাঝবয়সী, বেঁটে, জোয়ান, মাথায় ঠাসা কদমছাঁটা রুম্ম চুল।

পুলের তলা দিয়ে ভাটার টান ঠেলে এগিয়ে এল সরু লম্বা আরেকটা সালতি, দু-হাত চওড়া হয় কি না হয়। দু-মাথায় দাঁড়িয়ে দুজন প্রৌঢ়া বিধবা লগি ঠেলছে, ময়লা মোটা থানের আঁচল দুজনেরই কোমরে বাঁধা। মাঝখানে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে অল্পবয়সী একটি বৌ। গায়ে জামা আছে, নকশা পাড়ের সস্তা সাদা শাড়ি। আঁটসাঁট থমথমে গড়ন, গোলগাল মুখ।

‘মাসিপিসি ফিরছে কৈলাশ’, বুড়ো লোকটি বলল।

কৈলাশ বাহকের মাথায় খড় চাপাতে ব্যস্ত ছিল। চটপট শেষ আঁটিটা চাপিয়ে দিয়ে সে যখন ফিরল, মাসিপিসির সালতি দু-হাতের মধ্যে এসে গেছে।

“ও মাসি, ওগো পিসি, রাখো রাখো। খপর আছে শুনে যাও।”

সামনের দিকে লগি পুঁতে মাসিপিসি সালতির গতি ঠেকায়, আত্মাতির সিঁথির সিঁদুর পর্যন্ত ঘোমটা টেনে দেয়। সামনে থেকে মাসি বলে বিরক্তির সঙ্গে, ‘বেলা আর নেই কৈলাশ।’ পেছনে থেকে পিসি বলে, ‘অনেকটা পথ যেতে হবে কৈলাশ’। মাসিপিসির গলা বরবর, আওয়াজ একটু মোটা, একটু বাংকার আছে। কৈলাশের খবরটা গোপন, দুজনে লম্বা লম্বা সালতির দু-মাথায় থাকলে সম্ভব নয় চুপে চুপে বলা। মাসি বড় সালতির খড় ঠেকানো বাঁশটা চেপে ধরে থাকে, পিসি লগি হাতে নিয়েই পিছন থেকে এগিয়ে আসে সামনের দিকে। আত্মাতির যেখানে ছিল সেখানে বসেই কান পেতে রাখে। কথাবার্তা সে সব শুনতে পায় সহজেই। কারণ, সে যাতে শুনতে পায় এমন করেই বলে কৈলাশ।

‘বলি মাসি, তোমাকেও বলি পিসি’, কৈলাশ শুরু করে, ‘মেয়াকে একদম শ্বশুরঘর পাঠাবে না মনে করেছ যদি, সে কেমন ধারা কথা হয়? এত বড় সোমন্ত মেয়া, তোমরা দুটি মেয়েলোক বাদে ঘরে একটা পুরুষমানুষ নেই, বিপদ-আপদ ঘটে যদি তো-’

মাসি বলে, ‘খুনসুটি রাখো দিকি কৈলাশ তোমার, মোদাকথাটা কী তাই কও, বললে না যে খপর আছে কী?’

পিসি বলে, ‘খপরটা কী তাই কও। বেলা বেশি নেই কৈলাশ।’

মাসিপিসির সাথে পারা যাবে না জানে কৈলাশ। অগত্যা ফেনিয়ে রসিয়ে বলবার বদলে সে সোজা কথায় আসে, ‘জগুর সাথে দেখা হলো কাল। খড় তুলে দিতে সাঁঝ হয়ে গেল, তা দোকানে এটু-মানে আর কি চা খেতে গেছি চায়ের দোকানে, জগুর সাথে দেখা।’

মাসি বলে, ‘চায়ের দোকান না কিসের দোকান তা বুঝিছ কৈলাশ, তা কথাটা কী?’



পিসি বলে, ‘সেখা ছাড়া আর ওকে কোথা দেখবে। হাতে দুটো পয়সা এলে তোমারও স্বভাব বিগড়ে যায় কৈলেশ। তা, কী বললে জগু?’

কৈলাশ ফাঁপরে পড়ে আড়চোখে চায় আল্লাদির দিকে, হঠাৎ বেমক্কা জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে যে, তা নয়, পুলের কাছেই চায়ের দোকান, মাসিপিসি গিয়ে জিজ্ঞাসা করুক না সেখানে। তারপরেই জোর হারিয়ে বলে ‘ওসব একরকম ছেড়ে দিয়েছে জগু। লোকটা কেমন বদলে গেছে মাসি, সত্যি কথা পিসি, জগু আর সেই জগু নেই। বউকে নিতে চায় এখন। তোমরা নাকি পণ করেছ মেয়া পাঠাবে না, তাতেই চটে আছে। সম্মান তো আছে একটা মানুষের, কবার নিতে এল তা মেয়া দিলে না, তাই তো নিতে আসে না আর। আমি বলি কী, নিজেরা যেচে এবার পাঠিয়ে দেও মেয়াকে।’

মাসি বলে, ‘পেটে শুকিয়ে লাথি ঝাঁটা খেতে? কলকেপোড়া ছঁাকা খেতে? খুঁটির সাথে দড়িবাঁধা হয়ে থাকতে দিনভর রাতভর?’

পিসি-বলে, ‘মেয়া না পাঠাই, জামাই এলে রাখিনি জামাই-আদরে তাকে? ছাগলটা বেচে দিয়ে খাওয়াইনি ভালোমন্দ দশটা জিনিস?’

মাসি বলে, ‘ফের আসুক, আদরে রাখব যদিদিন থাকে। বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো। ঘরে এলে খাতির না করব কেন? তবে মেয়া মোরা পাঠাব না।’

পিসি বলে, ‘নে কৈলেশ, মরতে মোরা মেয়াকে পাঠাব না।’

বুড়ো রহমান একা খড় চাপিয়ে যায় বাহকদের মাথায়, চুপচাপ শুনে যায় এদের কথা। ছলছল চোখে একবার তাকায় আল্লাদির দিকে। তার মেয়েটা শ্বশুরবাড়িতে মরেছে অল্পদিন আগে। কিছুতে যেতে চায়নি মেয়েটা, দাপাদাপি করে কেঁদেছে যাওয়া ঠেকাতে, ছোট অবুঝ মেয়ে। তার ভালোর জন্যেই তাকে জোর-জবরদস্তি করে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আল্লাদির সঙ্গে তার চেহারায় কোনো মিল নাই। বয়সে সে ছিল অনেক ছোট, চেহারা ছিল অনেক বেশি রোগা। তবু আল্লাদির ফ্যাকাশে মুখে তারই মুখের চাপ রহমান দেখতে পায়, খড়ের আঁটি তুলে দেবার ফাঁকে ফাঁকে যখনই সে তাকায় আল্লাদির দিকে।

কৈলাশ বলে, ‘তবে আসল কথাটা বলি। জগু মোকে বললে, এবার সে মামলা করবে বৌ নেবার জন্য। তার বিয়ে করা বৌকে তোমরা আটকে রেখেছ বদ মতলবে। মামলা করলে বিপদে পড়বে। সোয়ামি নিতে চাইলে বৌকে আটকে রাখার আইন নেই। জেল হয়ে যাবে তোমাদের। আর যেমন বুঝলাম, মামলা জগু করবেই আজকালের মধ্যে। মরবে তোমরা জান মাসি, জান পিসি, মারা পড়বে তোমরা একেবারে।’

আল্লাদি একটা শব্দ করে, অস্ফুট আর্তনাদের মতো। মাসি ও পিসি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে কয়েক বার। মনে হয়, মনে তাদের একই কথা উদয় হয়েছে, চোখে চোখে চেয়ে সেটা শুধু জানাজানি করে নিল তারা।

মাসি বলল, ‘জেলে নয় গেলাম কৈলেশ, কিন্তু মেয়া যদি সোয়ামির কাছে না যেতে চায় খুন হবার ভয়ে?’

বলে মাসি বড় সালতির খড় ঠেকানো বাঁশ ছেড়ে দিয়ে লগি গুঁজে দেয় কাদায়, পিসি তরতর করে পিছনে গিয়ে লগি কাদায় গুঁজে হেলে পড়ে, শরীরের ভারে সরু লম্বা সালতিটাকে এগিয়ে দেয় ভাটার টানের বিপক্ষে। বেলা একরকম নেই। ছায়া নামছে চারদিকে।

শকুনরা উড়ে এসে বসছে পাতাশূন্য গুল্মগাছটায়। একটা শকুন উড়ে গেল এ আশ্রয় ছেড়ে অল্প দূরে আরেকটা গাছের দিকে। ডাল ছেড়ে উড়তে আর নতুন ডালে গিয়ে বসতে কী তার পাখা ঝাপটানি!



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

কলকেপোড়া ছঁাকা— তামাকসেবনে ব্যবহৃত হুকার উপরে কলকেতে থাকে যে আগুন তা দিয়ে দন্ধ করা। **কদমছাঁট**— মাথার চুল এমনভাবে ছাঁটা যে তা কদমফুলের আকার ধারণ করে। **খপর**— ‘খবর’ শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ। **খুনসুটি**— হাসি-তামাশায়ুক্ত বিবাদ বা ঝগড়া। **পেটে শুকিয়ে লাথি ঝাঁটা**— পর্যাণ্ড খাবার না জুগিয়ে কষ্ট দেওয়ার পাশাপাশি লাথি ঝাঁটার মাধ্যমে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা। **বেমক্কা**— স্থান-বহির্ভূত, অসংগত। **মেয়া**— ‘মেয়ে’ শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ। **লগি**— হাত ছয়েক লম্বা সরু বাঁশ। নৌকা চালানোর জন্য ব্যবহৃত বাঁশের দণ্ড। **সালতি**— শালকাঠ নির্মিত বা তালকাঠের সরু ডোঙা। **সোমন্ত**— সমর্থ (সংসারধর্ম পালনে), যৌবনপ্রাপ্ত।



সারসংক্ষেপ

এ গল্পে স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার পিতৃমাতৃহীন এক তরুণীর করুণ জীবনকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তরুণী আল্লাহদির মাসি ও পিসি দুজনই বিধবা ও নিঃস্ব। মাসিপিসি তাদের অস্তিত্বরক্ষার পাশাপাশি প্রতিকূল পৃথিবী থেকে আল্লাদিকে রক্ষার জন্য বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী সংগ্রাম পরিচালনা করেছে। আল্লাহদির স্বামী জগু মদ্য পান করে। স্ত্রীর ওপর চালায় নিয়মিত নির্মম শারীরিক নির্যাতন। নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাসিপিসি আল্লাদিকে জগুর সংসার থেকে ফিরিয়ে আনে। আর কিছুতেই যেতে দেয় না। জগু তার স্ত্রীকে ফিরে পাবার জন্য কৈলাশকে দিয়ে মাসিপিসিকে জেলের ভয় দেখায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পের এই অংশে দুজন বৃদ্ধার জীবন সংগ্রামের ছবি আঁকেছেন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারিতে নিষ্পেষিত তাদের জীবন, দু-বেলা খাবার জন্য মরণপণ সংগ্রাম করে তারা। তার উপর আল্লাহদির বোঝা। তার পরও তারা আল্লাদিকে ভালবাসে। মদ্যপ স্বামীর কাছে আল্লাদিকে ফিরিয়ে না দিতে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আল্লাহদির স্বামীর নাম কী?

ক. জগু

খ. কৈলাশ

গ. কানাই

ঘ. গোকুল

২. ‘বজ্জাত হোক, খুনে হোক, জামাই তো।’ – বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. মেয়ের প্রতি ভালবাসা

খ. মেয়ে জামাইয়ের প্রতি ভালবাসা

গ. মেয়ে জামাইয়ের প্রতি ঘৃণা

ঘ. নাত জামাইয়ের প্রতি ভালবাসা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বন্যা পরবর্তী সময়ে গ্রামটিতে আকাল পড়েছে। লতিফা তার দুধের সন্তানকে বলতে গেলে একরকম অনাহারেই রেখেছে। খাদ্য যোগাড় করতে বেশ কষ্ট হচ্ছে।

৩. উদ্দীপকের লতিফার সঙ্গে ‘মাসিপিসি’ গল্পে কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. মসি-পিসি

খ. আল্লাদি

গ. কৈলাশ

ঘ. জগু

৪. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ-

i. জীবনসংগ্রাম

ii. অস্তিত্ব-সংকট

iii. বন্যা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-২



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ✚ আল্লাদিকে নিয়ে মাসিপিসির সংগ্রামী জীবনের চিত্র বর্ণনা করতে পারবেন;
- ✚ মাসিপিসির বিরোধ অবসানের কারণ কী, তা লিখতে পারবেন;
- ✚ দারোগাবাবুর প্রতিনিধি কানাইকে মাসিপিসি কীভাবে মোকাবেলা করেছিল তা লিখতে পারবেন।



মূলপাঠ

মায়ের বোন মাসি আর বাপের বোন পিসি ছাড়া বাপের ঘরের কেউ নেই আল্লাদির। দুর্ভিক্ষ কোনোমতে ঠেকিয়েছিল তার বাপ। মহামারীর একটা রোগে, কলেরায়, সে, তার বৌ আর ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। মাসিপিসি তার আশ্রয়ে মাথা গুঁজে আছে অনেক দিন, দূর ছাই সয়ে আর কুড়িয়ে পেতে খেয়ে নিরাশ্রয় বিধবারা যেমন থাকে। নিজেদের ভরণপোষণের কিছুটা তারা রোজগার করত ধান ভেনে, কাঁথা সেলাই করে, ডালের বড়ি বেচে, হোগলা গোঁথে, শাকপাতা ফলমূল ডাঁটা কুড়িয়ে, এটা ওটা জোগাড় করে। শাকপাতা খুদকুঁড়ো ভোজন, বছরে দুজোড়া থান পরন- খরচ তো এই। বছরের পর বছর ধরে কিছু পুঁজি পর্যন্ত হয়েছিল দুজনের, রুপোর টাকা আধুলি সিকি। দুর্ভিক্ষের সময়টা বাঁচবার জন্য তাদের লড়তে হয়েছে সাংঘাতিকভাবে, আল্লাদির বাপ তাদের থাকাটা শুধু বরাদ্দ রেখে খাওয়া ছাঁটাই করে দিয়েছিল একেবারে পুরোপুরি। তারও তখন বিষম অবস্থা। নিজেরা বাঁচে না, তার ওপর জগুর লাথির চোটে মরমর মেয়ে এসে হাজির। সে কোনদিক সামলাবে? মাসিপিসির সেবা-যত্নেই আল্লাদি অবশ্য সেবার বেঁচে গিয়েছিল, তার বাপ-মাও সেটা স্বীকার করেছে। কিন্তু কী করবে, গলা কেটে রক্ত দিয়ে সে ধার শোধ করা যদি-বা সম্ভব, অল্প দেওয়ার ক্ষমতা কোথায় পাবে। পাল্লা দিয়ে মাসিপিসি আল্লাদির জীবনের জন্য লড়েছিল, পেল যদি তো খেয়ে না-পেল যদি তো না-খেয়েই। অবস্থা যখন তাদের অতি কাহিল, চারদিকে না-খেয়ে মরা শুরু করেছে মানুষ, মরণ ঠেকাতেই ফুরিয়ে আসছে তাদের জীবনীশক্তি; একদিন মাসি বলে পিসিকে, ‘একটা কাজ করবি বেয়াইন? তাতে তোরও দুটো পয়সা আসে, মোরও দুটো পয়সা আসে।’

শহরের বাজারে তরিতরকারি ফলমূলের দাম চড়া। গাঁ থেকে কিনে যদি বাজারে গিয়ে বেচে আসে তারা, কিছু রোজগার হবে। একা মাসির ভরসা হয় না সালতি বেয়ে অতদূর যেতে, যাওয়া-আসাও একার দ্বারা হবে না তার। পিসি রাজি হয়েছিল। এতে কিছু হবে কি না হবে ভগবান জানে, কিন্তু যদি হয় তবে রোজগারের একটা নতুন উপায় মাসি পেয়ে যাবে আর সে পাবে না, তাকে না পেলে অন্য কারো সাথে হয়ত মাসি বন্দোবস্ত করবে, তা কি পারে পিসি ঘটতে দিতে।

সেই থেকে শুরু হয় গেরস্তের বাড়তি শাকসবজি ফলমূল নিয়ে মাসিপিসির সালতি বেয়ে শহরের বাজারে গিয়ে বেচে আসা। গাঁয়ের বাবু বাসিন্দারাও নগদ পয়সার জন্য বাগানের জিনিস বেচতে দেয়।

মাসিপিসির ভাব ছিল আগেও। অবস্থা এক, বয়স সমান, একঘরে বাস, পরস্পরের কাছে ছাড়া সুখ-দুঃখের কথা তারা কাকেই-বা বলবে, কেই-বা শুনবে। তবে হিংসা দ্বেষ রেষারেষিও ছিল যথেষ্ট, কোন্দলও বেধে যেত কারণে অকারণে। পিসি এ বাড়ির মেয়ে, এ তার বাপের বাড়ি। মাসি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এখানে। তাই মাসির উপর পিসির একটা অবজ্ঞা অবহেলার ভাব ছিল। এই নিয়ে পিসির অহংকার আর খোঁচাই সবচেয়ে অসহ্য লাগত মাসির। ধীর শান্ত দুঃখী মানুষ মনে হতো এমনি তাদের, কিন্তু ঝগড়া বাধলে অবাক হয়ে যেতে হতো তাদের দেখে। সে কী রাগ, সে কী তেজ, সে কী গোঁ! মনে হতো এই বুঝি কামড়ে দেয় একে অপরকে, এই বুঝি কাটে বাঁটি দিয়ে।

শাকসবজি বেচে বাঁচবার চেষ্টায় একসঙ্গে কোমর বেঁধে নেমে পড়ামাত্র সব বিরোধ সব পার্থক্য উড়ে গিয়ে দুজনের হয়ে গেল একমন, একপ্রাণ। সে মিল জমজমাট হয়ে উঠল আল্লাদির ভার ঘাড়ে পড়ায়। নিজের পেট ভরানো শুধু নয়, নিজেদের বেঁচে থাকা শুধু নয়, তাদের দুজনেরই এখন আল্লাদি আছে। খাইয়ে পরিয়ে যত্নে রাখতে হবে তাকে, শ্বশুরঘরের কবল থেকে বাঁচাতে হবে তাকে, গাঁয়ের বজ্জাতদের নজর থেকে সামলে রাখতে হবে, কত দায়িত্ব তাদের, কত কাজ, কত ভাবনা।



বাপ মা বেঁচে থাকলে আল্লাদিকে হয়ত শ্বশুরবাড়ি যেতে হতো, মাসিপিসিও বিশেষ কিছু বলতো কি না সন্দেহ। কিন্তু তারা তো নেই, এখন মাসিপিসিরই সব দায়িত্ব। বিনা পরামর্শে আপনা থেকেই তাদের ঠিক হয়েছিল, আল্লাদিকে পাঠানো হবে না। আল্লাদিকে কোথাও পাঠানোর কথা তারা ভাবতেও পারে না। বিশেষ করে ওই খুনেরদেবর কাছে কখনো মেয়ে তারা পাঠাতে পারে, যাবার কথা ভাবলেই মেয়ে যখন আতঙ্কে পাঁশুটে মেরে যায়?

বাপের ঘরদুয়ার জমিজমাটুকু আল্লাদিকে বর্তেছে, জগুর বৌ নেবার আগ্রহও খুবই স্পষ্ট। সামান্যই ছিল তার বাপের, তারও সিকিমতো আছে মোটে, বাকি গেছে গোকুলের কবলে। তবু মুফতে যা পাওয়া যায় তাতেই জগুর প্রবল লোভ।

খালি ঘরে আল্লাদিকে রেখে কোথাও যাবার সাহস তাদের হয় না। দুজনের মিলে যদি যেতে হয় কোথাও আল্লাদিকে তারা সঙ্গে নিয়ে যায়।

মাসি বলে, ‘ডরাস্‌নি আল্লাদি। ভাঁওতা দিয়ে আমাদের দমাবার ফিকির সব। নয় তো কৈলেশকে দিয়ে ওসব কথা বলায় মোদের?’

পিসি বলে, ‘দুদিন বাদে ফের আসবে দেখিস জামাই। তখন শুধোলে বলবে, কই না, আমি তো ওসব কিছু বলি নি কৈলেশকে।’

মাসি বলে, ‘চার মাসে পড়লি, আর কটা দিন বা। মা-মাসির কাছেই রইতে হয় এ সময়টা, জামাই এলে বুঝিয়ে বলব।’ পিসি বলে, ‘ছেলে মুখ দেখে পাষণ নরম হয়, জানিস আল্লাদি। তোর পিসে ছিল জগুর মতো। খোকাটা কোলে আসতে কী হয়ে গেল সেই মানুষ। চুপি চুপি এসে এটা ওটা খাওয়ায়, উঠতে বলি তো ওঠে, বসতে বলি তো বসে।’

মাসি বলে, ‘তোর মেসো ঠিক ছিল, শাউড়ি নন্দ ছিল বাঘ। উঠতে বসতে কী ছাঁচা খেয়েছি ভাবলে বুক কাঁপে। কিন্তু জানিস আল্লাদি, মেয়েটা যেই কোলে এল শাউড়ি নন্দ যেন মোকে মাথায় করে রাখলে বাঁচে।’

পিসি বলে, ‘তুইও যাবি, সোয়ামির ঘর করবি। ডরাস্‌নি, ডরকিসের?’

বাড়ি ফিরে দীপ জ্বলে মাসিপিসি রান্নাবান্না সারতে লেগে যায়। বাইরে দিন কাটলেও আল্লাদির পরিশ্রম কিছু হয়নি, শুয়ে বসেই দিন কেটেছে। তবু মাসিপিসির কথায় সে একটু শোয়। শরীর নয়, মনটা তার কেমন করছে। নিজেকে তার ছাঁচড়া, নোংরা, নর্দমার মতো লাগে। মাসিপিসির আড়ালে থেকেও সে টের পায় কীভাবে মানুষের পর মানুষ তাকাচ্ছে তার দিকে, কতজন কতভাবে মাসিপিসির সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছে তরিতরকারির মতো তাকেও কেনা যায় কি না যাচাই করবার জন্য। গাঁয়েরও কতজন তার কত রকমের দর দিয়েছে মাসিপিসির কাছে। মাসিপিসিকে চিনে তারা অনেকটা চুপচাপ হয়ে গেছে আজকাল, কিন্তু গোকুল হাল ছাড়েনি। মাসিপিসিকে পাগল করে তুলেছে গোকুল। মায়ের বাড়ি তার এই মাসিপিসি, কী দুর্ভোগ তাদের তার জন্য। মাসিপিসিকে এত যত্ন দেওয়ার চেয়ে সে নয় শ্বশুরঘরের লাঞ্ছনা সহ্য, জগুর লাথি খেত। ঈষৎ তন্দ্রার ঘোরে শিউরে ওঠে আল্লাদি। একপাশে মাসি আর একপাশে পিসিকে না নিয়ে শুলে কি চলবে তার কোনোদিন?

রান্না সেয়ে খাওয়ার আয়োজন করছে মাসিপিসি, একেবারে ভাতটাত বেড়ে আল্লাদিকে ডাকবে। ভাগাভাগি কাজ তাদের এমন সহজ হয়ে গেছে যে বলাবলির দরকার তাদের হয় না, দুজনে মিলে কাজ করে যেন একজনে করছে। এবার ব্যঞ্জনে নুন দেবে এ কথা বলতে হয় না পিসিকে, ঠিক সময়ে নুনের পাত্র সে এগিয়ে দেয় মাসির কাছে। বলাবলি করছে তারা আল্লাদির কথা, আল্লাদির সুখদুঃখ, আল্লাদির সমস্যা আল্লাদির ভবিষ্যৎ। জামাই যদি আসে, একটি কড়া কথা তাকে বলা হবে না, এতটুকু খোঁচা দেওয়া হবে না। উপদেশ দিতে গেলে চটবে জামাই, পুরুষমানুষ তো যতই হোক, এটা করা তার উচিত নয়, এসব কিছু বলা হবে না তাকে। জামাই এসেছে তাই আনন্দ রাখবার যেন ঠাঁই নেই এই ভাব দেখাবে মাসিপিসি- আল্লাদিকে শিথিয়ে দিতে হবে সোয়ামি এসেছে বলে যেন আল্লাদে গদগদ হবার ভাব দেখায়। যে কদিন থাকে জামাই, সে যেন অনুভব করে, সে-ই এখানকার কর্তা, সে-ই সর্বসর্বা।

বাইরে থেকে হাঁক আসে কানাই চৌকিদারের। মাসিপিসি পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, জোরে নিঃশ্বাস পড়ে দুজনের। সারাটা দিন গেছে লড়ে আর লড়ে। সরকারবাবুর সঙ্গে বাজারের তেলা নিয়ে ঝগড়া করতে অর্ধেক জীবন বেরিয়ে গেছে দু-জনের। এখন এল চৌকিদার কানাই। হাঙ্গামা না আসে রাত্রে, গাঁয়ে লোক যখন ঘুমোচ্ছে।

রসুই চালায় ঝাঁপ এঁটে মাসিপিসি বাইরে যায়। গুল্লুপক্ষের একাদশীর উপোস করেছে তারা দুজনে গতকাল। আজ দ্বাদশী, জ্যোৎস্না বেশ উজ্জ্বল। কানাইয়ের সাথে গোকুলের যে তিনজন পেয়াদা এসেছে তাদের মাসিপিসি চিনতে পারে, মাথায় লাল পাগড়ি-আঁটা লোকটা তাদের অচেনা।



কানাই বলে, ‘কাছারিবাড়ি যেতে হবে একবার।’

মাসি বলে, ‘এত রাতে?’

পিসি বলে, ‘মরণ নেই?’

কানাই বলে, ‘দারোগাবাবু এসে বসে আছেন বাবুর সাথে। যেতে একবার হবেগো দিদিঠাকরুনরা। বেঁধে নিয়ে যাবার হুকুম আছে।’

মাসিপিসি মুখে মুখে তাকায়। পথের পাশে ডোবার ধারে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় তিন-চারজন ঘুপটি মেরে আছে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে মাসিপিসি। ওরা যে গাঁয়ের গুন্ডা সাধু বৈদ্য ওসমানেরা তাতে সন্দেহ নেই, বৈদ্যের ফেটি-বাঁধা বাবরি চুলওয়ালা মাথাটায় পাতার ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে। তারা যাবে কাছারিতে কানাই আর পেয়াদা কনসেটবলের সঙ্গে। ওরা এসে আল্লাদিকে নিয়ে যাবে।

মাসি বলে, ‘মোদের একজন গেলে হবে না কানাই?’

পিসি বলে, ‘আমি যাই বলো?’

কর্তা ডেকেছেন দুজনকে।

মাসিপিসি দুজনেই আবার তাকায় মুখে মুখে।

মাসি বলে, ‘কাপড়টা ছেড়ে আসি কানাই।’

পিসি বলে, ‘হাত ধুয়ে আসি, একদণ্ড লাগবে না।’

তাড়াতাড়িই ফিরে আসে তারা। মাসি নিয়ে আসে বাঁটিটা হাতে করে, পিসির হাতে দেখা যায় রামদার মতো মস্ত একটা কাটারি।

মাসি বলে, ‘কানাই, কত্তাকে বোলো, মেয়েনোকের এত রাতে কাছারিবাড়ি যেতে লজ্জা করে। কাল সকালে যাব।’

পিসি বলে, ‘এত রাতে মেয়েনোককে কাছারিবাড়ি ডাকতে কত্তার নজ্জা করে না কানাই?’

কানাই ফুঁসে ওঠে, ‘না যদি যাও ঠাকরুনরা ভালোয় ভালোয়, ধরে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাবার হুকুম আছে কিন্তু বলে রাখলাম।’

মাসি বাঁটিটা বাগিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত কামড়ে বলে, ‘বটে? ধরে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাবার হুকুম আছে কিন্তু বলে রাখলাম।’

মাসি বাঁটিটা বাগিয়ে ধরে দাঁতে দাঁত কামড়ে বলে, ‘বটে? ধরে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাবে? এসো। কে এগিয়ে আসবে এসো। বাঁটির এক কোপে গলা ফাঁক করে দেব।’

পিসি বলে, ‘আয় না বজ্জাত হারামজাদারা, এগিয়ে আয় না? কাটারির কোপে গলা কাটি দু-একটার।’

দু-পা এগোয় তারা দ্বিধাভরে। মাসিপিসির মধ্যে ভয়ের লেশটুকু না দেখে সত্যিই তারা খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। মারাত্মক ভঙ্গিতে বাঁটি আর দা উঁচু হয় মাসিপিসির।

মাসি বলে, ‘শোনো কানাই, এ কিন্তু একি নয় মোটে। তোমাদের সাথে মোরা মেয়েনোক পারব না জানি কিন্তু দুটো-একটাকে মারব জখম করব ঠিক।’

পিসি বলে, ‘মোরা নয় মরব।’

তারপর বিনা পরামর্শেই মাসিপিসি হঠাৎ গলা ছেড়ে দেয়। প্রথমে শুরু করে মাসি, তারপর যোগ দেয় পিসি। আশপাশে যত বাসিন্দা আছে সকলের নাম ধরে গলা ফাটিয়ে তারা হাঁক দেয়, ও বাবাঠাকুর! ও ঘোষ মশায়! ও জনাদন! ওগো কানুর মা!, বিপিন!, বংশী ...,

কানাই অদৃশ্য হয়ে যায় দলবল নিয়ে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি শুরু হয়ে যায় পাড়ায়, অনেকে ছুটে আসে, কেউ কেউ ব্যাপার অনুমান করে ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দেয় বাইরে না বেরিয়ে।

এই হটগেলের পর আরও নিব্বুম আরও থমথমে মনে হয় রাত্রিটা। আল্লাদিকে মাঝখানে নিয়ে শুয়ে ঘুম আসে না মাসিপিসির চোখে। বিপদে পড়ে হাঁক দিলে পাড়ার এত লোক ছুটে আসে, এমনভাবে প্রাণ খুলে এতখানি জ্বালার সঙ্গে নিজেদের মধ্যে



খোলাখুলিভাবে গোকুল আর দারোগা ব্যাটার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে সাহস পায়, জানা ছিল না মাসিপিসির। তারা হাঁকডাক শুরু করেছিল খানিকটা কানাইদের ভড়কে দেবার জন্যে, এত লোক এসে পড়বে আশা করেনি। তাদের জন্য যতটা নয়, গোকুল আর দারোগার ওপর রাগের জ্বালাই যেন ওদের ঘর থেকে টেনে বার করে এনেছে মনে হলো সকলের কথাবার্তা শুনে। কেমন একটা স্বস্তি বোধ করে মাসিপিসি। বুকে নতুন জোর পায়।

মাসি বলে, ‘জানো বেয়াইন, ওরা ফের ঘুরে আসবে মন বলছে। এত সহজে ছাড়বে কি।’

পিসি বলে, ‘তাই ভাবছিলাম। মেয়েটাকে কুটুমবাড়ি সরিয়ে দেওয়ায় সোনাদের ঘরে মাঝরাতে আগুন ধরিয়েছিল সেবার।’

খানিক চুপচাপ ভাবে দুজনে।

মাসি বলে, ‘সজাগ রইতে হবে রাতটা।’

পিসি বলে, ‘তাই ভালো। কাঁথা কম্বলটা চুবিয়ে রাখি জলে, কী জানি কী হয়।’

আগুন্তে চুপি চুপি তারা কথা কয়, আল্লাদির ঘুম না ভাঙে। অতি সন্তর্পণে তারা বিছানা ছেড়ে ওঠে। আল্লাদির বাপের আমলের গোরুটা নেই, গামলাটা আছে। ঘড়া থেকে জল টেলে মোটা কাঁথা আর পুরনো ছেঁড়া একটা কম্বল চুবিয়ে রাখে, চালায় আগুন ধরে উঠতে উঠতে গোড়ায় চাপা দিয়ে নেভানো যাতে সহজ হয়। ঘড়ায় আর হাঁড়ি কলসিতে আরও জল এনে রাখে তারা ডোবা থেকে। বাঁটি আর দা রাখে হাতের কাছেই। যুদ্ধের আয়োজন করে তৈরি হয়ে থাকে মাসিপিসি।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

একি- ‘ইয়ার্কি’ শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ, হাস্য-পরিহাস বা রসিকতা। কাটারি- কাটবার অস্ত্র। ডালের বড়ি- চালকুমড়া ও কলাইয়ের ডাল পিষে ছোট ছোট আকারে তৈরি করা খাদ্যবস্তু যা রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয় এবং সবজি-মাছ-মাংসের সঙ্গে রান্না করে খাওয়া হয়। পাঁশুটে- ছাইবর্ণবিশিষ্ট, পাংশুবর্ণ, পাণ্ডুর, ফ্যাকাশে। বাজারের তোলা- বাজারে বিক্রেতাদের কাছ থেকে আদায় করা খাজনা। ব্যঞ্জন- রান্না-করা তরকারি। সড়গড়- রপ্তা, মুখস্থ, অভ্যস্ত, স্মৃতিগত।



সারসংক্ষেপ

জগুর অত্যাচারে আল্লাদি বাবার বাড়ি চলে যায়। সেখানে তার একমাত্র অভিভাবক মাসিপিসি। তারা আল্লাদিকে সম্ভানের মতো কাছে টেনে নেয়। আল্লাদিও স্বামীর বাড়ি যেতে চায় না। কিন্তু জগু স্বীকে ঘরে নিতে চায়। স্বীর সম্পদের প্রতি তার লোভ আছে। আল্লাদিকে অপহরণ করার হীন মতলবে জোতদার ও দারোগা বাবু কানাই চৌকিদারকে মাসিপিসির বাড়িতে পাঠায়। তারা কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। কিন্তু মাসিপিসি তা বুঝতে পেরে চিৎকার করে লোক জড়ো করে এবং অস্ত্র হাতে দোষীদের ধাওয়া করে। আসন্ন বিপদের কথা কল্পনা করে মাসিপিসি শত্রুর আগুনের হাত থেকে বাঁচার জন্য বড় গামলাতে জল ভরে রাখে, কাঁথা আর কম্বল ভিজিয়ে রাখে, হাতের কাছে রাখে বাঁটি আরদা। জীবন-সংগ্রামী এই দুই নারী অত্যাচারী স্বামী, জোতদার, দারোগা ও খারাপ মানুষদের হাত থেকে আল্লাদিকে রক্ষার জন্য যে ভূমিকা পালন করেছে তা সত্যি অসাধারণ।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. আল্লাদিকে পাওয়ার জন্য মাসিপিসিকে কে পাগল করে তুলেছে?

ক. কানাই

খ. গোকুল

গ. কৈলেশ

ঘ. দারোগা বাবু

৬. ‘বাজারের তোলা’ বলতে বোঝায়-

ক. বিক্রেতাদের কাছ থেকে আদায় করা কর

খ. ক্রেতাদের দেয়া ক্ষতিপূরণ

গ. বিক্রেতাদের লাভের অংশ

ঘ. ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগকৃত অর্থ



নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

আহারে। এরে মাইয়াডারে মাইরা ফালাইস না। ওরে ও পাষাইগ্যা, দরজা খোল, মারিস না, আর মারিস না, জাহান্নামে যাইবি, মারিস না। বাইরে থেকে দু'হাতে ঝাঁপটাকে ঠেলছে ফকিরের মা। আবুল একবার তাকাল সেদিকে, কিন্তু ঝাঁপি খুলল না।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে 'মাসিপিসি' গল্পে কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. কৈলেশ	খ. জগু
গ. কানাই	ঘ. গোকুল

৮. এরূপ সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হল—

- নারী নির্যাতনে
- সমাজে পুরুষতন্ত্রে
- নারীর অসহায়তায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. i, ii, iii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. 'সোমন্ত' শব্দের অর্থ কী?

ক. ষণ্ডা	খ. যৌবনপ্রাপ্ত
গ. সোমবার	ঘ. শান্তি

১০. মাসিপিসির সমস্ত মন জুড়ে কোন ভাবনা কাজ করে?

ক. নতুন সংসার রচনা	খ. পালিয়ে যাবার চিন্তা
গ. আহ্লাদিকে রক্ষা করা	ঘ. ব্যবসায়ে উন্নতি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

পৃথিবীতে সাহসীরাই টিকে থাকে। কেননা সাহস মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। ভীর্ণ কাপুরুষেরাই কেবল মরে। বার বার মরে।

১১. উদ্দীপকের মূলভাব প্রকাশ পেয়েছে যে চরিত্রে—

ক. পিসি-আহ্লাদি	খ. মাসিপিসি
গ. জগু-কৈলাশ	ঘ. কানাই-দারোগা বাবু

১২. উদ্দীপক ও 'মাসিপিসি' গল্পে ফুটে উঠেছে—

- সাহসের বিকল্প নেই
- ভয় বিপদ বাড়ায়
- ভয় পুরুষতন্ত্রের সহায়ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে হাসু ও মায়মুনাকে নিয়ে অথৈ পাথারে ভেসে চলছিল জয়গুন। একসময় সমাজ ও লোকলজ্জা বিসর্জন দিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজে। এভাবে জয়গুন অকূল পাথারে কূল খুঁজে পায়। কেননা তাকে নিজে বাঁচতে হবে।



ছেলেমেয়েদেরকে বাঁচাতে হবে। নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে হবে। এমনও হতে পারে তার এই জীবনসংগ্রাম অনেককাল ধরে চলবে।

ক. ‘ছেলের মুখ দেখে পাষণ নরম হয়’ –উক্তিটি কার?

খ. মাসিপিসি কীভাবে কানাইকে প্রতিহত করেছিল?

গ. উদ্দীপকের জয়গুন ‘মাসিপিসি’ গল্পে কোন চরিত্রের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ঘ. উদ্দীপকে জীবন সংগ্রামের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা ‘মাসিপিসি’ গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :

“হে, বেবাক মাইনষেরেই এমবায় ঠকাইছে।” করিম গাজী বলে, “আরে মিয়া এমুন কারবারডা অইল আর তুমি ফিরিয়া চলছো?” “কী করমু তয়?” বলে ওসমান। “কী করবা।” খেঁকিয়ে ওঠে করিম গাজী, “চল আমাগ লগে, দেখি কী করতে পারি।” করিম গাজী তাড়া দেয়, “কী মিয়া চাইয়া রইছ ক্যান? আরে এমনেও মরছি অমনেও মরছি। একটা কিছু না কইর্যা ছাইড্যা দিমু?” ওসমান তাকে ঠেলে দিয়ে বলে, “তুই বাড়ী যা গা।” তার বিমিয়ে পড়া রক্ত জেগে ওঠে। গা ঝাড়া দিয়ে সে বলে— “হ, চল। রক্ত চুইয়া খাইছে। অজম করতে দিমু না, যা থাকে কপালে।”

ক. শকুনরা উড়ে এসে কোথায় বসেছে?

খ. অল্লাদি কেন স্বামীর ঘরে যেতে চায় না?

গ. উদ্দীপকের কোন দিকটি ‘মাসিপিসি’ গল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. “মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসেই অন্যায় প্রতিহত হয়।” –উদ্দীপক ও ‘মাসিপিসি’ গল্প অনুসরণে মন্তব্যটি বিচার করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

‘ছেলের মুখ দেখে পাষণ নরম হয়’ –উক্তিটি পিসি করেছিল।

খ.

মাসিপিসি বাঁটি ও কাটারি হাতে প্রতিবেশীদের ডেকে এনে কানাইকে প্রতিহত করেছিল।

কানাই বেশ রাত করে মাসিপিসিকে কাছারিতে ডেকে নিতে আসে। এতে তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তাছাড়া মাসিপিসি ঝোঁপের আড়ালে লুকানো সাধু বৈদ্য ও ওসমানকে দেখে ফেলে। তাই তারা ঘরে গিয়ে বাঁটি আর কাটারি নিয়ে আসে। তারপর প্রতিবেশীদের জোরে জোরে ডাকতে থাকে। প্রতিবেশীরা ছুটে এলে অবস্থা বেগতিক দেখে কানাই তার দলবল নিয়ে পালিয়ে যায়। বস্তুত মাসিপিসির অদম্য সাহস আর অল্লাদির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাই কানাইকে প্রতিহত করতে মাসিপিসিকে অনুপ্রেরণা যোগায়।

গ.

উদ্দীপকের জয়গুনের সঙ্গে ‘মাসিপিসি’ গল্পের মাসিপিসির সাদৃশ্য রয়েছে।

পৃথিবীতে মানুষকে নিজের অস্তিত্ব নিজেই টিকিয়ে রাখতে হয়। এটা করতে গিয়ে সে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। তবুও মানুষ চলার পথে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংস্কার, বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যায়।

উদ্দীপকে জয়গুন নামের এক অসহায় নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে সে অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। অন্যদিকে ‘মাসিপিসি’ গল্পেও দেখা যায়, অল্লাদির পিতা মারা যাওয়ায় মাসিপিসি অস্তিত্বের সংকটে উপনীত হয়। জয়গুন ও মাসিপিসির জীবনের সংকট তাদেরকে এক কাতারে এনে দাঁড় করায়। তারা পতিত হয় সমাজের পঙ্কিল ঘূর্ণাবর্তে। গল্পে মাসিপিসি যেমন অল্লাদিকে আগলে রাখে তেমনি জয়গুনও তার দুই সন্তান হাসু ও মায়মুনাকে সমস্ত প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করে। এভাবে উদ্দীপকের জয়গুনের সঙ্গে ‘মাসিপিসি’ গল্পে মাসিপিসির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘ.

উদ্দীপকে জয়গুনের জীবনসংগ্রামের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা ‘মাসিপিসি’ গল্পে মাসিপিসির জীবনসংগ্রামকে প্রতিফলিত করে। মানুষকে জীবনে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়। অন্যথায় সে বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে যায়। জীবন কখনো অলসদের পক্ষ অবলম্বন করে না। সক্ষমতার শেষ বিন্দু দিয়ে লড়াই করে মানুষকে জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে হয়।



উদ্দীপকে জয়গুনের জীবনসংগ্রামের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাকে জীবনসংগ্রামে নামতে হয়। সে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য কাজে বাঁপিয়ে পড়ে। জয়গুন জীবন যুদ্ধে নিজে বাঁচতে চায় এবং নিজের সন্তান হাসু ও মায়মুনাকে আগলে রাখে। এই যুদ্ধে সে জয়ী হয়। এভাবে একই চিত্র ফুটে উঠেছে ‘মাসিপিসি’ গল্পের মাসিপিসির জীবনচিত্রে। মাসিপিসি গ্রাম থেকে নানা রকম পণ্য সংগ্রহ করে শহরে বিক্রি করে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি তারা তাদের সন্তানতুল্য আল্লাদিকেও সমস্ত প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করে।

উদ্দীপকে জয়গুন স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে জীবন যুদ্ধে নেমেছে। আর নিজ সন্তান হাসু ও মায়মুনাকে সমস্ত প্রতিকূলতা থেকে আগলে রেখেছে। ঠিক তেমনি দুর্ভিক্ষের কারণে মাসিপিসিও সমাজের সকল বিধিনিষেধ ও সংস্কার উপেক্ষা করে জীবনযুদ্ধে নেমে পড়ে। এভাবে দেখা যায়, উদ্দীপকের জয়গুনের জীবন সংগ্রাম ‘মাসিপিসি’ গল্পে মাসিপিসির জীবন সংগ্রামকে প্রতিফলিত করে।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

মা তাকে জেরা করলেন। দেখলাম সে ভারি চাপা। মার প্রশ্নের ছাঁকা জবাব দিল, নিজে থেকে একটি কথা বেশি কইল না। সে বলল, তার নাম মমতা। আমাদের বাড়ি থেকে খানিক দূরে জীবনময়ের গলি, গলির ভেতরে সাতাশ নম্বর বাড়ির একতলায় সে থাকে। তার স্বামী আছে আর একটি ছেলে। স্বামীর চাকরি নেই চারমাস, সংসার আর চলে না, সে তাই পর্দা ঠেলে উপার্জনের জন্য বাইরে এসেছে। এই তার প্রথম চাকরি। মাইনে? সে তা জানে না। দুবেলা রুঁধে দিয়ে যাবে কিন্তু খাবে না।

ক. কোথায় ফলমূলের দাম চড়া?

খ. মাসিপিসি কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করে?

গ. মাসিপিসির কোন কোন বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকের মমতা চরিত্রটিতে ফুটে উঠেছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. উদ্দীপকটি ‘মাসিপিসি’ গল্পের সমগ্র ভাব ধারণ করে কি? –আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরুন।



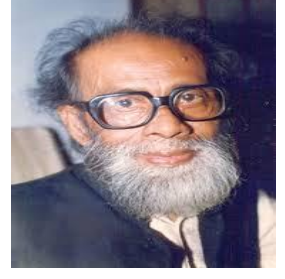
উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. খ ৩. ক ৪. খ ৫. খ ৬. ক ৭. খ ৮. ঘ ৯. খ ১০. গ ১১. খ ১২. ঘ



সৌদামিনী মালো

শওকত ওসমান



লেখক-পরিচিতি

শওকত ওসমান ১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার সবলসিংহপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম শেখ আজিজুর রহমান। তাঁর পিতা শেখ মোহাম্মদ এহিয়া ও মাতা গুলজান বেগম। শওকত ওসমান প্রথমে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা ও পরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে লেখাপড়া করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক ও বাংলা বিষয়ে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন পেশায় চাকরির পর ১৯৫৮ থেকে ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করে ১৯৭২ সালে স্বৈচ্ছায় অবসরে যান। চাকরিজীবনের প্রথমদিকে তিনি কিছুদিন ‘কৃষক’ পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। তিনি একাধারে গল্প, উপন্যাস, নাটক, রম্যরচনা, অনুবাদ ও শিশুসাহিত্য রচনা করেছেন। সবমিলে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ৮০টিরও বেশি। বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখক হিসেবে তাঁর সাহিত্যিকর্ম সমাজ-সচেতনতামূলক ও প্রগতিশীল ভাবধারার শৈল্পিক ফসল। সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬২), আদমজি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৬), একুশে পদক (১৯৮৩), মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯১), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯৭) ও ফিলিপ্স সাহিত্য পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৯৮ সালের ১৪ মে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

শওকত ওসমানের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকর্ম :

- উপন্যাস** : বনি আদম (১৯৪৩), জননী (১৯৫৮), ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২), চৌরসন্ধি (১৯৬৮), জাহান্নাম হইতে বিদায় (১৯৭১), রাজা উপাখ্যান (১৯৭১), নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩), পতঙ্গ পিঞ্জর (১৯৮৩);
- ছোটগল্প** : পিজরাপোল (১৯৫০), জুনা আপা ও অন্যান্য গল্প (১৯৫২), প্রস্তর ফলক (১৯৬৪), জন্ম যদি তব বঙ্গে (১৯৭৫), মনিব ও তাহার কুকুর (১৯৮৬);
- শিশুতোষ** : ওটেন সাহেবের বাংলা (১৯৪৪), ক্ষুদে সোশালিস্ট (১৯৭৩), পঞ্চসঙ্গী (১৯৮৭);
- প্রবন্ধগ্রন্থ** : ভাব ভাষা ভাবনা (১৯৭৪), সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই (১৯৮৫)।

ভূমিকা

‘সৌদামিনী মালো’ গল্পটি শওকত ওসমান রচিত ‘নির্বাচিত গল্প’ (১৯৮৪) থেকে চয়ন করা হয়েছে। গল্পটিতে বর্ণাভিত্তিক হিন্দু সমাজে জাতভেদ, ধর্মানুভূতির নামে মাতৃহত্যার অবমাননার দিকটি ফুটে উঠেছে। অর্থ সম্পদের লালসায় ধর্মকে ব্যবহার করে মানবতার বিরুদ্ধে সমাজের মানুষের অবস্থানই এ গল্পের আলোচ্য বিষয়।



সাধারণ উদ্দেশ্য

শওকত ওসমানের ‘সৌদামিনী মালো’ গল্পটি পড়ার পর আপনি—

- ✚ শওকত ওসমানের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- ✚ ‘সৌদামিনী মালো’ গল্পের মাধ্যমে লেখকের অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথা জানতে পারবেন।
- ✚ অর্থ, সম্পদ, লালসা কীভাবে মানুষকে অন্যায় ও দুষ্কর্মের পথে চালিত করে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ✚ ধর্মান্ধতা কীভাবে মানুষকে মানবতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে প্ররোচিত করে তার বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঠ-১



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আমাদের সমাজে মানবাত্মা কীভাবে প্রতিনিয়ত অপমানিত হচ্ছে তার চিত্র তুলে ধরতে পারবেন।
- অর্থ, লোভ, লালসা মানুষকে কীভাবে অন্যায় করতে সহায়তা করে, তা বর্ণনা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

একটু দাঁড়াও।

আমার বন্ধু নাসির মোল্লা কোর্টের প্রাঙ্গণে হাঁটতে হাঁটতে হাতে হেঁচকা টান দিয়ে বললে।

কী ব্যাপার?

ব্যাপার আছে। কোর্টের পেছনে একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। দেখে আসা যাক।

আমার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কথা। খাজনাসংক্রান্ত একটা মামলা ছিল, তার পরের দিন। নচেৎ এখানে এই টল্লি-দালাল উকিল-মোক্তারের দঙ্গলে আর এক তিল দাঁড়াতে মন চায় না। কিন্তু আমার মামলায় তদবির, যুক্তি-পরামর্শ উকিলের দরদস্তুর নাসিরই করে। এদিকে আমার মগজ দৌড়ায় না। অগত্যা মোগলের সঙ্গে খানা খেতে হয়।

আমার আরও আপত্তি ছিল অন্য কারণে। আদালতের পেছনে যাওয়া কতটা বিলাত ঘুরে মক্কা আসার মতো। কোর্ট টিলার ওপর। পেছনে যেতে হলে এক ধাপ নিচে নেমে আবার ওপরে উঠতে উঠতে জান খারাপ। রীতিমতো হাঁপানি ধরে যায়।

তবু নাসিরের অনুরোধ এড়াতে পারলাম না।

আমরা দুজনেই চাকরি থেকে রিটায়ার করেছি। এখনও সংসারের গেরো কাটেনি। আর সময় কাটাবে কী করে? কিছু না কিছু কাজে লেগে থাকতেই হয়। নাসির পাকাপোক্ত লোক। তার হাতে হাত সঁপেই আমি নিশ্চিত। এই ক্ষেত্রে আর ঘাড় বাঁকিয়ে জোয়ালের ভার আরও বাড়াতে রাজি নই।

কিন্তু টিলাপথে যথারীতি নেমে আবার ওপরে ওঠার সময় তামাশা দেখা গেল। আদালতের পেছনে এক ফালি মাঠের ওপর বেশ ভিড় জমে গেছে একটা পাদ্রিকে ঘিরে। যিশুখ্রিষ্টের সেবকটিকে আমরাও দেখতে পাচ্ছি। সামনে টাক-পড়া মাথা, ফরসা লম্বাটে চেহারা। গলায় ক্রস বুলছে।

এ তো আমার চেনা লোক! ব্রাদার জন। নাসির হঠাৎ বলে উঠল।

আমরা ক্রমশ ওপরে উঠছি। ধাপে ধাপে পা ফেলতে ফেলতে নাসির উচ্চারণ করে, আরে তুমি চিনবে না। এ হচ্ছে ব্রাদার জন। একবার কেরোসিন ব্ল্যাকমার্কেট করার অপরাধে আমার কোর্টে ব্যাটা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল। পরে সে কাহিনি বলব। এখন পা চালাও, দুজনে হাঁপিয়ে উঠছিলাম। বৃদ্ধকালে পাহাড়-চড়া অত সহজ নয়।

অকুস্থলে দেখা গেল, লোকজন কম জমেনি। ব্যাপার কী? ব্রাদার জন তখন চিৎকার করছে, এই সম্পত্তি খুব ভালো আছে। Very good ভেরি গুড।

আমরা দুই কৌতূহলী দর্শক। গিজগিজ ভিড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে গুনতে লাগলাম।

পাদ্রি হাঁকছে, দর্শকমণ্ডলী। আমি তখন নাসিরকে বললাম, বেশ বাংলা বলে তো।

বহুদিন এই দেশে আছে, বলবে না কেন? নাসির জবাব দিয়েই আবার পাদ্রির ওপর চোখ ফেলল। পাদ্রি হাঁকতে লাগল, দর্শকমণ্ডলী! এই সম্পত্তি খুব ভালো সম্পত্তি আছে। এক পুটে বারো ‘কানি’ জমি। পুকুর। আরও আছে তিন একর জমির ওপর বসতবাড়ি, পুকুর, গাছপালা, দশটা নারিকেল গাছ, লিচুগাছ পাঁচটা আরও ফুট-ফলের গাছ আছে। এখন নিলাম ডাকা হবে। প্রস্তুত-। ব্রাদার জন দম নিল।



কৌতূহলী শ্রোতা দর্শক এবার উৎকর্ষ। একজন নেপথ্যে জানতে চাইল, সম্পত্তি কার?

এই সম্পত্তির মালিক হচ্ছে সৌদামিনী মালো সিস্টার।

আজব নাম!

পাদ্রি ব্যঙ্গ স্বর শুনে আরও বিনয় সহকারে ঈষৎ জোর-গলায় বলে উঠল, সৌদামিনী মালো চার্চের সিস্টার- বহেন, ভগ্নী ছিল। তিনি এক মাস হয় মারা গেছেন। চার্চ তার সম্পত্তি নিলাম করছে। শ্রোতাদের মধ্যে এবার একটু চাঞ্চল্য দেখা যায়, কারণ আকাশের রোদ্দুর বেশ নির্দয়। হঠাৎ গরম পড়ছে। নেপথ্যে একজন বললে, সাহেব জলদি করো।

অলরাইট উচ্চারণের পর ব্রাদার জন হেঁকে উঠল, সৌদামিনী মালো, সৌদামিনী মালো, তারই সম্পত্তি এবার নিলাম শুরু হবে। আমাদের পয়লা ডাক পাঁচ হাজার। তারপর আপনারা বিডিং করুন। ‘হায়েস্ট বিডার’ উচ্চতম মূল্যে যিনি ডাকবেন, তিনিই পাবেন।

পাদ্রির সঙ্গে দুজন কুলি শ্রেণির যুবক ছিল। তাদের দিকে চোখ ইশারামতো একজন হেঁকে উঠল, পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার।

তার ডাকের মধ্যে জনান্তিকে একজন ডাক দিলে, পাঁচ হাজার পাঁচশ। পাদ্রির সহকারী হাঁকলে পাঁচ হাজার পাঁচশ। আর কেউ ডাকবেন। কিন্তু আর কারো হাঁকডাক শোনা যায় না। অবিশ্যি দর্শক-মধ্যে গুজগুজুনি চলছে নানা কথা। পাদ্রি-সহকারী আবার হাঁক দিলে, পাঁচ হাজার পাঁচশ- এক- পাঁচ হাজার পাঁচশ- দুই-। হঠাৎ একজন ডাক বাড়ালে, ছ-হাজার।

ভেরি গুড, ব্রাদার জন বলে উঠল। তার সহকারী ছ-হাজার ছ-হাজার রবে আরও কয়েকবার হাঁক দিলে। শেষে আর একজন ডাকিয়ে বাড়াল। সে সাত হাজার দাম তুলে দিলে।

আমরা বেশ মজা দেখছিলাম। কিন্তু বাড়তি টাকা তো নেই। পেনশনে যে কটা টাকা পাই তা দিয়ে কোনো রকমে সংসার চলে। নচেৎ এত বড় সম্পত্তি পাওয়া যেত। বড় আফসোস হতে লাগল। দাঁড়িয়ে ছিলাম, সম্পত্তি কোন ভাগ্যবানের পাতে যায় তা দেখার জন্যে।

নিলাম জমে উঠল কিছুক্ষণের মধ্যে। কিন্তু ন-হাজারের পর আর দাম শতে শতে লাফ দিয়ে যায় না। একজন ডাকলে ন-হাজার ন-শ পঞ্চাশ। আরও পঞ্চাশ টাকা বাড়ল। দশ হাজার।

পাদ্রি-সহকারী হাঁক দিতে লাগল দশ হাজার এক- দশ হাজার দুই-। তারপর সে স্তব্ধ। জনতা নীরব। তিন বলার আগে একজন মাত্র পঁচিশ টাকা যোগ দিলে। দশ হাজার পঁচিশ।

ওদিকে রোদ্দুর বাড়ছে। বৃদ্ধকালে তবু কেন দাঁড়িয়েছিলাম? আজ বলতে লজ্জা নেই। হয়ত সম্পত্তির লোভে। ক্ষুধার্ত কালেভদ্রে অপরের খাওয়া দেখেও নাকি শান্তি পায়।

শেষ পর্যন্ত আরও পাঁচাত্তর টাকা দাম বাড়ল। অর্থাৎ দশ হাজার একশ। বোঝা গেল, নিলাম ডাকিয়েদের পকেট শুকিয়ে যাচ্ছে। রস নাদারাৎ। যিনি শেষ পঁচিশ টাকা বাড়িয়েছিলেন, ভিড়ে তাঁকে দেখা গেল না। তবে হাত নাড়ছিল সে অপরের কাঁধের ওপর দিয়ে।

পাদ্রি-সহকারী হাঁক দিলে, দশ হাজার একশ- এক, -দশ হাজার একশ- দুই-। সে থামলে তারপর। পাঁচ ছ-মিনিট কেটে গেল। আর তিন উচ্চারণ করে না সে। এবার লোকটাকে দেখলাম, যে দশ হাজারের ওপর একশ বাড়িয়েছিল। মাঝবয়সী লোক, কিন্তু বুড়োবুড়ো ঠেকে। প্যান্ট-কোট-টাই সমন্বিত। মাথায় মখমলের টুপি। বাজি মেরে দিয়েছে, এই ভাব চোখেমুখে। কতক্ষণ আর নিলাম-ঘর চুপ থাকতে পারে? কিন্তু ‘তিন’ আর উচ্চারিত হয় না। দর্শক অধৈর্য। সেও জবাব চেয়ে বসল।

এখন বেশ মজা বেধে গেছে। কৌতূহলী দর্শক তাই দাঁড়িয়ে থাকে। রোদ্দুর সত্ত্বেও নড়ে না। ব্রাদার জনের মুখের দিকে তাকাই। সেখানে কালো আর ফিকে সবুজ রং খেলা করছে মুহূর্তে মুহূর্তে। কিন্তু একটা কাশি দিয়ে হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে উঠে সে হাঁক মারলে, দর্শকমণ্ডলী।

কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। নিলামদাতা এবার কী করবে।



ব্রাদার জন মুখ খুললে, যেন গির্জার পুলপিট অর্থাৎ প্রচারবেদি থেকে সার্মান দিচ্ছে এমনই কণ্ঠস্বর : ভ্রাতৃগণ, আজ নিলাম এখানেই রহিত থাকবে। আগামীকাল্য পুনরায় ডাকা হবে। আজ লোক খুবই কম। কাল দশ হাজার এক শ হইতেই আরম্ভ হইবেক। আমেন।

দর্শকদের মধ্যে অনেক গুলতানি শুরু হলো। আর টুপিপরা সেই শেষ পোঁচ-মারা নিলাম-শিল্পী তো রেগেই খুন। ব্রাদার জনের চারদিকে জটলা পেকে গেছে। সেখানে ভদ্রলোক জোর গলায় বলছে, This is sheer hypocrisy এটা জোচ্ছুরি... ইত্যাদি। আমার কৌতূহলের মাত্রা আরও বেড়ে গিয়েছিল। ভিড়ের সান্নিধ্য এই ক্ষেত্রে আরামদায়ক। আমি তাই পা বাড়াই। নাসির আমার হাত ধরে হেঁচকা টান মেরে বললে, আরে ভিড়ে সৈঁধিও না।

একটু মজা দেখে যাই।

—মজা দেখে আর কাজ নেই। যা গরম সর্দিগর্মি হয়ে মরব, চলো বাড়ি যাই।

—একটু দেখে যাই না।

—দেখে কাজ নেই। আমার কাছ থেকেই সব বৃত্তান্ত শুনে নিও। আকাশে সূর্য তখন দোজখের পিণ্ড বললেই চলে। আমি নাসিরের কথা মেনে নিলুম।

আবার চড়াই-উত্ৰাই। ওঠানামার ব্যাপারটা এমন কষ্টকর। নাসির হেসে বললেন, আরও মজা দেখতে গেলে আমাদের মাজা ভেঙে যেত।

রসিকতার দিকে আমার খেয়াল ছিল না। আমি বললাম, নাসির, ব্যাপার কী?

সে বেশ মাথা দুলিয়ে হঠাৎ ব্যঙ্গ আর ত্রুরতা-মাখানো এক রকমের হাসি ছাড়িয়ে শেষে মুখ খুলল, বাবা, এর নাম ব্রাদার জন।

জন?

হ্যাঁ, ও এক জন বটে। আমার কোর্টে কেরোসিন ব্ল্যাকমার্কেটের দায়ে অভিযুক্ত। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, What have you to say তোমার কী বলার? জন জবাব দিল End justifies the means, উদ্দেশ্য দিয়েই উপায়ের বিচার করা উচিত। আমি ব্ল্যাকমার্কেট করিয়াছি ভিক্ষুকদের লঙ্গরখানায় ভাত প্রদানের জন্য।

—অপরাধ স্বীকার করলে?

—হ্যাঁ। প্রথম অপরাধ। তাই ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ব্যাটা পাকা বদমাশ। আজ দেখলে না, কীভাবে ম্যানেজ করলে।

—কী ম্যানেজ?

—ওই সম্পত্তির দাম কমসে কম পঁচিশ হাজার। দশ হাজারে ছাড়তেই পারে না।

নাসির আমার দিকে মুখ কুঁচকে চোখ নাচিয়ে, জনের বাহাদুরির অবস্থাটা ফোটাতে চাইলে।

—কিন্তু সৌদামিনী মালোর সম্পত্তি, আর নিলাম করছে ব্রাদার জন? এ ব্যাপারটা কী?

নাসির তার সাদাচুল মাথা দুলিয়ে চোখের কোনায় হাসি মাখিয়ে জবাব দিলে, সেটাই তো মজা।

—মজা?

—শোনো। সে অনেক কথা। ব্রাদার জনের মতো চিজকে ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক বয়ান প্রয়োজন।

—তো বয়ান করো।

বেলার দিকে খেয়াল আছে? খেয়েদেয়ে এসো সন্ধ্যায় আমার বাড়ি, তখন সব সবিস্তার বলব ব্রাদার জন-সৌদামিনী মালো উপাখ্যান।

—না, অত দেরি করতে পারব না। খেয়ে একটু জিরিয়েই বিকেলে আসছি। বিকেলের চা তোমার ওখানেই খাব।

—বেশ।

কথায় কথায় আমরা রাস্তায় এসে পড়েছি। উত্ৰাই শেষ হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালাতে লাগলুম।

জানো সাজ্জাদ, ভাবছি কোথা থেকে আরম্ভ করব। ব্যাপারটা বেশ জটিল। নাসির মোল্লা এখন বুড়ো হয়ে এসেছে বলতে পারো। তাই ভয় পাচ্ছে। তবে শুরু করতে হয়।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অকুস্থল– ঘটনাক্রম। **উৎকর্ণ**– কান খাড়া করে আছে এমন। **গেরো**– বন্ধন, বাঁধন। **গুজগুজুনি**– গুঞ্জন। **জনাঙ্কিকে**– আড়ালে থেকে, একপাশে থেকে বা নেপথ্যে। **জান খারাপ**– অবস্থা ভালো নয়। **টল্লি**– টর্নি, আমমোজার। **নাদারাত**– বিহীন, শূন্য, অভাব, নাই। **বয়ান**– বিবরণ, বর্ণনা। **বিডিং**– নিলামে দাম হাঁকা। **মোগলের সাথে খানা খেতে হয়**– বাধ্য হয়ে নতি স্বীকার করতে হয়, পরিস্থিতির চাপে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্মতি দিতে হয়। ‘পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে’–প্রবাদটির অনুসরণে রচিত বাক্যবন্ধ। **লঙ্গরখানা**– বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের স্থান। **সার্মান**– গির্জার বেদি থেকে প্রদত্ত ধর্মীয় বা নৈতিক অভিভাষণ। **হায়েস্ট বিডার**– সবচেয়ে বেশি দাম হাঁকিয়ে, জনগণের আড়ালে। **hypocrisy**– কথায় এক কাজে আরেক, ভণ্ডামি। **sheer**– পুরোদস্তুর, নির্ভেজাল।



সারসংক্ষেপ

গল্পকার গল্পের এ-অংশে অর্থ-সম্পদের মোহ মানুষকে কীভাবে মানবিক গুণ থেকে দূরে সরিয়ে অন্যায় ও খারাপ কাজের দিকে ধাবিত করে তা দেখিয়েছেন। গল্পের প্রথমে ব্রাদার জনের মাধ্যমে বৃটিশদের মানসিকতা, এদেশে তাদের দু-একটা ভালো কাজে হাত দেবার উদ্দেশ্য, সর্বোপরি খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার প্রয়াস দেখিয়েছেন। গল্পের শুরুতে সৌদামিনী মালো নামের এক নিঃসন্তান ধর্মান্তরিত নারীর বিরাট বসতবাড়িসহ পুকুর-গাছপালার নিলাম ডাকা হচ্ছে। সম্পত্তি সৌদামিনী মালোর, আর তার নিলাম ডাকছে খ্রিষ্টান পাদ্রি ব্রাদার জন। নিলাম ডাকার নিয়ম অনুযায়ী সর্বোচ্চ দরদাতা সম্পত্তির অধিকারী হলেও ব্রাদার জন কাক্ষিত মূল্য না পাওয়ায় নিয়ম ভঙ্গ করে নিলাম স্থগিত করে এবং পরবর্তী দিন থেকে আবার সেখান থেকেই ডাক শুরু করার ঘোষণা দেয়। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে গুঞ্জনসহ ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়। সৌদামিনী মালো কীভাবে সৌদামিনী সিস্টার হলো এবং কীভাবেই বা এত সম্পত্তির মালিক হলো এবং তা কেন নিলাম হচ্ছে গল্পকার পাঠের এই অংশে তা বলেননি।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বৃদ্ধকালে কোনটি চড়া সহজ নয়?

ক. পাহাড়

খ. টিলা

গ. গির্জা

ঘ. কোট

২. ‘অগত্যা মোগলের সাথে খানা খেতে হয়’ উক্তিটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে–

ক. মোগল সম্রাটদের সঙ্গে খেতে হবে

খ. বাধ্য হয়ে নতি স্বীকার করতে হয়

গ. পাদ্রিদের সঙ্গে খাবার খেতে হবে

ঘ. ইচ্ছে করে নতি স্বীকার করতে হয়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

চাকরি থেকে রিটায়ার করার পরও শমসেরের সঙ্গ ছাড়তে পারিনি। কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে। বিকালে ঘুরতে যাওয়ার জন্য প্রতিদিন তার অপেক্ষায় থাকি।

৩. উদ্দীপকের শমসের ‘সৌদামিনী মালো’ গল্পের কোন চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়?

ক. নাসির

খ. ব্রাদার জন

গ. মনোরঞ্জন

ঘ. জগদীশ

৪. উদ্দীপক ও ‘সৌদামিনী মালো’ গল্পে প্রকাশিত হয়েছে?

i. আবেগের আতিশয্য

ii. ধূর্ততা

iii. ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও iii

পাঠ-২



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মানুষ কীভাবে হীন উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করে, তা লিখতে পারবেন।
- সৌদামিনী কোন প্রেক্ষাপটে স্বধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

সৌদামিনী মালো নবীগঞ্জের অধিবাসিনী। নবীগঞ্জে যে ব্যাপটিস্ট মিশন আছে, তারই কাছাকাছি। তুমি ওই অঞ্চলে কত দিন সার্কেল অফিসার ছিলে, জায়গাটা তো চেনই। অবিশ্যি তখন ওখানে মিশনের পাদ্রি ছিল ফাদার জনসন। লোকটা ভালোই। এদের আবার ভালোমন্দ কী? ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত পাকা করতে এদের এখানে সেখানে ছড়িয়ে দেওয়া হতো, যেন দরকার মতো আউটপোস্টের কাজ করতে পারে। গরিব দেশে এখানে ওখানে দু-চারটে দাতব্য ডিসডেন্সারি কী এক-আধটা স্কুল চালায়। লোকেরা ভাবে, আহা কী সব দয়ার প্রাণ; ব্রিটিশরা ভালোই জানত, The nearest way to poor man's heart is down their throat- ইংরেজেরই প্রবাদ। ওরা এইভাবে কিছু কিছু খ্রিষ্টানও বানায়। তারা তো ইংরেজের খয়ের খাঁ বনে যেত। বলতে পারো- ইংরেজ করে ফেলে। পড়োনি নজরুলের ‘মৃত্যু-ক্ষুধা’? আসলে এরা কেউ যিশুখ্রিষ্টের ভৃত্য নয়, এরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভৃত্য। হ্যাঁ, কোথা থেকে কোথা এসে পড়লাম। একটু ধৈর্য ধরে শোনো। বৃদ্ধকালে তাল রাখা দায়। কথায় কথায় অনেক দূর চলে গেছি।

হ্যাঁ, সৌদামিনীর স্বামী জগদীশ মালো ছিল পেশায় আরদালি। কিন্তু বেজায় তুখোড় লোক। প্রভুর মন জুগিয়ে চলা শিল্প সে বেশ রপ্ত করেছিল। যে কোনো অফিসারকেই খুশি করার পন্থা আবিষ্কারে দক্ষ জগদীশ মালো। ফলে, কলা-মূল্যে ভালোই পেত। বখশিসে মোটা পেট, এমন আরদালি তুমি দুটি খুঁজে বের করতে পারবে না। আমি অবশ্যি তাকে দেখিনি। আমারও শোনা কথা। সস্তার বাজার। পুরা বেতন বাঁচল, তার ওপর উপরি ইনকাম। আর সে তো মিশরের সশ্রু হতে চায়নি। চেয়েছিল, গ্রামে দু-চার বিঘে জমি-জিরেত, একটু অনটন-মুক্ত দিন-যাপন। পনের-বিশ বছরের চাকরিতে জগদীশ তা পুষিয়ে নিলে। কিন্তু বেচারার একটা বেশ দুঃখ ছিল। ছেলেপুলে নেই। সৌদামিনীর স্বামী স্থির করলে, আর একটা বিয়েই যুক্তিযুক্ত; অন্তত চেষ্টা করে দেখা যাক। বংশ তো গুঁম করে দেওয়া চলে না? কিন্তু বেচারার বর সাজার অবসর পায়নি। হঠাৎ মরে গেল। অথচ বিয়ের কথাবার্তা ঠিক। তার মৃত্যুটা আজও রহস্য রয়ে গেছে। কু-লোকেরা রটিয়ে দিলে সৌদামিনী তাকে বিষ খাইয়েছে। বংশ রক্ষা হোক, কিন্তু অপরের সন্তানে নয়। সৌদামিনী ভিতরে ভিতরে হয়ত এমন একটা দুর্জয় পণ করে বসেছিল। এসব খোদাকেই মালুম। এসব ক্ষেত্রে কোনো মেয়ে কী করে, বোঝা দায়। কিন্তু তুমি বলছ, স্বামীকে হত্যা করবে- তা অনুমান করা মুশকিল। মুশকিল কিছুই নয়। এমন হতে তো পারে। আমিও বলছি, গুজবের কথা। কারণ, এসব নিয়ে আর কোনো তদারক হয়নি। তখন সৌদামিনীর বয়স চল্লিশ পার। জগদীশ পঞ্চাশের সামান্য এদিক কি ওদিক। হয়ত যৌবনের খাঁই নেই, তবু সতীন বা সতীনের ছেলে আসবে- তা সৌদামিনী মনের সঙ্গে মেলাতে পারেনি। এতএব ‘দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল’ আচ্ছা। আমিও বলছি, অনুমানের কথা। যাক, ও-পাট চুকল। সৌদামিনী তখন একা। কিন্তু সেও হুঁশিয়ার মেয়ে। আর রবদব ছিল জোর। তখনও দেহ আছে, তার ওপর সম্পত্তি। গ্রামের দু-চার জন ছুঁচোর মতো হয়ত হেঁ হেঁ শব্দে ঘুরঘুর করছিল। কিন্তু সৌদামিনী গোপনেও জগদীশেরই বউ হয়ে থাকল। অপবাদ কেউ দিতে পারবে না। অবিশ্যি জগদীশ একটা কাজ করে যেতে পারত। কোনো আত্মীয়ের নামে সম্পত্তি লিখে পড়ে সৌদামিনীকে জীবনস্বত্বের অধিকারিণী করে দিতে পারত।

কিন্তু তা হওয়ার জো ছিল না। এক নিকট আত্মীয় ছিল জেঠতুতো দাদা। সে স্বদেশি করত। জগদীশ সরকারের পেয়ারের লোক। অন্য দিকে স্বদেশি বাবু। সাপে-নেউলে আর কী দিয়ে বন্ধুত্ব হবে। এসব কথা তোমাকে শোনাচ্ছি, তাহলে সব বুঝতে পারবে। জগদীশ তো মরল। কিন্তু জের কাটল না। বিধবার সম্পত্তির দিকে ওই আত্মীয়ের লোভ সহজে কি মেটে! অবশিষ্ট আট দশ বছর এইভাবে কেটে গেছে। স্বদেশি বাবুর নাম মনোরঞ্জন মালো। তারও বয়স হয়ে গিয়েছিল। ছেলেপুলে



আছে। জেল-টেল খেটে গ্রামে ফিরে সে নামে স্বদেশি বাবু রইল। সাদা টুপিটা পকেটে খুঁজে অথবা দরকার হলে মাথায় দিয়ে সেও মন দিলে সংসার গোছাতে। গ্রাম্য দলাদলির মধ্যে মাথা গলান এবং তৎ-মন্ততার দুচার পয়সার দালালি বা টন্নিগিরি কমিশনে একটা আয়ের পথ তো খোলা যায়। এককথায়, স্বদেশি বাবুর গুভ্রতা তার টুপির মধ্যেই নিবদ্ধ রইল। পাশাপাশি বাড়ি, সুতরাং বিধবা বৌদির দিকে নজর পড়া স্বাভাবিক। ভুল বললাম, বৌদি নয়, সম্পত্তির দিকে। কিন্তু সৌদামিনীর শরীর গৌর আর মুখ সুন্দর হলেও, কঠোর হওয়ার মতো যথেষ্ট তেজ ছিল। অবরে-সবরে এই মানুষ আবার হীরার চেয়ে শক্ত হতে পারে। যত বাগড়া তো সেইখানে। নচেৎ মনোরঞ্জন মালো কবে দুর্গ ফতে করে ফেলত। মনোরঞ্জন মালো প্রথম প্রথম কতগুলো স্ট্র্যাটেজি-পায়তারা কষে নিলে। একদিন হয়ত সকালে দেখা গেল, সৌদামিনির কলাবাগান থেকে কয়েক কাঁদি পাকা ফল গায়েব। কিছু চারাগাছ মাড়ানো। কিন্তু পাড়াপড়শিদের খুব মিষ্ট ভাষায় ব্যাপারটা জানিয়ে এল। আর কিছু না। তারপর মাঝে মাঝে রাতে সে বন্দুক ছুড়ত। কমিশনার সাহেব জগদীশকে নিজের বন্দুক দিয়েছিলেন বখশিসরূপে। অস্ত্রখানা তখনও সৌদামিনীর কাছে আছে। তাছাড়া তার তাক আশ্চর্য। বাড়ির উঠানে চিল ঢুকতে সাহস পায় না। মনোরঞ্জন ফেল মারলে। বৌদির চেহারা সুন্দর, কিন্তু তেজ তেমনি অপরিখ্য। অবিশ্যি সৌদামিনীর হাতে কয়েকটা লোক ছিল। তার জমিনের চাষি, কয়েকজন। তারা বলত, মায়ের অল্পে প্রতিপালিত, মার তো অপমান হতে দিতে পারি নে। স্বদেশি বাবুর সেও একটা ভয়। ছোটো লোকগুলো কখন কী করে বসে, বলা যায় না। আর সৌদামিনীর অন্তর ছিল। বিপদে-আপদে সে বহু মানুষকেই সাহায্য করত। বেড়ার মধ্যে গেরস্থর মুরগি দেখলে জিতে জল-সরা শেয়াল যেমন ঘন ঘন তাকায় আর লোভের চোটে ছটফট করে, মনোরঞ্জন মালো সেই রকম অবস্থায় নতুন পায়তারা ভাঁজতে লাগল। কী করা যায়, কী করা যায়। অবিশ্যি সময়ও এদিকে গড়িয়ে যাচ্ছে, তা মনে রেখো। বছর যাচ্ছে বছর আসছে। সৌদামিনীর চুল ক্রমশ সাদা, দেহে শ্রৌড়ত্বের রেখা। কিন্তু আদ্যুত্তি ঠিক চলছে। সৌদামিনী বনাম স্বদেশি বাবু।

ঠিক এই পর্যায়ে দেখা দিল ব্রাদার জন। সে তো পরকালের চেয়ে ইহকালের খবর ঢের বেশি রাখে। তারপর মিশনের অবস্থা ভালো নয়। ইউরোপে মহাযুদ্ধ বেধেছিল। ফলে ডোনাররা আর খাত-মতো চাঁদা পাঠায় না বা হার দিয়েছে কমিয়ে। সুতরাং আয়বৃদ্ধির উপায় একটা করতেই হয়। ব্রাদার জন এলাকার খবর জানত। মনোরঞ্জনের সঙ্গে তার বিলম্বিত পরিচয় ছিল। কারণ, বাবু এলাকার সবচেয়ে ভালো ইংরেজি কইয়ে-বলিয়ে। ভাষা মারফত একটা অদৃশ্য যোগসূত্র গড়ে ওঠে। অবিশ্যি তখন পাদ্রির ভূমিকা তত প্রকট হয়নি। আর বাবুর সঙ্গে কী কথাবার্তা হতো তা খোদকেই মালুম।

কিন্তু সৌদামিনী সকলের মুখে ছাই দিয়ে বসল।

ব্যাপারটা বলছি। সৌদামিনী মাঝে মাঝে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে যায়। আট-দশ-বিশ-মাইল দূরে দূরে তার মাতৃকুলের কিছু ভাইবোন কুটুম আছে। এক জায়গায় থেকে থেকে মানুষের প্রাণ তো হাঁপিয়ে ওঠে। সৌদামিনী বছরে এমন দু-একবার দম ফেলতে বেরুত। তখন ঘর পাহারা দিত তার চাষি এবং কামিনেরা। সৌদামিনী এই ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিল। কারণ, ওরা রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিলে আর কোনো আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু এবার সে শুধু বেড়িয়ে এলো না, সঙ্গে নিয়ে এলো একটা বছর দুয়েকের শিশু। এক আত্মীয়ের কাছ থেকে আনা। পোষ্যপুত্র রাখবে সৌদামিনী। পোষ্যপুত্র? সম্পত্তির দিকে যারা চোখ রাখছিল, তারা এবার আকাশের দিকে চোখ তুললে। সম্পত্তির নতুন শরিক জুটে গেছে। আর শুধু মালিক নয়, চিরস্থায়ী উত্তরাধিকারী। যেন সদ্য আঁতুড়ঘর-ছাড়া। চব্বিশ প্রহর চোখে চোখে রাখতে লাগল ছেলেটাকে। নাম রাখলে হরিদাস। হরিদাস বেড়ে উঠতে লাগল। চেহারাটা ফরসা, বেশ খাড়া নাক। আর চোখ দুটো ঝিলিকে ঠাসা। সৌদামিনী হরিদাসের মধ্যে জীবনের সমস্ত পূর্ণতার একটা প্রতীক খুঁজে পেলে যেন। বেশি বাইরে যেতে দিত না তাকে। কারণ, পাড়াপড়শির চক্ষুশূল। ওর জন্যে আলাদা একটা শিক্ষকই রেখে দিলো বাড়ি এসে পড়িয়ে যাওয়ার জন্যে। আরও পাঁচ-ছ বছর এভাবেই কেটে গেল। সৌদামিনীর অবিশ্যি চুল পেকে গেছে। চেহারা নিস্ত্রভ। কিন্তু তার মুখাবয়বে একটা পরিতৃপ্তির আভা ছিল। সেই মুখের দিকে তাকালে তোমার চোখ খুঁজে পাবে স্নিগ্ধতা, দয়াসম্প্রদ এক রকমের তাপহর স্পর্শ। অবিশ্যি মনোরঞ্জন বসে নেই। তারও বয়স বাড়ছে। আর তৎসঙ্গে সংসার। অর্থাৎ সর্ব রকমের বোঝা। সম্পত্তির দিকে চাইলে এখন চোখ পুড়ে যায়। নতুন শরিক এসে জুটেছে। হরিদাসের বয়স বারো। একটা মেয়ে মানুষের কাছে হেরে যাবে মনোরঞ্জন মালো? একটা কিছু করতে হয়। ব্রাদার জনের মিশন চলছে না ঠিকমতো। রুজি-রোজগার প্রয়োজন। একদিন ওদিকে গেলে কিছু একটা যুক্তি করা যায়। মনোরঞ্জন মনে মনে এসব লঙ্কাভাগ করেছিল নিশ্চয়। আঁচ করতে পারো সাজ্জাদ। ... হ্যাঁ, জ্ঞাতি শত্রু বড় শত্রু। মনোরঞ্জন মালো এবার একটা বোম ফাটালে, স্বদেশি আমলে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে থেকেও যা সে করতে সাহস পায়নি।



সে গ্রামময় প্রচার করে দিলে সৌদামিনীর পোষ্যপুত্র জাতে নমশূদ্র নয়, ব্রাহ্মণ। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখ। কী ভয়ানক শাস্ত্রবিরুদ্ধ পাপকর্ম। ব্রাহ্মণের জাত মেরেছে এক শূদ্রাণী। রাম, রাম। মনোরঞ্জন এই ঢিলে পাখিকে কাত করে ছাড়লে। আগে শত্রুতা বা ঈর্ষা যা বলো, ছিল ব্যক্তিগত। এবার তা সমাজগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। গ্রামে দু-চার ঘর ব্রাহ্মণ-কায়েত-মাহিষ্য ছিল, তারা দাঁতে আঙুল কাটলে। ছি ছি, এমন কথা কে কোনদিন শুনেছে। যাদের বয়স বেশি তারা মন্তব্য করল : কলি কাল। সৌদামিনীকে গ্রাম্য-সমাজের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো। সে বেশ জোর দিয়ে হলপ্ করে বললে, হরিদাস শূদ্র-তার দূরসম্পর্কীয় এক গরিব আত্মীয়ের ছেলে। পরিস্থিতি আপাতত এখানে চুকল। কিন্তু সৌদামিনীর বিরুদ্ধে তো মনোরঞ্জন একা নয়। আরও ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আছে। সুতরাং গ্রামের অচল নিষ্কর্মা প্রহর তারা সহজে যেতে দিলে না। খোঁজ নিয়েই দেখা যাক। যদিও বিশ মাইল দূরে, কিছু রাহা খরচ যাবে, যাক। আহা, ভগবান যাকে ডাক দেয় সে তো হেঁটে হেঁটে বারানসি চলে যায় তীর্থ করতে। এই দশ ক্রোশ পথ আর তারা সামাল দিতে পারবে না? বোঝা গেল ওদের সেবার ভগবান ডাক দিয়েছিল। একজন দেব-উৎসর্গিত প্রাণ বারোয়ারি রাহা-খরচে সৌদামিনীর সেই আত্মীয় বাড়ি থেকে খোঁজ নিয়ে ফিরল। বাজিমাতা মজকুর ব্যক্তির কোনো ছেলেই নেই। সব মেয়ে। সৌদামিনী বুট বলেছে, মিথ্যাবাদিনী। সমস্ত গ্রাম তোলপাড়। ধর্মের কল বাতাসে নড়ছিল, সেটা যুধিষ্ঠিরের দল থামাতে চায়। তো নচেৎ কল তো ভেঙে যেতে পারে। সৌদামিনী এবার তো বেশ রোয়াবের সঙ্গে জবাব দিলে কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করলে না। সমস্ত গ্রাম তার বিরুদ্ধে। আর জুলুম শুরু হলো। তার ছাগল মাঠ থেকে আর ফিরল না, দুধেল দুটো গাই হারিয়ে গেল। এমন ছোটোখাটো নিত্য নির্যাতন। একদিন ব্রাদার জন এই সময় গ্রামে এল। ইহকালের খবর সে পরকালের চেয়ে কম রাখে না, আগেই বলেছি। ব্রাদার জন সব শুনে গ্রামবাসীদের মিটিয়ে ফেলতে বলল ব্যাপারটা, সৌদামিনীর সামনেই। একটা ছেলে মানুষ করছে ... মানুষ ... সে শূদ্র আছে না কয়েকটা আছে গড এসব দেখিতে বারণ করিয়াছে ... এই জাতীয় নানা বাণী ছাড়লে। সৌদামিনী কাঁদতে কাঁদতে ব্রাদার জনকে উকিল পাকড়ালে একটা মিটমাটের জন্যে। মনোরঞ্জন মালোর সঙ্গেও একপাশে চুপি চুপি কী কথা হলো তা ব্রাদার জনের গডই জানে। বিষয় নিষ্পত্তি প্রয়োজন। কিন্তু মনোরঞ্জন মালো তো সম্পত্তি নিষ্পত্তি চায়। ব্রাদার জন বললে, দুদিন সবুর করো, আমি ফয়সালা করিয়ে দিবে। আর মনে রেখ, সৌদামিনী এখন কোণঠাসা। এক হুণ্ডায় তার চুল শন হয়ে গেছে। আগে তো বুড়ি মনে হতো না, এখন তো শ্মশানযাত্রীর শামিল ধরে নিতে পার। বুড়ি সেই অবস্থায় ওকে যারা দেখেছিল, তাদের কাছেই শুনেছি। হরিদাস আর বাড়ির বাইরে যেত না। যেতে চাইলে সৌদামিনী কেঁদেকেটে বাধা দিত। চতুর্দিকে ঘোলাটে আবহাওয়া। ব্রাদার জন এই গ্রামে আসে কিন্তু সৌদামিনীর সঙ্গে দেখা করে না। শেষে কয়েকজন মরিয়া-ধর্মপুত্র তো একদিন সৌদামিনীর বাড়ি হামলা করে বসল। কিন্তু শান্ত প্রকৃতির বুড়ো মানুষ এই ঈশ্বর-প্রাণ ব্যক্তিদের থামাল। সৌদামিনী বাপের বেটি। বাঘের দুধ খেয়েই বোধ হয় মানুষ-বেরিয়ে এল একদম নিরস্ত্র, যদিও বাড়িতে বন্দুক আছে। ক্ষিপ্ত জন্তুর সামনে সে এবার বোমা ফাটল। বোমাও বোধ হয় এত শব্দ তুলতে পারত না। সৌদামিনী চোখ থেকে শিবের মতো আগুন ছড়িয়ে বললে... কী বললে শোন। তার কথাটাই মুখজবানি পেশ করতে হয়। সৌদামিনীর ওপর তখন যেন কিছু ভর করেছিল।

—শোন অভাগির ব্যাটারী, ধর্মপুত্রের যুধিষ্ঠিরের দল ... আমার হরিদাস শূদ্রও নয়, ব্রাহ্মণও নয়। শোন, কী। তোরা তো জানিস। আমি বছরে একবার-দুবার আত্মীয়বাড়ি যাই। তখন পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, একদম পুরো কোটাল। গাঁয়ে গাঁয়ে হাজার দু-হাজার লোক মরছে হুণ্ডায়। আমি ফিরছিলাম হরিশ্চক থেকে ... আলোকডাঙার কাছাকাছি আসতে বেহারাদের তেষ্ঠা লাগল। একটা আমগাছের তলায় পালকি রেখে ওরা গেল খেতে। পুকুর আছে, বিঘে দুই জমি দূরে। আমার সামনে আবার একটা ধানক্ষেত, ধান পেকে গেছে। আর পনের দিন বাঁচলে কত লোক বেঁচে যেত নিজের ক্ষেতের চাল খেয়ে; কিন্তু তার আর হলো কই। হঠাৎ শুনলাম, ধানক্ষেত থেকে শিশুর কান্না আসছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। দেখলাম একটা লোক জমিন আঁকড়ে মরে পড়ে আছে। মুখে দাড়ি। তার পাশে একটা মরা মেয়ে। তার পাশে একটা ছেলে বসে মরা মায়ের বুকে মাথা রেখে কাঁদছে থেকে থেকে; আবার উঠে বসছে। কিন্তু সেও চিঁচিঁ করছে। ধুকছে। ছেলেটার পানে চাইতে আমার দিকে হাত বাড়াল। চোখের চাউনি কী করুণ। আমিও অজানিতে হাত বাড়িয়ে দিলাম। বছর তিনেকের ছেলে, কিন্তু অনাহারে অনাহারে দেড় বছরের বেশি দেখায় না। কোলে তুলে নিলাম... নিয়ে এলাম... পালকির ভেতরে লুকিয়ে রাখলাম... আফিম খাই, সঙ্গে দুধ ছিল... দুধ দিতে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল। বেহারারা টের পেলে না। এক আত্মীয়ের কাছে তিন মাসের জন্যে রেখে এলাম দুশ টাকা দিয়ে। ভালো খাওয়া দাওয়ায় ছেলেটা বেশ তাজা হয়ে উঠল। তার পর নিয়ে এলাম। ওর আসল বাবা সেই মুসলমান চাষি ... আমার হরিদাস মুসলমান ... যেন বাজ পড়ল উপস্থিত জনতার ওপর।



রেশ কাটল কয়েক মুহূর্ত পর। কিন্তু সৌদামিনীকে কেউ একটা উচ্চবাচ্য করতে সাহস পেল না। তামাশা দেখতে দু-চার জন মুসলমান পর্যন্ত জুটেছিল। এখন ব্যাপার আরও গন্ডগোলে গড়াতে পারে, তাই ধর্মপুত্ররা যে যার মানে মানে বাড়ি ফিরলে। বুঝল আর গোলমাল বিধেয় নয়। ব্যাপার আরও থিতুয়ে দেখা যাবে।

মনোরঞ্জন অন্তত তাই-ই ভেবেছিল। তাই ভেগেছিল।

সেই রাতে হরিদাস বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল।

সৌদামিনী ব্রাদার জনকে ডাকিয়ে আনলে এক হুঁপা অপেক্ষার পর। সে খ্রিষ্টান হবে। ব্রাদার জন প্রথমে বারণ করলে, উপদেশ দিলে, ধর্ম ত্যাগ ভালো নয়। শোনা কথা বলছি। ধরে নাও তা হতেও পারে। নৌকা ঠেলে দিয়ে বিয়াইকে ‘আজ থাকলে হতো’ বলার মতো।

সৌদামিনী খ্রিষ্টান হয়ে গেল। তিন চার দিনের মধ্যে তার সমস্ত সম্পত্তি মিশনের নামে লিখেপড়ে দিলে পর্যন্ত। নিজে উঠে গেল মিশনের বাড়িতে। ব্রাদার জন সম্পত্তি দেখার জন্যে নতুন লোক নিয়োগ করলে। সৌদামিনী এক মাসের মধ্যে পাগল হয়ে গেল। বদলি হওয়ার আগে এক সিস্টারের মুখে শুনেছিলাম, সৌদামিনী কাঁদত আর চিৎকার দিত :

...আমাকে ছেড়ে পালিয়ে গেলে- হে যিশু, ও হরি, হে আল্লা, আমার যবন হরিদাসকে ফিরিয়ে দে- ফিরিয়ে দে- ফিরিয়ে দে-

আজই জানতে পারলাম, এতদিনে হতভাগিনীর হাড় জুড়িয়েছে।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অবরে-সবরে- সময়ে-অসময়ে। **আদাওতি-** শক্রতা, বিদ্বেষ। **কামিন-** স্ত্রী-মজুর, মজুরনি। **কায়েত-** কায়স্থ। **কোটাল-** অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় সমুদ্র বা নদীতে জলক্ষীতি, ভরা জোয়ার। এখানে সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত। **খাঁই-** কামনা-বাসনা। **ডোনার-** দাতা। **তাপহর-** উত্তাপ দূর করে এমন। **ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির-** মহাভারতের চরিত্র, অত্যন্ত সত্যবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। পঞ্চপাণ্ডবের প্রথম পাণ্ডব। ধর্মদেবতার ঔরসে কুন্তির গর্ভজাত সন্তান। এই গল্পেব্যঙ্গার্থে সত্যবাদিতার ভানকারী, অতিশয় মিথ্যাবাদী বা রটনাকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। **ফতে-** জয়। **বারোয়ারি রাহা খরচে-** সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলে সংগৃহীত পথ খরচে। **ব্যাপটিস্ট মিশন-** খ্রিষ্টধর্ম সম্প্রদায়ের প্রচার ও দীক্ষা কেন্দ্র। **মুখজবানি-** মুখের ভাষায়। **মজকুর-** পূর্ববর্ণিত। **মালুম-** অনুভূত, বোধগম্য। **মাহিম্য-** কৈবর্ত জাতি। **রোয়াব-** সন্ধ্যা। **জাঙ্গা-** জোর করে ক্ষমতা দখলকারী সামরিক চক্র, এখানে আক্রমণকারী। **সার্কেল অফিসার-** এক ধরনের সরকারি কর্মকর্তা, কার্যক্রম পরিমণ্ডলের কর্মকর্তা। **রবদব-** জাঁকজমক। **স্ট্র্যাটেজি-** লক্ষ্য ও সাফল্য অর্জনের কৌশল বা নীতি।



সারসংক্ষেপ

সৌদামিনীর স্বামী জগদীশ মালো পেশায় আরদালি ছিল। সে অফিসারকে খুশি করে পনের-বিশ বছরের চাকরিতে ভালো অবস্থা করেছে। সৌদামিনীর ছেলেপুলে না থাকায় জগদীশ মালো আর একটা বিয়ে করার চিন্তা করে। কিন্তু জগদীশ বর সাজার আগে কেন মারা গেল তা অজানা রয়ে গেল। এ সুযোগে মনোরঞ্জন মালো সুন্দরী সৌদামিনীর সম্পত্তি দখলের চেষ্টা শুরু করে। সৌদামিনী উত্তরাধিকারসূত্রে ধানি জমি, বসতবাড়ি, পুকুর, ফলের বাগানসহ কয়েক একর সম্পত্তির মালিক হয়। সৌদামিনীর সাহস ও লোকপ্রীতির কারণে জ্ঞাতি দেবর মনোরঞ্জন সৌদামিনীর কিছুই করতে পারেনি। সন্তানহীন প্রৌঢ়া সৌদামিনী মাতৃহৃদয়ের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করার জন্য দূরদেশ থেকে আনা একটি শিশুকে সন্তানের মতো পালন করতে থাকে। মনোরঞ্জন তখন নমশূদ্র ঘরে ব্রাহ্মণ সন্তান পালিত হচ্ছে বলে অপবাদ দিয়ে বর্ণবিভক্ত হিন্দু সমাজে ধর্মানুভূতির ধূয়া তুলে সৌদামিনীকে সমাজচ্যুত করার উদ্যোগ নেয়। সমাজের চাপে সৌদামিনী তার পালিত পুত্র যে মুসলমানের ঔরসজাত- এ সত্য প্রকাশ করে। এদিকে সৌদামিনীর পালিত সন্তান হরিদাস নিজের পরিচয় জানতে পেরে নিরুদ্দেশ হয়, আর এই শোকে সৌদামিনীর মানসিক বিকৃতি ঘটে। ব্রাদার জনের প্ররোচনায় স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হতে বাধ্য হয়। মানুষের লোভ ও ধর্মান্ধতার কাছে মাতৃহৃদয় চূর্ণ হলেও মানবতার জয়গান ধ্বনিত হয়। মাতৃত্বের কাছে ধর্ম ও অর্থের পরাজয় ঘটে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. জগদীশ মালোর পেশা কী ছিল?

ক. আরদালি	খ. পাদ্রি-সহকারী
গ. নিলাম ডাককারী	ঘ. স্বদেশি নেতা

৬. 'সৌদামিনী মালো' গল্পে 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির' বলতে বোঝানো হয়েছে—

ক. সত্যবাদিতার ভানকারী	খ. দাতা
গ. নারী শ্রমিক	ঘ. কৈবর্ত জাতি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ভারতবাসী। তাই দেশব্যাপী শুরু হয়েছে স্বদেশী আন্দোলন। এই স্বদেশীদের অনেকেই ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দেশের জন্য প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন।

৭. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'সৌদামিনী মালো' গল্পে কোন চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়?

ক. মনোরঞ্জন মালো	খ. জগদীশ মালো
গ. সৌদামিনী মালো	ঘ. ব্রাদার জন

৮. উদ্দীপকের সঙ্গে 'সৌদামিনী মালো' গল্পে স্বদেশী বাবুর চেতনা—

- সমধর্মী
- বিপরীতধর্মী
- প্রায় সমধর্মী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. i ও iii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. 'মুখজবানি' শব্দের অর্থ কী?

ক. মুখের ভাষা	খ. গুঞ্জন
গ. ভরা জোয়ার	ঘ. বিদ্রোহ

১০. হরিদাস বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল কেন?

ক. সমাজের চাপে	খ. সৌদামিনীর অনাগ্রহে
গ. আত্মসম্মানের কারণে	ঘ. মনোরঞ্জনের কূটিলতায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

গত শুক্রবার ওয়াজ মহফিলে বয়ান করা নিয়ে বড় হুজুরের সঙ্গে কথাকাটাকাটি হয় কয়েকজন মুসল্লির। রাতে দেখা গেল বড় হুজুরের দহলিজখানাটি ভাঙা সমাপ্ত হয়েছে।

১১. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু কোন বাক্যটিতে প্রতিফলিত হয়েছে?

ক. একদিন সৌদামিনীর বাড়ি হামলা করে বসল	খ. ক্ষিপ্ত জাতীর সামনে সে এবার বোমা ফাটল
গ. তার ছাগল মাঠ থেকে আর ফিরল না	ঘ. তাই ধর্মপুত্ররা যে যার মানে মানে বাড়ি ফিরলে

১২. উদ্দীপক ও 'সৌদামিনী মালো' গল্পে প্রকাশিত হয়েছে—

- ধর্মীয় বিরোধ
- ধর্মের উদারতা
- ধর্মীয় গোঁড়ামি



নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পটি উদার মানবিক সম্পর্কের। এ গল্পে লেখক দুটি ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও আর্থিক অবস্থানে বেড়ে ওঠা চরিত্রের মধ্যে সংকীর্ণতা ও সংস্কারমুক্ত মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। গল্পটিতে দেখা যায়, মানুষের মধ্যে স্নেহ-মমতা-প্রীতির যে বন্ধন তা ধনসম্পদে নয় গড়ে ওঠে নিবিড় অপত্য স্নেহ, উদার হৃদয়ের আন্তরিকতা ও মানবীয় দৃষ্টির ফলে। আমাদের সামাজিক জীবনধারা যে অনেকটা সংকীর্ণতামুক্ত এ সত্যটিও গল্পে ফুটে উঠেছে।

ক. সার্মান কী?

খ. ‘মনোরঞ্জন এই ঢিলে পাখিকে কাত করে ছাড়লে।’ কীভাবে? –বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু সৌদামিনী মালো চরিত্রের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপক এবং ‘সৌদামিনী মালো’ গল্পে মানবতার জয়গান গাওয়া হয়েছে।” –মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :

জাতের নামে বজ্জাতি সব
জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া,
ছুঁলেই তোদের জাত যাবে
জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া।

ক. সৌদামিনী মালো কোন এলাকার অধিবাসী?

খ. ‘মজা দেখে আর কাজ নেই’ –কেন?

গ. উদ্দীপকটি ‘সৌদামিনী মালো’ গল্পের কোন বিষয়কে ইঙ্গিত করে? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘সৌদামিনী মালো’ গল্পের চেতনা একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।” –মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

সার্মান হচ্ছে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের গির্জার বেদি থেকে প্রদত্ত ধর্মীয় বা নৈতিক অভিভাষণ।

খ.

‘সৌদামিনী মালো’ গল্পে ‘ঢিল’ বলতে ধর্মকে বোঝানো হয়েছে।

সৌদামিনী মালো স্বামীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে অনেক সম্পত্তির মালিক হয়। এই সম্পত্তি তার জ্ঞাতি দেবর মনোরঞ্জন ছলে-বলে-কৌশলে নিজের হস্তগত করার চেষ্টা করলেও দৃঢ়চিত্ত সৌদামিনীর সাহস ও লোকপ্রীতির কারণে কখনো তা পেরে ওঠেনি। তাই সে অন্য কৌশল অবলম্বন করে। সে সৌদামিনীর পালিতপুত্রকে ব্রাহ্মণের সন্তান বলে প্রচার করে। এতে বর্ণবিভক্ত হিন্দু সমাজের ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে। হিন্দু সমাজ তাকে সমাজচ্যুত করার উদ্যোগ নেয়। সমাজপতিদের চাপে পড়ে সৌদামিনী তার পালিত সন্তান যে মুসলমান ধর্মজাত এ তথ্য প্রকাশ করে। পরিণতিতে সৌদামিনী স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হতে বাধ্য হয়। আলোচ্য গল্পে ‘ঢিলে পাখিকে কাত করা’ বলতে এটিকেই বোঝানো হয়েছে।

গ.

উদ্দীপকে ‘সৌদামিনী মালো’ চরিত্রে অপত্য স্নেহের দিকটি ফুটে উঠেছে।

মাতৃহৃদয় নিবিড় স্নেহের অন্যতম উৎস। এটি ধর্ম-বর্ণ মানে না। মাতৃহৃদয়ের বাঁধন স্নেহ-মমতা-প্রীতির। এটি হৃদয়ের নিবিড় আন্তরিকতার স্পর্শে গড়ে ওঠে। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা একেবারে অকৃত্রিম। কোনো প্রকার ব্যক্তিস্বার্থ এখানে সম্পৃক্ত নয়।



‘সৌদামিনী মালো’ গল্পে সৌদামিনীর মাতৃহৃদয়ের কথা বলা হয়েছে। সন্তানের জন্য তার মাতৃহৃদয়ে হাহাকার শোনা যায়। সৌদামিনীর মাতৃত্বের কাছে ধর্ম কিংবা অর্থ স্থান পায় নি। তার পালকপুত্র হরিদাস যখন সন্তান হলেও সে পরম মমতায় হরিদাসকে লালন-পালন করেছে। উদ্দীপকেও এ ভাবটি পরিলক্ষিত হয়। উদ্দীপকে উদার মানবিক সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে নিবিড় অপত্য স্নেহ ও শ্বশতান্তরিকতার কথা। মূলত অপত্য স্নেহের দিক থেকে ‘সৌদামিনী মালো’ চরিত্রটি উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ.

‘উদ্দীপক এবং ‘সৌদামিনী মালো’ গল্পে মানবতার জয়গান গাওয়া হয়েছে’ –মন্তব্যটি যথার্থ।

সভ্যতার ইতিহাসে মানবিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। কেননা মানবিকতার নিকট পৃথিবীর সকল কিছু হার মেনে যায়। পার্থিব সকল প্রতিকূলতা ধুয়ে-মুছে যায় এই মহাশক্তির কাছে। ধর্ম-জাতি-বর্ণ সকল কিছু এখানে একাকার হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকে মানবতার জয়গান গাওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে নিবিড় স্নেহ, উদার হৃদয়ের আন্তরিকতা আর মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির কথা। মানুষের স্নেহ ও মমতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যা পাওয়া যায় তা ধন-সম্পদের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে ‘সৌদামিনী মালো’ গল্পে দেখা যায়, সৌদামিনীর মাতৃহৃদয় অকৃত্রিম ও অশ্লান। যদিও তা মানুষের লোভ ও ধর্মান্ধতার যুপকাঠে বলিপ্রাপ্ত হয়েছে। তার অনন্ত হাহাকারের মধ্যেও ধ্বনিত হয়েছে মানবতার জয়গান। সৌদামিনীর মাতৃত্বের কাছে ধর্ম, অর্থ সকল কিছুর পরাভব ঘটেছে।

উদ্দীপকে উদার মানবতার কথা বলা হয়েছে। মানব হৃদয়ের নিবিড় আন্তরিকতার মাধ্যমে মানবতার বন্ধন পোক্ত হয়। ধনী-দরিদ্র, ধর্ম-জাতি সবকিছুর ব্যবধান ঘুচে যায় উদার হৃদয়ের আন্তরিকতা ও মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির ফলে। ‘সৌদামিনী মালো’ গল্পেও লেখক দুটি ভিন্ন ধর্ম ও আর্থিক অবস্থানে থাকা চরিত্রের মধ্যে সংকীর্ণতা ও সংস্কারমুক্ত মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সবশেষে বলা যায়, ‘উদ্দীপক এবং ‘সৌদামিনী মালো’ গল্পে মানবতার জয়গান গাওয়া হয়েছে’ মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

কাঙালির মা ছোটজাত, দুলের মেয়ে বলিয়া কাছে যাইতে সাহস পাইল না, তফাতে একটা উঁচু চিপির মধ্যে দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্তোষ্টিক্রিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত ও পর্যাণ্ড চিতার পরে যখন শব স্থাপিত করা হইল তখন তাহার রাঙ্গা পা-দুখানি দেখিয়া তাহার দু’চক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া একবিন্দু আলতা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়। বহুকণ্ঠের হরিধ্বনির সহিত পুত্রহন্তের মন্ত্রপুত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল তখন তাহার চোখ দিয়া বারবার করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিল, ভাগ্যি মানী মা, তুমি সগে যাচ্চো-আমাকেও আশীর্বাদ করে যাও, আমিও যেন এমনি কাঙালির হাতের আগুনটুকু পাই। ছেলের হাতের আগুন ! সে ত সোজা কথা নয়।

ক. কেরোসিন ব্ল্যাক মার্কেটের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল কে?

খ. সৌদামিনী মালো কীভাবে বোমা ফাটিয়েছিল?

গ. উদ্দীপকের কাঙালির মা’র সঙ্গে সৌদামিনী চরিত্রের অমিলগুলো তুলে ধরুন।

ঘ. “উদ্দীপকটি ‘সৌদামিনী মালো’ গল্পের চেতনাকে ধারণ করেনি।” –যুক্তিসহ আপনার মতামত উপস্থাপন করুন।



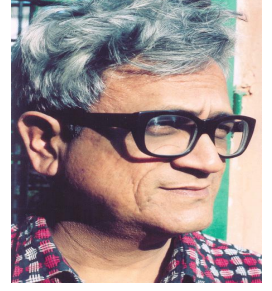
উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. খ ৩. ক ৪. ঘ ৫. ক ৬. ক ৭. ক ৮. খ ৯. ক ১০. গ ১১. ক ১২. গ



রেইনকোট

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস



লেখক-পরিচিতি

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গাইবান্ধা জেলার গোটিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস বগুড়া শহরের নিকটে নারুলি গ্রামে। তাঁর পিতা বদিউজ্জামান মুহম্মদ ইলিয়াস ছিলেন পূর্ববঙ্গ পরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য, মাতার নাম মরিয়ম ইলিয়াস। তাঁর পিতৃদত্ত নাম আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস। তিনি বগুড়া জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ঢাকা কলেজ থেকে আইএ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক সন্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি সরকারি কলেজে বাংলা বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি সমাজ, ঐতিহ্য ও ইতিহাস সচেতন একজন শক্তিমান লেখক। তিনি জীবন ও জগৎকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে পর্যবেক্ষণ করেছেন। অনাহার, অভাব, দারিদ্র্য ও শোষণের শিকার হয়ে যারা মানবেতর জীবন-যাপন করছে সে-সব অবহেলিত মানুষের জীবনাচরণ তাঁর গল্প ও উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে উঠে এসেছে। তিনি লেখার সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর জোর না দিয়ে জোর দিয়েছেন লেখার গুণগত মানের ওপর। এদেশের প্রগতিশীল শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক সমর্থন ছিল। তাঁর পাঁচটি গল্পগ্রন্থে মোট গল্পের সংখ্যা ২৮টি। তিনি ক্যাসারে আক্রান্ত হয়ে ১৯৯৭ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্যকর্ম :

উপন্যাস : চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭), খোয়াবনামা (১৯৯৬);

গল্পগ্রন্থ : অন্যঘরে অন্যস্বর (১৯৭৬), খোঁয়ারি (১৯৮২), দুখেভাবে উৎপাত (১৯৮৫), দোজখের ওম (১৯৮৯), জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল (১৯৯৭);

প্রবন্ধগ্রন্থ : সংস্কৃতির ভাঙাসেতু (১৯৯৮)।

ভূমিকা

‘রেইনকোট’ (১৯৯৫) গল্পটি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল (১৯৯৭) গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। এ গল্পের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে ‘আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র-১’ থেকে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ সময় ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণের পরিস্থিতি নিয়ে গল্পটি রচিত হয়েছে। গল্পে রেইনকোটের প্রতীকী তাৎপর্য অসাধারণ। রেইনকোটের মাধ্যমে সাধারণ ভীরা মানুষের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধার সাহস, উষ্ণতা ও দেশপ্রেম কীভাবে সঞ্চারিত হয়েছে তা লেখক সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।



সাধারণ উদ্দেশ্য

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘রেইনকোট’ গল্পটি পড়ার পর আপনি—

- ✚ মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা তৎপরতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ✚ মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাচার সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- ✚ একজন মুক্তিযোদ্ধার রেইনকোট কীভাবে এক ভীরা প্রকৃতির মানুষকে সাহসী ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

পাঠ-১



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাক-বাহিনীর বর্বরতার চিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীরা কীভাবে পাকবাহিনীকে সহায়তা করেছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

ভোররাত থেকে বৃষ্টি। আহা! বৃষ্টির ঝামঝাম বোল। এই বৃষ্টির মেয়াদ আল্লা দিলে পুরো তিন দিন। কারণ শনিতে সাত মঙ্গলে তিন, আর সব দিন দিন। এটা জেনারেল স্টেটমেন্ট। স্পেসিফিক ক্যাসিফিকেশনও আছে। যেমন, মঙ্গলে ভোররাতে হইল শুরু, তিন দিন মেঘের গুরুগুরু। তারপর, বুধের সকালে নামল জল, বিকালে মেঘ কয় এবার চল। বৃহস্পতি শুক্র কিছু বাদ নাই। কিন্তু এখন ভুলে গেছে। যেটুকু মনে আছে, পুরু বেড-কভারের নিচে গুটিসুটি মেয়ে শুয়ে আর-একপশলা ঘুমিয়ে নেওয়ার জন্যে তাই যথেষ্ট। অন্তত তিন দিন ফুটফুট বন্ধ। বাদলায় বন্দুক-বারুদ কি একটু জিরিয়ে নেবে না? এই কটা দিন নিশ্চিন্তে আরাম করো।

তা আর হলো কই? ম্যান প্রোপোজেন্স-। এমন চমৎকার বাদলার সকালে দরজায় প্রবল কড়া নাড়া শেষ হেমন্তের শীত শীত পর্দা ছিঁড়ে ফালাফালা করে ফেলল। সব ভেঙে দিল। মিলিটারি! মিলিটারি আজ তার ঘরে। আল্লা গো। আল্লাহুমা আন্তা সুবহানকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জোয়ালেমিন। -পড়তে পড়তে সে দরজার দিকে এগোয়। এই কয়েক মাসে কত সুরাই সে মুখস্থ করেছে। রাস্তায় বেরলে পাঁচ কালেমা সব সময় রেডি রাখে ঠোঁটের ওপর। কোনদিক থেকে কখন মিলিটারি ধরে। -তবু একটা না একটা ভুল হয়েই যায়। দোয়া মনে হলো ঠিকই কিন্তু টুপিটা মাথায় দিতে ভুলে গেল।

দুটো ছিটকিনি, একটা খিল এবং কাঠের ডাশা খুলে দরজার কপাট ফাঁক করতেই বাতাস আর বৃষ্টির ঝাপটার সঙ্গে ঘরে ঢোকে প্রিন্সিপ্যালের পিওন। আলহামদুলিল্লাহ! মিলিটারি নয়। পিওনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু লোকটার চিনচিনে গলা গম্ভীর স্বরে হাঁকে, “স্যার নে সালাম দিয়া।” বলেই ভাঙাচোরা গালের খোঁচাখোঁচা দাড়িতে লোকটা নিজের বাক্যের কোমল শাঁসটুকু শুষে নেয় এবং হুকুম ছাড়ে, “তলব কিয়া। আভি যানে হোগা।”

কী ব্যাপার?

বেশি কথা বলার সময় নাই- কলেজের দেওয়াল ঘেঁষে কারা বোমা ফাটিয়ে গেছে গত রাতে।

মানে?

“মিসকিরিয়ান লোগ ইলেকট্রিক টেরানসফার্মার তোড় দিয়া। অণ্ডর অয়াপস যানেকা টাইম পিরিনসিপাল সাহাবকা কোঠিমে গেরেনড ফেকা। গেট তোড় গিয়া।”

ভয়াবহ কাণ্ড। ইলেকট্রিক ট্রান্সফার্মার তো কলেজের সামনের দেওয়াল ঘেঁষে। দেওয়ালের পর বাগান, টেনিস লন। তারপর কলেজ দালান। মস্ত দালান পার হয়ে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার মাঠ। মাঠ পেরিয়ে একটু বাঁ দিকে প্রিন্সিপ্যালের কোয়ার্টার। এর সঙ্গে মিলিটারি ক্যাম্প। কলেজের জিমন্যাসিয়ামে এখন মিলিটারি ক্যাম্প। প্রিন্সিপ্যালের বাড়ির গেটে বোমা ফেলা মানে মিলিটারি ক্যাম্প অ্যাটাক করা। সামনের দেওয়ালে বোমা মেরে এতটা পথ ক্রস করে গেল কী করে? সে জানতে চায়, “ক্যাসেসে?”

প্রিন্সিপ্যালের পিওন জানবে কী করে? “উও আপ হি কহ সক্তা।”

মানে? সে-ই বা বলবে কী করে? পিওন কি তাকে মিসক্রিয়ান্টদের লোক ভাবে নাকি? -তার মাথাটা আপনাআপনি নিচু হলে মুখ দিয়ে পানির মতো গড়িয়ে পড়ে, “ইসহাক মিয়া, বৈঠিয়ে চা টা খাইয়ে। আমার এই পাঁচ সাত মিনিট লাগেগা।”



‘নেহি।’ নাশতার আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিয়ে ইসহাক বলে, “আব্দুস সাত্তার মিরধাকা ঘর যানে হোগা। আপ আভি আইয়ে। এক কর্নেল সাহাব পঁওছ গিয়া। সব পরফসরকো এন্তেলা দিয়া। ফওরন আইয়ে।”

কর্নেলের নেতৃত্বে মিলিটারির হাতে কলেজটা এবং তাকেও ন্যস্ত করে ইসহাক বেরিয়ে যায়, রাস্তায় ঘড়ঘড় করতে থাকা বেবি ট্যাকসির গর্জন তুলে সে রওয়ানা হলো জিওগ্রাফির প্রফেসরের বাড়ির দিকে। ইসহাক নিজেই এখন মিলিটারির কর্নেল বললেও চলে। তবে ভোরবেলা কলেজের ভেতরে কর্নেল খোদ চলে আসায় সে হয়ত ডেমোটেড হয়েছে লেফটেন্যান্ট কর্নেলে। আরও নিচেও নামাতে পারে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের এদিকে তাকে ঠেলা মুশকিল। মিলিটারি প্রাদুর্ভাবের পর থেকে তাকে দেখে কলেজের সবাই তটস্থ। এপ্রিলের শুরু থেকে সে বাংলা বলা ছেড়েছে। কোনকালে দাদা না পরদাদার ভায়রার মামু না কে যেন দিল্লিওয়ালা কোন সাহেবের খাস খানসামা ছিল, সেই সুবাদে দিনরাত এখন উর্দু বলে।

“যেতেই হবে? অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজে তোমার হাঁপানির টানটা আবার—।” বৌয়ের এসব সোয়াগের কথা শুনলে কি তার চলবে? বৌ কি প্রিন্সিপ্যালের ধমকের ভাগ নেবে? এর ওপর কলেজে কর্নেল এসেছে। কপালে আজ কী আছে আল্লাই জানে! ফায়ারিং স্কোয়াডে যদি দাঁড় করিয়েই দেয় তো কর্নেল সাহেবের হাতে পায়ে ধরে ঠিক কপালে গুলি করার হুকুম জারি করানো যায় না? প্রিন্সিপ্যাল কি তার জন্যে কর্নেলের কাছে এই তদবিরটুকু করবে না? পাকিস্তানের জন্যে প্রিন্সিপ্যাল দিনরাত দোয়া-দরুদ পড়ছে। সময় নাই অসময় নাই আল্লার দরবারে কান্নাকাটি করে এবং সময় করে কলিগদের গালাগালিও করে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি প্রিন্সিপ্যাল মিলিটারির বড়ো কর্তাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করেছিল, পাকিস্তান যদি বাঁচাতে হয় তো সব স্কুলকলেজ থেকে শহিদ মিনার হটাও। এগুলো হলো পাকিস্তানের শরীরের কাঁটা। পাকিস্তানের পাক সাফ শরীরটাকে নীরোগ করতে হলে এসব কাঁটা ওপড়াতে হবে। তা মিলিটারি ডক্টর আফাজ আহমদের পরামর্শ শুনেছে, গ্রামে-গঞ্জে যেখানেই গেছে প্রথমেই কামান তাক করছে শহিদ মিনারের দিকে। দেশের একটা কলেজে শহিদ মিনার আর অক্ষত নাই। তা প্রিন্সিপ্যাল তাদের এত বড়ো একটা পরামর্শ দিল, আর সামান্য এক লেকচারারকে গুলি করার সময় শরীরের আলতুফালতু জায়গা বাদ দিয়ে কপালটা টার্গেট করার অনুরোধটা তার মানবে না? আবার প্রিন্সিপ্যালকে সে এত সার্ভিস দিচ্ছে, তার কলিগের, তওবা, সাব-অর্ডিনেটের জন্যে এতটুকু করবে না?

প্যান্টের ভেতর পা গলিয়ে দিতে দিতে সে শোনে রান্নাঘর থেকে বৌ বলছে, “তাড়াতাড়ি চলে এসো। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে মিরপুর ব্রিজের দিক থেকে গুলির আওয়াজ আসছিল। কখন কী হয়।”

এসব কথা এখন বলার দরকারটা কী? —রেডিও টেলিভিশনে হরদম বলছে, সিচুয়েশন নর্ম্যাল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক। দুশমনকে সম্পূর্ণ কব্জা করা গেছে। মিসক্রিয়েন্টরা সব খতম। প্রেসিডেন্ট দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। কিছুদিন বাদে বাদে তার ভাষণ শোনা যায়, আওয়ার আলটিমেট এইম রিমেইনস দ্য সেম, দ্যাট ইজ টু হ্যাণ্ডভার পাওয়ার টু দি ইলেকটেড রিপ্রেজেন্টেটিভস অব দ্য পিপল। সবই তো নর্ম্যাল হয়ে আসছে। বাঙালি, আই মিন, ইস্ট পাকিস্তানি গভর্নর, মন্ত্রীরা ইস্ট পাকিস্তানি। সবই তো স্বাভাবিক। এখন বৌ তার এসব বাজে কথা বলে কেন? ইস! আসমাকে নিয়ে পারা যায় না।

“এই বৃষ্টিতে শুধু ছাতায় কুলাবে না গো।” বৌয়ের আরেক দফা সোয়াগ শোনা গেল, “তুমি বরং মিন্টুর রেইনকোটটা নিয়ে যাও।”

ইস! আবার মিন্টু। বৌয়ের এই ভাইটার জন্যেই তাকে এক্সট্রা তটস্থ হয়ে থাকতে হয়। বাড়ি থেকে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার মগবাজারের দুই কামরার ফ্ল্যাট থেকেই তো মিন্টু চলে গেল জুন মাসে, জুনের ২৩ তারিখে। জুলাইয়ের পয়লা তারিখে সে বাড়ি শিফট করল। বলা যায় না, ওখানে যদি কেউ কিছু আঁচ করে থাকে। ও চলে যাবার তিনদিন পরেই পাশের ফ্ল্যাটের গোলগাল মুখের মহিলা তার বৌকে জিগেস করছিল, “ভাবি, আপনার ভাইকে দেখছি না।” ব্যস, এই শুনেই সে বাড়ি বদলাবার জন্যে লেগে গেল হন্যে হয়ে। মিলিটারি লাগার পর থেকে এই নিয়ে চারবার বাড়ি পাল্টানো হলো। এখানে আসার পর নিচের তলার ভদ্রলোক একদিন বলছিল, “আমার ভাইটাকে আর ঢাকায় রাখলাম না। যে গোলমাল, বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম।” শুনে বুকটা তার টিপটিপ করছিল, এবার যদি তার শালার প্রসঙ্গ তোলে? নিরাপত্তার জন্যেই সে এখানে এসেছে। কলেজ থেকে দূরে, আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে। শহর থেকেও দূরেই বলা যায়। ভেবেছিল নতুন এলাকা, পূর্বদিকে জানলা ধরে দাঁড়ালে চোখে পড়ে বিল আর ধানক্ষেত। তা কী বিপদ! এদিকে নাকি নৌকা করে চলে আসে স্টেনগানওয়ালা ছোকরার দল। এদিককার মানুষ চোখে খালি নৌকা দেখে, নৌকা ভরা অস্ত্র। এর ওপর বৌ যদি মিন্টুর কথা তোলে তো অস্ত্র ঢুকে পড়ে তার ঘরের মধ্যখানে। মিন্টু যে কোথায় গেছে তা সে-ও জানে তার বৌ-ও জানে। কিসিনজার সাহেব বলেছে,



এসব হলো পাকিস্তানের ইনটার্নাল অ্যাফেয়ার। -মানুষ মেরে সাফ করে দেয়, বাড়িঘর, গ্রাম, বাজারহাট জ্বালিয়ে দিচ্ছে, -কারো কোনো মাথাব্যথা নাই। এসব হলো ইনটার্নাল অ্যাফেয়ার। -না, না, এ ধরনের ভাবনা ধারে কাছে ঘেঁষতে দেওয়াও ঠিক নয়। নিচের ফ্ল্যাটে থাকে ওয়েলডিং ওয়ার্কশপের মালিক, তার শ্বশুর নিশ্চয়ই সর্দার গোছের রাজাকার। সপ্তাহে দুইদিন-তিনদিন মেয়ের বাড়িতে রেফ্রিজারেটর, টেপ রেকর্ডার, দামি দামি সোফাসেট, ফ্যান, খাট-পালং সব চালান পাঠায়।

“দেখি তো, ফিট করে কিনা।” আসমা এগিয়ে এসে তার গায়ে রেইনকোট চড়িয়ে দিতে দিতে বলে, “মিন্টু তো আমার চেয়ে অনেক লম্বা। তোমার গায়ে হবে তো?” -দেখো, ফের মিন্টুর দৈর্ঘ্যের তুলনা করে তার সঙ্গে। এই ভাইকে নিয়ে এরকম বাড়াবাড়ি করাটা কি আসমার ঠিক হচ্ছে?

“ভালোই হলো। তোমার গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে। পায়েও বৃষ্টি লাগবে না।” এখানেই আসমার শেষ নয়। রেইনকোটের সঙ্গেকার টুপি এনে চড়িয়ে দেয় তার মাথায়।

“আব্বু ছোটোমামা হয়েছে। আব্বু ছোটোমামা হয়েছে।” আড়াই বছরের মেয়ের সদ্য-ঘুম-ভাঙা গলায় ভাঙা ভাঙা বুলি শুনে সে চমকে ওঠে, মিন্টু কি ঢুকে পড়লো অস্ত্রশস্ত্র হাতে? এর মানে পিছে পিছে ঢুকছে মিলিটারি। তার মানে-। না, দরজার ছিটকিনি ও খিল সব বন্ধ।

তাকে কি মিন্টুর মতো দেখাচ্ছে? মিলিটারি আবার ভুল করে বসবে না তো? এর মধ্যে তার পাঁচ বছরের ছেলেটা গম্ভীর চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করে রায় দেয়, “আব্বুকে ছোটোমামার মতো দেখাচ্ছে। আব্বু তা হলে মুজিবাহিনী। তাই না?”

এ তো ভাবনার কাথা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নতুনরূপে সে ভ্যাবাচ্যাকা খায়। না-! খামাখা ভয় পাচ্ছে। বৃষ্টির দিনে রেইনকোট গায়ে দেওয়াটা অপরাধ হবে কেন? মিলিটারির কি আর বিবেচনাবোধ নাই? প্রিন্সিপ্যাল ড. আফাজ আহমদ ঠিকই বলে, “শোনে, মিলিটারি যাদের ধরে, মিছেমিছি ধরে না। সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজের সঙ্গে তারা সামহাউ অর আদার ইন্ভলভড।” তা সে তো বাপু এসব থেকে শতহাত দূরে। শালা তার বর্ডার ক্রস করল, ফিরে এসে দেশের ভেতরে দমাদম মিলিটারি মারে। তাতে আর দুলাভাইয়ের দোষটা কোথায়? এই যে মিলিটারি প্রত্যেকদিন এই ঢাকা শহরের বাজার পোড়ায়, বস্তিতে আগুন লাগিয়ে টপাটপ মানুষ মারে, মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়, -সে কখনো এসব নিয়ে টু শব্দটি করেছে? কলেজের দেওয়াল ঘেঁষে প্রিন্সিপ্যালের কোয়ার্টারের পাশে মিলিটারি ক্যাম্প, ক্লাশট্রাশ সব বন্ধ। ছেলেরা কেউ আসে না। মাস্টারদের হাজিরা দিতে হয়, তাও বহু টিচার গা ঢাকা দিয়েছে কবে থেকে। সে তো রোজ টাইমলি যায়। স্টাফ রুমে কলিগরা ফিসফিস করে, কোথায় কোন ব্রিজ উড়ে গেল, কোথায় সাত মিলিটারির লাশ পড়েছে ছেলের গুলিতে, এই কলেজের কোন কোন ছেলে ফ্রন্টে গেছে, -কই, সে তো এসব আলাপের মধ্যে কখনো থাকে না। এসব কথা শুরু হলেই আলগোছে উঠে সে চলে যায় প্রিন্সিপ্যালের কামরায়। ড. আফাজ আহমদের খ্যাসখ্যাস গলায় হিন্দুস্তান ও মিসক্রিয়েন্টদের আশু ও অবশ্যম্ভাবী পতন সম্বন্ধে নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী শোনে। ওই ঘরে আজকাল সহজে কেউ ঘেঁষে না। উর্দুর প্রফেসর আকবর সাজিদকে প্রিন্সিপ্যাল আজকাল তোয়াজ করে।

মিন্টুর ফেলে-যাওয়া নাকি রেখে-যাওয়া রেইনকোটে ঢোকান পর থেকে তার পা শিরশির করছে, আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। প্রিন্সিপ্যাল তাকে ডেকে পাঠিয়েছে সেই কখন!



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

‘আব্দুস সাত্তার মিরখাকা ঘর যানে হোগা। আপ আভি আইয়ে। এক কর্নেল সাহাব পঁওছ গিয় সব পরফসরকো এত্তলা দিয়া। ফওরন আইয়ে।’- ‘আবদুস সাত্তার মৃধার বাসায় যেতে হবে। আপনি এখনই আসুন। এক কর্নেল সাহেব এর মধ্যেই চলে এসেছেন। সব প্রফেসরকে ডেকেছেন। তাড়াতাড়ি আসুন।’ ‘উও আপ হি কহ সক্তা’- ‘সেটি আপনিই বলতে পারেন।’ ‘ওয়েলডিং ওয়ার্কশপ’- ঝালাই কারখানা। ‘ক্যায়সে?’- ‘কীভাবে?’ জেনারেল স্টেটমেন্ট- সাধারণ বিবৃতি। ট্রান্সপারেন্ট- স্বচ্ছ। ‘তলব কিয়া। আভি যানা হোগা’- ‘তলব করেছেন। এখনই যেতে হবে।’ ‘মিসকিরিয়ান লোগ ইলেকটিরি টেরানসফার্মার তোড় দিয়া। অওর ওয়াপস যানে কা টাইম পিরিনসিপাল সাহাবকা কোঠিমে গেরেনড ফেকা। গেট তোড় গিয়া।’- ‘মিসক্রিয়েন্টরা ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার উড়িয়ে দিয়েছে। আবার ফিরে যাওয়ার সময় প্রিন্সিপাল সাহেবের বাড়িতে থ্রেনড ছুড়েছে। গেট ভেঙে গেছে।’ ‘মিসক্রিয়ান্ট’- দুষ্কৃতকারী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকার ও তার সেনাবাহিনী এই শব্দটি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের হয়ে প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যবহার করেছে। সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজ- রাষ্ট্র বিরোধী



কার্যক্রম। মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতাকে পাকিস্তান সরকার ও তাদের সমর্থকরা ১৯৭১ সালে এভাবে অভিহিত করত।
স্পেসিফিক ক্লাসিফিকেশন- সুনির্দিষ্ট শ্রেণিকরণ।



সারসংক্ষেপ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এ গল্পের ঘটনাবলি গল্পের কথক নুরুল হুদার জবানিতে বিবৃত হয়েছে। পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের কারণে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ বাঁচার জন্য অনেক কৌশল অবলম্বন করতো। এ গল্পের কথকও পাকবাহিনীর হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেক সুরা মুখস্থ করেছে। রাত্তায় বের হয়ে পাঁচ কালেমা সবসময় প্রস্তুত রাখে ঠোঁটের ওপর। কলেজের পিওন ইসহাকসহ অনেক প্রফেসর পর্যন্ত উর্দু ভাষা শিখেছে। নুরুল হুদা পাকিস্তানি আর্মির ভয়ে দরজার কড়া নাড়া শুনেই দোয়া ইউনুস পড়তে শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ইসহাকের মতো তোষামোদী চরিত্রের মানুষগুলো পাক বাহিনীকে সহযোগিতা করে। ইসহাক কলেজের প্রিন্সিপালের আজ্ঞাবহ হিসেবে কাজ করে এবং বাংলা ছেড়ে উর্দুতে কথা বলে। সে কাউকে পরোয়া করে না, নুরুল হুদার ওপরও ছড়ি ঘোঁরায়ে। ইসহাকের মতো আকবর সাজিদ, প্রিন্সিপাল গং পাকবাহিনীকে গ্রামে ডেকে এনে লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও মানুষ হত্যা করে। এমনকি, পাকবাহিনীর কাছে ভালো হওয়ার জন্য সুন্দরী মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে ক্যাম্পে পৌঁছে দেয়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘রেইনকোট’ গল্পে বৃষ্টি কখন থেকে শুরু হয়েছে?

ক. সকাল

খ. ভোর

গ. বিকাল

ঘ. সন্ধ্যা

২. ‘মিসকিরিয়ান লোগ’ বলতে বোঝানো হয়েছে—

ক. মুক্তিযোদ্ধাদের

খ. বাংলাভাষীদের

গ. মিলিটারিদের

ঘ. উর্দুভাষীদের

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ছোট শিশু মেনন। বয়স কতইবা, তিন অথবা চার। একা একা বাইরে বের হতে পারে না। সে ঘরের জানালার শিক ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে স্লোগান দেয়— ‘ইয়াহিয়ার গোষ্ঠী কিল্লাই, রাজাকারের গোষ্ঠী কিল্লাই, পাকিস্তানির গোষ্ঠী কিল্লাই।’ শত্রুপক্ষের ভয়ে মা মেননকে জানালা থেকে সরিয়ে আনেন।

৩. উদ্দীপকের মেনন ‘রেইনকোট’ গল্পে কার কথা মনে করিয়ে দেয়?

ক. মিন্টু

খ. কর্নেল

খ. আকবর সাজিদ

ঘ. ড. আফাজ আহমদ

৪. উদ্দীপক ও ‘রেইনকোট’ গল্পে ফুটে উঠেছে—

i. দেশদ্রোহিতা

ii. দেশপ্রেম

iii. বিশ্বাসঘাতকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. ii ও iii

পাঠ-২



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পাক-বাহিনীর অত্যাচারের বিবরণসহ মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথা লিখতে পারবেন।
- পাক-বাহিনীর ক্যাম্পে কীভাবে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সমর্থকদের অত্যাচার করা হতো, সে-সব চিত্র সংক্ষেপে প্রকাশ করতে পারবেন।



মূলপাঠ

রাস্তায় একটা রিকশা নাই। তা রিকশার পরোয়াও সে এখন করছে না। রেইনকোটের ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে বাসস্ট্যান্ড যেতে তার কোনো অসুবিধে হবে না। রেইনকোটের ওপর বৃষ্টি পড়ছে অবিরাম। কী মজা, তার গায়ে লাগে না একটি ফোঁটা। টুপির বারান্দা বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়লে কয়েক ফোঁটা সে চেটে দেখে। ঠিক পানসে স্বাদ নয়, টুপির তেজ কি পানিতেও লাগল নাকি? তাকে কি মিলিটারির মতো দেখাচ্ছে? পাঞ্জাব আর্টিলারি, না বালুচ রেজিমেন্ট, না কম্যান্ডো ফোর্স, নাকি প্যারা মিলিটারি, না মিলিটারি পুলিশ, -ওদের তো একেক গুপ্তির একেক নাম, একেক সুরত। তার রেইনকোটে তাকে কি নতুন কোনো বাহিনীর লোক বলে মনে হচ্ছে? হোক। সে বেশ হনহন করে হাঁটে। শেষ-হেমন্তের বৃষ্টিতে বেশ শীত-শীত ভাব। কিন্তু রেইনকোটের ভেতরে কী সুন্দর গুম। মিন্টুটা এই রেইনকোট রেখে গিয়ে কী ভালোই যে করেছে।

বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে বাসের জন্য তাকে তাকাতে হয় উত্তরেই। মিলিটারি লরির ল্যাজটাও দেখা যাচ্ছে না। আবার তার বাসেরও তো নামগন্ধ নেই। বাসস্ট্যান্ডে জনপ্রাণী বলতে সে একেবারে একলা। রাস্তার পাশে পান-বিড়ি-সিগ্রেটের ছোট দোকানটার ঝাঁপ একটুখানি তুলে দোকানদারও তাকিয়ে রয়েছে উত্তরেই, ওদিকে কি কোনো গোলমাল হলো নাকি? দোকানদার ছেলেটা একটু বাচাল টাইপের। বাসস্ট্যান্ডে তাকে দেখলেই ছোঁড়াটা বিড়বিড় করে, কাল শোনে নাই? মিরপুরের বিল দিয়া দুই নৌকা বোঝাই কইরা আইছিল। একটা জিপ উড়াইয়া দিছে, কমপক্ষে পাঁচটা খানসেনা খতম। বিবিসি কইছে, রংপুর-দিনাজপুরের হাফের বেশি জায়গা স্বাধীন। এর মধ্যেই ছিপছিপে বৃষ্টিতে লালচে আভা তুলে এসে পড়ল লাল রঙের স্টেট বাস।

বাসে যাত্রী কম। না, না, কন্ডাক্টররা সবসময় যেমন- খালি-গাড়ি বলে চ্যাঁচায়, সেরকম নয়। সত্যি সত্যি অর্ধেকের বেশি সিট খালি। সে বাসে উঠলে তার রেইনকোটের পানি পড়তে লাগল বাসের ভিজে মাটিতে। এ জন্যে তার একটু খারাপ কথা, অন্তত টিটকারি শোনার কথা। কিন্তু তাকে কেউ কিছু বলে না।

ঠোঁটে তার একটু হাসি বিছানো থাকে। এই নীরব কিন্তু স্পষ্ট হাসির কারণ কি এই যে, তার রেইনকোটের পানিতে বাসে সয়লাব হয়ে গেলেও কেউ টু শব্দটি করছে না? তার পোশাক কি সবাইকে ঘাবড়ে দিল নাকি?

খালি রাস্তা পেয়ে বাস চলে খুব জোরে। কিন্তু তার আসনটি সে নির্বাচন করতে পারছে না। টলতে টলতে একবার এই সিট দেখে, পছন্দ হয় না বলে ফের ওই সিটের দিকে যায়। এমন সময় পেছনের দিক থেকে দুজন যাত্রী উঠে পড়ে তাড়াহুড়া করে, ‘রাখো রাখো’ বলতে বলতে ঝুঁকি নিয়ে তারা নেমে পড়ে চলন্ত বাস থেকে। সে তাদের দিকে তাকায় এবং বুঝতে পারে, এরা পালাল ঠিক তাকে দেখেই। লোক দুটো নিশ্চয়ই ক্রিমিনাল। একটা চোর, আরেকটা পকেটমার। কিংবা দুটোই চোর অথবা দুটোই পকেটমার। নামবার মুহূর্তে দুটোর মধ্যে সর্দার টাইপেরটা তার দিকে পেছন ফিরে তাকাল। সেই চোখ ভরা ভয়, কেবল ভয়।

জুত্‌সই সিট বেছে নিয়ে সে ধপাস করে বসতেই ফোমে ফস করে আওয়াজ হয় এবং তাতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় সামনের সিটে বসা তিনজন যাত্রী। হুঁ! এদেরও সে ঠিক চোর অথবা পকেটমার বলে ঠিক শনাক্ত করে ফেলে। ডাকাতও হতে পারে। কিংবা মিলিটারি কোনো বস্তিতে আগুন লাগিয়ে চলে এলে এরা ছোট্টে সেখানে লুটপাট করতে। অথবা মিলিটারি কোথাও



লুটপাট করলে এরা গিয়ে উচ্ছিষ্ট কুড়ায়। তিনটেই পরের স্টপেজে নামার জন্যে অনেক আগেই ধরফর করে উঠে দাঁড়ায় এবং বাস থামার সঙ্গে-সঙ্গে নেমে পড়ে ঝটপট পায়। তিনটে ক্রিমিনালের একটাও তার দিকে আর ফিরেও তাকায় না। তার মানে তাকে বেশ ভয় পেয়েছে বলেই তার সঙ্গে চোখাচোখি এড়াতে এদের এত কসরত।

যাক, মিন্টুর রেইনকোটে তার কাজ হচ্ছে। চোর ছাঁচোর পকেটমার সব কেটে পড়ছে। ভালো মানুষেরা থাক। সে বেশ সৎসঙ্গে চলে যাবে একেবারে কলেজ পর্যন্ত।

আসাদ গোট বাসস্টপেজে ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল বেশ কয়েকজন মানুষ। ছাতা হাতে কেউ কেউ নিজ-নিজ ছাতার নিচে এবং ছাতা ছাড়া অনেকেই অন্যের ছাতার নিচে মাথার অন্তত খানিকটা পেতে দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট থেকে আত্মরক্ষা করতে শরীরগুলোকে আঁকাবাঁকা করছিল। বাস থামলে সে দেখল, একে একে নয়জন প্যাসেঞ্জার বাসে উঠল। সে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবাইকে দেখে। তো তার দিকে তাকিয়ে নয়জনের তিনজন ‘আরে রাখো রাখো’ এবং একজন ‘রোখো-রোখো’ বলতে বলতে নেমে পড়ল ধড়ফড় করে। শেষের জন বোধ হয় এমনি অর্ডিনারি চোর, ছিঁচকে চোর হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আর প্রথম তিনটে কোথাও সুন্দরী মেয়ে মানুষ দেখলে মিলিটারিকে খবর দেয় কিংবা মিলিটারির কাছ থেকে বন্দুক নিয়ে ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’, ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ শ্লোগান দিয়ে মহল্লায়-মহল্লায় ঘোরে আর সুন্দরী মেয়েদের ধরে এনে পৌঁছে দেয় মিলিটারি ক্যাম্পে। এগুলো হলো রাজাকার। ফের নতুন করে অপরাধীমুক্ত বাসে যেতে এখন ভালো লাগছে। জানালার বাইরে বৃষ্টি আঁশ উড়ছে ঠাণ্ডা হাওয়ায় গাছপালা, লোকজন, দোকানপাট ও বাড়িঘরের ওপর ট্রান্সপারেন্ট আবরণ দেখে তার এক্সট্রা ভালো লাগে। সমস্ত ভালো-লাগাটা চিড় খায়, বাস হঠাৎ করে ব্রেক কষলো। তখন তাকে তাকাতে হয় বাঁয়ে, চোখ পড়ে নির্মীয়মাণ মসজিদের ছাদের দিকে, দরজা থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগে তার মুখে এবং নাকের ভেতর দিয়ে সেই হাওয়া ঢুকে পড়ে বুকে, সেখানে ধাক্কা লাগে; ক্রাক-ডাউনের রাত কেটে ভোর হলে মিলিটারির গুলিতে এই মসজিদের ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিল মোয়াজ্জিন সাহেব। ঠাণ্ডা হওয়ার ধাক্কা রেইনকোটের তাপে এতটাই গরম হয়ে ওঠে যে, মনে হয় ভিতরে বুঝি আগুন ধরে গেল। মসজিদের উল্টোদিকের বাড়িতে তিনতলায় থাকত তখন তারা। রাতভর ট্যাক্সের হুঙ্কার আর মেশিনগান আর স্টেনগানের ঘেউঘেউ আর মানুষের কাতরানিতে তাদের কারও ঘুম হয়নি সে রাতে। ছেলেমেয়ে নিয়ে ছেলেমেয়ের মায়ের সঙ্গে সে শুয়েছিল খাটের নিচে। ভোরবেলা মিলিটারি মানুষ মারায় একটু বিরতি দিলে ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ে এবং বন্ধ জানালার পর্দা একটু তুলে সে রাস্তা দেখতে থাকে। রাস্তার ওপরে মসজিদের ছাদে মোয়াজ্জিন সাহেব দাঁড়িয়েছিল আজান দিতে। সাধারণত জুমার নামাজটা সে নিয়মিত পড়ে। তবে সেই ভোরে তার আজান শুনতে ইচ্ছা করছিল খুব। মোয়াজ্জিনের আজান দেওয়াটা সম্পূর্ণ দেখবে বলে সে জানালার ধার থেকে সরে না। সারা এলাকায় ইলেকট্রিসিটি নষ্ট, মসজিদের মাইক্রোফোন অকেজো। মোয়াজ্জিন সাহেব গমগমে গলায় যতটা পারে জোর দিয়ে বলে উঠল ‘আল্লাহ্ আকবার’। দ্বিতীয়বার আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা করার সুযোগ তার আর মেলেনি, এর আগেই সম্পূর্ণ অন্যরকম ধ্বনি করে লোকটা পড়ে যায় রাস্তার ওপর। তো কোনো নামাজের ওয়াক্ত নেই, তবে আজান দেওয়াবে কী করে? এরা বোধ হয় যে কোনো সময়কেই নামাজের ওয়াক্ত ঘোষণা করে নতুন হুকুম জারি করেছে।

মিলিটারি এখন যাবতীয় গাড়ি থামাচ্ছে। গাড়ির প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় রাস্তার ধারে। আরেক দল মিলিটারি স্টেনগান তাক করিয়ে রেখেছে এই মানুষের সারির ওপর। অন্য একটি দল ফের ওই সব লোকের জামাকাপড় ও শরীরের গোপন জায়গাগুলো তল্লাসি করে। মিলিটারি যাদের পছন্দ করছে তাদের ঠেলে দিচ্ছে পেছনে দাঁড়ানো একটা লরির দিকে। তাদের বাসটিতে এসে উঠল লম্বা ও খুব ফর্সা এক মিলিটারি।

এখন বাসের ভিতর কোনো আওয়াজ নাই। যাত্রীদের বুকের টিপটিপ শব্দ এই নীরবতার সুযোগ বাড়ে এবং এটাই তার মাথায় বাজে দ্রাম-দ্রাম করে। বারান্দাওয়ালা টুপির নিচে শব্দের ঘষায় ঘষায় আগুন জ্বলে এবং তার হলকু বেরোয় তার চোখ দিয়ে। তবে একটু নড়ে বসলে মাথার ও বুকের ধ্বনি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং এসবকে পরোয়া না করে সে সরাসরি তাকাল মিলিটারির মুখের দিকে। মিলিটারির চোখ ছুঁচালো হয়ে আসে এবং ছুঁচালো চোখের মণি কাঁটার মতো বিঁধে যায় তার মুখে। সেও তার চোখের ভোঁতা কিন্তু গরম চাউনিটাকে স্থির করে আলগোছে বিছিয়ে দেয় মিলিটারির খাড়া নাকে, ছুঁটলো চোখে, গৌফের নিচে ও নাক, গৌফ ও চোখের আশপাশের ও নিচের লালচে চামড়ায়। এতে কাজ হলো। মিলিটারির চোখা চোখ সরে যায় তার মুখ থেকে, নেমে পড়ে তার রেইনকোটের ওপর। মনে হয় রেইনকোটের পানির ফোঁটাগুলো লোকটা গুণে গুণে দেখছে। ভেতরের তাপে এইসব পানির ফোঁটা দেখে মিলিটারির এত থ মেরে যাবার কী হলো? লোকটা কি এগুলোতে রক্তের চিহ্ন দেখে? রেইনকোটের বৃষ্টির ফোঁটা গোণাগুনতি সেরে মিলিটারি হঠাৎ বলে, ‘আগে বাটো’ বাস হঠাৎ স্টার্ট দিয়ে



কয়েক পা লাফিয়ে আগে বাড়ে এবং যাত্রীদের স্বস্তির নিঃশ্বাসের ধাক্কায় অতিরিক্ত বেগে ছুটে পার হয়ে যায় ঢাকা কলেজের গেট। নিউ মার্কেটের সামনে এসে পড়লে সে উঠে দাঁড়ায় এবং হুকুম করে, ‘রাখেন নামবো’। বাস একটু স্লো হলে তার রেইনকোটের জমানো পানি গড়িয়ে পড়তে দিয়ে অপরাধীমুক্ত বাস থেকে নামতে নামতে সহযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে সে চোঁট বাঁকায়, এতে তার সামনের সারি দাঁতও বেরিয়ে পড়ে। যারা দেখেছে তারা তার সেই ভঙ্গিটিকে ঠিক হাসি বলে শনাক্ত করতে পেরেছিল বলে তার ধারণা হয়।

প্রিন্সিপালের কামরায় প্রিন্সিপালের সিংহাসন মার্কা চেয়ারে বসে রয়েছে জাঁদরেল টাইপের এক মিলিটারি পান্ডা। তার ভারি মুখ থেকে অনুমান করা যায়, পান্ডাটি কর্নেল কিংবা মেজর জেনারেল, অথবা মেজর বা ব্রিগেডিয়ার। তাকে দেখে প্রিন্সিপালের কালো মুখ বেগুনি হয়, ড. আফাজ আহমদ এমএসসি, পিএইচডি, ই পি এস ই এস হওয়ার চেষ্টা করতে করতে স্যার বলে, ‘হি ইজ প্রফেসর হুদা।’

কিন্তু ড. আফাজ আহমদ এমএসসি, পিএইচডি নিজের ভুল সংশোধন না করে পারে না, ‘সরি হি ইজ নট এ প্রফেসর। এ লেকচারার ইন কেমিস্ট্রি।’

‘শাট আপ।’

এবার প্রিন্সিপাল থামে।

তাকে এবং আবদুস সাত্তার মৃধাকে নিয়ে মিলিটারি জিপে তোলার আগে জাঁদরেল কর্নেল না ব্রিগেডিয়ার প্রিন্সিপালকে কড়া গলায় বলে, সেনাবাহিনীকে নিয়ে মজা করে শায়েরি করা খুব বড়ো অপরাধ। এবার তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো, তবে কড়া ওয়াচে রাখা হবে। উর্দুর প্রফেসর আকবর সাজিদের দোহাই পেড়ে প্রিন্সিপালের সুবিধা হয় না। নুরুল উদ্দিন হয়, সাজিদ সাহেব যদি পালিয়ে না থাকে তো তার কপালে যে কী আছে তা জানে এক আল্লা আর জানে এই মিলিটারি।

তাদের দুজনের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, জিপ চলছিল একেবেঁকে। মস্ত উঁচু একটা ঘরে তাদের এনে ফেলা হলো। চোখ খুলে দিলে সে আবদুস সাত্তার মৃধাকে দেখতে পায় না। জায়গাটাও একেবারে অচেনা। একটা ডেক-চেয়ারে সে যে কতক্ষণ বসে থাকল তার কোনো হিসাব নেই। তার সামনে একটা চেয়ারে এসে বসল এক মিলিটারি। তাকে ইংরেজিতে নানান প্রশ্ন করে, সে জবাব দেয়। লোকটা চলে গেলে তাকে অন্য ঘরে নিয়ে ফের অন্য একটা লোক এসে তাকে প্রশ্ন করে এবং সে জবাব দেয়। প্রশ্নগুলো প্রায় একইরকম এবং তার উত্তরেরও হেরফের হয় না। যেমন, কিছুদিন আগে তাদের কলেজে কয়েকটা লোহার আলমারি কেনা হয়েছে। ওগুলো বয়ে নিয়ে এসেছিল কারা?

সে জবাব দেয়, ঠিক। অফিসের জন্যে তিনটে, বোটানি হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের জন্যে দুটো করে এবং ইংরেজির জন্যে একটা, সর্বমোট দশটি আলমারি কলেজে নিয়ে আসা হয়েছে।

এত কথা বলার দরকার নাই তার। ওই আলমারিগুলো নিয়ে আসা হয় কয়েকটা ঠেলাগাড়ি করে। ঠেলাগাড়িওয়ালাদের তো সে ভালো করেই চেনে।

নুরুল হুদা জবাব দেয়, তাদের সে চিনবে কোথেকে? তারা হলো কুলি, সে একজন লেকচারার।

তাহলে সে তাদের সঙ্গে এত কথা বলছিল কেন?

প্রিন্সিপালের আদেশে সে আলমারিগুলোর স্টিলের পাতের ঘনত্ব, দেরাজের সংখ্যা ও আকার, তালাচাবির মান, রঙের মান প্রভৃতি পরীক্ষা করে দেখছিল, তার দায়িত্ব ছিল—।

মিলিটারি শাস্ত্র গলায় তথ্য সরবরাহ করার ভঙ্গিতে বলে, মিসট্রিয়েন্টরা কলেজে ঢুকেছিল কুলির বেশে। এটা তার চেয়ে আর ভালো জানে কে? তারা আজ ধরা পড়ে নুরুল হুদার নাম বলেছে। তাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিয়মিত, সে গ্যাঙের একজন সক্রিয় সদস্য।

‘আমার নাম? সত্যি বলেছ? আমার নাম বলেছ?’ নুরুল হুদার হঠাৎ চিৎকারে মিলিটারি বিরক্ত হয় না, বরং উৎসাহ পায়। উৎসাহিত মিলিটারি ফের বলে, কুলিরা ছিল ছদ্মবেশী মিসট্রিয়েন্ট। তারা কলেজের টিচারদের মধ্যে নুরুল হুদার নামই বলেছে।

নুরুল হুদা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারা কি তাকে চেনে? কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে আলমারি সাজিয়ে রাখার সময় এক কুলি দাঁড়িয়েছিল তার গা ঘেঁষে! তখন তো ঘোরতর বর্ষাকাল, ঢাকায় এবার বৃষ্টিও হয়েছে খুব। রাতদিন এই বৃষ্টি নিয়ে সে কি যেন বলেছিল, তাতে কুলিটা বিড়বিড় করে ওঠে, ‘বর্ষাকালেই তো জুং’। কথাটা দুবার বলেছিল। এর মানে কী?



স্টাফরুমে কে একজন একদিন না দুদিন ফিসফিস করছিল, বাংলার বর্ষা তো শালারা জানে না। রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইনটার, আমাদের জেনারেল মনসুন। -ওই ছদ্মবেশী ছেলেটা কি এই কথাই বুঝিয়েছিল? তার ওপর তাদের এত আস্থা? -উৎসাহে নুরুল হুদা এদিক-ওদিক তাকায়। তার মৌনতা মিলিটারিকে আরেকটু নিশ্চিত করে।

কিছুক্ষণ পর, কতক্ষণ পর সে বুঝতে পারে না, মিলিটারি তাকে ফের একই প্রশ্ন করে জবাব না পেয়ে প্রবল বেগে দুটো ঘুষি লাগায় তার মুখে। প্রথম ঘুষিতে সে কাত হয়, দ্বিতীয় ঘুষিতে পড়ে যায় মেঝেতে। মেঝে থেকে তুলে তাকে মিলিটারি ফের জিজ্ঞেস করে, ওদের আস্তানা কোথায় সে খবর তার তো ভালোভাবেই জানা আছে। সে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ'!

ওই ঠিকানাটা বলে দিলেই তো তাকে সসম্মানে ছেড়ে দেওয়া হবে এই নিশ্চয়তা দিয়ে তাকে পাউরুটি ও দুধ খাওয়ানো হয়। তাঁকে ভাবতে সময় দিয়ে মিলিটারি চলে যায়। কিছুক্ষণ পর, কতক্ষণ সে জানে না, মিলিটারি ফিরে এসে ফের বলে, মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তো তার জানা আছে। সে ফের জবাব দেয়, 'হ্যাঁ'। কিন্তু পরের প্রশ্নের জবাব না পেয়ে মিলিটারি তাকে নিয়ে যায় অন্য একটি ঘরে। তার বেঁটেখাটো শরীরটাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো ছাদে-লাগানো একটা আংটার সঙ্গে। তার পাছায় চাবুকের বাড়ি পড়ে সপাৎ সপাৎ করে। তবে বাড়িগুলো বিরতিহীন পড়তে থাকায় কিছুক্ষণের মধ্যে সেগুলো নুরুল হুদার কাছে মনে হয় শ্রেফ উৎপাত বলে। মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি পড়ছে মিন্টুর রেইনকোটের ওপর। রেইনকোটটা এরা খুলে ফেলেছে, কোথায় রাখল কে জানে। কিন্তু তার ওম তার শরীরে এখনো লেগেই রয়েছে। বৃষ্টির মতো চাবুকের বাড়ি পড়ে তার রেইনকোটের মতো চামড়ায় আর সে অবিরাম বলেই চলে, মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তার জানা আছে। শুধু তার শালার নয়, তার ঠিকানা জানার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নাই, সে ছদ্মবেশী কুলিদের আস্তানাও চেনে। তারাও তাকে চেনে এবং তার ওপর তাদের আস্থাও কম নয়। তাদের সঙ্গে তার আঁতাতের অভিযোগ ও তাদের সঙ্গে তার আঁতাত রাখার উত্তেজনায় নুরুল হুদার ঝুলন্ত শরীর এতটাই কাঁপে যে চাবুকের বাড়ির দিকে তার আর মনোযোগ দেওয়া হয়ে ওঠে না।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

ক্রাক-ডাউনের রাত- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যা পরিচালনা করে সেই রাতের কথা বলা হয়েছে। **ছদ্মবেশী-আত্মপরিচয় গোপন করেছে এমন।** **মৌনতা-** নীরবতা।

রাশিয়ায় ছিল জেনারেল উইনটার আমাদের জেনারেল মনসুন- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ায় প্রচণ্ড শীতের কবলে পড়ে হিটলারের বাহিনী রুশ বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রবল বর্ষায় তেমনি বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়েছিল হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী। এখানে সেই বিষয়টির তুলনা করা হয়েছে।



সারসংক্ষেপ

গেরিলা আক্রমণের ঘটনা যে রাতে ঘটে তার পরদিন সকালে ছিল বৃষ্টি। তলব পেয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা শ্যালক মিন্টুর রেইনকোটটি গায়ে দিয়ে নুরুল হুদা কলেজের দিকে রওনা দেয়। রেইনকোটটি গায়ে দেয়ার পর ভিত্তি প্রকৃতির নুরুল হুদার মধ্যে ভিন্ন অনুভূতির জন্ম হয়। নুরুল হুদার মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। মুক্তিযুদ্ধের এক পর্যায়ে ঢাকায় গেরিলা আক্রমণ শুরু হয়েছে। তেমনি একটা ঘটনা এ গল্পের বিষয়। ঢাকা কলেজের সামনে গেরিলারা আক্রমণ করে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার ধ্বংস করে দেয়। আর এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাক সেনাবাহিনী কলেজের শিক্ষকদের তলব করে। তাদের মধ্যে নুরুল হুদা এবং আবদুস সাত্তার মৃধাকে গ্রেফতার করে নির্যাতন চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের খবর নিতে চেষ্টা করে। নুরুল হুদা প্রিন্সিপালের জরুরি তলবে কলেজে যাবার সময় বৃষ্টির জন্য তার মুক্তিযোদ্ধা শ্যালক মিন্টুর রেইনকোটটি পরে নেয়। মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিয়ে ভীতু নুরুল হুদার ভেতর যে উষ্ণতা, সাহস ও দেশপ্রেম দেখা যায় তারই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ ঘটেছে এ পাঠ্যাংশে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. অফিসের জন্য কয়টি আলমারি কেনা হয়েছিল?

- ক. দুইটি
গ. চারটি

- খ. তিনটি
ঘ. পাঁচটি

৬. পিয়নকে দেখে সবাই তটস্থ থাকেন কেন?

- ক. আচরণের জন্য
গ. রাজাকার বলে

- খ. মিলিটারির কারণে
ঘ. মিলিটারির সঙ্গে সুসম্পর্কে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি।

৭. উদ্দীপকটি ‘রেইনকোট’ গল্পের কার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

- ক. নুরুল হুদা
গ. আবদুস সাত্তার মুধা

- খ. সাজিদ আকবর
ঘ. ইসহাক

৮. উদ্দীপকে ‘রেইনকোট’ গল্পের কোন দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে?

- i. দেশপ্রেম
ii. মানবিকতা
iii. নৃশংসতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
গ. iii

- খ. ii
ঘ. ii ও iii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. ‘রেইনকোট’ গল্পে কোথায় বোমা ফেলা হয়েছিল?

- ক. কলেজের জিমনেশিয়ামে
গ. প্রিন্সিপালের বাড়ির গেটে

- খ. বাগানে
ঘ. গেমস্ রুমে

১০. মসজিদের মাইক্রোফোন অকেজো হয়েছে যে কারণে?

- ক. প্রিন্সিপালের ভয়ে
গ. মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে

- খ. কর্নেলের হুকুমে
ঘ. বিদ্যুৎ না থাকায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের মনে দেখা দিয়েছিল ভয় আর উৎকণ্ঠা। সে সময়ে অনেক তরুণই দেশের জন্য পালিয়ে গিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তারা ভয়কে জয় করেছে।

১১. উদ্দীপকের তরুণদের সঙ্গে ‘রেইনকোট’ গল্পে কার সাদৃশ্য রয়েছে?

- ক. মিন্টু
গ. নুরুল হুদা

- খ. ড. আফাজ আহমেদ
ঘ. ইসহাক

১২. উদ্দীপক ও ‘রেইনকোট’ গল্পের যে বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে—

- i. নির্ভরতা
ii. সাহসিকতা
iii. স্বজনপ্রীতি



নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

মেলাঘর কতদূর ! মা কী কল্পনা করতে পারেন ? কিন্তু সেখানেই গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয় মায়ের ছেলে নাফি। নাফির চোখে স্বাধীন বাংলার স্বপ্নছবি লালসবুজের পতাকা। মেলাঘরে প্রশিক্ষণ শেষে নাফি মুক্তিবাহিনীর একটি গেরিলা ইউনিটে কমান্ডো হিসাবে কাজ করে। হৃদয়ের টানে তার নিকট মা আর মাতৃভূমি একাকার বলে মনে হয়।

ক. রেইনকোট পরার পর নুরুল হুদাকে কার মতো দেখাচ্ছিল?

খ. ‘রাশিয়ার ছিল জেনারেল উইন্টার, আমাদের জেনারেল মনসুন’ –কথাটির তাৎপর্য কী?

গ. উদ্দীপকের নাফি ‘রেইনকোট’ গল্পে কোন চরিত্রটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়? –আলোচনা করুন।

ঘ. উদ্দীপকটি ‘রেইনকোট’ গল্পের সমগ্র ভাব ধারণ করে কী? –মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :

‘কলিমদ্দি দফাদার’ গল্পে বর্ণিত হয়েছে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনীর নিষ্ঠুর বর্বরতার ছবি। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে গ্রাম এলাকার আনসার, চৌকিদার-দফাদাররাও যে কখনো কখনো পরোক্ষ কৌশলে অত্যন্ত গোপনে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সহায়তা করেছিল, সেই বাস্তবতাই শিল্প-সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে এ গল্পে। গ্রামবাংলার একজন সাধারণ দফাদারের দেশপ্রেম ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় গল্পটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

ক. প্রিন্সিপালের উদ্বুদ্ধা নিয়ে ঠাট্টা করে কে?

খ. ‘আবু তাহলে মুক্তিবাহিনী’ –কথাটি কে, কোন প্রসঙ্গে বলেছিল?

গ. উদ্দীপকটি ‘রেইনকোট’ গল্পের কার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপকে ‘রেইনকোট’ গল্পের সামগ্রিক চিত্র প্রকাশিত হয়নি।” –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

রেইনকোট পরার পর নুরুল হুদাকে মিন্টুর মত দেখাচ্ছিল।

খ.

উক্তিটিতে বাংলাদেশে বর্ষার সুযোগে মুক্তিযোদ্ধাদের পাকিস্তানি বাহিনীকে বিপর্যস্ত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির হিটলার বাহিনী রাশিয়া আক্রমণ করতে গিয়ে বৈরি পরিবেশের মুখোমুখি হয়। রাশিয়ার প্রচণ্ড শীতে জার্মান বাহিনী বিধ্বস্ত হয়। সেখানে শীতের ভূমিকা অনেকটাই প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেনারেলের মত হয়েছিল। আর ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হলেও বাংলাদেশের মৌসুমি আবহাওয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলনা। ফলে তারা বাংলাদেশে বর্ষাকালে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। মোটকথা বর্ষা ঋতু বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য শাপে বর হয়েছে। তাই বর্ষাকালকে জেনারেল মনসুন বলা হয়েছে।

গ.

উদ্দীপকের নাফি চরিত্রটি ‘রেইনকোট’ গল্পে মুক্তিযোদ্ধা মিন্টুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মুক্তিযুদ্ধ হাজার বছরের বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। মাতৃভূমি বাংলাকে শত্রুমুক্ত করতে এদেশের দামাল ছেলেরা ১৯৭১ সালে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মৃত্যুকে অজেয় করে তারা শত্রু হননের শপথ নেয়। তাদের বুকের রক্তে রঞ্জিত হয় বাংলার সবুজ শ্যামল প্রান্তর।

উদ্দীপকে নাফি একজন মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে মেলাঘরে গেরিলা প্রশিক্ষণ নেয়। অতঃপর সে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মেলাঘর কতদূর তা তার মা কল্পনা করতে পারেন না। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাফি শত্রুসেনাদের নিশ্চিহ্ন করে। উদ্দীপকের নাফি চরিত্রটির মিল রয়েছে ‘রেইনকোট’ গল্পের মিন্টুর সঙ্গে। মিন্টুও বাসা



থেকে পালিয়ে গেরিলা যুদ্ধে দেয়। দেশকে শত্রুমুক্ত করতে সেও স্বাধীনতার চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে।

ঘ.

উদ্দীপকটি ‘রেইনকোট’ গল্পের সমগ্র চেতনাকে ধারণ করে না।

স্বাধীনতা যে কোন জাতির স্বপ্নিল প্রত্যাশা। বাঙালি জাতি এ প্রত্যাশা পূরণ করেছে ১৯৭১ সালে। লাখে বাঙালির রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে এ প্রত্যাশা। বাংলা মায়ের বীর সন্তানেরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল এ যুদ্ধে।

উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে একজন তরুণের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা। নাফি নামের এই তরুণটি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে গেরিলা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। অথচ এটা তার মা কল্পনা করতে পারেন না। উদ্দীপকের এ বিষয়টিতে ‘রেইনকোট’ গল্পের একটি দিকমাত্র ফুটে উঠেছে। এটা দেখা যায় মিন্টুর মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের ঘটনার মধ্য দিয়ে। কিন্তু ‘রেইনকোট’ গল্পে উক্ত বিষয়টি ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ও উঠে এসেছে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘রেইনকোট’ গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে ঢাকার আবহে রচিত। গল্পটিতে ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ, বর্বরতা, রাজাকারদের অত্যাচার, নুরুল হুদার ভীষণতা, প্রাণভয়ে ভীত মানুষের আহাজারি, সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে। ‘রেইনকোট’ গল্পটিকে এককথায় বলা যায় সমকালীন সময়ের সাহিত্যিক দলিল। উদ্দীপকে আলোচ্য গল্পটির উক্ত বিষয়গুলো ফুটে ওঠেনি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি ‘রেইনকোট’ গল্পের সমগ্র ভাব ধারণ করে না।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

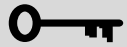
প্লিজ, মেজর সাহেব, আই বেগ ইউ, প্লিজ, রহম কিজিয়ে, আমার বিবিকে ছেড়ে দিন। ওকে নিয়ে যাবেন না। আপনারা ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? দেন, কিল মি, প্লিজ, ফিনিশ মি, আপনারা আমাকে কোথায় নিয়ে চললেন? আউট সাইড? আমি শুনেছি, আপনারা আমাদের দিয়ে আগে গোর খুঁড়িয়ে নেন, তারপর গুলি করেন। প্লিজ, ব্রিং মাই ওয়াইফ ব্যাক; আমরা দুজনেই গোর খুঁড়ব।

ক. আকবর সাজিদ কোন বিষয়ের অধ্যাপক?

খ. নুরুল হুদাকে এক্সট্রা তটস্থ থাকতে হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘রেইনকোট’ গল্পের কোন দিক দিয়ে মিল বা অমিল রয়েছে? –যুক্তিসহ উপস্থাপন করুন।

ঘ. “মুক্তিযুদ্ধে চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ।” –উদ্দীপক ও ‘রেইনকোট’ গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।



উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. ক ৩. ক ৪. খ ৫. খ ৬. ঘ ৭. ক ৮. ক ৯. গ ১০. ঘ ১১. ক ১২. ঘ



মহাজাগতিক কিউরেটর

মুহম্মদ জাফর ইকবাল



লেখক-পরিচিতি

মুহম্মদ জাফর ইকবাল ১৯৫২ সালের ২৩ ডিসেম্বর সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নেত্রকোনা জেলায়। তাঁর পিতা ফয়জুর রহমান আহমেদ এবং মাতা আয়েশা আখতার খাতুন। তাঁর পিতা একজন শহিদ মুক্তিযোদ্ধা। পিতার পুলিশের চাকরির সুবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে জাফর ইকবালের ছেলেবেলা কেটেছে। তিনি ১৯৬৮ সালে বগুড়া জেলা স্কুল থেকে এসএসসি ও ১৯৭০ সালে ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। দীর্ঘ প্রবাসজীবন শেষে ১৯৯৪ সালে দেশে ফিরে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি অবসরে আছেন। তাঁর স্ত্রী ড. ইয়াসমিন হকও একই বিভাগের একজন অধ্যাপক ছিলেন। মুহম্মদ জাফর ইকবাল একাধারে পদার্থবিদ, শিক্ষাবিদ, কলামিস্ট, সায়েন্স ফিকশন লেখক, কথাসাহিত্যিক। তাঁকে বাংলাদেশে সায়েন্স ফিকশন বা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি লেখা ও জনপ্রিয়করণের পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর কিশোর উপন্যাস ও ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর একাধিক কিশোর উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশের তরুণ-প্রজন্মকে তিনি গণিত ও বিজ্ঞানমুখী করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। মুক্তিযুদ্ধ, মাতৃভূমি ও মানুষকে প্রগতিশীল করার দায়বদ্ধতা থেকে তিনি লিখে যাচ্ছেন। তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

মুহম্মদ জাফর ইকবালের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম :

- কল্পকাহিনি :** কপোট্টনিক সুখদুঃখ (১৯৭৬), মহাকাশে মহাত্রাস (১৯৭৭), টুকুনজিল (১৯৯৩), নিঃসঙ্গ গ্রহচারী (১৯৯৪), একজন অতিমানবী (১৯৯৮), জলজ (২০০০), ফোবিয়ানের যাত্রী (২০০১), ব্ল্যাকহোলের বাচ্চা (২০১৩);
- উপন্যাস :** দীপু নম্বার টু (১৯৮৪), আকাশ বাড়িয়ে দাও (১৯৮৭), আমার বন্ধু রাশেদ (১৯৯৪), কাচসমুদ্র (১৯৯৯), আমি তপু (২০০৫), নাটবন্টু (২০০৮), গাক্সু (২০১৩);
- কিশোর সাহিত্য :** বুগাবুগা (২০০১), রঙিন চশমা (২০০৭), ঘাস ফড়িং (২০০৮), হাকাহাকি ডাকাডাকি (২০০৮), ছোটদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস (২০০৯); ভূতের বাচ্চা কটকটি (২০১১), আরো প্রশ্ন আরো উত্তর (২০১২)।

ভূমিকা

‘জলজ’ গ্রন্থের অন্তর্গত ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পটি মুহম্মদ জাফর ইকবালের ‘সায়েন্স ফিকশন সমগ্র’ তৃতীয় খণ্ড (২০০২) থেকে গৃহীত হয়েছে। অনন্ত মহাজগৎ থেকে আগত মহাজাগতিক কাউন্সিলের দুজন কিউরেটরের বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর নমুনা সংগ্রহে পৃথিবীতে আসার তথ্য এ গল্পে আলোচিত হয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণীর নমুনা সংগ্রহের সময় তারা বুঝতে পারে মানুষের কারণেই ওজন স্তরের হ্রাস ঘটে যাচ্ছে। মানুষই নির্বিচারে গাছ কাটছে এবং পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিউক্লিয়ার বোমা ফেলছে যদিও মানুষই সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলে কথিত। কিন্তু প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে পিপড়াকেই শ্রেষ্ঠ প্রজাতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এখানে লেখক কল্পকাহিনির রসের সঙ্গে সমাজ পরিবেশ ও পৃথিবী সম্পর্কে সকলকে সচেতন করতে চেষ্টা করেছেন।



উদ্দেশ্য

মুহম্মদ জাফর ইকবালের ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পটি পড়ার পর আপনি—

- মহাজাগতিক কিউরেটরদের পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানুষের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো আলোচনা করতে পারবেন।
- লেখকের বিবেচনায় কেন পিঁপড়েকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী উল্লেখ করা হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারা বেশ সমৃদ্ধ হলো। প্রথম প্রাণীটি বলল, ‘এখানে প্রাণের বিকাশ হয়েছে।’

‘হ্যাঁ।’

‘বেশ পরিণত প্রাণ। অনেক ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রজাতি। একেবারে ক্ষুদ্র এককোষী থেকে শুরু করে লক্ষ-কোটি কোষের প্রাণী।’

দ্বিতীয় প্রাণীটি আরও একটু খুঁটিয়ে দেখে বলল, ‘না। আসলে এটি জটিল প্রাণ নয়। খুব সহজ এবং সাধারণ।’

‘কেন? সাধারণ কেন বলছ? তাকিয়ে দেখ কত ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণ। শুরু হয়েছে ভাইরাস থেকে, প্রকৃতপক্ষে ভাইরাসকে আলাদাভাবে প্রাণহীন বলা যায়। অন্য কোনো প্রাণীর সংস্পর্শে এলেই তার মাঝে জীবনের লক্ষণ দেখা যায়। তারপর রয়েছে এককোষী প্রাণ, পরজীবী ব্যাকটেরিয়া। তারপর আছে গাছপালা, এক জায়গায় স্থির। আলোকসংশ্লেষণ দিয়ে নিজের খাবার নিজেই তৈরি করে নিচ্ছে। পদ্ধতিটা বেশ চমৎকার। গাছপালা ছাড়াও আছে কীটপতঙ্গ। তাকিয়ে দেখ কত রকম কীটপতঙ্গ। পানিতেও নানা ধরনের প্রাণী আছে, তাদের বেঁচে থাকার পদ্ধতি ভিন্ন। ডাঙাতেও নানা ধরনের প্রাণী, কিছু কিছু শীতল রক্তের কিছু কিছু উষ্ণ রক্তের। উষ্ণ রক্তের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একটির ভিতরে আবার অত্যন্ত নিম্নশ্রেণির বুদ্ধির বিকাশ হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে।’

‘কিন্তু সব আসলে বাহ্যিক। এই ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মাঝে আসলে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই।’

প্রথম প্রাণীটি বলল, ‘আমি বুঝতে পারছি না তুমি কেন এই পার্থক্যকে বাহ্যিক বলছ।’

‘তুমি আরেকটু খুঁটিয়ে দেখ। এই ভিন্ন প্রজাতি কী দিয়ে তৈরি হয়েছে দেখ।’

প্রথম প্রাণীটি একটু খুঁটিয়ে দেখে বিস্ময়সূচক শব্দ করে বলল, ‘তুমি ঠিকই বলেছ। এই প্রাণীগুলো সব একইভাবে তৈরি হয়েছে। সব প্রাণীর জন্য মূল গঠনটি হচ্ছে ডিএনএ দিয়ে, সব প্রাণীর ডিএনএ একই রকম, সবগুলো একই বেস পেয়ার দিয়ে তৈরি। সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে জটিল প্রাণীটির একই রকম গঠন। প্রাণীটির বিকাশের নীলনকশা এই ডিএনএ দিয়ে তৈরি করে রাখা আছে। কোনো প্রাণীর নীলনকশা সহজ, কোনো প্রাণীর নীলনকশা জটিল— এটুকুই হচ্ছে পার্থক্য।’

‘হ্যাঁ।’ দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, ‘আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীগুলোকে সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছি—কাজটি সহজ নয়। এই গ্রহ থেকেও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীটি খুঁজে বের করতে হবে— যেহেতু সবগুলো প্রাণীর গঠন একই রকম, কাজটি আরও কঠিন হয়ে গেল।’

‘সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক।’

‘হ্যাঁ।’

‘এই ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়া বেশি ছোট, এর গঠন এত সহজ এর মাঝে কোনো বৈচিত্র্য নেই।’

‘হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আবার এই হাতি বা নীল তিমি নিয়েও কাজ নেই, এদের আকার বেশি বড়। সংরক্ষণ করা কঠিন হবে।’

‘গাছপালা নেওয়ারও প্রয়োজন নেই। এরা এক জায়গায় স্থির থাকে। যেখানে গতিশীল প্রাণী আছে সেখানে স্থির প্রাণ নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না।’



‘এই প্রাণটি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? এটাকে বলে সাপ।’

‘সাপটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু এটা সরীসৃপ। সরীসৃপের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত নয়, ঠাণ্ডার মাঝে এরা কেমন যেন স্থবির হয়ে পড়ে। প্রাণিজগতে সরীসৃপ একটু পিছিয়ে পড়া প্রাণী।’

‘ঠিকই বলেছ। তা হলে সরীসৃপ নিয়ে কাজ নেই।’

প্রথম প্রাণীটি বলল, ‘আমার এই প্রাণীটি খুব পছন্দ হয়েছে। এটাকে বলে পাখি। কী চমৎকার! আকাশে উড়তে পারে!’

দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, ‘হ্যাঁ, আমারও এটি পছন্দ হয়েছে। আমরা এই প্রাণীটিকে নিতে পারি। তবে-’

‘তবে কী?’

‘এদের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমি খুব নিশ্চিত নই। আমাদের কি এমন কোনো প্রাণী নেওয়া উচিত নয় যারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে, যারা কোনো ধরনের সভ্যতা গড়ে তুলেছে?’

‘ঠিকই বলেছ। তা হলে আমাদের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একবার দেখা উচিত।’

‘এই দেখ একটা স্তন্যপায়ী প্রাণী। কী সুন্দর হলুদের মাঝে কালো ডোরাকাটা! এর নাম বাঘ।’

‘হ্যাঁ প্রাণীটি চমৎকার। কিন্তু এটি একা একা থাকতে পছন্দ করে। একটা সামাজিক প্রাণী নিতে পারি না?’

‘কুকুরকে নিলে কেমন হয়? এরা একসাথে থাকে। দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়।’

প্রথম প্রাণীটি বলল, ‘প্রাণীটিকে মানুষ পোষ মানিয়ে রেখেছে, প্রাণীটা নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলছে।’

‘ঠিকই বলেছ, গৃহপালিত প্রাণীগুলোর মাঝে স্বকীয়তা লোপ পেয়ে যাচ্ছে। একটা খাঁটি প্রাণী নেওয়া প্রয়োজন। হরিণ নিলে কেমন হয়?’

‘তৃণভোজী প্রাণী। তার অর্থ জান?’

‘কী?’

‘এদের দীর্ঘ সময় খেতে হয়। বেশির ভাগ সময় এটা ঘাস লতাপাতা খেয়ে কাটায়।’

‘ঠিকই বলেছ। আমরা দেখছি কোনো প্রাণীই পছন্দ করতে পারছি না।’

‘আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে।’

‘কী?’

‘এই গ্রহটিতে যে প্রাণীটি সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেই প্রাণীটি নিলে কেমন হয়?’

‘কোন প্রাণীর কথা বলছ?’

‘মানুষ।’

‘মানুষ?’

‘হ্যাঁ। দেখ এদের একটা সামাজিক ব্যবস্থা আছে। সমাজবদ্ধ হয়ে থাকে। এদের কেউ শ্রমিক, কেউ সৈনিক, কেউ বুদ্ধিজীবী।’

‘ঠিকই বলেছ।’

‘এই দেখ এরা শহর-বন্দর-নগর তৈরি করেছে। কত বিশাল বিশাল নগর তৈরি করেছে।’

‘শুধু তাই না, দেখ এরা চাষাবাদ করছে। পশুপালন করছে।’

‘যখন কোনো সমস্যা হয় তখন এরা দলবদ্ধভাবে সেটা সমাধান করার চেষ্টা করে।’

‘নিজেদের সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য এদের কত আত্মত্যাগ রয়েছে দেখেছ?’

‘কিন্তু আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে-’

‘কী?’

‘তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর মানুষ এই গ্রহের শ্রেষ্ঠ প্রাণী?’



‘তুমি কেন এটা জিজ্ঞেস করছ?’

‘এই পৃথিবীর দিকে তাকাও। দেখেছ বাতাসে কত দূষিত পদার্থ? কত তেজস্ক্রিয় পদার্থ? বাতাসের ওজোন স্তর কেমন করে শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখেছ? গাছ কেটে কত বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংস করেছে দেখেছ?’

‘এর সবই কি মানুষ করেছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘কী আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম এরা বুদ্ধিমান প্রাণী।’

‘এরা একে অন্যের ওপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলছে। যুদ্ধ করে একজন আরেকজনকে ধ্বংস করে ফেলছে। প্রকৃতিকে এরা দূষিত করে ফেলেছে।’

‘ঠিকই বলেছ।’

প্রাণী দুটি কিছুক্ষণ বেশ মনোযোগ দিয়ে মানুষকে লক্ষ করল, তারপর প্রথম প্রাণীটি বলল, ‘না মানুষকে নেওয়া ঠিক হবে না। এরা মাত্র দুই মিলিয়ন বছর আগে জন্ম নিয়েছে, কিন্তু এর মাঝেই শুধু যে নিজেদের বিপন্ন করেছে তাই নয়, পুরো গ্রহটিকে ধ্বংস করে ফেলার অবস্থা করে ফেলেছে।’

দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, মহাজাগতিক কাউন্সিল আমাদের কিউরেটরের দায়িত্ব দিয়েছে। আমাদের খুব চিন্তা-ভাবনা করে প্রাণীগুলো বেছে নিতে হবে। এই সুন্দর গ্রহ থেকে এ রকম স্বেচ্ছা ধ্বংসকারী প্রাণী আমরা নিতে পারি না। কিছুতেই নিতে পারি না।’

প্রাণী দুটি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে এবং হঠাৎ করে প্রথম প্রাণীটি আনন্দের ধ্বনি দিয়ে ওঠে। দ্বিতীয় প্রাণীটি অবাক হয়ে বলল, ‘কী হয়েছে?’

‘আমি একটি প্রাণী খুঁজে পেয়েছি। এরাও দল বেঁধে থাকে। এদের মাঝে শ্রমিক আছে সৈনিক আছে। বংশ বিস্তারের জন্য চমৎকার একটা পদ্ধতি আছে। দেখ নিজেদের থাকার জন্য কী চমৎকার বিশাল বাসস্থান তৈরি করেছে।’

দ্বিতীয় প্রাণীটি বলল, ‘ঠিকই বলেছ। দেখ এরাও মানুষের মতো চাষাবাদ করতে পারে। মানুষ যেরকম নিজেদের সুবিধার জন্য পশুপালন করতে পারে এদেরও ঠিক সেরকম ব্যবস্থা রয়েছে।’

‘কী সুশৃঙ্খল প্রাণী দেখেছ?’

‘শুধু সুশৃঙ্খল নয়, এরা অসম্ভব পরিশ্রমী, গায়ে প্রচণ্ড জোর, নিজের শরীর থেকে দশগুণ বেশি জিনিস অনায়াসে নিয়ে যেতে পারে।’

‘হ্যাঁ। কোনো ঝগড়াবিবাদ নেই। কে কোন কাজ করবে আগে থেকে ঠিক করে রেখেছে। কোনো রকম অভিযোগ নেই, যে যার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।’

‘অত্যন্ত সুবিবেচক। আগে থেকে খাবার জমিয়ে রাখছে। আর বিপদে কখনো দিশেহারা হয় না। অন্যকে বাঁচানোর জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়ে যাচ্ছে।’

‘মানুষের বয়স মাত্র দুই মিলিয়ন বছর, সেই তুলনায় এরা সেই ডাইনোসরের যুগ থেকে বেঁচে আছে।’

‘প্রকৃতির এতটুকু ক্ষতি করেনি। আমি নিশ্চিত মানুষ নিজেদের ধ্বংস করে ফেলার পরও এরা বেঁচে থাকবে। পৃথিবী এক সময় এরাই নিয়ন্ত্রণ করবে।’

‘ঠিকই বলেছ। তা হলে আমরা এই প্রাণীটাই নিয়ে যাই?’

‘হ্যাঁ। পৃথিবীর এই চমৎকার প্রাণীটা নেওয়াই সবচেয়ে সুবিবেচনার কাজ হবে।’

দুজন মহাজাগতিক কিউরেটর সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটি থেকে কয়েকটি পিঁপড়া তুলে নিয়ে গ্যালাক্সির অন্য গ্রহ-নক্ষত্রে রওনা দেয়, দীর্ঘদিন থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে ঘুরে তারা গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী সংগ্রহ করেছে।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

এককোষী— একটিমাত্র কোষবিশিষ্ট প্রাণী। **ওজোন স্তর**— বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে ওজোন গ্যাসে পূর্ণ স্তর বিশেষ, যা আমাদের সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে। **কিউরেটর**— জাদুঘরের রক্ষক, জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক তথা পরিচালক। **গ্যালাক্সী**— ছায়াপথ। **ডাইনোসর**— লুপ্ত হওয়া বৃহদাকার প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী। **তেজস্ক্রিয় পদার্থ**— যা থেকে এমন রশ্মির বিকিরণ ঘটে যা অস্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়ে দেখা যায়। **নিউক্লিয়ার বোমা**— পারমাণবিক বোমা। **প্রজাতি**— প্রাণীর বংশগত শ্রেণি। **মহাজাগতিক**— মহাজগৎ সম্বন্ধীয়। **সরীসৃপ**— বুকে ভর দিয়ে চলে এমন প্রাণী।



সারসংক্ষেপ

‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ মুহম্মদ জাফর ইকবালের বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি হলেও এতে দেশকালের প্রভাবপুষ্ট লেখকের জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে। এ গল্পের শুরুতে আমরা দেখি মহাজগৎ থেকে আগত মহাজাগতিক কাউন্সিলের দুজন কিউরেটর বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর নমুনা সংগ্রহের জন্য সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে। কিউরেটরদের পৃথিবীতে আগমনের মূল উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রাণীর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বিচার বিশ্লেষণ করে শ্রেষ্ঠ প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করা। প্রজাতির যাচাই-বাছাই করার সময় বিভিন্ন প্রাণীর গুণাগুণ কিউরেটরদের সংলাপে উঠে আসে। তারা মানুষের ইতিবাচক দিকগুলো বিবেচনায় নিলেও নেতিবাচক আচরণগুলো দেখে বিস্মিত হয়। বোমা নিক্ষেপ, বৃক্ষ নিধন, যুদ্ধংদেহী মনোভাবসহ এ জাতীয় নেতিবাচক কাজের জন্য তারা মানুষ প্রজাতিকে শ্রেষ্ঠ প্রাণীর স্বীকৃতি দিতে পারেনি। কিউরেটরদের উদ্দেশ্য ছিল অনন্ত মহাজগতের সব গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী সংগ্রহ করা। রচনাটিতে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়ার মতো ক্ষুদ্র প্রাণী, সরীসৃপজাতীয় সাপ, স্তন্যপায়ী প্রাণী বাঘ, তৃণভোজী প্রাণী হরিণ, গৃহপালিত প্রাণী কুকুর, বৃহৎ প্রাণী হাতি বা নীল তিমি এবং মানুষের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। মানুষের কর্মকাণ্ডে তারা শঙ্কিত। অবশেষে তারা পরিশ্রমী ও সুশৃঙ্খল সামাজিক প্রাণী হিসেবে পিঁপড়াকে শনাক্ত করে। ডাইনোসরের যুগ থেকে এখনো বেঁচে থাকা সুবিবেচক ও পরোপকারী পিঁপড়াকে তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রজাতি হিসেবে বিবেচনা করে সঙ্গে নিয়ে যায়। কল্পকাহিনির রসের সঙ্গে সমাজ, পরিবেশ ও পৃথিবী সম্পর্কে লেখকের সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি এবং একই সঙ্গে তীব্র শ্রেয় ও পরিহাসের মিশ্রণে গল্পটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পিঁপড়া কোন যুগ থেকে বেঁচে আছে?

ক. ডাইনোসর

খ. প্লাইটোসিন

গ. গ্যালাক্সি

ঘ. নিউক্লিয়ার

২. মহাজাগতিক কিউরেটররা কেন পৃথিবীতে এসেছিলেন?

ক. প্রাণের অস্তিত্ব খোঁজ করতে

খ. পৃথিবীতে মানুষের কর্মকাণ্ড দেখতে

গ. সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীর খোঁজে

ঘ. প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ভীমরূপের গায়ে ভুল আছে। সুযোগ পেলে সে মনোয়ারকেও কামড়াতে ছাড়ে না। কিন্তু তার সামাজিক দায়িত্ববোধ সত্যিই বিস্ময়কর। কোনো ভীমরূপকে সংক্রামক ব্যাধি আক্রমণ করলে সে চাক ছেড়ে চলে যায় যাতে অন্যরা ওই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত না হয়।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পের কোন্ প্রাণীর সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. মানুষ

খ. হরিণ

গ. পিঁপড়া

ঘ. ভাইরাস



৪. এরূপ সাদৃশ্য যে বিষয়ে পরিলক্ষিত হয়—

- i. সমাজমনস্কতা
- ii. দায়িত্বশীলতা
- iii. আত্মত্যাগ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. iii
- ঘ. i ও ii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. কারা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়?

- ক. কুকুর
- খ. বিড়াল
- গ. বাঘ
- ঘ. সিংহ

৬. মহাজাগতিক কিউরেটররা মানুষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাণী বলেনি কেন?

- ক. মানুষ বুদ্ধিহীন
- খ. সংকীর্ণতার কারণে
- গ. মানুষের আত্মধ্বংসী প্রবণতা
- ঘ. পরোপকারী বলে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

অচিন গ্রহ থেকে পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছে কিটি। সে পৃথিবীতে এসে দেখে মানুষ মারণাস্ত্র তৈরি করে চলেছে। সামান্য কারণে বোমা ফেলে লোকালয় ধ্বংস করছে। কিটির মনে হল মানুষ সভ্য হলেও এক ধরনের আত্মঘাতী প্রাণী।

৭. অনুচ্ছেদে ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পের কোন বাক্যটির ভাবার্থ প্রতিফলিত হয়েছে?

- ক. প্রাণিজগতে সরীসৃপ একটু পিছিয়ে পড়া প্রাণী।
- খ. গাছ কেটে কত বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংস করেছে দেখেছে?
- গ. এরা একে অন্যের উপর নিউক্লিয়ার বোমা ফেলছে।
- ঘ. মহাজাগতিক কাউন্সিল আমাদের কিউরেটরের দায়িত্ব দিয়েছে।

৮. উদ্দীপক এবং ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পে মানুষের কোন বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে?

- i. সুবিবেচনা
- ii. আত্মত্যাগ
- iii. আত্মধ্বংস

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. iii
- ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

মঙ্গলগ্রহ থেকে পৃথিবীতে এসেছে এলিয়েনরা। পৃথিবীতে এসে তারা দেখে এটা বৈচিত্র্যময় এক প্রাণিজগৎ। এদের মধ্যে মানুষ নামক প্রাণীটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা তারা সভ্যতার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এলিয়েনরা আরো বুঝতে পারে যে, মানুষের কারণেই এখানে ওজোন স্তরের ক্ষয় হচ্ছে। মানুষই নির্বিচারে গাছ কেটে ধ্বংস করে চলেছে প্রকৃতির ভারসাম্য। পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তারাই নিউক্লিয়ার বোমা ফেলছে একে অন্যের উপর। মানুষ প্রজাতির নির্বুদ্ধিতায় তারা শঙ্কিত হয়।

- ক. ‘কিউরেটর’ শব্দের অর্থ কী?
- খ. ‘তা হলে সরীসৃপ নিয়ে কাজ নেই’ –কেন? ব্যাখ্যা করুন।
- গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পের সাদৃশ্যগুলো তুলে ধরুন।



ঘ. “পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য মানুষ নিজেই দায়ী।” –উদ্দীপক ও ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ক.

‘কিউরেটর’ শব্দের অর্থ হচ্ছে জাদুঘর রক্ষক। জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক তথা পরিচালক।

খ.

সরীসৃপরা জীবজগতে পিছিয়ে পড়া প্রাণী হওয়ার কারণে কিউরেটররা বলেছে এদেরকে মহাজগতে নিয়ে কাজ নেই। পৃথিবীর প্রাণিজগৎ বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যময় জগতের অন্যতম প্রাণী হল সরীসৃপ বা সাপ। সরীসৃপ বুকে ভর দিয়ে চলে। এরা জল-স্থল উভয়স্থানেই বাস করে। সরীসৃপের দেহের তাপমাত্রা সাধারণত নিয়ন্ত্রিত থাকে না। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় এরা স্থবির হয়ে পড়ে। তাই সরীসৃপ জগতের অন্যান্য প্রাণী থেকে পিছিয়ে পড়া প্রজাতি। এ কারণে মহাজাগতিক কিউরেটররা সরীসৃপকে সঙ্গে নিতে চায়নি।

গ.

উদ্দীপক ও ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পে মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য রয়েছে।

পৃথিবীতে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রাণী হলো মানুষ। মানুষের ইতিবাচক আলোড়নের চেয়ে নেতিবাচক আলোড়নটিই চোখে পড়ে বেশি। কেননা মানুষ সভ্যতা নির্মাণে যতটা উদ্ভাবন ও গঠনমূলক কাজ করেছে তার চেয়ে নেতিবাচক কাজের পরিমাণ একেবারে কম নয়। যা মানবসভ্যতা তথা পৃথিবীর ধ্বংস সাধনে সহায়ক হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায় মঙ্গলগ্রহ থেকে আসা এলিয়েনরা তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর মানুষকে মূল্যায়ন করেছে। তারা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে যে, পৃথিবীতে সভ্যতা নির্মাণকারী প্রাণী হচ্ছে মানুষ। কিন্তু মানুষ নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করেছে, ক্ষয় করেছে পৃথিবীর ওজোন স্তর। ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ কল্পকাহিনীতেও ভিনগ্রহের কিউরেটরদের পৃথিবীর মানুষ সম্পর্কে অনুরূপ মূল্যায়ন রয়েছে। কিউরেটররা ধারণা করেছিল পৃথিবী নামক গ্রহে সম্ভবত শ্রেষ্ঠ প্রাণী হবে মানুষ। কিন্তু তারা মানুষের স্ববিরোধী ও স্ব-প্রজাতির বিনাশকারী কর্মকাণ্ডে বিস্মিত হয়। ফলে তারা পৃথিবীর বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে ‘মানুষ’কে গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করে। আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকটি ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ.

‘পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য মানুষ নিজেই দায়ী’ –মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

সাধারণত দেখা যায় বুদ্ধিমান প্রাণী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। ভবিষ্যতের কথা ভেবে সে ইতিবাচক কাজে লিপ্ত হয়। মানুষ নগর নির্মাণ করেছে এটা তার ইতিবাচক দিক। কিন্তু এই মানুষই গাছপালা কেটে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করেছে, ওজোন স্তরের ক্ষয় করেছে, এগুলো তার নেতিবাচক দিক। মানুষ নিজের স্বার্থে সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবীকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে।

‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পে অনন্ত মহাজগৎ থেকে দুজন কিউরেটর পৃথিবীতে এসেছে। তারা পৃথিবীর জীবজগত হতে শ্রেষ্ঠ প্রাণিটি বাছাই করে মহাজগতে নিয়ে যাবে। প্রথমে কিউরেটররা মনে করে পৃথিবীতে মানুষই বুদ্ধিমান ও শ্রেষ্ঠ প্রাণী। কিন্তু মানুষের কিছু কর্মকাণ্ডে তাদের সে ধারণা পাল্টে পায়। কেননা মানুষ গাছ কাটে, নানাভাবে বায়ুদূষণ করে ওজোন স্তরের ক্ষয় করে, পৃথিবীর পরিবেশ ধ্বংস করে। উদ্দীপকেও মানুষের সৃষ্টিশীলতা ও হিংসাত্মক প্রবণতা প্রকাশিত হয়েছে। মানুষেরই অক্লান্ত পরিশ্রমে পৃথিবীতে সভ্যতা গড়ে উঠেছে। আবার এই মানুষই সামান্য কারণে সবকিছু ধ্বংস করে শূন্য করে দেয়।

উদ্দীপক এবং ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পে মানুষের স্বেচ্ছা ধ্বংসকারী রূপটি ফুটে উঠেছে। মানুষ নিজের প্রয়োজনে স্বীয় শ্রম আর চেষ্টায় লোকালয় গড়ে তুলেছে। কিন্তু এই মানুষেরই কর্মকাণ্ডে তার নীড়ে দাবানল বয়ে যায়, ধ্বংস হয় লোকালয়। পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যারা প্রতিনিয়ত নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করে ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করেছে। বস্তুত মানবচরিত্রের এই স্বরূপ উদ্দীপক এবং ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

বিষ পিঁপড়ার পা ছেঁড়ার চেষ্টা করা নেহায়েতই বোকামির কাজ, কারণ তখন সেটা টিটনের বুড়ো আঙ্গুলে আবার কামড়ে ধরল। টিটন বলল, “আউ! আউ!” এবং কিছু বোঝার আগে সেই পিঁপড়া তার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে প্রথমে গাছের ডালে তারপর পাতার আড়ালে গিয়ে অন্য পিঁপড়াদের মাঝে গা ঢাকা দিয়ে ফেলল। সেটাকে আলাদা করে আর খুঁজে পাওয়ার কোনো উপায় নেই। টিটন ফাঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, “দেখেছিস? দেখেছিস? বদমাইশ পিঁপড়াটা কী করল?”

ক. সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহের নাম কী?

খ. ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পে কাকে ‘অত্যন্ত সুবিবেচক’ বলা হয়েছে?

গ. উদ্দীপকটি ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. “মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পে পিঁপড়া ও উদ্দীপকের পিঁপড়ার চেতনাগত ভিন্নতা রয়েছে।” –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।



উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. গ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ক ৬. গ ৭. খ ৮. গ





কবিতা

বাংলা কবিতার উদ্ভব ও বিকাশ : একটি রূপরেখা

নানা বিতর্ক ও ভিন্নমত থাকলেও, একথা আজ সকলেই মেনে নিয়েছেন যে বাংলা সাহিত্যের বয়স প্রায় দেড় হাজার বছর। পৃথিবীর সব সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেরও যাত্রা শুরু কবিতা দিয়ে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ। আনুমানিক দেড় হাজার বছর পূর্বে এগুলো রচিত হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের রচিত এ পদগুলো দীর্ঘদিন অনাবিষ্কৃত ছিল। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এগুলো নেপাল রাজদরবারের পুঁথিশালা থেকে উদ্ধার করেন। চর্যাপদে প্রাচীন বাংলার সমাজ জীবনের নানা ছবি চিত্রিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বকথা অবলম্বনে রচিত হলেও, চর্যাপদগুলো সাহিত্যগুণেও অনন্য। চর্যাপদের প্রধান কবিরা হলেন লুইপাদ, ভুসুকুপাদ, কাহ্নপাদ ও সরহপাদ। চর্যাপদ ছাড়া প্রাচীন যুগের (৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দকে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ বলা হয়) আর কোন সাহিত্য নিদর্শন এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয়নি।

চর্যাপদের পর বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হচ্ছে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকে এ কাব্য রচিত হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করেছেন। তবে চর্যাপদের মতোই এ কাব্যও রচনার বহু শতাব্দী পরে আবিষ্কৃত হয়। ১৯০৯ সালে বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে কাব্যের পুঁথিটি উদ্ধার করেন বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদল্লভ। এটি রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক আখ্যানকাব্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের (১২০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ বলা হয়) প্রথম নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মধ্যযুগের বাংলা কবিতা প্রধানত চারটি শাখায় বিকাশ লাভ করে। এ শাখা চারটি হলো বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, রোমান্সমূলক প্রণয়-কাব্য এবং অনুবাদ-কাব্য। চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মতো এ-সব সাহিত্যশাখাও ধর্মচিন্তাকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করে। বৈষ্ণব ধর্মমতকে অবলম্বন করে রচিত হয় বৈষ্ণব পদাবলী। চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) মানবতাবাদী ধর্মচিন্তা বৈষ্ণব সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ প্রেরণা সঞ্চার করে। সাহিত্যগুণে বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। রাধা-কৃষ্ণের মর্ত্যলীলাকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান কবিরা হচ্ছেন- বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও বলরামদাস।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শাখা হচ্ছে মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্য রচনার পশ্চাতেও ধর্মীয় প্রেরণা কাজ করেছে। খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে রচিত হয় মঙ্গলকাব্য। বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার প্রচার সম্পর্কিত এক প্রকার আখ্যানকাব্যকে মঙ্গলকাব্য বলে। মধ্যযুগের মানুষ জাগতিক নানা প্রয়োজনে ও বিপদে-আপদে এ-সব দেব-দেবীর শরণাপন্ন হয়েছে। এভাবে হিংস্র শ্বাপদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য চণ্ডীদেবীর পরিকল্পনা, সাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য মনসাদেবীর অধিষ্ঠান, বসন্তরোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য শীতলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। একপে আরও বহু দেব-দেবীর পরিকল্পনা করা হয়েছে। নানা দেব-দেবীর পরিকল্পনার কারণে মঙ্গলকাব্যেও রয়েছে নানা শাখা। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, শিবমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি হচ্ছে মঙ্গলকাব্যের প্রধান প্রধান শাখা। মনসামঙ্গলের প্রধান কবিরা হচ্ছেন বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বিপ্রদাস প্রমুখ। চণ্ডীমঙ্গলের প্রধান কবি হচ্ছেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, যিনি কবিকঙ্কন নামে সমধিক পরিচিত। অন্নদামঙ্গলের প্রধান কবির নাম ভারতচন্দ্র রায়। মঙ্গলকাব্যসমূহ ধর্মীয় প্রেরণায় রচিত হলেও এ-সব কাব্যে মধ্যযুগের বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতার নানা দিক বিধৃত হয়ে আছে। সাহিত্যগুণেও এ-কাব্য বিশিষ্টতার পরিচয়বাহী। ধর্মীয় প্রেরণায় রচিত মধ্যযুগের সাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য শাখা হচ্ছে অনুবাদ কাব্য। সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের অনুবাদের মাধ্যমে এ কাব্যশাখার সৃষ্টি। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত অনুবাদকাব্য বিশেষ বিকাশ লাভ করে। রামায়ণ-মহাভারত ভাগবতের অনুবাদের মাধ্যমে নতুন জীবনাদর্শে সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন অনুবাদকারীরা। বাল্মীকির মূল রামায়ণ প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন কৃত্তিবাস ওঝা। পঞ্চদশ শতাব্দীে তিনি রামায়ণ অনুবাদ করেন। মহাভারতের প্রথম বঙ্গানুবাদক হচ্ছেন কাশীরাম দাস। আরও অনেক কবি রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদ করে বাংলা অনুবাদ কাব্যের শাখাটি সমৃদ্ধ করেছেন।

মধ্যযুগে এ পর্যন্ত যে-সব সাহিত্যশাখার কথা আমরা জেনেছি, তার সবগুলোই হিন্দু ধর্মের বিষয় ও বিধানকে অবলম্বন করে রচিত। ইসলাম ধর্মের প্রসার ও প্রচারকল্পে সুফি ধর্মমতের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় এ-সময় মুসলিম কবিদের হাতে নতুন এক কাব্যশাখার সৃষ্টি হয়। সাহিত্যের ইতিহাসে এ কাব্যশাখা রোমান্সমূলক প্রণয়-কাব্য নামে পরিচিত। এগুলো মূলত আখ্যান কাব্য। বাংলা রোমান্সমূলক প্রণয়-কাব্যের ধারায় যাঁদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়, তাঁরা হচ্ছেন সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ আলাওল, মুহম্মদ কবীর, কাজী দৌলত, দৌলত উজির বাহরাম খান প্রমুখ। এঁদের মধ্যে সৈয়দ আলাওলের অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য। পদ্মাবতী, হস্তপয়কর প্রভৃতি আলাওলের উল্লেখযোগ্য কাব্য। রোমান্সমূলক প্রণয়কাব্যসমূহ ধর্মীয় প্রেরণায় সৃষ্টি হলেও এগুলোর মধ্যেও মধ্যযুগের বাংলাদেশের বহুমাত্রিক সামাজিক পরিচয় পাওয়া যায়।



১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়কে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আধুনিক যুগে এসে বাংলা সাহিত্য কেবল কবিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বহু বিচিত্র শাখায় বিচিত্রভাবে তা বিকাশ লাভ করে। তবে এখানে আমরা কেবল কবিতা সম্পর্কেই জানার চেষ্টা করবো। আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। তবে তাঁর পূর্বে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে বাংলা কাব্যে আবির্ভূত হন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। এজন্য তাঁকে ‘যুগ-সন্ধিক্ষণের’ কবি বলা হয়। তিনি খণ্ড কবিতা রচনা করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তই বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা হিসেবে সমধিক পরিচিত। তাঁর অমর কীর্তি মেঘনাদবধকাব্য (১৮৬১)। এটিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য। তিনি পত্রকাব্য এবং সনেটেরও প্রবর্তক। বীরাজনা কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী প্রভৃতি মাইকেল মধুসূদন দত্তের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রচনা।

মধুসূদন যেমন মহাকাব্য, পত্রকাব্য এবং সনেটের প্রবর্তক, বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪) তেমনি গীতিকবিতার প্রবর্তক। তার সঙ্গীত শতক-ই (১৮৬২) হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতিকবিতার সঙ্কলন। গীতিকবিতার প্রবর্তন করেছেন বলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ‘ভোরের পাখি’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বিহারীলালের অন্যান্য কাব্যের নাম বঙ্গ-সুন্দরী, নিসর্গ সন্দর্শন, বন্ধু বিয়োগ, সাধের আসন, সারদামঙ্গল ইত্যাদি।

এ পর্বেই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) উজ্জ্বল আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা কাব্য নতুন নতুন মাত্রায় অভিষিক্ত হলো। দুই শতাব্দে জুড়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা বিস্তৃত। ১৯৭৬ সালে মাত্র পনের বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্য বনফুল প্রকাশিত হয়। তাঁর সর্বশেষ কাব্য শেষলেখা প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে। মাঝখানে রয়েছে পঞ্চাশের অধিক কাব্যগ্রন্থ। এ-সব কাব্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা, ক্ষণিকা, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পুনশ্চ, জন্মদিনে প্রভৃতি। ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ বিষয় ও প্রকরণে বাংলা কবিতার মান বহুগুণে সমৃদ্ধ করেন। মানবতাবাদী চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের কবিতা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা, নিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নতুন-নতুন ছন্দোবীতি, বিশ্বায়ক সংক্ষিপ্তরূপ, অলঙ্কারের স্বল্পতা এবং ভাবসংহতিতে শেষ পর্বের রবীন্দ্রকবিতা বিশিষ্ট ও উজ্জ্বল।

এ কালের অন্য তিনজন কবি রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে প্রকাশের একটা স্বতন্ত্র পথ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এ কবিদ্বয় হচ্ছেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)। কবিতার বিষয় এবং আঙ্গিকে এঁরা রবীন্দ্রনাথের দূরবর্তী জগতের মানুষ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম কবি হিসেবে কায়কোবাদের (১৮৫৭-১৯৫১) অবদানও এখানে স্মরণীয়। মহাশাশান কাব্য রচনা করে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর অন্যান্য কাব্য হচ্ছে অশ্রুমালা, অমিয়ধারা প্রভৃতি। অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী চেতনা কায়কোবাদের কবি প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বিংশ শতাব্দীর বিশ দশকের সর্বাপেক্ষা প্রবল-প্রাণ কবির নাম কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। বাংলা কবিতার ইতিহাসে তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত। নজরুল ইসলাম মূলত রোমান্টিক কবি। রোমান্টিকতার অন্তর-প্রেরণায় তিনি কখনো উচ্চারণ করেছেন বিদ্রোহের বাণী, কখনো-বা গেয়েছেন প্রেম সৌন্দর্যের গান। শব্দব্যবহার ও অলঙ্কার নির্মাণেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রধান প্রধান কাব্যের নাম অগ্নিবীণা, সাম্যবাদী, ভাঙার গান, দোলন চাঁপা, পুনের হাওয়া, চক্রবাক, সিদ্ধু-হিন্দোল, মরুভাঙ্গর ইত্যাদি। এ পর্বের একজন উল্লেখযোগ্য কবি জসীমউদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬)। পল্লিবাংলার জীবন ও বিশ্বাসকে অবলম্বন করে বাংলা কবিতায় তিনি সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারা নির্মাণ করেছেন। রাখালী, নব্বী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট প্রভৃতি জসীমউদ্দীনের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে এসে বাংলা কবিতায় নতুন পরিবর্তন সূচিত হলো। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৯৩), অজিত দত্ত (১৯০৭-১৯৭৯), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) প্রমুখ এ পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কবি। এঁরা তিরিশোত্তর কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। এঁদের কবিতার প্রধান প্রবণতা আধুনিক জীবনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-অবিশ্বাস রূপায়ণ ও রবীন্দ্র-বিরোধিতা। তিরিশোত্তর এ কবি সমাজের হাতে বাংলা কবিতা বিষয় ও আঙ্গিকে নতুন মাত্রা অর্জন করে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির ফলে বাংলা কবিতা দুটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। পূর্ব বাংলাকেন্দ্রিক কবিতা বাংলা কবিতার একটি স্বতন্ত্র ধারা নির্মাণে সচেষ্ট হলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এ ধারার কবিদের মধ্যে প্রবল প্রতিবাদী চেতনা সৃষ্টি করে। এ ধারার কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন আবুল হোসেন, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, সিকান্দার আবু জাফর, আবদুল গণি হাজারী, সানাউল হক, সৈয়দ শামসুল হক, আলাউদ্দিন আল-আজাদ, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আল মাহমুদ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রমুখ। ষাটের দশকের পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আরও অনেক কবি পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশ-কেন্দ্রিক কাব্যধারা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

হাজার বছরের বাংলা কবিতার ইতিহাস আমরা সংক্ষেপে ওপরের আলোচনায় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। এ আলোচনা পাঠ করে আপনি কবিতা অধ্যয়ন করার চেষ্টা করুন, তাহলে পাঠ অনুধাবন আপনার জন্য সহজ হবে।



বঙ্গভাষা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত



কবি-পরিচিতি

১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত এবং মাতা জাহ্নবী দেবী। মধুসূদনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় সাগরদাঁড়ির গ্রামের পাঠশালায়। ১৮৩৩ সালে তিনি কলকাতার হিন্দু কলেজে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এ সময় তিনি ডিরোজিও প্রভাবিত ইয়ং-বেঙ্গল দল দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তিনি মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবজ্ঞা ও ইংরেজি ভাষার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। ১৮৪৩ সালে তিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর নামের প্রথমে যোগ হয় ‘মাইকেল’। ধর্মান্তরিত হওয়ায় হিন্দু কলেজ ছেড়ে শিবপুরের বিশপ্স কলেজে ভর্তি হন এবং এখানে তিনি গ্রিক, লাতিন ও হিব্রু ভাষা শেখেন। এছাড়াও তিনি সংস্কৃত, ফরাসি, জার্মান ও ইতালীয় ভাষাতেও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ১৮৬২ সালে মধুসূদন ইংল্যান্ড যান এবং ব্যারিস্টারি পাস (১৮৬৬) করেন। লন্ডন থেকে তিনি ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে যান ও বেশ কয়েক বছর অবস্থান করেন। এ সময় তিনি চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটে পতিত হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ সময় অর্থ প্রেরণ করে মধুসূদনকে দেনার দায় থেকে মুক্ত করেন ও দেশে ফেরার ব্যবস্থা করেন। কলকাতার উচ্চ আদালতে আইন ব্যবসা করে দারিদ্র্যের যন্ত্রণা থেকে সাময়িক মুক্তি অর্জন করলেও শেষ জীবনে তিনি পুনরায় অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে নিপতিত হন। হাজার বছরের বাংলা কাব্যের প্রথাগত ধারায় মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথম বঙ্গনমুক্তির অগ্রনায়ক। মধ্যযুগের কবিতায় চরণের শেষে অন্তমিল-সম্পন্ন পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের প্রথা ভেঙে তিনি প্রবর্তন করেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। আধুনিক বাংলা কবিতার অগ্রদূত হিসেবে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে রেখে যান অক্ষয় অবদান। বিষয় ভাবনা, জীবনার্থ এবং প্রকরণ-শৈলীর স্বাতন্ত্র্যে মধুসূদনের রচনা আধুনিকতার শিখরস্পর্শী। মহাকাব্য, সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা, পত্রকাব্য, প্রহসন, ট্রাজেডি নাটক ইত্যাদি রূপকল্পবাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জুন কলকাতার আলীপুর জেনারেল হাসপাতালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

- কাব্যগ্রন্থ : তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০), মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১), ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১), বীরঙ্গনা কাব্য (১৮৬২), চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬);
- নাটক : শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯), পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী নাটক (১৮৬১);
- প্রহসন : একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৫৯), বুড় সালিকের ঘাড়ে রৌ (১৮৫৯);
- গদ্য-কাব্য : হেকটর-বধ (অসমাপ্ত)।

ভূমিকা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত ‘বঙ্গভাষা’ কবিতাটি চতুর্দশপদী কবিতাবলী গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। ‘বঙ্গভাষা’ কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেট। মাতৃভাষার প্রতি কবির সুগভীর হৃদয়বেগ এই কবিতায় মার্জিত ও পরিশীলিত ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অজস্র ঐশ্বর্য ও সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত হয়েছে কবির নিপুণ বর্ণনায়।



উদ্দেশ্য

মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘বঙ্গভাষা’ সনেটটি পড়ার পর আপনি-

- বাংলা ভাষায় কবির কাব্য রচনার যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ‘বিবিধ রত্নে’ পরিপূর্ণ বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- ‘বঙ্গভাষা’ কবিতার কাব্যবৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

হে বঙ্গ, ভাঙারে তব বিবিধ রতন;-
 তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
 পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
 পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
 কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!
 অনিদ্রায়, অনাহারে, সঁপি কায়, মনঃ,
 মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;-
 কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন!

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,-
 “ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
 এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
 যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।”
 পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
 মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে॥



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অবরেণ্যে- যা বরণ বা গ্রহণযোগ্য নয় বিদেশি ভাষাকে পরধন হিসেবে দেখেছেন বলেই কবি ‘অবরেণ্যে’ শব্দ প্রয়োগ করেছেন। প্রয়োগটিকে এই অর্থেও হয়ত নেওয়া যেতে পারে- যা বরণ করা বা গ্রহণ করা সাধ্য বা সামর্থ্যের বাইরে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন বহুভাষাবিদ বাঙালি। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ বহু সাহিত্যকর্মের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল; কিন্তু মাতৃভাষার চেয়ে বড়ো কিছু হতে পারে না- এই বোধই কবিকে তাঁর নিজের ভাষা-সাহিত্যের কাছে ফিরিয়ে এনেছিল। **অবোধ-** নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন। **আচরি-** আচরণ করে, অবলম্বন করে। **আজ্ঞা-** আদেশ, নির্দেশ। **এ ভিখারী-দশা-** কবি ভিখারীর মতো বিদেশি সাহিত্যের দ্বারা হাত পেতেছিলেন। **কমল-কানন-** পদ্মবন। **কালে-** যথাসময়ে, একসময়ে। **কাটাইনু-** কাটলাম। **কায়-** দেহ, শরীর। **কেলিনু-** খেলা করলাম। **কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন-** কবি বাংলা ভাষাকে পদ্মের এবং ইংরেজি ভাষাকে শ্যাওলার সঙ্গে উপমিত করেছেন। কবির মন্তব্য : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে উপেক্ষা করে বিদেশি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করে তিনি ভুল করেছেন এবং তার সাধনা ব্যর্থ হয়েছে। এ যেন পদ্মবনকে উপেক্ষা করে শ্যাওলা নিয়ে খেলা করা। **কুললক্ষ্মী-** মাতৃভাষায় কবিতা রচনার দৈবী প্রেরণাকে কবি মাতৃভাষার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে কল্পনা করেছেন। **কুক্ষণে-** অশুভ সময়ে, অনভিপ্রেত মুহূর্তে। **তা সবে-** সে সবকে, সেগুলোকে। **পরদেশে-** বিদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে, ইউরোপে কবির প্রবাস জীবনের কথা এখানে বলা হয় নি। কারণ সাহিত্য জীবনের শেষে অর্থোপার্জনের আশায় কবি দেশত্যাগ করেছিলেন। **পরধন-লোভে মত্ত-** পরের সম্পদের লোভে অতিমাত্রায় আকৃষ্ট। **পরধন**



বলতে পাশ্চাত্য সাহিত্যকে বুঝিয়েছেন। কবি মধুসূদনের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা ছিল ইংরেজি সাহিত্যের কবি হবার। তাই তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাব-সম্পদ আহরণে মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য-সাধনার সূচনা হয়েছিল ইংরেজি সাহিত্য রচনার মাধ্যমে। পরে ভুল বুঝতে পেরে বাংলা সাহিত্যের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। **পরিহারি**— পরিহার করে, ত্যাগ করে, এখানে বঞ্চিত হয়ে। **পালিলাম**— পালন করলাম, মান্য করলাম। **বরি**— বরণ করে। কবি মধুসূদন তাঁর সাহিত্য-চর্চার শুরুতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। মাদ্রাজে থাকাকালে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেন বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নে। মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করার জন্যে যে প্রয়াস সে সময়ে তিনি চালিয়েছিলেন তা যে ব্যর্থ প্রয়াস ছিল তা তিনি শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারেন। এখানে আক্ষেপের সুরে সে কথাই বলেছেন তিনি। **বিফল তপে**— নিষ্ফল বা ব্যর্থ তপস্যা। **ভাঙারে তব বিবিধ রতন**— বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য-ভাঙার বৈচিত্র্যময় ও উৎকর্ষমণ্ডিত সাহিত্য-সম্পদে পরিপূর্ণ। **ভিক্ষাবৃত্তি**— বিদেশি সাহিত্যকে পরধন বিবেচনা করায় তার চর্চাকে তিনি ভিক্ষাবৃত্তির সমতুল্য মনে করেছেন। নিজের সম্পদকে উপেক্ষা করে অন্য ভাষার সম্পদের দ্বারস্থ হওয়ার জন্য অনুশোচনা ও আত্মসমালোচনার বোধ এখানে প্রকাশিত হয়েছে। **মজিনু**— মগ্ন হলাম, বিভোর হলাম, অত্যধিক আসক্ত হলাম। **মনঃ**— মন, অন্তর, অন্তঃকরণ, চিত্ত। **মাতৃকোষে**— মাতৃভাষার ভাঙারে অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে। **যা রে ফিরি ঘরে**— মাতৃভাষার সাহিত্য সৃষ্টির কাজে ব্রতী হও। **মাতৃভাষা রূপ-খনি, পূর্ণ মণিজালে**— মাতৃভাষা ও সাহিত্যের ভাঙার যেন খনির মতো অনন্ত রত্নসম্পদের আকর। খনি থেকে যেমন বিচিত্র রত্নরাজি লাভ করা যায় তেমনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অজস্র ঐশ্বর্য ও সম্ভাবনায় ভরপুর। বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন বলে যেসব সুকাব্যের কথা কবি তাঁর ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’-তে উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হল : কবিকঙ্কণের ‘চণ্ডীমঙ্গল’, ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’, কাশীরাম দাসের ‘মহাভারত’, কৃত্তিবাসের ‘রামায়ণ’, কালিদাসের ‘মেঘদূত’ ও জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’। **রতনের রাজি**— রত্নসমূহ অর্থাৎ বিচিত্র ঐশ্বর্যময় সাহিত্য নিদর্শনগুলো। **শৈবাল**— শ্যাওলা। **সঁপি**— সঁপে, সমর্পণ করে। **স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী করে দিলা পরে**— মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার মূলে কবি যে গভীর প্রেরণা অনুভব করেছিলেন তাকে কবি বাংলা ভাষার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্বপ্নাদেশ বলে কল্পনা করেছেন। **হে বঙ্গ**— বঙ্গ বলতে কবি বাংলা ভাষাকেই বুঝিয়েছেন এবং তাকেই সম্বোধন করেছেন।



সারসংক্ষেপ

স্বদেশের প্রতি, মাতৃভাষার প্রতি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ ফুটে উঠেছে এই কবিতার প্রতিটি চরণে। এখানে কবি শুধু তাঁর সুগভীর হৃদয়বেগই প্রকাশ করেননি, সবকিছু ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে মাতৃভাষার মহিমা এবং সুগভীর দরদ। স্বদেশ ও স্বভাষাকে অবহেলা করে কবি ভিনদেশি সাহিত্যে খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা করেন। তাতে ব্যর্থ হওয়ায় একদা তাঁর মধ্যে শুভবোধ জাগ্রত হয়। তিনি বুঝতে সক্ষম হন মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে বিদেশি-ভাষা চর্চার মাধ্যমে পূর্ণ সফলতা সম্ভব নয়। বরং মাতৃভাষা চর্চার মাধ্যমেই কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভ করা যায়। কবি বিদেশি ভাষাকে পরধন বলে আখ্যায়িত করে সেই ধন লাভ করার চেষ্টাকে ভিক্ষাবৃত্তির সামিল মনে করেছেন। মাতৃভাষা বাংলা বিবিধ রত্নে পরিপূর্ণ। বাংলা ভাষার যে ঐশ্বর্য রয়েছে তা নিয়েই নির্মিত হতে পারে কালজয়ী সাহিত্য। তাই এ কবিতাটিতে কবি মূলত মাতৃভাষা ভুলে গিয়ে অন্য ভাষায় সাহিত্য রচনার ব্যর্থতা এবং মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনার পরিতৃপ্তির কথা বলেছেন। এই কবিতায় কবির ব্যক্তি-জীবনের প্রভাব পড়েছে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘সঁপি’ শব্দের অর্থ কী?

ক. অর্পণ করে	খ. সমর্পণ করে
গ. বরণযোগ্য	ঘ. বিবিধ রতন

২. কবি ‘কমল-কানন’ বলতে বুঝিয়েছেন—

ক. ফরাসি সাহিত্য	খ. শ্যাওলাবন
গ. পদ্মবন	ঘ. বাংলা সাহিত্য



নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

মাগো তোমার কোলে, তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালোবাসা, আ-মরি বাংলা ভাষা।

৩. উদ্দীপকটির ভাব যে চরণে প্রতিফলিত হয়েছে—

ক. পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
গ. কত নদী সরোবর, কিবা জল চাতকীর

খ. হে বঙ্গ, ভাঙারে তব বিবিধ রতন
ঘ. বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী

৪. উদ্দীপক ও ‘বঙ্গভাষা’ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে—

i. ভাষাপ্রীতি
ii. বিত্তবাসনা
iii. প্রকৃতিপ্ৰীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও ii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. ‘সনেট’ হচ্ছে কবিতার একটি—

ক. বিশেষ রূপকল্প
গ. তাত্ত্বিক আলোচনা

খ. আত্মসমালোচনা
ঘ. বিশেষ চিত্রকল্প

৬. ‘বঙ্গভাষা’ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে ‘মাতৃভাষার’—

i. সৌন্দর্য
ii. মাদুর্য
iii. মহিমা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় সে- যে মায়ের মুখের ভাষা।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘বঙ্গভাষা’ কবিতার মিল রয়েছে—

ক. শিল্পরূপে
গ. চিত্রকল্পে

খ. ভাবে
ঘ. উৎপ্রেক্ষায়

৮. উদ্দীপক ও ‘বঙ্গভাষা’ কবিতার তাৎপর্য হচ্ছে—

ক. মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ
গ. কবির আত্মসমালোচনা

খ. কবির সাফল্য ও ব্যর্থতা
ঘ. প্রথাবিরোধী মানসিকতা

সৃজনশীল প্রশ্ন :

আমি বাংলায় ভালোবাসি
আমি বাংলাকে ভালোবাসি
আমি তারই হাত ধরে
সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আসি
আমি যা কিছু মহান বরণ করেছি



বিন্দু শ্রদ্ধায়
মেশে তের নদী সাত সাগরের জল
গঙ্গায় পদ্মায়।

- ক. ‘বঙ্গভাষা’ কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
খ. ‘মাতৃকোষে রতনের রাজি’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘বঙ্গভাষা’ কবিতার সাদৃশ্য নিরূপণ করুন।
ঘ. “উদ্দীপকে ‘বঙ্গভাষা’ কবিতার মূলভাব প্রকাশিত হয়েছে।” –মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করুন।

🔑 নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.

‘বঙ্গভাষা’ কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

খ.

‘মাতৃকোষে রতনের রাজি’ বলতে কবি বাংলা ভাষার ঐশ্বর্যময় সাহিত্য-নিদর্শনগুলোকে বুঝিয়েছেন। ‘বঙ্গভাষা’ কবিতায় অনুশোচনাদলিত কবি উপলব্ধি করেছেন তাঁর মাতৃভাষার সাহিত্যের সমৃদ্ধি। তাঁর মতে বাংলা সাহিত্যে রচিত কবিকঙ্কণের ‘চণ্ডীমঙ্গল’, ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’, কাশীরাম দাসের ‘মহাভারত’, কৃত্তিবাসের ‘রামায়ণ’ ইত্যাদি অমূল্য রত্ন। কবি মধুসূদন বাংলা ভাষার এসব চিরায়ত সাহিত্যকর্মকে ‘মাতৃকোষে রতনের রাজি’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

গ.

‘বঙ্গভাষা’ কবিতায় কবির মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অপরিমেয় ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে, যা উদ্দীপকেও ফুটে উঠেছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম জীবনে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। বস্তুত বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতে গিয়েই তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। অবশ্য মাতৃভাষায় কাব্যচর্চার পেছনে তাঁর অন্তরে জমে থাকা গভীর দেশপ্রেম নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছে। উদ্দীপকের কবিতার চরণগুলোতে দেশপ্রেমের অফুরন্ত নিদর্শন রয়েছে। উদ্দীপকের কবিতায় কবি বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশকে ভালোবাসার কথা বলেছেন। দেশপ্রেমের দৃষ্টিকোণ হতে এখানে প্রকৃতিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। উদ্দীপকে বলা হয়েছে সব নদীর জল যেমন সাগর সঙ্গমে এসে মিলিত হয় তেমনি বাঙালি জাতি ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত হলেও অভিন্ন আত্মার বন্ধনে বিশ্বাসী। এছাড়া উদ্দীপকে বাংলার মানুষের সঙ্গে বিশ্বমানবের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে ‘বঙ্গভাষা’ কবিতায়ও মাইকেল মধুসূদনের হৃদয়ে সঞ্চিত গভীর দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কবিতাটিতে কবির হৃদয়ের সত্তা বাংলা ভাষায় আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে পূর্ণতার আনন্দ লাভ করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সঙ্গে ‘বঙ্গভাষা’ কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ.

উদ্দীপক ও ‘বঙ্গভাষা’ কবিতায় মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাপ্রীতির অন্তরালে দেশপ্রেম প্রকাশিত হওয়ায় উভয়ের মূলভাব একই রকম হয়েছে।

‘বঙ্গভাষা’ কবিতাটিতে বাংলা ভাষার মাধুর্য ও এর প্রতি গভীর অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। এতে মাতৃভাষাকে ঘিরে কবির জীবনে যে আত্মোপলব্ধি ঘটেছিল তারও বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। এ কবিতায় মূলত মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের মধ্য দিয়ে দেশমাতৃকার প্রতিই গভীর মমত্ববোধ ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে দেশপ্রেমের এক অনিন্দ্য সুন্দর উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে স্বভাষা, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগের মধ্য দিয়ে। উপরন্তু উদ্দীপকে রয়েছে বিশ্বমানবতার প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধ। অন্যদিকে ‘বঙ্গভাষা’ কবিতায় দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় স্বভাষাপ্রীতির অনুষঙ্গে। উদ্দীপক ও ‘বঙ্গভাষা’ কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উভয় স্থানেই দেশপ্রেম প্রধান হয়ে উঠেছে। অবশ্য উদ্দীপক ও কবিতাটিতে প্রকাশভঙ্গির দিক দিয়ে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে।



উদ্দীপকে কবির চেতনায় বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের প্রতি তীব্র অনুরাগ লক্ষ করা যায়। এখানে অভিন্ন বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া বাঙালি জাতিসত্তার সঙ্গে সংযোগ সাধন করা হয়েছে সর্বমানবের। ‘বঙ্গভাষা’ কবিতায়ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত উপলব্ধি করেছেন যে, মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করা গৌরবের। তাই কবিতায় তিনি মাতৃভাষার বন্দনা করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশপ্রেমকেও তুলে ধরেছেন। কবিতার প্রবহমাণ পটভূমিতে কবি মাতৃভাষার ঐশ্বর্যের প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করেছেন। কবিতার এ বিষয়গুলো দেশপ্রেমেরই উদাহরণ, যা উদ্দীপককে স্মরণ করিয়ে দেয়। অতএব, পর্যালোচনা শেষে একথা বলা যায় যে, উদ্দীপকে ‘বঙ্গভাষা’ কবিতার মূলভাব প্রকাশিত হয়েছে।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।

নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ ন যায় ॥

মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গত বসতি।

দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি ॥

ক. বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করেন কে?

খ. ‘পালিলাম আজ্ঞা সুখে’ বলতে কী বোঝায়?

গ. ‘বঙ্গভাষা’ কবিতার কোন চেতনার সঙ্গে উদ্দীপকের মিল রয়েছে? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘বঙ্গভাষা’ কবিতার কবি চেতনার দিক থেকে এক অভিন্ন সত্তা।” –মূল্যায়ন করুন।

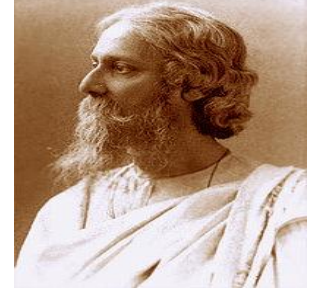


উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. গ ৩. ক ৪. ক ৫. ক ৬. ঘ ৭. খ ৮. ক



সোনার তরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



কবি-পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ বাবা-মার চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র। তাঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমী প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার জন্য পাঠানো হলেও বিদ্যালয়ের পড়ালেখার প্রতি তিনি মনোযোগী ছিলেন না। ঠাকুর বাড়ির অনুকূল পরিবেশে শৈশবেই রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ১৮৭৬ সালে পনের বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *বনফুল*। অতঃপর কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, ভ্রমণসাহিত্য, রম্যরচনা, সঙ্গীত ইত্যাদি শাখায় রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন তাঁর অসামান্য শিল্প-প্রতিভার স্বাক্ষর। বাংলা কবিতাকে তিনিই প্রথম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রসারিত করেন। কবিতার বিষয়বস্তু এবং প্রকাশরীতিতে রবীন্দ্রনাথের নিত্য-নতুন পরীক্ষা বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে। কেবল সাহিত্যিক হিসেবেই নয়, একজন কর্মযোগী মানুষ হিসেবেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্য কীর্তির পরিচয় রেখে গেছেন। ১৯০১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়’। এটিই পরবর্তীকালে ‘বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়’-এ রূপলাভ করে। *গীতাঞ্জলি* ও অন্য কিছু কবিতার সমন্বয়ে স্ব-অনুদিত *Song Offerings* গ্রন্থের জন্য ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে প্রথম কৃষিব্যাংক স্থাপন করেন। বাংলাদেশের শিলাইদহ, পতিসর এবং শাহজাদপুরে জমিদারি তত্ত্বাবধান সূত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত করেন। গীতিকার ও চিত্রশিল্পী হিসেবেও রবীন্দ্রনাথের অবদান অনন্যসাধারণ। ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ) কলকাতায় তিনি পরলোকগমন করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

- কাব্যগ্রন্থ** : মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), ক্ষণিকা (১৯০০), গীতাঞ্জলি (১৯১১), বলাকা (১৯১৬), পুনশ্চ (১৯৩২), জন্মদিনে (১৯৪১), শেষলেখা (১৯৪১);
- উপন্যাস** : চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯১০), ঘরে-বাইরে (১৯১৬), শেষের কবিতা (১৯২৯);
- ছোটগল্প** : গল্পগুচ্ছ (১ম ও ২য় খণ্ড-১৯২৬, ৩য় খণ্ড-১৯২৭), তিনসঙ্গী (১৯৪১), গল্পসল্প (১৯৪১);
- নাটক** : বিসর্জন (১৮৯০), চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২), অচলায়তন (১৯১২), ডাকঘর (১৯১২), রক্তকরবী (১৯২৬);
- প্রবন্ধ** : আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭), কালান্তর (১৯৩৭), সাহিত্যের স্বরূপ (১৯৪৩);
- আত্মজীবনী** : জীবন স্মৃতি (১৯১২), ছেলেবেলা (১৯৪০)।

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সোনার তরী’ কবিতাটি ‘সোনার তরী’ কাব্যগ্রন্থের নামকবিতা। এই কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর অধিকাংশ পঙ্ক্তি ৮+৫ মাত্রা পূর্ণপর্বে বিন্যস্ত। সুদীর্ঘ কাল ধরে এই কবিতাটি অনেক আলোচনা ও ব্যাখ্যায় নতুন নতুন তাৎপর্যে অভিষিক্ত। এই কবিতাটিতে কবির জীবনদর্শন অপূর্ব মহিমায় প্রকাশিত হয়েছে। মহাকালের শ্রোতে জীবন-যৌবন ভেসে যায়, কিন্তু মানুষের সৃষ্ট কর্ম বেঁচে থাকে অনন্তকাল।



উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সোনার তরী’ কবিতাটি পড়ার পর আপনি—

- রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তরী’ কবিতার মূলভাব লিখতে পারবেন।
- এ কবিতায় কবির যে জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সোনার ধানের সম্ভার নিয়ে অপেক্ষারত নিঃসঙ্গ ও আশাহত কৃষকের মনোবেদনার কারণবর্ণনা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভরা ভরা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা,
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা ॥
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা—
এপারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা।

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা পালে চলে যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু ধারে—
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

ওগো, তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে,
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।
যেয়ো যেথা যেতে চাও,
যারে খুশি তারে দাও,
শুধু তুমি নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে



আমার সোনার ধান কূলেতে এসে ।

যত চাও তত লও তরণী-’পরে ।

আর আছে?—আর নাই, দিয়েছি ভরে

এতকাল নদীকূলে

যাহা লয়ে ছিনু ভূলে

সকলই দিলাম তুলে

থরে বিথরে—

এখন আমারে লহো করুণা করে ।

ঠাই নাই, ঠাই নাই— ছোটো সে তরী

আমারি সোনার ধারে গিয়েছে ভরি ।

শ্রাবণগগন ঘিরে

ঘন মেঘে ঘুরে ফিরে,

শূন্য নদীর তীরে

রহিনু পড়ি—

যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী ।

(শিলাইদহ । বোট । ফাল্গুন ১২৯৮)



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

আমি একলা— কৃষক কিংবা শিল্পশ্রুতি কবির নিঃসঙ্গ অবস্থা। আমার সোনার ধান— কৃষকের শ্রেষ্ঠ ফসল। ব্যঞ্জনার্থে শিল্পশ্রুতি কবির সৃষ্টিসম্ভার। আর আছে আর নাই, দিয়েছি ভরে— ছোট জমিতে উৎপন্ন ফসলের সবটাই অর্থাৎ কবির সমগ্র সৃষ্টি তুলে দেওয়া হয়েছে মহাকালের শ্রোতে ভেসে আসা সোনার তরী-রূপী চিরায়ত শিল্পলোকে। এখন আমারে লহো করুণা করে— ফসল বা সৃষ্টিসম্ভার তুলে দেওয়া হয়েছে নৌকায়। এখন ফসল বা সৃষ্টির শ্রুতি স্থান পেতে চায় ওই মহাকালের নৌকায়। ওগো, তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে? — নির্বিকার মাঝির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কৃষক বা কবির চেষ্টা। ‘বিদেশ’ এখানে চিরায়ত শিল্পলোকের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো দিকে নাই চায়— মহাকালের প্রতীক এই মাঝি নিরাসক্ত বলেই তার সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিপাত নেই। ক্ষুরধারা— ক্ষুরের মতো ধারালো যে প্রবাহ বা শ্রোত। খরপরশা— ধারালো বর্ষা। গরজে— গর্জন করে। গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে— ক্ষুরের মতো ধারালো জলশ্রোতে গান গাইতে গাইতে যে মাঝি পারের দিকে এগিয়ে আসছে, রবীন্দ্র-ভাবনায় সে নির্মোহ মহাকালের প্রতীক। চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা— ধানক্ষেতটি ছোট দ্বীপের আঙ্গিকে চিত্রিত। তার পাশে ঘূর্ণায়মান শ্রোতের উদ্দামতা। নদীর ‘বাঁকা’ জলশ্রোতে বেষ্টিত ছোট ক্ষেতটুকুর আশু বিলীয়মান হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে এ অংশে। ‘বাঁকা জল’ এখানে অনন্ত কালশ্রোতের প্রতীক। ঠাই নাই, ঠাই নাই ছোট সে তরী— সোনার তরীতে মহৎ সৃষ্টিরই স্থান সংকুলান হয় কেবল। ব্যক্তিসত্তা ও তার শারীরিক অস্তিত্বকে নিশ্চিতভাবে হতে হয় মহাকালের নিষ্ঠুর কালগ্রাসের শিকার। তরুছায়ামসীমাখা— ওপারের মেঘে ঢাকা গ্রামটি যেন গাছের ছায়ার কালো রঙে মাখানো। থরে বিথরে— স্তরে স্তরে, সুবিন্যস্ত করে। দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে— এই আগন্তুক মাঝি কৃষক বা শিল্পশ্রুতি কবির হয়ত চেনা। কেননা, চেনা মনে হলেও কৃষক বা শিল্পশ্রুতি কবির সংশয় থেকেই যায়। বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে— চিরায়ত শিল্পলোকে ঠাই পাওয়ার জন্যই কৃষকরূপী কবির ব্যাকুল অনুনয় এখানে প্রকাশিত। ভরা ভরা— ‘ভরা’ অর্থ ধান রাখার পাত্র, এরকম পাত্রের সমষ্টি বোঝাতে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। ভরসা— আশা, নির্ভরশীলতা। শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি— নিঃসঙ্গ অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে আসন্ন ও অনিবার্য মৃত্যুর প্রতীক্ষার ইঙ্গিত। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : “মহাকাল আমার সর্বস্ব লইয়া যায় বটে, কিন্তু আমাকে ফেলিয়া যায় বিস্মৃতি ও অবহেলার মধ্যে। ...সোনার তরীর নেয়ে আমার সোনার ধান লইয়া যায় খেয়াপারে, কিন্তু আমাকে লয় না।



সারসংক্ষেপ

বাংলা কবিতার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তরী’ একটি চিরায়ত আবেদনবাহী কবিতা। এ কবিতায় চারপাশের প্রবল শ্রোতের মধ্যে জেগে থাকা দ্বীপের মতো একটি ধানখেতে নিঃসঙ্গ এক কৃষক তার উৎপন্ন ধানের সম্ভার নিয়ে অপেক্ষমাণ। পাশের খরশ্রোতা নদী আকাশের ঘন মেঘ আর ভারী বর্ষণে হিংস্র হয়ে উঠেছে। চারদিকের ‘বাঁকাজল’ অনন্ত কালশ্রোতের প্রতীক হিসেবে কৃষকের মনে ঘনঘোর সৃষ্টি করেছে। খরশ্রোতা নদীতে তখন ভরাপাল সোনার নৌকা নিয়ে বেয়ে আসা এক মাঝিকে দেখা যায়। চিন্তিত কৃষক মাঝিকে সকাতরে অনুরোধ করে নৌকা কূলে ভিড়িয়ে তার উৎপাদিত সোনার ধান নিয়ে যাওয়ার জন্য। মাঝি সোনার ধান মহাকালের নৌকায় তুলে নিয়ে চলে গেলেও নৌকা ছোট বলে তাতে স্থান হয় না কৃষকের। আশাহত কৃষক শূন্য নদীর তীরে নিঃসঙ্গ অপূর্ণতার বেদনা নিয়ে আসন্ন ও অনিবার্য মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পড়ে রইলেন। কবির উপলব্ধি হয়— মহাকালের শ্রোতে মানুষের জীবন-যৌবন নিষ্ঠুরভাবে ভেসে গেলেও এই পৃথিবীতে মানুষেরই সৃষ্ট সোনার ফসল, তথা তাঁর দর্শন, কর্মযজ্ঞ বেঁচে থাকে চিরকাল।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘সোনার তরী’ কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

ক. স্বরবৃত্ত

খ. মাত্রাবৃত্ত

গ. অক্ষরবৃত্ত

ঘ. গদ্যছন্দ

২. ‘তরুছায়ামসী-মাখা’ কেন বলা হয়েছে?

ক. ছায়াসুনিবিড় পরিবেশকে উপস্থাপন করার জন্য

খ. মেঘলা আবহাওয়াকে নির্দেশ করার জন্য

গ. বৃক্ষ ছায়ার কালচে রং মাখাকে বোঝানোর জন্যে

ঘ. পল্লবায়িত বৃক্ষকে তুলে ধরার জন্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মাদার তেরেসা আজীবন মানবতার জয়গান গেয়েছেন। মানবসেবার জন্য গড়ে তুলেছেন অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। তিনি তাঁর কর্ম ও সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীতে অমর হয়ে রয়েছেন।

৩. উদ্দীপকের মূলভাব কোন পংক্তির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা

খ. একখানি ছোটো খেত আমি একেলা

গ. আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি

ঘ. দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে

৪. উদ্দীপক ও ‘সোনার তরী’ কবিতায় যে ভাব প্রকাশিত হয়েছে—

i. মানুষের জীবনবোধ যন্ত্রণাময়

ii. ব্যক্তিসত্তা নয় টিকে থাকে মানুষের কীর্তি

iii. কালপ্রবাহকে মানুষ এড়াতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও ii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. ‘খরে বিথরে’ শব্দগুচ্ছ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. রাশি রাশি

খ. বোঝা বোঝা

গ. স্তরে স্তরে

ঘ. সারি সারি

৬. ‘সোনার তরী’ কবিতায় কৃষক মাঝিকে কী অনুরোধ করেছিল?

ক. কৃষকের সঙ্গে গল্প করতে

খ. কৃষকের ভয় দূর করে দিতে

গ. সোনার ধান নৌকায় তুলে দিতে

ঘ. সোনার পাট নৌকায় তুলে দিতে



নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে

আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে?

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে কোন চরণের মিল রয়েছে?

ক. গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা

খ. যত চাও তত লও তরগী-’পরে

গ. শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি

ঘ. যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী

৮. উদ্দীপক ও ‘সোনার তরী’ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে—

i. বর্ষার প্রকৃতি

ii. নিঃস্ব কৃষক

iii. সৃষ্টিশীল কর্ম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

গ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে চির তারুণ্যের প্রতীক। চিরায়ত বাঙালির সংস্কৃতি তাঁর কাব্যকর্মে স্মৃতি লাভ করেছে। বিদ্রোহ, সাম্য ও মানবতাবোধের কথা লিখে তিনি বাঙালি চিন্তে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন কাল থেকে কালান্তরে। তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে ১৯৭৬ সালে। অথচ তাঁর সৃষ্টিকর্ম এখনো বাঙালি জাতির চেতনার ফল্গুধারা। তাঁর কবিতা ও গান এখনও বাংলার মানুষের চেতনার অফুরান উৎস। তিনি তাঁর সৃষ্টিশীল কর্মে আমাদের মাঝে অমর হয়ে আছেন।

ক. ‘সোনার তরী’ কবিতায় কোন ঋতুর কথা বলা হয়েছে?

খ. ‘যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী’ –কথাটির মাধ্যমে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. ‘সোনার তরী’ কবিতার জীবনদর্শন উদ্দীপকে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. “মহৎ কর্মই পৃথিবীতে মানুষকে অমরত্ব দান করে।” –উদ্দীপক ও ‘সোনার তরী’ কবিতার আলোকে মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.

‘সোনার তরী’ কবিতায় বর্ষা ঋতুর কথা বলা হয়েছে।

খ.

মহাকাল মানুষকে নয়, বরং তার সৃষ্টিশীলতাকে ধারণ করে। আলোচ্য চরণটির মাধ্যমে এ সত্যটিকেই তুলে ধরা হয়েছে। ‘সোনার তরী’ কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লিখিত চরণে রূপকের আড়ালে একটি গভীর জীবন দর্শনকে প্রকাশ করেছেন। কবিতায় দেখা যায়, সোনার তরীর মাঝে কৃষকের সব ফসল তরীতে তুলে নেয় কিন্তু তরীতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ধানক্ষেতে একাকী দাঁড়িয়ে থাকে কৃষক। এখানে সোনার তরী মহাকালের প্রতীক। এ তরীতে শুধু মানুষের সৃষ্টিকর্মের ঠাঁই হয়, কোনো ব্যক্তিসত্তা নয়। তাই ব্যক্তি মানুষ তথা কবিতায় বর্ণিত কৃষককে ধানক্ষেতে একাকী অপেক্ষমান রেখে তার সোনার ধান অর্থাৎ সৃষ্টিকর্মকে সোনার তরী বয়ে নিয়ে যায়।

গ.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সোনার তরী’ কবিতায় অন্তর্লীন হয়ে রয়েছে একটি গভীর জীবন দর্শন। এটি উদ্দীপকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

‘সোনার তরী’ কবিতাটিতে রূপকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে মানব জীবনের এক শ্বশত দর্শন। কবিতার রূপকল্পে রয়েছে বর্ষার শ্রোত পরিবেষ্টিত ধানক্ষেতে রাশি রাশি সোনার ধান নিয়ে অপেক্ষা করছে একজন কৃষক। অপেক্ষার একপর্যায়ে ভরা



পালে তরী বেয়ে চলে যেতে থাকা এক মাঝিকে ধানগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে সে। কিন্তু মাঝি কেবল কৃষকের ধানগুলো তরীতে ভরে নেয়। সোনার তরীতে স্থানের অভাবে কৃষকের আর ওঠা হয় না।

কবিতায় সোনার তরী হচ্ছে প্রবহমান সময়ের প্রতীক। মানুষ একদিন এই পৃথিবী থেকে চলে যাবে। কিন্তু এখানে টিকে থাকবে কেবল তার সোনার ধান তথা কর্মফল। ‘সোনার তরী’ কবিতার এ ভাবটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত কাজী নজরুল ইসলাম ব্যক্তিমানুষ হিসাবে বেঁচে নেই কিন্তু টিকে আছে তাঁর সৃষ্টিকর্ম। বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহ, সাম্য ও মানবতাবোধের কথা লিখে তিনি আজও প্রেরণা যোগাচ্ছেন সাধারণ মানুষকে। তাঁর অবিনাশী গান, ধ্রুপদী কবিতা এখনও বাংলাভাষী পাঠকের চিরপ্রেরণার উৎস। যেকোন আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর সৃষ্টিকর্ম আমাদের চেতনার প্রদীপ্ত শিখা। তাই বলা যায়, কবিতাটির অন্তর্নিহিত জীবন দর্শন উদ্দীপকে যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ.

উদ্দীপক ও ‘সোনার তরী’ কবিতা উভয়টিতে ফুটে উঠেছে যে, মহৎ কীর্তিই মানুষকে পৃথিবীতে অমরত্ব প্রদান করে। পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে থাকে তাঁর কর্মের মাধ্যমে। কেননা, মহাকালের চিরন্তন শ্রোতে মানুষ তার অনিবার্যতাকে এড়াতে পারে না। অতৃপ্তির বেদনা নিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে হয় কালশ্রোতে বিলীন হওয়ার জন্য। মহাকালরূপী সোনার তরী শুধু মানুষের সৃষ্টিকেই ধারণ করে, ব্যক্তি-মানুষকে নয়।

কবিতায় কৃষক তাঁর জমি থেকে সোনার ধান কেটে অপেক্ষায় আছে কখন তরী এসে সোনার ফসলসহ তাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে তরীতে সমস্ত ফসল তোলা হলে সেখানে কৃষকের জন্য আর এতটুকু জায়গাও অবশিষ্ট থাকে না। অর্থাৎ মহাকালের শ্রোতে ব্যক্তি-মানুষ বা কবিতার কৃষক হারিয়ে যায় ঠিকই কিন্তু বেঁচে থাকে তার সোনার ধান বা কর্মফল। কবিতায় বর্ণিত এ কর্মফল উদ্দীপকের কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিকর্মের সমতুল্য। কালের শ্রোতে ব্যক্তি নজরুল হারিয়ে গেলেও তাঁর কীর্তির মধ্য দিয়ে তিনি অমরত্ব পেয়েছেন।

উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সাহিত্যে বিদ্রোহ, সাম্য ও মানবতাবোধের কথা বলেছেন। তাঁর সৃষ্টিকর্ম সমাজ পরিবর্তন ও জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে শ্রেণিসংগ্রাম ও স্বাধিকার আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছে। তাঁর কবিতা ও গান বর্তমানেও বাঙালির প্রতিদিনকার চেতনার অফুরন্ত উৎস। তিনি তাঁর মহৎ সৃষ্টিকর্মের জন্যই এখনও বেঁচে আছেন বাঙালির হৃদয়ে। ‘সোনার তরী’ কবিতায়ও প্রকাশিত হয়েছে একই জীবন দর্শন। তাই উদ্দীপক এবং ‘সোনার তরী’ কবিতার আলোকে বলা যায়, মহৎ কর্মই মানুষকে পৃথিবীতে অমরত্ব দান করে।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর
আউশের খেত জলে ভরভর,
কালি-মাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ চাহি রে।

ক. ‘গীতাঞ্জলি’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন জাতীয় রচনা?

খ. ‘দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।’ –উক্তিটির তাৎপর্য লিখুন।

গ. ‘সোনার তরী’ কবিতার কোন দিকটির সঙ্গে উদ্দীপকের সাদৃশ্য রয়েছে? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘সোনার তরী’ কবিতায় বর্ষার অনিন্দ্য সুন্দর রূপটি উদ্ভাসিত হয়েছে।” –বিচার করুন।



উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. গ ৩. গ ৪. খ ৫. গ ৬. গ ৭. ক ৮. ক



সাম্যবাদী কাজী নজরুল ইসলাম



কবি-পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৫ মে (বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম দুখু মিয়া। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। নজরুল অল্প বয়সেই পিতামাতা দুজনকেই হারান। শৈশব থেকেই দারিদ্র্য আর দুঃখ-কষ্ট ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। স্কুলের ধরাবাঁধা জীবনে কখনোই তিনি আকৃষ্ট হননি। বারো বছর বয়সে তিনি লেটো গানের দলে যোগ দেন ও পালাগান লেখেন। পরে বর্ধমানে ও ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার দরিরামপুর হাইস্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ১৯১৭ সালে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে করাচি যান। যুদ্ধশেষে নজরুল কলকাতায় ফিরে আসেন ও সাহিত্যসাধনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি কিছুদিন মসজিদে ইমামতিও করেন। সাপ্তাহিক বিজলি পত্রিকায় ‘বিদ্রোহী’ কবিতা প্রকাশের পর সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত হন। তাঁর লেখায় তিনি বিদেশি শাসক, সামাজিক অবিচার ও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নজরুল সাহিত্য রচনা ছাড়াও কয়েক হাজার গানের রচয়িতা। তিনি বেশ কয়েকটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। তিনি গজল, খেয়াল ও রাগপ্রধান গান রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক ব্যবহার তাঁর কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের তৈরি করা পথে না চলে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে নিজেকে বিকশিত করেছেন। সাহিত্যে এনেছেন সাম্যবাদ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা। গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রচনায়ও তিনি কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। সম্পাদক এবং সমালোচক হিসেবেও নজরুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি মূলত যৌবনের কবি। যৌবনের ধর্মই হল একদিকে যেমন বিদ্রোহ এবং প্রতিবাদ, অন্যদিকে প্রেম। এ দুটো অনুভূতিরই সূচনা হয় আবেগের প্রাবল্য থেকে। নজরুলের ভাষণ, সম্পাদকীয়, সমালোচনা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভাষার কাব্যিক ব্যঞ্জনা এবং বলিষ্ঠতায় পূর্ণ। তিনি দৈনিক নবযুগ, ধূমকেতু ও লাঙল পত্রিকায় সম্পাদকের কাজ করেছেন। মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ১৯৭২ সালে কবিকে ঢাকায় আনা হয় এবং তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করে জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। কবিকে ঢাকা ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ডিলিট, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ‘জগত্তারিণী স্বর্ণপদক’, ভারত সরকার ‘পদ্মভূষণ’ ও বাংলাদেশ সরকার ‘একুশে পদক’ প্রদান করে। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

নজরুলের প্রধান সাহিত্যকর্ম :

- কাব্যগ্রন্থ** : অগ্নিবীণা (১৯২২), বিষের বাঁশী (১৯২৪), ছায়ানট (১৯২৪), সাম্যবাদী (১৯২৫), সর্বহারা (১৯২৬), সিঙ্কু-হিন্দোল (১৯২৭), চক্রবাক (১৯২৯), ফণি-মনসা (১৯২৯), প্রলয়-শিখা (১৯৩০);
- উপন্যাস** : বাঁধনহারা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০), কুহেলিকা (১৯৩১);
- গল্পগ্রন্থ** : ব্যথার দান (১৯২২), রক্তের বেদন (১৯২৫), শিউলিমালা (১৯৩১);
- প্রবন্ধগ্রন্থ** : যুগবাণী (১৯২২), রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩), দুর্দিনের যাত্রী (১৯২৬), রুদ্রমঙ্গল (১৯২৬)।

ভূমিকা

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত সাম্যবাদী কবিতাটি আবদুল কাদের সম্পাদিত বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ‘নজরুল রচনাবলি’র প্রথম খণ্ড থেকে সংকলিত হয়েছে। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত ‘সাম্যবাদী’ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত এ কবিতাটি বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক মানব সমাজ গঠনের প্রত্যাশায় রচিত হয়েছে। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীর দোহাই দিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদকে ভুলে কবি মানবতার মর্মবাণীকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আহ্বান জানিয়েছেন এই কবিতায়।



উদ্দেশ্য

কাজী নজরুল ইসলামের ‘সাম্যবাদী’ কবিতাটি পড়ার পর আপনি—

- ✚ নজরুল ইসলামের জীবনদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ✚ ‘সাম্যবাদ’ শব্দটির অর্থের ব্যাপকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ✚ কবি মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে কীভাবে মন্দির, মসজিদ, গীর্জার তুলনা করেছেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ✚ এ কবিতা অবলম্বনে নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা কীভাবে আমাদের জীবনপথের প্রেরণা হতে পারে তা আলোচনা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

গাহি সাম্যের গান—

যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম খ্রিস্টান।

গাহি সাম্যের গান!

কে তুমি?— পার্শি? জৈন? ইহুদি? সাঁওতাল, ভীল, গারো?
কন্ফুসিয়াস? চার্বাক— চেলা? বলে যাও, বল আরও!

বন্ধু, যা খুশি হও,
পেটে-পিঠে, কাঁধে-মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক—
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থ-সাহেব পড়ে যাও যত সখ,—
কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর-কষাকষি?— পথে ফোটে তাজা ফুল!
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।
কেন খুঁজে ফের দেবতা-ঠাকুর মৃত-পুথি-কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে!

বন্ধু, বলিনি বুট,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
এই রণ-ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হলো মেঘের রাখাল নবির খোদার মিতা।
এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি



ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আস্থান,
এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান!
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

আরব-দুলাল— আরব সন্তান। এখানে হযরত মুহম্মদ (স) কে বোঝানো হয়েছে। **ইহুদি**— প্রাচীন হিব্রু বা জু-জাতি ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ। **কনফুসিয়াস**— চীন দেশের একজন প্রখ্যাত দার্শনিক। এখানে তাঁর অনুসারীদের বোঝানো হয়েছে। **কন্দরে**—পর্বতের গুহা, হৃদয়ের গভীর গোপন স্থান। **কোরানের সাম্য-গান**— পবিত্র কোরানের সাম্যের বাণী। **কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া**— হিন্দুদের পবিত্র ধর্মীয় কয়েকটি স্থান। **গারো**— গারো পর্বত অঞ্চলের অধিবাসী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বিশেষ। **চার্বাক**— একজন বস্তুবাদী দার্শনিক ও মুনি। তিনি বেদ, আত্মা, পরলোক ইত্যাদিতে আস্থাশীল ছিলেন। **জেরুজালেম**— বায়তুল-মোকাদ্দস। ফিলিস্তিনে অবস্থিত এই স্থানটি মুসলমান, খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের নিকট সমভাবে পুণ্যস্থান। **জেন্দাবেস্তা**— পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা এবং তার ভাষা জেন্দা। **জৈন**— জিন বা মহাবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতাবলম্বী সম্প্রদায়। **ঝুট**— মিথ্যা। **দেউল**— দেবালয়, মন্দির। **নীলাচল**— জগন্নাথক্ষেত্র, নীলবর্ণযুক্ত পাহাড়। যে বিশাল পাহাড়ের পরিসীমা নির্ধারণ করা যায় না। **পার্সি**— পারস্যদেশের বা ইরানের নাগরিক। **বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা**— হিন্দুধর্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। **মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়**— মানুষের হৃদয়ই মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রের মতো পবিত্র। **যুগাবতার**— বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ মহাপুরুষ। **শাক্যমুনি**— শাক্যবংশে জন্ম যার, বুদ্ধদেব। **সাম্য**— সমদর্শিতা, সমতা। **সাম্যবাদ**— জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল মানুষের সমান অধিকার থাকা উচিত এই মতবাদ। **সাঁওতাল, ভীল**— ভারতীয় উপমহাদেশের আদিম নৃগোষ্ঠী বিশেষ। **সকল শাস্ত্রখুঁজে পাবে সখা খুলে দেখে নিজ প্রাণ**— ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরান শরিফ, হিন্দুদের বেদ, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বাইবেল—এভাবে পৃথিবীর নানাজাতির নানা ধর্মগ্রন্থ। কবি এখানে বলতে চেয়েছেন সকল ধর্মগ্রন্থের মূলমন্ত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যেই সংকলিত আছে তা হচ্ছে মানবতাবোধ, সমতার দৃষ্টিভঙ্গি। **হিয়া**— হৃদয়।



সারসংক্ষেপ

এই কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। কবির বিশ্বাস মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে পরিচিত হয়ে ওঠা সবচেয়ে সম্মানের। নজরুলের এ আদর্শ আজও প্রতিটি মানুষের জীবনপথের প্রেরণা। কিন্তু মানুষ সম্প্রদায়কে ব্যবহার করে রাজনীতি করে, দুর্বলকে শোষণ করে, এখনও একের বিরুদ্ধে অন্যকে উচ্ছেদ দেয়। এক জনের প্রতি অন্য জনকে বিমুখ করার ষড়যন্ত্র করে। নজরুল এ কবিতায় বলেছেন— “মানুষেরই মাঝে স্বর্গনরক মানুষেতে সুরাসুর।” নজরুল জোর দেন অন্তর ধর্মের ওপর। ধর্মগ্রন্থ পড়ে অর্জিত জ্ঞান যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে প্রয়োজন মানবিকতাবোধ। কবি বলেছেন মানুষের হৃদয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন মন্দির কাবা নেই। কবি সকল মত, সকল পথের উপরে স্থান দিয়েছেন মানবিকতা। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলিম সকলকে একই মায়ের সন্তানের মতো ভেবেছেন। নজরুল মানবিক মেলবন্ধনের জন্য সংগীত রচনা করেছেন। বাণী ও সুরের মাধ্যমে মানবতার সুবাস ছড়ানোর চেষ্টা করেছেন। নজরুল ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় মন্দির, মসজিদ, গির্জা বা অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রের মতো পবিত্র মনে করেছেন মানুষের হৃদয়কে। এ হৃদয় যদি পবিত্র থাকে, হৃদয়ে যদি কারো প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ না থাকে, সকলের প্রতি সমদর্শিতা থাকে তাহলে পৃথিবী হবে সুখের আবাসস্থল। সাম্যবাদ মানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল মানুষের সমান অধিকার থাকা উচিত এ মতবাদ। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় সব ধরনের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাম্যবাদের বাণী প্রচার করেছেন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'কনফুসিয়াস' কে?

ক. চীনা দার্শনিক	খ. হিব্রু কবি
গ. ভারতীয় কবি	ঘ. ইরানি দার্শনিক

২. 'খোদার মিতা' বলতে বোঝানো হয়েছে—

ক. ঈশ্বরের সহচর	খ. খোদার সহচর
গ. আল্লাহর বন্ধু	গ. যিশুর অনুসারী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

যখন তুমি ভবে এলে
তখন তুমি কি জাত ছিলে
কি জাত হবে যাবার কালে
সেই কথা কেন বল না।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে আপনার পঠিত কোন কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে—

ক. লোক-লোকান্তর	খ. সাম্যবাদী
গ. সোনার তরী	গ. ঐকতান

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

৪. উদ্দীপক ও 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি সবার উপরে স্থান দিয়েছেন—

ক. ধর্মকে	খ. সাম্যবাদকে
গ. মানুষকে	ঘ. প্রশান্তিকে



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. মথুরা কাদের পবিত্র ধর্মীয় স্থান?

ক. হিন্দু	খ. মুসলমান
গ. বৌদ্ধ	ঘ. খ্রিষ্টান

৬. কাশী-মথুরা-বৃন্দাবন-গয়া বলতে বোঝানো হয়েছে ?

ক. পর্বতের গুহা	খ. ঐতিহাসিক স্থান
গ. ধর্মীয় স্থান	ঘ. মানুষের হৃদয়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মুহম্মদ কবির নিজের এলাকায় একজন বিদ্বান পণ্ডিত হিসাবে পরিচিত। তিনি এলাকার হিন্দু-মুসলিমকে সমান চোখে দেখেন। তার কাছে সকল ধর্মের মানুষ ন্যায়বিচার পেয়ে থাকে।

৭. 'সাম্যবাদী' কবিতার কোন ভাবটি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে?

- অসাম্প্রদায়িক চেতনা
- সাম্প্রদায়িক চেতনা
- সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. ii ও iii



৮. মুহম্মদ কবির ও ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কাজী নজরুল ইসলামের উপজীব্য-

- i. মনুষ্যত্ববোধ
- ii. ধর্মীয় মাহাত্ম্য
- iii. বংশ পরিচয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ
কাণ্ডারি ! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।
হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারি ! বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার !

ক. ‘চার্বাক’ কে?

খ. কবি ‘সাম্যের গান’ গেয়েছেন কেন?

গ. উদ্দীপকে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার কোন দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ‘সাম্যবাদী’ কবিতার চেতনাকে ধারণ করেছে।” –উক্তিটি মূল্যায়ন করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.

চার্বাক একজন মুনি ও বস্তুবাদী দার্শনিক।

খ.

সাম্যবাদ বলতে কবি রাষ্ট্রের সকল নাগরিক অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার ভোগ করাকে বুঝিয়েছেন।

‘সাম্য’ শব্দের অর্থ সমতা। এটি একটি রাজনৈতিক পরিভাষা। একটি রাষ্ট্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ধনী-দরিদ্র সকল নাগরিক একই রকম অধিকার ভোগ করে। রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে সবার সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এর যদি কোন ব্যত্যয় ঘটে তবে সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদ্বিত হয়। ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাম্যবাদের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ধর্মের অচলায়তন ভেঙ্গে একটি আদর্শ মানবসমাজ গঠনে সকলকে উজ্জীবিত করেছেন।

গ.

উদ্দীপকে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। কবি সাম্যের গান গেয়ে মানবসমাজকে জোটবদ্ধ করতে চেয়েছেন। তাঁর সাম্যের সমাজে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কোনো পার্থক্য থাকবে না। সবকিছু ছাপিয়ে মানুষের ‘মানুষ’ পরিচয়টিই বড় হয়ে উঠবে।

উদ্দীপকের কবিতায় অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। এখানে অসহায় জাতি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ডুবন্ত প্রায়। এ অসহায় জাতিকে উদ্ধার করা কাণ্ডারির দায়িত্ব। এরা হিন্দু না মুসলিম এটা কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। এরা মানুষ, এটিই বিবেচ্য বিষয়। বস্তুত উদ্দীপকে কবির একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ জাহত করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ‘সাম্যবাদী’ কবিতায়ও কবি কাজী নজরুল ইসলাম মানবতাবাদী। তিনি এই কবিতায় সাম্যের গান গেয়ে গোটা মানবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে আগ্রহী। তাঁর স্বপ্নের সমাজে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমঅধিকার নিশ্চিত হবে। এ সমাজে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি ভেদাভেদ থাকবে না। অতএব, বলা যায় উদ্দীপকে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।



ঘ.

উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ‘সাম্যবাদী’ কবিতার চেতনাকে ধারণ করেছে— মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মননে মানবতাবাদী চেতনাকে লালন করেছেন। মানবধর্মকে তিনি জাতিধর্মের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। কবি ধর্মীয় ভেদ ভুলে হিন্দু, খ্রিষ্টান, মুসলিম, বৌদ্ধদের মধ্যে সাম্যের কথা বলেছেন। কবি আশা করেছেন- সমাজে মানুষে মানুষে সব ব্যবধান ঘুচে গিয়ে সংকীর্ণবাদীদের পতন ঘটবে। তিনি কবিতাটিতে ধর্মের বেড়া জাল ডিঙ্গিয়ে পৃথিবীতে সাম্যের সমাজ গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মানবতার গান গেয়েছেন। তাঁর চেতনায় মানবতাবাদী বোধ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ কবিতার মূলসুর শ্রেণিহীন মানবতাবাদী সমাজ গড়ার প্রত্যয়। কবি এই মানবতার গান গেয়ে গোটা মানবসমাজকে একসঙ্গে সংযুক্ত করতে চেয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার চেয়ে সুন্দর পৃথিবীতে আর কিছু হতে পারে না। বস্তুত মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান ঘুচিয়ে শান্তির বার্তা ঘোষণা করা হয়েছে ‘সাম্যবাদী’ কবিতায়। উদ্দীপকের কবিতায়ও কবির মানবতাবাদী চেতনার আদর্শ ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকের কবিতাংশে কাণ্ডারি জাতির কর্ণধার। তার কাঁধে অসহায় জাতিকে উদ্ধারের গুরুভার। এ কাজে মানুষের ধর্ম ও বর্ণ পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানুষের মানুষ পরিচয়টিই কাণ্ডারির কাছে বড় হবে। মূলত ‘সাম্যবাদী’ কবিতার মানব চেতনাই উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজন্ম অসাম্প্রদায়িক মানব চেতনাকে লালন করেছেন। এটিকেই তিনি ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় ভাবে ও ভাষায় তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় সাম্যের গান গেয়ে মানব সমাজকে এক করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তিনি কল্পনা করেছেন আমাদের সমাজে এক উদার মানবতাবাদী পবিত্র আত্মার উদ্বোধন ঘটবে। ‘সাম্যবাদী’ কবিতার মতো উদ্দীপকেরও অগ্নিষ্ট কাণ্ডারির কাছে মানুষের বড় পরিচয় হবে ‘মানুষ’। যেখানে হিন্দু-মুসলিম কোনো বিভেদ থাকবে না। এক মানবতাবাদী জীবনবোধ জাতির কর্ণধারকে জীবনপথে প্রেরণা যোগাবে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার চেতনাকে ধারণ করেছে।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

মুসলমান এবং জেলেপাড়ার অমুসলিম অধিবাসীরা এভাবেই দিন কাটায়। ধর্ম যতই পৃথক হোক, দিনযাপনের মধ্যে তাহাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। সকলেই তাহারা ধর্মের চেয়ে এক বড় অধর্ম পালন করে দারিদ্র্য। বিবাদ যদি কখনো বাধে, সে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিবাদ, মিটিয়াও যায় অগ্নেই। কুবেরের সঙ্গে সিধুর যে কারণে বিবাদ হয়, আমিনুদ্দিনের সঙ্গে জহরের সে কারণে বিবাদ হয়, কুবেরের-আমিনুদ্দিনের বিবাদও হয় সেই কারণেই।

ক. আরব-দুলাল কে?

খ. কবি ‘অন্তর-ধর্মের’ উপর জোর দিয়েছেন কেন?

গ. উদ্দীপকের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ‘সাম্যবাদী’ কবিতার সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় ধর্মের চেয়ে মানুষের মনুষ্যত্ববোধটিই বড় হয়ে উঠেছে।” –বিশ্লেষণ করুন।



উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. গ ৩. খ ৪. গ ৫. ক ৬. গ ৭. ক ৮. ক



এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে

জীবনানন্দ দাশ



কবি-পরিচিতি

জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। মা কুসুমকুমারী দাশও একজন কবি ছিলেন এবং তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে’- এখনো জনপ্রিয় শিশুপাঠ্য। জীবনানন্দ দাশ ১৯১৫ সালে বরিশাল ব্রজমোহন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯১৭ সালে ব্রজমোহন কলেজ থেকে আইএ, ১৯১৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স ও ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি কলকাতা সিটি কলেজ ও বরিশাল ব্রজমোহন কলেজসহ বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের কিছু পূর্বে সপরিবারে বাংলাদেশ ত্যাগ করে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। জীবনানন্দ দাশ বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান আধুনিক কবি এবং বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃতদের মধ্যে অন্যতম। তাঁকে বাংলা ভাষার ‘শুদ্ধতম কবি’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বুদ্ধদেব বসু তাঁকে ‘নির্জনতম কবি’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাংলার প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যে কবি নিমগ্নচিত্ত। এ দেশের গাছপালা, লতাগুল্ম, ফুল-পাখি তাঁর আজন্ম প্রিয়। তাঁর নিসর্গবিষয়ক কবিতা ১৯৭১-পূর্ব আন্দোলনে ও আমাদের মুক্তিযুদ্ধে এদেশের মানুষকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। তিনি নিভূতে ১৪টি উপন্যাস ও ১০৮টি ছোটগল্প রচনা করেছেন, যার একটিও জীবদ্দশায় প্রকাশ করেননি। এছাড়া তিনি আটশরও বেশি কবিতা লিখলেও জীবদ্দশায় মাত্র ২৬২টি কবিতা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ অক্টোবর জীবনানন্দ দাশ কলকাতায় এক ট্রাম-দুর্ঘটনায় আহত হন এবং ২২ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

- কাব্যগ্রন্থ :** *ঝরা পালক* (১৯২৮), *ধূসর পাণ্ডুলিপি* (১৯৩৬), *বনলতা সেন* (১৯৪২), *মহাপৃথিবী* (১৯৪৪), *সাতটি তারার তিমির* (১৯৪৮), *রূপসী বাংলা* (১৯৫৭), *বেলা অবেলা কালবেলা* (১৯৬১);
- উপন্যাস :** *মাল্যবান* (১৯৭৩), *সুতীর্থ* (১৯৭৪);
- প্রবন্ধগ্রন্থ :** *কবিতার কথা* (১৯৫৬)।

ভূমিকা

জীবনানন্দ দাশ রচিত ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতাটি *রূপসী বাংলা* নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। অপরূপ রূপে রূপসী প্রকৃতির সৌন্দর্যের এমন লীলাভূমি পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই এমন ধারণা করেই তিনি বাংলার রূপের বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতির রহস্যময় সৌন্দর্যই কবির কবিতার মূল প্রেরণা।



উদ্দেশ্য

জীবনানন্দ দাশের ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতাটি পড়ার পর আপনি-

- রূপসী বাংলার সৌন্দর্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকা গাছ-গাছালি, নদী, ফুল-ফল ও পাখিদের অপূর্ব রূপ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- প্রকৃতির রূপ দেখে কবি কীভাবে তাকে রূপসী নারীর সঙ্গে তুলনা করেছেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে- সবচেয়ে সুন্দর করুণ:
 সেখানে সবুজ ডাঙা ভঁরে আছে মধুকুপী ঘাসে অবিরল;
 সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বথ, বট, জারুল, হিজল;
 সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ;
 সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে- সেখানে বরুণ
 কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল;
 সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল,
 সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ;
 সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর;
 সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে;
 সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর-
 শঙ্খমালা নাম তার : এ বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
 তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো- বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর,
 তাই-সে-জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অরুণ- সূর্য। **এই পৃথিবীতে...সুন্দর করুণ**- কবির চোখে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, মমতারসে সিক্ত, সহানুভূতিতে আর্দ্র ও বিষণ্ণ দেশ বাংলাদেশ। **বর**- এখানে আশীর্বাদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। **বারুণী**- জলের দেবী বরুণানী, বরুণের স্ত্রী, জলের দেবী। **বিরল**- কম। **বিশালাক্ষী**- যে রমণীর চোখ আয়ত বা টানাটানা। আয়তলোচনা সুন্দরী নারী। **নাটা**- লতাকরধঃ; গোলাকার ক্ষুদ্র ফল বা তার বীজ। **সেখানে ভোরের...জাগিছে অরুণ**- বাংলার প্রভাতের সৌন্দর্য ও রহস্যময়তা আঁকতে গিয়ে ভোরের মেঘের আড়াল থেকে গাঢ় লাল সূর্যের আলো বিচ্ছুরণ যেন ধারণ করেছে করমচা বা করমচা ফুলের রং। **সেখানে বারুণী থাকে...অবিরল জল**- জলে পরিপূর্ণ এদেশের অসংখ্য নদী-নালায় স্রোতধারার প্রাণৈশ্বর্য ও সৌন্দর্যের রূপ আঁকা হয়েছে এই পঙ্ক্তির দুটির মধ্যে। **সেইখানে শঙ্খচিল...**- বাংলাদেশে প্রাণী আর প্রকৃতির ঐক্য ও সংহতিতে একাকার। পানের বনে হাওয়ায় যে চঞ্চলতা জেগে ওঠে সেই চঞ্চলতা সম্প্রসারিত হয় দূর আকাশের শঙ্খচিলে। **সুদর্শন**- এক ধরনের পোকা।



সারসংক্ষেপ

সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা এই বাংলাদেশ কবির চোখে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব লীলাভূমি সারা পৃথিবীর মধ্যে অনন্য। অসংখ্য বৃক্ষ, গুল্ম ছড়িয়ে আছে এদেশের জনপদে অরণ্যে। তাদের মধ্যে মধুকুপী, কাঁঠাল, অশ্বথ, বট, জারুল, হিজল অন্যতম। বাংলার প্রভাতের সৌন্দর্য ও রহস্যময়তা যেন মেঘের আড়াল থেকে গাঢ় লাল সূর্যের আলো ধারণ করেছে করমচা বা করমচা ফুলের রং। হাওয়া যখন পানের বনে চঞ্চলতা জাগায় তখন দূর আকাশের শঙ্খচিল যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। এদেশের প্রতিটি নদ-নদী স্বচ্ছতোয়া জলে পূর্ণ থাকে। জলের দেবতা অনিঃশেষ জলধারা দিয়ে স্রোতস্বিনী রাখে এদেশের অসংখ্য নদীকে। প্রকৃতি আর প্রাণিকুলের বন্ধনে গড়ে উঠেছে চির অবিচ্ছেদ্য এক সংহতি। হাওয়া পানের বনে চঞ্চলতা জাগালে দূর আকাশের শঙ্খচিল চঞ্চল হয়ে ওঠে। ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট লক্ষ্মী পেঁচাও মিলে থাকে প্রকৃতির গভীরে, অন্ধকারের বিচিত্ররূপ এই দেশে। অন্ধকার ঘাসের উপর নুয়ে থাকে লেবুর শাখা কিংবা অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে সুদর্শন উড়ে যায়। শঙ্খমালা নামের রূপসী নারীর হলুদ শাড়িরবর্ণশোভাজন্ম দেয়। কবির ধারণা, পৃথিবীর অন্য কোথাও শঙ্খমালাদের পাওয়া যাবে না। তাঁর বিশ্বাস, বিশালাক্ষী বর দিয়েছিল বলেই নীল-সবুজে মেশা বাংলার ভূ-প্রকৃতির মধ্যে এই অনুপম সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মধুকূপী কী?

ক. ঘাস	খ. পান
গ. লতা	ঘ. বৃক্ষ

২. 'সবুজ ডাঙ্গা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

ক. সবুজ প্রকৃতি	খ. সবুজ রং
গ. বাংলার প্রকৃতি	ঘ. সূর্যের রং

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ধনধান্যপুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।

৩. উদ্দীপকে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে?

ক. মর্ত্যপ্রীতি	খ. প্রাকৃতিক সৌন্দর্য
গ. প্রকৃতির রহস্যময়তা	ঘ. সৌন্দর্য ভাবনা

৪. উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার উপজীব্য হচ্ছে—

- i. দেশপ্রেম
- ii. প্রকৃতিপ্রেম
- iii. সম্প্রীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. i ও ii	ঘ. i, ii ও iii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. 'বনলতা সেন' কোন ধরনের রচনা?

ক. কাব্য	খ. প্রবন্ধ
গ. গল্প	ঘ. উপন্যাস

৬. 'হলুদ শাড়ি' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

ক. কাঁচা ধানের মৌসুম	খ. পাকা ধানের মৌসুম
গ. বাংলার পোশাক বৈচিত্র্য	ঘ. বাংলার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

রূপসী বাংলার রূপের যেন শেষ নেই। বাংলার প্রকৃতির এই রূপ এবং সৌন্দর্য পৃথিবীর অন্য কোথাও খুব একটা দেখা যায় না।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার কোন চরণের সাদৃশ্য রয়েছে?

- | |
|---|
| ক. সেখানে সবুজ ডাঙ্গা ভরে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল। |
| খ. কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল। |
| গ. তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো-বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর। |
| ঘ. সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে— |

৮. উদ্দীপক ও 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতায় ফুটে উঠেছে—

- i. বাংলার রূপ
- ii. প্রাকৃতিক সৌন্দর্য
- iii. প্রকৃতির সংহতি



নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii

গ. iii

ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়- হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে,
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়।

ক. জীবনানন্দ দাশ কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

খ. সুদর্শন কেন উড়ে যায়?

গ. উদ্দীপকের কোন দিকটি ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার সঙ্গে তুলনীয়? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় স্বদেশপ্রেমই প্রাধান্য পেয়েছে।” –মন্তব্যটি পর্যালোচনা করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.

কবি জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ সালে বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন।

খ.

কবির কল্পনায় সুদর্শন বাংলার রূপ ফুটিয়ে তুলতে উড়ে বেড়ায়।

সুদর্শন হল এক ধরনের গোবরে পোকা। এর বসবাস গোবরের চিবিতে। সুদর্শন সন্ধ্যার অন্ধকারে সিক্ত বাতাসে তার ঘরে ফিরে। কবি জীবনানন্দের মতে বাংলার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান একীভূত হয়েছে। এর মধ্যে সুদর্শন পোকাও বাংলার রূপ-সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করে। কবির ধারণা এদেশকে মন মাতানো সৌন্দর্যের দেশ হিসাবে ফুটিয়ে তুলতে সুদর্শন পোকা উড়ে বেড়ায়।

গ.

উদ্দীপকের প্রকৃতিপ্রেমের বিষয়টি ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার সঙ্গে তুলনীয়।

বাংলার প্রকৃতি অপূর্ব সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এখানে চারদিকে শুধু সবুজের সমারোহ। এদেশের নদ-নদী একদিকে যেমন প্রকৃতিকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে, তেমনি অন্যদিকে তা দেশকে সমৃদ্ধ করেছে। এদেশের সবুজ প্রকৃতি, ভোরের দোয়েল, পল্লবের স্তূপ, জাম, বট, কাঁঠাল, হিজলের গাছ প্রভৃতি যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে তা চিরায়ত মানব হৃদয়কে স্পর্শ করে।

‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় প্রকৃতিপ্রেমের বিষয়টি উঠে এসেছে। কবিতায় কবির কাছে তাঁর জন্মভূমি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সুন্দর মনে হয়েছে। এদেশের রূপ ও সৌন্দর্যে কবি এতটাই মুগ্ধ যে তিনি পৃথিবীর আর কোনো দেশের সৌন্দর্য উপভোগ করতে আগ্রহী নন। দেশের সবুজ প্রকৃতি, ডুমুর গাছের সৌন্দর্য কবির হৃদয়ে এনেছে প্রশান্তির ছোঁয়া। দেশের সৌন্দর্যের প্রতি এমন মুগ্ধতা মূলত কবির প্রকৃতিপ্রেমেরই ইঙ্গিত বহন করে। উদ্দীপকের কবিও বাংলার প্রকৃতিকে ভালোবেসেছেন। কবি তাঁর মাতৃভূমির প্রকৃতিতে এতটাই মগ্ন যে মৃত্যুর পরও বারবার এদেশের বুকে ফিরে আসতে চেয়েছেন। এদেশের প্রকৃতির মাঝে তিনি খুঁজে পেয়েছেন শান্তির ছায়া। তিনি মানুষরূপে না হলেও শঙ্খচিল, শালিক কিংবা ভোরের কাকের রূপ ধরে কুয়াশার বুকে ভেসে কাঁঠাল-ছায়ায় কার্তিকের নবান্নের দেশে ফিরে আসতে চান। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের প্রকৃতিপ্রেমের বিষয়টি ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

ঘ.

বাংলার প্রকৃতি উদ্দীপক ও ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় প্রধানরূপে ফুটে উঠেছে।



বাংলার প্রাকৃতিক রূপ অপরূপ মহিমায় মহিমায়িত। এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি পৃথিবীতে কমই আছে। এদেশের সৌন্দর্যকে আরো বেশি আকর্ষণীয় করেছে জালের মত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য নদ-নদী। এছাড়া এদেশের প্রকৃতি প্রত্যেক ঋতুতে সজ্জিত হয় নানা রূপে। আর পরিবর্তন হয় বাংলার নদী, মাঠ, ঘাটের চিত্র ও বাঙালির হৃদয়।

উদ্দীপকে বাংলার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ফুটে উঠেছে। কবি এদেশের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বারবার এই কার্তিকের নবান্নের দেশে কুয়াশার বকে ভেসে ফিরে আসতে চেয়েছেন। উদ্দীপকের উপমায় উঠে এসেছে বাংলার প্রতি মুগ্ধতা। শঙ্খচিল, শালিক, ভোরের কাক ইত্যাদিতেও কবির স্বদেশপ্রেমের চিত্র ধরা পড়েছে। অন্যদিকে ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায়ও কবির স্বদেশপ্রেমের পরিচয় লক্ষ করা যায়। এদেশের প্রকৃতির মাঝে কবি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছেন। এদেশের চারদিকে সবুজের সমারোহ, পূর্বাকাশের সূর্য, নদ-নদী সবকিছু কবির হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ তুলেছে। বস্তুত কবিতাটিতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বন্দনার মধ্য দিয়ে স্বদেশপ্রেম ফুটে উঠেছে।

‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় কবির বাংলার প্রতি মমত্ববোধ প্রকৃতি বর্ণনার আবহে উপস্থাপিত হয়েছে। কবির চোখে এদেশের সবুজ স্থলভাগ মধুকূপী ঘাসে ঢেকে আছে নরোম লিঙ্কতায়, সেখানে আছে কাঁঠাল, অশ্বথ, বট, জারুল, হিজলের শ্যামল ছায়া, সেখানে ছড়িয়ে আছে ভোরের মেঘে ঢাকা সূর্যের নাটা রঙ অপার মুগ্ধতায়। কবির কাছে মনে হয়েছে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, মমতারসে সিক্ত, সহানুভূতিতে আর্দ্র বাংলাদেশ। বস্তুত কবিতার এ জন্মভূমি প্রীতির চিত্রণের বিষয়টিই উদ্দীপকে অনুরণিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপক ও ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় স্বদেশপ্রেমই মুখ্য হয়ে উঠেছে।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা;
তাহার মাঝে আছে দেশ এক- সকল দেশের সেরা;
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
এমন লিঙ্ক নদী কাহার, কোথায় এমন ধূস্র পাহাড়;
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।

ক. শঙ্খচিলের বৈশিষ্ট্য কী?

খ. কবির চোখে এদেশ সবচেয়ে সুন্দর কেন?

গ. উদ্দীপকের কবির ‘দেশ’ ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় কাকে প্রতিনিধিত্ব করে? -আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে’ কবিতায় প্রকৃতিপ্রেম উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে।” -স্বীকার করেন কি? যুক্তিসহ আলোচনা করুন।



উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. ক ৩. খ ৪. গ ৫. ক ৬. গ ৭. ক ৮. ক



কবর

জসীমউদ্দীন



কবি-পরিচিতি

জসীমউদ্দীন ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার তামুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ফরিদপুরের গোবিন্দপুর গ্রাম। তাঁর পিতা আনসারউদ্দিন মোল্লা ও মা আমিনা খাতুন। ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আইএ ও বিএ পাস করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ পাস করেন। পাস করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে রামতনু লাহিড়ী গবেষণা সহকারী পদে যোগ দেন। এরপর ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং পরে সরকারি তথ্য ও প্রচার বিভাগে উচ্চপদে যোগদান করেন। কলেজে পড়ার সময় তিনি রচনা করেন বিখ্যাত ‘কবর’ কবিতা এবং এই কবিতা তাঁর ছাত্রজীবনেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার বাংলা পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। জসীমউদ্দীনের কবিতায় বাংলার মাঠ, ঘাট, নদী-নালা, বালুচর, চাষীর কুটির, ফুল-পাখি, গ্রামের সাধারণ মানুষ ও তাদের সুখ দুঃখের চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেজন্য তাঁকে বলা হয় ‘পল্লিকবি’। তাঁর বিখ্যাত নক্সা কাঁথার মাঠ কাব্যটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি গান, নাটক ও গদ্যরচনাতেও অবদান রেখেছেন। ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট উপাধি প্রদান করে। এছাড়া সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭৬ সালের ১৪ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

- কাব্যগ্রন্থ** : রাখালী (১৯২৭), নক্সা কাঁথার মাঠ (১৯২৯), বালুচর (১৯৩০), ধানখেত (১৯৩৩), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪), এক পয়সার বাঁশী (১৯৫৬), মাটির কান্না (১৯৫৮);
- গানের সংকলন** : রঙিলা নায়ের মাঝি (১৯৩৫), গাঙের পাড় (১৯৬৪);
- নাটক** : পদ্মাপাড় (১৯৫০), বেদের মেয়ে (১৯৫১), পল্লীবধূ (১৯৫৬), গ্রামের মায়া (১৯৫৯);
- উপন্যাস** : বোবাকাহিনী (১৯৬৪);
- গদ্যরচনা** : চলে মুসাফির (১৯৫২), বাঙালির হাসির গল্প (১৯৬০), জীবন কথা (১৯৬৪), হলদে পরিদে (১৯৬৭), জার্মানীর শহরে বন্দরে (১৯৭৫)।

ভূমিকা

জসীমউদ্দীনের রাখালী কাব্যগ্রন্থ থেকে ‘কবর’ কবিতাটি সংকলিত হয়েছে। কবিতাটি ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। কাহিনিধর্মী এই কবিতাটিতে সহজ সরল ভাষায় এক গ্রামীণ বৃদ্ধের জীবনের প্রিয়জন হারানোর বেদনার স্মৃতি বর্ণিত হয়েছে। জীবনের শেষ প্রান্তে বৃদ্ধ যে তাঁর আপনজনদের হারিয়ে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন, তারই বর্ণনা কবি গভীর সহানুভূতি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।



সাধারণ উদ্দেশ্য

জসীমউদ্দীনের ‘কবর’ কবিতাটি পড়ার পর আপনি—

- কবি জসীমউদ্দীনের কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- সহজ-সরল কৃষক জীবনের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করবেন।

পাঠ-১



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ার পর আপনি-

- দাদুর বেদনা ও কষ্টের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- দাদুর বর্ণনা থেকে দাদির চরিত্র বুঝতে ও লিখতে পারবেন।



মূলপাঠ

এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায় রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছি সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।
এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা,
সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা।
সোনালি উষায় সোনামুখ তার আমার নয়নে ভরি
লাঙল লইয়া ক্ষেতে ছুটিতাম গাঁয়ের ও-পথ ধরি।
যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত
এ কথা লইয়া ভাবি-সাব মোরে তামাশা করিত শত।
এমনি করিয়া জানি না কখন জীবনের সাথে মিশে
ছোট-খাট তার হাসি ব্যথা মাঝে হারা হয়ে গেলু দিশে।

বাপের বাড়িতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা
“আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু উজান-তলীর গাঁ”
শাপলার হাটে তরমুজ বেচি দু পয়সা করি দেড়ী,
পুঁতির মালার একছড়া নিতে কখনও হত না দেরি।
দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে,
সন্ধ্যা বেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুরবাড়ির বাটে!
হেস না-হেস না-শোন দাদু, সেই তামাক মাজন পেয়ে,
দাদি যে তোমার কত খুশি হত দেখিতিস যদি চেয়ে!
নথ নেড়ে নেড়ে কহিত হাসিয়া “এতদিন পরে এলে,
পথ পানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখিজলে।”
আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হয়,
কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিব্বাঝ নিরালায়!
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ দাদু, “আয় খোদা! দয়াময়,
আমার দাদির তরেতে যেন গো ভেস্ত নসিব হয়।”



তারপর এই শূন্য জীবনের যত কাটিয়াছি পাড়ি
যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।
শত কাফনের শত কবরের অঙ্ক হৃদয়ে আঁকি,
গণিয়া গণিয়া ভুল করে গণি সারা দিনরাত জাগি।
এই মোর হাতে কোদাল ধরিয়া কঠিন মাটির তলে,
গাড়িয়া দিয়াছি কত সোনামুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে।
মাটিরে আমি যে বড় ভালোবাসি, মাটিতে মিশায়ে বুক,
আয়- আয় দাদু, গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ।

এখানে তোর বাপজি ঘুমায়, এইখানে তোর মা,
কাঁদছিস তুই? কী করিব দাদু! পরাণ যে মানে না।
সেই ফাল্গুনে বাপ তোর এসে কহিল আমারে ডাকি,
“বা-জান, আমার শরীর আজিকে কী যে করে থাকি থাকি।”
ঘরের মেঝেতে সপটি বিছায়ে কহিলাম, বাছা শোও,
সেই শোওয়া তার শেষ শোওয়া হবে তাহা কি জানিত কেউ?
গোরের কাফনে সাজায়ে তাহারে চলিলাম যবে বয়ে,
তুমি যে কহিলা, “বা-জানরে মোর কোথা যাও, দাদু লয়ে?”
তোমার কথায় উত্তর দিতে কথা থেমে গেল মুখে,
সারা দুনিয়ার যত ভাষা আছে কেঁদে ফিরে গেল দুখে!

তোমার বাপের লাঙল জোয়াল দুহাতে জড়ায়ে ধরি,
তোমার মায়ে যে কতই কাঁদিত সারা দিনমান ভরি।
গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝরে,
ফাল্গুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শুনো-মাঠখানি ভরে।
পথ দিয়া যেতে গৈয়ো পথিকেরা মুছিয়া যাইত চোখ,
চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত গাছের পাতার শোক।
আখালে দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠ পানে চাহি,
হাম্বা রবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জলে নাহি।
গলাটি তাদের জড়ায়ে ধরিয়া কাঁদিত তোমার মা,
চোখের জলের গহীন সায়ে ডুবায়ে সকল গা।

উদাসিনী সেই পল্লি-বালায় নয়নের জল বুঝি,
কবর দেশের আন্ধার ঘরে পথ পেয়েছিল খুঁজি।
তাই জীবনের প্রথম বেলায় ডাকিয়া আনিল সাঁঝ,
হায় অভাগিনী আপনি পরিল মরণ-বিষের তাজ।
মরিবার কালে তোরে কাছে ডেকে কহিল, “বাছারে যাই,
বড় ব্যথা র'ল, দুনিয়াতে তোর মা বলিতে কেহ নাই;



দুলাল আমার, যাদুরে আমার, লক্ষ্মী আমার ওরে,
কত ব্যথা মোর আমি জানি বাছা ছাড়িয়া যাইতে তোরে।”
ফোঁটায় ফোঁটায় দুইটি গণ্ড ভিজিয়ে নয়ন-জলে
কী জানি আশিস করে গেল তোরে মরণ-ব্যথার ছলে।

ক্ষণপরে মোরে ডাকিয়া কহিল- “আমার কবর গায়
স্বামীর মাথার মাথালখানিরে বুলাইয়া দিও বায়।”
সেই সে মাথাল পচিয়া গলিয়া মিশেছে মাটির সনে,
পরানের ব্যথা মরে নাক সে যে কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
জোড়মানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরু ছায়,
গাছের শাখারা শ্লেহের মায়ায় লুটায় পড়েছে গায়।
জোনাকি-মেয়েরা সারারাত জাগি জ্বলাইয়া দেয় আলো
ঝাঁঝীরা বাজায় ঘুমের নূপুর কত যেন বেসে ভালো।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ দাদু, “রহমান খোদা! আয়;
ভেস্ত নাজেল করিও আজিকে আমার বাপ ও মায়।”



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অভাগিনী- যে মহিলার ভাগ্য খারাপ। **আথালে**- গোহালে (আথাল আঞ্চলিক শব্দ, পল্লিকবিদের রচনায় পাওয়া যায়)।
আন্ধার- আঁধার। **আশিস**- আশীর্বাদ, দোয়া। **কাফন**- মৃতের পোশাক। **কেয়ামত**-শেষ বিচারের দিন, এখানে মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। **ক্ষণপরে**- একটু পরে। **গহীন**-গভীর সাগর। **গাড়িয়া**- পুঁতে দেয়া। **গাঁটে**- কোমরে। **গোঁয়ো**- গ্রামের। **গন্ড**- গাল। **গোর**- কবর। **ঘুমের নূপুর**- বিশেষ অর্থে শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। শিশুকে ঘুম পাড়ানোর জন্য যে গান গাওয়া হয় তাকে বলে ঘুম পাড়ানী গান। ঝাঁঝী পোকের শব্দকে এখানে ঘুম পাড়ানী বাজনা বলা হয়েছে। যে বাজনা শুনলে হয়তো ঘুম আরও গাঢ় হয়। খুবই কাব্যিক প্রয়োগ হয়েছে শব্দ দুটির। **জোনাকী**- ছোটো পোকা, যার গায়ের আলো রাতে স্পষ্ট দেখা যায়। **ঝাঁঝী**- এক ধরনের পোকা, তাদের ডাকে ঝাঁঝী শব্দ হয়। **তরেতে**- জন্য। **তরু-ছায়**- গাছের ছায়ায়। **দোয়া মাঙ দাদু**- দোয়া চাও দাদু। **দেড়ী**- দেড় সের। **নথ**- নাকের অলঙ্কার, গহনা। **নাজেল**- নেমে আসা। **নাহি**- গোসল করে। **বাপজি**- বাবা, কোথাও কোথাও সম্বোধনের সঙ্গে ‘জি’ ব্যবহারের চলন আছে। যেমন, বুজি (বু+জি=বুজি)। **নূপুর**- পায়ের অলঙ্কার যা রুম বুম শব্দ সৃষ্টি করে। **পরান**- প্রাণ, এখানে ‘মন’ অর্থে ব্যবহৃত। **ফাল্লুণী হাওয়া**- ফাল্লুণ মাস হলো বসন্ত কাল, সেই সময়ের হাওয়া। **বাটে**- পথে। **বা-জান**- বাবাজান বা বাপজান, ‘জান’ এখানে আদর ও সম্মান সূচক শব্দ। **ভেস্ত**- বেহেশত। **মরিবার কালে**- মরার সময়। **মাথাল**- খড় বাঁশের পাতা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি ছাতা বিশেষ। গ্রামের কৃষকেরা হাতে তৈরি ছোটো এ ছাতা মাথায় টুপির মতো করে পরে। রোদ বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচায়। এটি আঞ্চলিক শব্দ। **মরণ-বিষের তাজ**- মরণকে এখানে বিষ বলা হয়েছে। তাজ হলো মুকুট, যা মাথায় পরা হয়। মাথায় বিষের মুকুট পরলে তাকে নিশ্চয় মরতে হবে। কবিতায় শব্দ তিনটির ব্যবহারে মৃত্যুর মতো কঠিন সত্যও হয়ে উঠেছে কাব্যময়। **মজীদ**- মসজিদ (আঞ্চলিক শব্দ)। **সপ**- বিশেষ ধরনের লম্বা ও মোটা ঘাস দিয়ে তৈরি মাদুর। **সোনামুখ**- সোনালী উষার মতো সুন্দর রঙভরা মুখ বা চেহারা। **সোনালী উষা**- সূর্য ওঠার আগে আকাশের পূর্বদিকে যে লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ে তাকেই কবি সোনালি উষা বলেছেন। উষাকাল হলো সূর্য ওঠার আগের সময়টুকু।



পাঠ-২



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ার পর আপনি-

- দাদুর প্রিয়জনদের আর কে কে তাঁকে ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছে তাদের কথা লিখতে পারবেন;
- দাদুর পুত্রবধূ অর্থাৎ নাতির মা স্বামীর মৃত্যুতে যে শোক পেয়েছিলেন তার বর্ণনা লিখতে পারবেন।



মূলপাঠ

এইখানে তোর বুজির কবর, পরীর মতন মেয়ে,
বিয়ে দিয়েছিলু কাজিদের বাড়ি বনিয়াদি ঘর পেয়ে।
এত আদরের বুজিরে তাহারা ভালোবাসিত না মোটে
হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোটে।
খবরের পর খবর পাঠাত, “দাদু যেন কাল এসে
দুদিনের তরে নিয়ে যায় মোরে বাপের বাড়ির দেশে।”
শুশুর তাহার কসাই চামার, চাহে কি ছাড়িয়া দিতে
অনেক কহিয়া সেবার তাহারে আনিলাম এক শীতে।
সেই সোনামুখ মলিন হয়েছে ফোটে না সেথায় হাসি,
কালো দুটি চোখে রহিয়া রহিয়া অশ্রু উঠিছে ভাসি।
বাপের মায়ের কবরে বসিয়া কাঁদিয়া কাটাত দিন,
কে জানিত হয়, তাহারও পরাণে বাজিবে মরণ-বীণ!
কী জানি পচানো জ্বরেতে ধরিল আর উঠিল না ফিরে,
এইখানে তারে কবর দিয়েছি দেখে যাও দাদু! ধীরে।

ব্যথাতুরা সেই হতভাগিনীকে বাসে নাই কেহ ভালো,
কবরে তাহার জড়ায়ে রয়েছে বুনো ঘাসগুলি কালো।
বনের ঘুঘুরা উহু উহু করি কেঁদে মরে রাতদিন,
পাতায় পাতায় কেঁপে উঠে যেন তারি বেদনার বীণ।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ- দাদু! “আয় খোদা দয়াময়!
আমার বু-জির তরেতে যেন গো ভেস্তু নসিব হয়।”

হেথায় ঘুমায় তোর ছোট ফুপু, সাত বছরের মেয়ে,
রামধনু বুঝি নেমে এসেছিল ভেস্তুর দ্বার বেয়ে।
ছোট বয়সেই মায়েরে হারিয়ে কী জানি ভাবিত সদা,
অতটুকু বুকে লুকাইয়াছিল কে জানিত কত ব্যথা!
ফুলের মতন মুখখানি তার দেখিতাম যবে চেয়ে,
তোমার দাদির ছবিখানি মোর হৃদয়ে উঠিত চেয়ে।



বুকেতে তাহারে জড়ায়ে ধরিয়া কেঁদে হইতাম সারা,
রঙিন সাঁজেরে ধুয়ে মুছে দিত মোদের চোখের ধারা।

একদিন গেনু গজনার হাটে তাহারে রাখিয়া ঘরে,
ফিরে এসে দেখি সোনার প্রতিমা লুটায় পথের পরে।
সেই সোনামুখ গোলগাল হাত সকলি তেমন আছে।
কী জানি সাপের দংশন পেয়ে মা আমার চলে গ্যাছে।
আপন হস্তে সোনার প্রতিমা কবরে দিলাম গাড়ি,
দাদু! ধর-ধর-বুক ফেটে যায় আর বুঝি নাহি পারি।

এইখানে এই কবরের পাশে আরও কাছে আয় দাদু,
কথা কস্ নাক, জাগিয়া উঠিবে ঘুম-ভোলা মোর যাদু।
আস্তে আস্তে খুঁড়ে দেখ দেখি কঠিন মাটির তলে,
দীনদুনিয়ার ভেস্তু আমার ঘুমায় কিসের ছলে।

* * *

ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবিরের রাগে,
অমনি করিয়া লুটায় পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে।
মজিদ হইতে আজান হাঁকিছে বড় সঙ্করণ সুর,
মোর জীবনের রোজকেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর।
জোড়হাতে দাদু মোনাজাত কর, “আয় খোদা! রহমান।
ভেস্তু নসিব করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত-প্রাণ।”



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

আবীরের রাগে- উৎসবের রঙে। কসাই- পশু হত্যা করে মাংস বিক্রি করা যাদের পেশা। গেনু- গেলাম (আঞ্চলিক শব্দ)। ঘুম ভোলা- সহজে যাদের ঘুম ভেঙে যায়। চামার- চামড়ার কাজ করা বা জুতা সেলাই করা যাদের পেশা। চেয়ে- দেখে। চোখের ধারা- চোখের পানি। জোড়হাতে- দুই হাতে। দংশন- কামড়। দীন দুনিয়ার- ইহ জগতের। পচানো জ্বর- লাগাতার জ্বর, কোনো সময় যে জ্বর ছেড়ে যায় না। প্রতিমা- মূর্তি, (এখানে মেয়েকে প্রতিমা বলা হয়েছে)। বনিয়াদি ঘর- ভালো বংশের পরিবার। মরণ-বীণ- মৃত্যুর সুর। মৃত্যু-ব্যথিত প্রাণ- মৃত্যু যাদের প্রাণে ব্যথা দিয়ে হত্যা করেছে অর্থাৎ যারা এখন মৃত। যবে- যখন। রামধনু- রঙধনু। শত যে মারিত ঠোঁটে- ঠোঁটে বলতে এখানে ‘কথা’ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কর্কশ, শক্ত এবং কষ্টদায়ক কথাকে কবি ঠোঁটের মার বলেছেন। সদা- সব সময়। সোনা মুখ- সুন্দর মুখ। হতভাগিনী- যার ভাগ্য খারাপ। হেথায়- এখানে।



সারসংক্ষেপ

নাতির কাছে দাদু নিজের ছেলে ও ছেলের বউ অর্থাৎ নাতির বাবা ও মায়ের মৃত্যুর কথা বলছেন। হঠাৎ করেই ছেলে অসুস্থ হয় এবং মারা যায়। নাতি তখন ছোটো। কাফনে ঢাকা লাশ কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জিজ্ঞাসা করলে দাদু বোবা হয়ে যান। অবুঝ শিশুকে শব্দ উচ্চারণ করে মৃত্যুর ধারণা দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মৃত্যু যে কত বেদনার ও কত নিষ্ঠুর বাস্তব, তা বোঝানোর ভাষা খুঁজে পাননি দাদু। স্বামীর শোক পূত্রবধূ সহ্য করতে পারলো না। স্বামীর লাঙল জোয়াল বুকে জড়িয়ে এবং বলদের গলা ধরে দিনরাত শুধু কাঁদতো। এমনই করণ সে কান্না যে মনে হতো গাছের পাতা পর্যন্ত ঝরে যায়। পথিকের চোখ ভিজে ওঠে। অবশেষে শিশুপুত্রকে রেখে অকালেই সে চিরবিদায় নিলো। মৃত্যুর সময় শিশুরের কাছে



অনুরোধ করেছিলো স্বামীর মাথালটা যেনো তার কবরের গায়ে বুলিয়ে দেয়া হয়। সে মাথাল পচে গলে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে কিন্তু দাদুর মনের ব্যথার মরণ নেই। নাতিকে তার বাবা-মার জন্য দোয়া করতে বলেন দাদু। অসহায় মানুষ আর কী-ই বা করতে পারে। দোয়া করাই তার শেষ সান্ত্বনা।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. ‘মজিদ’ শব্দের অর্থ কী?

ক. মসজিদ

খ. দরগাহ

গ. বেহেশত

ঘ. মাথাল

৬. ‘কবর’ কবিতায় ফুটে উঠেছে—

ক. কবির শোক ও বেদনা

খ. বৃদ্ধ দাদুর শোক ও বেদনা

গ. কবির জীবনের কাহিনি

ঘ. বৃদ্ধের নাতির শোক ও বেদনা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

ঘরে কান্দে পালা বিলাই গোয়ালে কান্দে গাই।

সকলিত আছে আমার পরাণের দোসর নাই ॥

৭. উদ্দীপকের ভাষারীতির সঙ্গে মিল রয়েছে যে রচনার—

ক. সোনার তরী

খ. পাঞ্জেরি

গ. কবর

ঘ. বঙ্গভাষা

৮. উদ্দীপক ও ‘কবর’ কবিতায় ব্যবহৃত ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য—

ক. গ্রামীণ জীবনের ভাষা

খ. কৃত্রিম ভাষা

গ. শহুরে জীবনের ভাষা

ঘ. সাধু ভাষা



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. ‘কবর’ কবিতার পংক্তি সংখ্যা কত?

ক. ১১৮

গ. ১১৭

খ. ২১৮

ঘ. ২২০

১০. ‘কবর’ কবিতায় স্বগতোক্তি হল—

ক. এক গ্রাম্য বৃদ্ধের হাহাকার

খ. জীবনযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি

গ. গ্রাম্য মানুষের পারিবারিক জীবন

ঘ. মৃত্যুযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

নিষিদ্ধ কল্পনাগুলি বন্ধ্যা তবু

অলক্ষ্যে প্রসব করে অব্যক্ত যন্ত্রণা।

১১. উদ্দীপকের অভিব্যক্তি ‘কবর’ কবিতার যে চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে—

ক. মৃত্যুঞ্জয়

খ. বিলাসী

গ. কল্যাণী

ঘ. বৃদ্ধ দাদু

১২. উদ্দীপক ও ‘কবর’ কবিতার ভাষ্য—

ক. স্মৃতি

খ. বিস্মৃতি

গ. অনুশোচনা

ঘ. বিদ্রূপ



সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

মাওয়া ঘাটে চানাচুর বিক্রি করে সংসার চালায়গণি মিয়া। ঈদের বাজারে বিক্রি-বাটা ভাল হওয়ায় তার মন-মেজাজ আজ বেশ ফুরফুরে। কিন্তু বউ বাপের বাড়ি থাকায় মাঝে-মধ্যে তাকে বিষণ্ণতায় পেয়ে বসে। আজ সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বউকে আনতে যাবে। বউয়ের মন ভোলানোর জন্য সে ঘাটের দোকান থেকে চুড়ি, ফিতা, ক্রিম, সাবান কিনে নেয়। উপহারগুলো পেয়ে বউ খুশি হবে মনে করে সে আনন্দচিত্তে শ্বশুরবাড়ির দিকে হাঁটা দেয়।

ক. 'Elegy' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'কবর' কবিতায় 'জোড়মানিকেরা' কারা?

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'কবর' কবিতায় কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে? -আলোচনা করুন।

ঘ. "কবর" কবিতা কেবল করুণ কাহিনি নয় আনন্দময় জীবনেরও প্রতিচ্ছবি।" -উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :

ছিল আশা মেঘনাদ, মুদিব অস্তিমে
এ নয়নদ্বয়, আমি তোমার সম্মুখে-
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র তোমায়, করিব
মহাযাত্রা।

ক. 'কবর' কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?

খ. 'শত যে মারিত চোঁটে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের মেঘনাদ 'কবর' কবিতায় কার প্রতিনিধিত্ব করে? -আলোচনা করুন।

ঘ. "কবর" কবিতার বৃদ্ধ দাদুর স্বজন হারানোর বেদনা উদ্দীপকের অন্তর্লোককেও স্পর্শ করেছে।" -মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.

'Elegy' শব্দের অর্থ শোক-কবিতা।

খ.

'কবর' কবিতায় 'জোড় মানিকেরা' বলতে কবি বৃদ্ধের পুত্র ও পুত্রবধূকে বুঝিয়েছেন।

'কবর' কবিতায় এক বৃদ্ধ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তার নাতির নিকট প্রবহমান জীবনের শোকাকর্ষক দিকগুলো তুলে ধরেছেন। স্মৃতিচারণের এক পর্যায়ে বৃদ্ধ তার পুত্র ও পুত্রবধূর কবর দেখিয়ে বেদনার্ত কণ্ঠে তাদের শোকাবহ মর্মান্তিক মৃত্যুর বর্ণনা দেন। বৃদ্ধের স্নেহের পুত্র অকালে মৃত্যুবরণ করেছিল। স্বামীশোকে বৃদ্ধের পুত্রবধূও স্বামীর অনুগামী হয়। নিবিড় প্রণয়ের কারণে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের বিচ্ছেদ বেদনা সহিতে পারেনি। স্বামীকে হারিয়ে বৃদ্ধের পুত্রবধূ সংসারের সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। মৃত্যুর পরও তারা পাশাপাশি কবরে অবস্থান করছে। তাই তাদের 'জোড় মানিকেরা' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

গ.

'কবর' কবিতায় বৃদ্ধ দাদু শাপলার হাটে তরমুজ বিক্রি করে দাদির জন্য উপহার কিনে নিয়ে যেতেন, উদ্দীপকেও গণি মিয়াকে দেখা যায় স্ত্রীর জন্য উপহার নিতে।

কবিতায় বৃদ্ধ দাদু পুতুল খেলার বয়সে দাদিকে বিয়ে করেছিলেন। খেলার ছলে দাদি সারাদিন বাড়িময় ঘুরে বেড়াতেন। দাদু কখনোই তাকে দৃষ্টির আড়াল করতে চাইতেন না। দাদি যখন বাপের বাড়ি বেড়াতে যেতেন তখন দাদুর কাছে অনুনয় করতেন- তিনি যেন দাদিকে দেখতে বাপের বাড়ি যান।

উদ্দীপকে মাওয়া ঘাটের গণি মিয়া চানাচুর বিক্রোতা। ঈদের বাজার হওয়াতে তার আয়-রোজগারও ভাল হয়েছে। কিন্তু স্ত্রী বাপের বাড়ি অবস্থান করায় মন তার বিষণ্ণ থাকে। স্ত্রীর মন ভোলানোর জন্য সে মাওয়া ঘাট থেকে চুড়ি, ফিতা, ক্রিম, সাবান ইত্যাদি কিনে নেয়। উপহারগুলো পেয়ে তার স্ত্রী খুশি হবে মনে করে সে শ্বশুরবাড়ির পথে পথ চলতে শুরু করে। 'কবর'



কবিতায়ও দেখা যায় দাদু তরমুজ বিক্রি করে ওই পয়সা দিয়ে দাদির জন্য পুঁতির মালা আর দেড় পয়সার তামাক ও মাজন কিনতেন। সন্ধ্যাবেলায় দাদু যখন উপহারগুলো নিয়ে দাদির সামনে উপস্থিত হতেন তখন তার আর খুশির সীমা থাকত না। দাদিকে খুশি করার জন্য দাদুর সবসময় একটা সযত্ন প্রয়াস থাকত। উদ্দীপকে গণি মিয়াও চেয়েছে তার স্ত্রীকে সবসময় প্রসন্ন রাখতে। বস্তুত কবিতার বিষয়বস্তু এভাবেই উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ.

‘কবর’ কবিতায় কেবল করুণ কাহিনি নয় জীবনের কিছু সুখস্মৃতিও ফুটে উঠেছে, যা উদ্দীপকেও পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক কবিই জীবনের কোনো না কোনো প্রেক্ষাপট নিয়ে কবিতা রচনা করেন। কবি জসীমউদ্দীনের এই প্রেক্ষাপটটি হচ্ছে আবহমানকালের বাঙালির গ্রামীণ জীবন। এই কবিতায় গ্রামীণ সমাজের নানা ঘটনার সমাবেশ ঘটলেও সবচেয়ে বেশি মূর্ত হয়েছে শোকার্ত এক বৃদ্ধের হৃদয়ের হাহাকার। কিন্তু এই শোকের পাশাপাশি কবিতায় কিছু আনন্দঘন মুহূর্তেরও স্ফূরণ ঘটেছে।

উদ্দীপকে মাওয়া ঘাটের নিম্ন আয়ের একজন মানুষের জীবনের খণ্ডচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই চিত্র শোকের নয়, আনন্দের এবং সুখের। এখানে গণি মিয়া তার স্ত্রীর মন প্রসন্ন করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। স্ত্রীর জন্য সাবান, ক্রিম, ফিতা ইত্যাদি উপহার সামগ্রী ক্রয় করেছে। ‘কবর’ কবিতায় দাদুও খুশি হবে বলে দাদির জন্য তরমুজ বিক্রি করে পুঁতির মালা আর তামাক ও মাজন কিনেছে। এভাবে দেখা যায়, উদ্দীপকের গণি মিয়া স্ত্রীর মন রক্ষা করার জন্য যে প্রয়াস চালিয়েছে তার সঙ্গে বৃদ্ধ দাদুর দাদিকে খুশি করার প্রচেষ্টার মিল পাওয়া যায়।

উদ্দীপক এবং ‘কবর’ কবিতায় আমরা জীবনের কিছু আনন্দঘন চিত্র লক্ষ্য করি। পুতুল খেলার বয়সে দাদু ও দাদির বিয়ে হয়েছে। দাদির সোনার বরণ মুখ দেখার জন্য দাদু ঘুরে-ফিরে তার দিকে তাকাতেন। দাদি বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় দাদুকে খুব অনুনয় করতেন তাকে দেখতে যাওয়ার জন্য। শাপলার হাটে দাদু তরমুজ বিক্রি করতেন। তারপর দাদির জন্য পুঁতির মালা কিনে তাকে দেখতে যেতেন। এভাবে আমরা দেখি কবিতাটিতে দাদুর আনন্দময় জীবনের কিছু চিত্রও হার্দিক ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। যদিও কাহিনিটি শোকের আবহে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। তাই বলা যায়, ‘কবর’ কবিতাটি কেবল শোকের কাহিনি নয়, জীবনের কিছু আনন্দঘন মুহূর্তেরও প্রতিচিত্র।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

বাইশ বছরের বুকের মানিককে কবরে শুইয়ে দিয়েছে এখানে।

এই ই শেষ নয়, শুনুন; বলি

মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছিলাম পলাশতলী

সেখানেও আকাল! মানুষে মানুষ খায়।

তিন দিনের উপবাসী আর লজ্জা বস্ত্রহীন হয়ে নিদারুণ ব্যথায়।

দড়ি কলসী বেঁধে পুকুরের জলে ডুবে মরেছিল একদিন সন্ধ্যায়।

ক. কাকে ‘ঘুম ভোলা মোর যাদু’ বলা হয়েছে?

খ. ‘মোর জীবনের রোজ কেয়ামত’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. ‘কবর’ কবিতায় বৃদ্ধ দাদুর জীবনের কোন কোন ঘটনা উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপক এবং ‘কবর’ কবিতার চরিত্রগুলো যেন একই শোকযন্ত্রণায় কাতর।” –মন্তব্যটি কি যথার্থ? বিচার করুন।



উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. ঘ ৩. ঘ ৪. ক ৫. ক ৬. খ ৭. গ ৮. ক ৯. ক ১০. ক ১১. ঘ ১২. ক



তাহারেই পড়ে মনে

সুফিয়া কামাল



কবি-পরিচিতি

সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালের ২০ জুন বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস কুমিল্লায়। তাঁর পিতা সৈয়দ আবদুল বারী ও মাতা সাবেরা বেগম। কবির বয়স যখন মাত্র সাত বছর তখন তাঁর পিতা মারা যান। বারো বছর বয়সে সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে কবির বিয়ে হয়। আধুনিকমনা ও সাহিত্যানুরাগী স্বামীর উৎসাহে কবির সাহিত্যসাধনা শুরু। ১৯৩২ সালে স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু হয়। অতঃপর ১৯৩৯ সালে কামালউদ্দীন আহমেদের সঙ্গে কবির পুনরায় বিয়ে হয়। পরিবারের নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তিনি স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। বেগম রোকেয়ার চিন্তাধারা তাঁর মনে বেশ প্রভাব ফেলেছিল। দেশভাগের পূর্বে তিনি নারীদের জন্য প্রকাশিত ‘বেগম’ পত্রিকার সম্পাদক হন। ভাষা-আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং এতে অংশ নিতে নারীদের উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি শিশু-সংগঠন ‘কচিকাঁচার মেলা’ প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া ১৯৬১-তে তিনি ‘ছায়ানট’র সভাপতি ও ১৯৬৯-এ ‘মহিলা সংগ্রাম কমিটি’র সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি নারী জাগরণ, সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা সকল প্রগতিবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে শুধু কবি হিসেবেই নয়, ‘জননী’ অভিধায়ও ভূষিত হয়েছেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি স্বাধীনতা দিবস পদক, একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, বেগম রোকেয়া পদক, নাসির উদ্দীন স্বর্ণপদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

- কাব্যগ্রন্থ : সাঁঝের মায়া (১৯৩৮), মায়া কাজল (১৯৫১), মন ও জীবন (১৯৫৭), উদাত্ত পৃথিবী (১৯৬৪);
 গল্পগ্রন্থ : কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭);
 ভ্রমণকাহিনি : সোভিয়েতে দিনগুলি (১৯৬৮);
 স্মৃতিকথা : একাত্তরের ডায়েরি (১৯৮৯)।

ভূমিকা

‘তাহারেই পড়ে মনে’ শীর্ষক কবিতাটি সুফিয়া কামালের বিখ্যাত কাব্য সাঁঝের মায়া থেকে সংকলিত হয়েছে। এই কবিতাটি প্রথম ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ‘মাসিক মোহাম্মদী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি একটি সংলাপ নির্ভর রচনা। এই কবিতায় প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রকাশিত হয়েছে। এখানে কবির ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। সহজ সরল ভাষায় কবি প্রকৃতি এবং তাঁর হৃদয়ের বেদনাকে অপূর্ব শিল্প নৈপুণ্যে প্রকাশ করেছেন।



উদ্দেশ্য

সুফিয়া কামালের ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতাটি পড়ার পর আপনি-

- প্রকৃতিতে বসন্তের রূপ বর্ণনা করতে পারবেন।
- কবির ব্যক্তিজীবনের ঘটনা কীভাবে তাঁকে বসন্তের রূপ আত্মদানে বিমুখ করেছিল তা আলোচনা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

“হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়,
বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়?”
কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি—
“দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?
বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি? ফুটেছে কি আমার মুকুল?
দখিনা সমীর তার গন্ধে গন্ধে হয়েছে কি অধীর আকুল?”

“এখনো দেখনি তুমি?” কহিলাম, “কেন কবি আজ
এমন উন্মনা তুমি? কোথা তব নব পুষ্পসাজ?”
কহিল সে সুদূরে চাহিয়া—
“অলখের পাথার বাহিয়া
তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান?
ডেকেছে কি সে আমারে? শুনি নাই, রাখি নি সন্ধান।”

কহিলাম, “ওগো কবি! রচিয়া লহ না আজও গীতি,
বসন্ত-বন্দনা তব কর্তে শুনি— এ মোর মিনতি।”
কহিল সে মৃদু মধু-স্বরে—
“নাই হলো, না হোক এবারে—
আমারে গাহিতে গান, বসন্তেরে আনিতে বরিয়া—
রহেনি, সে ভুলেনি তো, এসেছে তা ফাগুনে স্মরিয়া।”

কহিলাম : “ওগো কবি, অভিমান করেছ কি তাই?
যদিও এসেছে তবু তুমি তারে করিলে বৃথাই।”
কহিল সে পরম হেলায়—
“বৃথা কেন? ফাগুন বেলায়
ফুল কি ফোটেনি শাখে? পুষ্পারতি লভেনি কি ঋতুর রাজন?
মাধবী কুঁড়ির বুকে গন্ধ নাহি? করে নাই অর্ঘ্য বিরচন?”

“হোক, তবু বসন্তের প্রতি কেন এই তব তীব্র বিমুখতা?”
কহিলাম, “উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা?”
কহিল সে কাছে সরে আসি—
“কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ধ্যাসী—
গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে
রিক্ত হস্তে! তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোনো মতে।”



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অগোচর— দেখা যাবে না এমন, অপ্রত্যক্ষ। **অনুসুক**— আগ্রহ নেই এমন। **অলখ**— অলক্ষ, দৃষ্টির অগোচরে। **অর্ঘ্য**— পূজার উপকরণ। **অর্ঘ্য বিরচন**— অঞ্জলি বা উপহার রচনা। প্রকৃতি বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে ফুল ও তার সৌরভ উপহার দিয়ে বসন্তকে বরণ করে। **উত্তরী**— চাদর, উত্তরীয়। **উপেক্ষায় ঋতুরাজে কেন কবি দাও তুমি ব্যথা**— কবিভক্ত বুঝতে পারছেন না, কবি যথারীতি সানন্দে বসন্ত বন্দনা না করে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন কেন। **এখনো দেখনি তুমি?**— কবিভক্তের এ কথায় আমরা নিশ্চিত হই প্রকৃতিতে বসন্তের সব লক্ষণ মূর্ত হয়ে উঠেছে। অথচ কবি তা লক্ষ করছেন না। **কুহেলি**— কুয়াশা। **কুহেলি উত্তরী হলে মাঘের সন্ধ্যাসী**— কবি শীতকে মাঘের সন্ধ্যাসীরূপে কল্পনা করেছেন। বসন্ত আসার আগে সর্বত্যাগী সর্বরিক্ত সন্ধ্যাসীর মত মাঘের শীত যেন কুয়াশার চাদরে মিলিয়ে গেছে। **কোথা তব বন পুষ্পসাজ**— বসন্ত এসেছে অথচ কবি নতুন ফুলে ঘর সাজাননি। নিজেও ফুলের অলংকারে সাজেননি। **করিলে বৃথাই**— ব্যর্থ করলে। অর্থাৎ কবি-ভক্তের অনুযোগ-বসন্তকে কবি বরণ না করায় বসন্তের আবেদন গুরুত্ব হারিয়েছে। **তব বন্দনায়**— তোমার রচিত বন্দনা-গানের সাহায্যে। অর্থাৎ বন্দনা-গান রচনা করে বসন্তকে কি তুমি বরণ করে নেবে না? **তাহারেই পড়ে মনে**— প্রকৃতিতে বসন্ত এলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ত ও বিষণ্ণ ছবি। কবির মন দুঃখ ভারাক্রান্ত। তার কণ্ঠ নীরব। শীতের করুণ বিদায়কে তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তাই বসন্ত তার মনে কোনো সাড়া জাগাতে পারছে না। বসন্তের সৌন্দর্য তার কাছে অর্থহীন, মনে কোনো আবেদন জানাতে পারছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর প্রথম স্বামী ও কাব্যসাধনার প্রেরণা— পুরুষের আকস্মিক মৃত্যুতে কবির অন্তরে যে বিষণ্ণতা জাগে তারই সুস্পষ্ট প্রভাব ও ইঙ্গিত এ কবিতায় ফুটে উঠেছে। **দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?**— কবির জিজ্ঞাসা— বসন্তের দখিনা বাতাস বইতে শুরু করেছে কি না। উদাসীন কবি যে তা লক্ষ করেননি তার এই জিজ্ঞাসা থেকে তা স্পষ্ট হয়। **দিগ্বিদিক**— সর্বদিক। **নীরব কেন**— উদাসীন হয়ে আছেন কেন? কেন কাব্য ও গান রচনায় সক্রিয় হচ্ছে না। **পাথার**— সমুদ্র। **পুষ্পারতি**— ফুলের বন্দনা বা নিবেদন। **পুষ্পারতি লভেনি কি ঋতুর রাজন?**— ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ ও বন্দনা করার জন্য গাছে গাছে ফুল ফোটেনি? অর্থাৎ বসন্তকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্যেই যেন ফুল ফোটে। **পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে**— শীত প্রকৃতিতে দেয় রিক্ততার রূপ। গাছের পাতা যায় ঝরে। গাছ হয় ফুলহীন। শীতের এ রূপকে বসন্তের বিপরীতে স্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃতি বসন্তের আগমনে ফুলের সাজে সাজলেও কবির মন জুড়ে আছে শীতের রিক্ততার ছবি। শীত যেন সর্বরিক্ত সন্ধ্যাসীর মতো কুয়াশার চাদর গায়ে পত্রপুষ্পহীন দিগন্তের পথে চলে গেছে। **ফাগুন যে এসেছে ধরায়**— পৃথিবীতে ফাগুন অর্থাৎ বসন্তের আবির্ভাব ঘটেছে। **বরিয়া**— বরণ করে। **বসন্তেরে আনিতে...** **ফাগুন অরিয়া**— কবি বন্দনা-গান রচনা করে বসন্তকে বর্ণনা করলেও বসন্ত অপেক্ষা করেনি। ফাগুন আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে। **বাতাবি নেবুর ফুল...অধীর আকুল**— বসন্তের আগমনে বাতাবি নেবুর ফুল ও আমের মুকুলের গন্ধে দখিনা বাতাস দিগ্বিদিক সুগন্ধে ভরে তোলে। কিন্তু উন্মাদ কবি এসব কিছুই লক্ষ করেননি। কবির জিজ্ঞাসা তাঁর উদাসীনতাকেই স্পষ্ট করে। **মাধবী**— বাসন্তী লতা বা তার ফুল। **রিক্ত**— শূন্য, নিঃস্ব। **রিচিয়া**— রচনা করে। **লহ**— নাও। **লবে**— নেবে। **হে কবি**— কবিভক্ত এখানে কবিকে সম্বোধন করেছেন। **সমীর**— বাতাস। **অরিয়া**— অরণ করে।



সারসংক্ষেপ

কবি সুফিয়া কামাল প্রকৃতি ও মানবমনের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের রং বদলায়। প্রকৃতিতে বসন্ত এলে, প্রকৃতি অপরূপরূপে সজ্জিত হলে তার চেউ মানব মনেও এসে পড়ে। বসন্তে প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য কবিমনে খুশির জোয়ার আনবে, কবিকে ভাবে-ছন্দে-সুরে ফুটিয়ে তুলবেন এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু কোনো কারণে কবির মনে বসন্তের আগমন কোনো প্রভাব ফেলেনি, বসন্ত কবির হৃদয়কে আন্দোলিত করতে পারছে না। তাঁর দৃষ্টি এখনো শীতের দিকে, শীতকে তিনি কোনোভাবেই ভুলতে পারছেন না। কবি সুফিয়া কামালের সাহিত্য সাধনার প্রধান সহায়ক ও উৎসাহদাতা ছিলেন স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন, যাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে। তিনি সর্বত্যাগী সর্বরিক্ত সন্ধ্যাসীর মতো বিদায় নিয়েছেন— যা শীতের সঙ্গে তুলনীয়। যার উৎসাহ-উদ্দীপনায় কবি বর্তমানের একজন সফল কবি— যা বসন্তের সঙ্গে তুলনীয়। শীত রিক্তহস্তে চলে যাবার কারণেই বসন্ত এসেছে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে। কিন্তু যে শীত তথা প্রথম স্বামীর কারণেই বসন্ত তথা বর্তমান সফলতার আগমন, সেই শীতকে তিনি কোনো ভাবেই ভুলতে পারছেন না। ফলে প্রকৃতিতে যে বসন্ত তা কবিকে স্পর্শ করছে শীতরূপে। শীতের রিক্ততার হাহাকার যেন কবির জীবনে স্বজন হারানোর বেদনাকেই প্রতিধ্বনিত করে। এ কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে কে চলে গেছে?

ক. কবির স্বামী

খ. মাঘের সন্ন্যাসী

গ. বসন্ত ঋতু

ঘ. বসন্তের কোকিল

২. দখিনা সমীর ফুলের গন্ধে আকুল হয়েছে কেন?

ক. নবান্ন উৎসবে

খ. শীতের আগমনে

গ. বসন্তের আগমনে

ঘ. নববর্ষের উৎসবে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ভুলিতে পারি না তারে ভোলা যায় না,

বারে বারে মনে পড়ে কেন জানি না।

৩. উদ্দীপকের চরণদ্বয়ের সঙ্গে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কোন চরণের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. আসিবে এবার ঋতুরাজ বুঝি।

খ. তাহারেই পড়ে মনে ভুলিতে পারি না কোনোমতে।

গ. তরী তার এসেছে কি? বেজেছে কি আগমনী গান?

ঘ. রহেনি, সে ভুলে নিতে এসেছে ফাগুন স্মরিয়া।

৪. উদ্দীপক ও ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে—

i. স্মৃতিকাতরতা

ii. প্রিয়জন বিচ্ছেদ

iii. জীবন প্রবাহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও iii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. ‘পাথার’ শব্দের অর্থ কী?

ক. নদী

খ. সমুদ্র

গ. সমীর

ঘ. কুয়াশা

৬. ‘পুষ্পারতি’ বলতে বোঝানো হয়েছে—

ক. পুষ্পের সৌন্দর্য

খ. শীতের আগমন

গ. পুষ্পের বন্দনা

ঘ. নবান্নের উৎসব

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

হিম কুহেলির অন্তর তলে আজিকে পুলক জাগে

রাঙিয়া উঠেছে পলাশ কণিকা মধুর রঙিন রাগে।

৭. উদ্দীপকটিতে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কোন বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে—

ক. বসন্তের আগমন

খ. কবির বিদায়

গ. প্রকৃতির সৌন্দর্য

ঘ. কবির রিক্ততা

৮. উদ্দীপক ও ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় যে সুর ধ্বনিত হয়েছে—

i. প্রকৃতি ও মানবমনের সৌন্দর্য

ii. প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতা

iii. জীবনের প্রবহমাণতা



নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

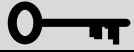
যারে খুব বেসেছিঁনু ভাল
সে মোরে ছেড়ে চলে গেল
যে ছিল মোর জীবন ছায়া
রেখে গেছে শুধু মায়া।
লাগে না ভালো অপরূপ প্রকৃতি
যতই করুক কেউ মিনতি।

ক. ‘দখিন দুয়ার গেছে খুলি?’ –প্রশ্নটি কে করেছিল?

খ. শীতকে কবি ‘মাঘের সন্ন্যাসী’ বলেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কোন দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপকটি ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার মূলভাবকে ধারণ করেছে।” –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.

‘দক্ষিণ দুয়ার গেছে খুলি?’ ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় এ প্রশ্নটি কবি করেছিলেন।

খ.

শীতের রিক্ততার সঙ্গে নিজের নিঃসঙ্গ জীবনের তুলনা করে কবি সুফিয়া কামাল শীতকে মাঘের সন্ন্যাসী বলেছেন। ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় প্রকৃতির পালাবদলে আগমন ঘটেছে ঋতুরাজ বসন্তের। কিন্তু সৌন্দর্যময় বসন্ত কবির অন্তরে কোনো সাড়া জাগায়নি। কারণ, কবি অতীত দিনের স্মৃতিচারণে বিভোর রয়েছেন। শীত ঋতু পূর্বেই পুষ্পশূন্য হয়েছে, রিক্ত হস্তে বিদায় নিয়েছে দিগন্তের পথে। মূলত শীতের এ রিক্ততার সঙ্গে কবি তাঁর জীবনের শূন্যতার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। এ কারণে তিনি শীতকে ‘মাঘের সন্ন্যাসী’ বলেছেন।

গ.

উদ্দীপকে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার প্রিয়জনকে হারানোর বেদনার দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রকৃতির মুক্ত আবহে মহাসমারোহে বসন্ত ঋতুর আগমন ঘটেছে অনিন্দ্য সুন্দর রূপরাশি নিয়ে। কিন্তু কবি বসন্তের এ আগমনে সাড়া দিতে পারছেন না। তিনি বসন্তের প্রতি বিমুখ। কবি শীতের রিক্ত নিরব বিদায়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়েছেন। কেননা শীতের রিক্ত নিরব প্রস্থান কবিমনে তার প্রিয়জন হারানোর স্মৃতিকে মনে করিয়ে দেয়।

উদ্দীপকে কবির প্রিয়জন হারানোর গভীর বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। উদ্দীপকের কবি যাকে খুব ভালোবেসেছিলেন সে তাকে ছেড়ে চলে গেছে। কবির জন্য রেখে গেছে শুধু মায়া। ফলে অপরূপ প্রকৃতির প্রতিও কবি বিমুখ। তেমনভাবে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায় কবি সুফিয়া কামালের প্রেরণাদাতা তাঁর স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন। ফলে কবি রিক্ততা ও শূন্যতায় আচ্ছন্ন হয়েছেন। জীবনে এ গভীর শূন্যতার জন্য কবি প্রকৃতি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েছেন। কবি নিজ হৃদয়ের রিক্ততা উপলব্ধি করেছিলেন শীতের পুষ্পশূন্য দিগন্তের মাঝে। তাই তিনি বসন্তের রাজকীয় আগমনের চেয়ে শীতের রিক্ত প্রস্থান নিয়ে বেশি ভেবেছেন।



ঘ.

উদ্দীপক ও ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতা উভয়টিতে কবি হৃদয়ের রিজতা ও বিষণ্ণতা প্রকাশিত হয়েছে।

প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে তার নিজস্ব নিয়মে। কিন্তু কবি আনন্দচিন্তে বসন্তকে বরণ করতে পারছেন না। কেননা তাঁর ব্যক্তিজীবন প্রিয়জন হারানোর বেদনায় ভারাক্রান্ত। শীতের রিজ বিদায়ে কবি নিজ প্রিয় প্রেরণাকে হারানোর স্মৃতিতে কাতর হয়েছেন। তাই বসন্তের প্রাণময় আগমনেও তিনি শীতের প্রস্থানে বিরহকাতর।

উদ্দীপকে দেখা যায় কবি তার ভালোবাসার মানুষটি চলে যাওয়ায় বিরহে কাতর। ভালোবাসার এই মানুষটি তার জীবনে ছায়া হয়ে প্রেরণা দিয়েছিল। তাই তার অনুপস্থিতি কবিকে প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি উদাসীন করে তোলে। তার মন কেবল পড়ে থাকে সেই প্রিয় মানুষের স্মৃতিময়তায়। ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতায়ও এই স্মৃতিকাতরতা প্রকাশিত হয়েছে। কবি নিজ হৃদয়ের রিজতা উপলব্ধি করেছিলেন শীতের পুষ্পশূন্য দিগন্তের বলয়ে। তাই প্রকৃতির সবকিছুতেই তার বিমুখতা দেখা দিয়েছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশ ও সুফিয়া কামালের ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতা উভয়টিতেই কবির ব্যক্তিজীবনের বিষাদময় ঘটনা রেখাপাত করেছে। শীতের বিদায়ের মুহূর্তে বসন্তের আগমন ঘটলেও কবির মনে কোনো আবেদন সৃষ্টি হয়নি। শীতের রিজতায় প্রিয়জনকে হারিয়েছেন বলে শীতকে কোনোমতেই কবি ভুলতে পারছেন না। জীবনের ক্ষণে ক্ষণে প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা কবিমনকে নিরবধি আচ্ছন্ন করে রাখে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার মূলভাবকে ধারণ করেছে।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

ওরে আয় রে তবে, মাতরে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
পিছন-পানের বাঁধন হতে চল ছুটে আজ বন্যাস্রোতে,
আপনাকে আজ দখিন-হাওয়ায় ছড়িয়ে দে-রে দিগন্তে।
বাঁধন যত ছিন্ন করো আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

ক. ‘সাব্বের মায়্যা’ কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা?

খ. ‘হে কবি নীরব কেন?’ –কবি এখানে কোন কারণে নীরব?

গ. উদ্দীপকে ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার কোন ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘তাহারেই পড়ে মনে’ কবিতার উদ্দিষ্ট বসন্ত-বন্দনা।” –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।



উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. গ ৩. খ ৪. ক ৫. খ ৬. গ ৭. ক ৮. ঘ



সেই অস্ত্র

আহসান হাবীব



কবি-পরিচিতি

আহসান হাবীব ১৯১৭ সালের ২ জানুয়ারি পিরোজপুর জেলার শঙ্করপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হামিজুদ্দীন হাওলাদার ও মাতা জমিলা খাতুন। পারিবারিকভাবে আহসান হাবীব সাহিত্য-সংস্কৃতির আবহের মধ্যে বড় হয়েছেন। সেই সূত্রে ছাত্রজীবন থেকেই তিনি লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত হন। পিরোজপুর সরকারি স্কুল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে বরিশাল বিএম কলেজে ভর্তি হন কিন্তু অর্থভাবে পড়াশুনা অসমাপ্ত রেখে ১৯৩৬ সনে তিনি জীবিকার সন্ধানে কলকাতা চলে যান। এ-সময় থেকেই তাঁর কঠিন জীবন-সংগ্রামের এবং প্রকৃত কাব্যসাধনার শুরু। কলকাতার জীবনে আহসান হাবীব সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং মৃত্যু অবধি এ পেশাতেই নিয়োজিত ছিলেন। দেশবিভাগের পর ১৯৫০-এর দিকে আহসান হাবীব ঢাকা চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এ-সময় থেকেই তাঁর কাব্যসাধনার দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলাদেশের দৈনিক বাংলা পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী ও ভাবুক প্রকৃতির। নদী বিধৌত বৃহত্তর বরিশালের পল্লিপ্রকৃতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলো শৈশবেই। গভীর জীবনবোধ ও আশাবাদ তাঁর কবিতাকে বিশিষ্ট ব্যঙ্গনা দান করেছে। মেধার মনন ও আবেগকে শিল্পে রূপ দেয়ার অসাধারণ দক্ষতা ছিলো তাঁর। তিনি সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং আত্মমানবতার সপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। অন্যদিকে স্বদেশ ও মাতৃভাষার স্বরূপ-সন্ধান তাঁর কাব্যসাধনার প্রেরণা। বর্তমানের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক-সাংবাদিক মঈনুল আহসান সাবের আহসান হাবীবের বড় ছেলে। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ইউনেস্কো সাহিত্য পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। আহসান হাবীব ১৯৮৫ সালের ১০ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা:

কাব্যগ্রন্থ : রাত্রিশেষ (১৯৪৭), ছায়া হরিণ (১৯৬২), সারা দুপুর (১৯৬৪), আশায় বসতি (১৯৭৪), মেঘ বলে চৈত্রে যাবো (১৯৭৬), দু'হাতে দুই আদিম পাথর (১৯৮০), বিদীর্ণ দর্পণে মুখ (১৯৮৫);

উপন্যাস : আরণ্য নীলিমা (১৯৬২), রানী খালের সাঁকো (১৯৬৫);

শিশুতোষ : ছুটির দিন দুপুরে (১৯৭৮), বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর (১৯৭৭)।

ভূমিকা

আহসান হাবীব রচিত 'বিদীর্ণ দর্পণে মুখ' কাব্যগ্রন্থ থেকে 'সেই অস্ত্র' কবিতাটি সংকলন করা হয়েছে। কবিতাটিতে কবি সহজ সরল ভাষায় তাঁর প্রত্যাশিত ভালোবাসা মানবসমাজে ফিরে পাওয়ার কামনা ব্যক্ত করেছেন। কবিতাটি অন্ত্যমিলহীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর পর্বগুলোর বিন্যাসও অসম। কবি বিশ্ববাসীকে হিংসা-বিদ্বেষ বিসর্জন দিয়ে ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করেছেন।



উদ্দেশ্য

আহসান হাবীবের 'সেই অস্ত্র' কবিতাটি পড়ার পর আপনি-

- কবি 'ভালোবাসা' নামক অবিনাশী অস্ত্র মানুষের কাছে ফিরিয়ে দিতে প্রত্যাশী কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- 'ভালোবাসা'-কে কবি অবিনাশী অস্ত্র হিসেবে কেন আখ্যায়িত করেছেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- একমাত্র 'ভালোবাসা' দিয়েই পৃথিবীর সকল প্রকার হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, জাত্যাভিমান দূর করা সম্ভব-কবির এই ধারণা আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারবেন।





মূলপাঠ

আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও
সভ্যতার সেই প্রতিশ্রুতি
সেই অমোঘ অনন্য অস্ত্র
আমাকে ফিরিয়ে দাও ।
সেই অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও
যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র হবে আনত
যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
অরণ্য হবে আরও সবুজ
নদী আরও কল্লোলিত
পাখিরা নীড়ে ঘুমোবে ।
যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
ফসলের মাঠে আগুন জ্বলবে না
খাঁ খাঁ করবে না গৃহস্থালি ।
সেই অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও
যে অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে
নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না
মানব বসতির বুকে
মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত
লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্গু-বিকৃত
আমাদের চেতনা জুড়ে তারা করবে না আতনাদ
সেই অস্ত্র যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
বার বার বিধ্বস্ত হবে না ট্রয়নগরী ।
আমি সেই অবিনাশী অস্ত্রের প্রত্যাশী
যে ঘৃণা বিদ্বেষ অহংকার
এবং জাত্যভিমানকে করে বার বার পরাজিত ।
যে অস্ত্র আধিপত্যের লোভকে করে নিশ্চিহ্ন
যে অস্ত্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না
করে সমাবিষ্ট
সেই অমোঘ অস্ত্র- ভালোবাসা
পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করো ।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অমোঘ- অব্যর্থ, সার্থক, অবশ্যস্বাবী। **জাত্যভিমান সমাবিষ্ট-** কোনো যুক্তি ছাড়াই নিজ জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করার অহংকারী মনোভাব। **ট্রয়নগরী-** প্রাচীন তুরস্কের স্থাপত্যকলায় নন্দিত এক শহর। মানুষের হিংসা-বিদ্বেষ ঈর্ষা আর দম্ভের শিকার হয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে বারংবার ধ্বংস হয়েছে এই নগরী। যুদ্ধের নির্মমতার এক চিরায়ত দৃষ্টান্ত এই ট্রয়। **মানব বসতির বুকে মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে পঙ্গু-বিকৃত-** ভালোবাসাহীন বিদ্বেষপূর্ণ পৃথিবীতে যুদ্ধের অনিবার্য ক্ষতি সম্পর্কে নিজের উৎকণ্ঠা কবি এখানে প্রকাশ করেছেন। অনুমান করা যায়, কবিচৈতন্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকিতে ঘটে যাওয়া নৃশংসতার স্মৃতি জাগ্রত ছিল। তাই আণবিক বোমার আঘাতে মৃত কিংবা প্রজন্ম-



পরম্পরায় পঙ্গুত্ব বরণকারী বহু মানুষের আত্মনাদ কবির এই যুদ্ধবিরোধী মননকে আন্দোলিত করেছে। যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র হবে আনত— কবি বিশ্বাস করেন, ভালোবাসা দিয়ে মানুষের হিংসা বিদ্বেষ দূর করা সম্ভব। ভালোবাসা থাকলে মানুষ মানুষকে শত্রু ভাববে না, কৃষকের দুঃখ-জ্বালার অবসান হবে এবং বিদ্রোহের আগুন জ্বলবে না। যে অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না— কবি এখানে যুদ্ধে ব্যবহৃত ছোট-বড় ক্ষেপণাস্ত্রের কথা বুঝিয়েছেন। কবি চান, মানুষ যেন যুদ্ধের ভয়াবহতায় জড়িয়ে না পড়ে, বিশ্বে যেন শান্তি নিশ্চিত হয়। সমাবিষ্ট— সমভাবে আবিষ্ট, সমাবেশ হয়েছে এমন, সমবেত হওয়া অর্থে।



সারসংক্ষেপ

কবি আহসান হাবীবের ‘সেই অস্ত্র’ কবিতাটি শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য চিরায়ত প্রার্থনাসংগীতের মতো। কবির একমাত্র প্রত্যাশা ‘ভালোবাসা’ নামের মহান অস্ত্রকে পুনরায় এই মানবসমাজে ফিরে পাওয়া। ভালোবাসা মানুষকে যেমন সকল কাজে শক্তি জোগায়, তেমনি ভালোবাসা সকল অমঙ্গল থেকে রক্ষার উপায় বলে দেয়। এ জন্য কবি বিশ্ববাসীর কাছে এই ভালোবাসা ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ করেছেন। হিংসা, লোভ পরিহার করতে পারলে পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করবে, পৃথিবী এগিয়ে যাবে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে। এ সবই সম্ভব হবে কেবল মানুষের কাক্ষিত ভালোবাসা ছড়িয়ে দেবার মাধ্যমে। কবির প্রত্যাশা, বিশ্বময় ভালোবাসা ছড়িয়ে দিয়ে মানবিকতার হতবোধ জাঘত করা। কবি জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকির ভয়াবহতা, হিংসা-বিদ্বেষ, ঈর্ষা আর দস্তের বলি ট্রয় নগরীর ধ্বংসলীলা প্রভৃতি নৃশংসতার স্মৃতি তাড়িত হয়ে পৃথিবীবাসীর জন্য প্রত্যাশিত ভালোবাসার প্রত্যাভর্তন কামনা করেছেন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রাচীন তুরস্কের স্থাপত্যকলায় নন্দিত যে শহরটি—

ক. মিনার্ভা

খ. এথেন্স

গ. ট্রয়

ঘ. ব্যাবিলন

২. ‘জাত্যভিমান’ শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে—

ক. আভিজাত্য গর্ব

খ. মানবীয়তা

গ. জিঘাংসা প্রবৃত্তি

ঘ. ভালোবাসা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যুদ্ধাহত সৈনিকদের সেবা দিয়ে অসহ্য যন্ত্রণা দূর করেছিলেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। মানবসেবার জন্য আজও তিনি পৃথিবীর বুকে অমর হয়ে আছেন।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে—

ক. যুদ্ধের উন্মাদনায়

খ. অহংকারী মনোভাবে

গ. স্বদেশপ্রেমে

ঘ. মানবপ্রেমে

৪. উদ্দীপক ও ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় মানুষের প্রতি প্রকাশিত হয়েছে—

ক. বিদ্বেষ ও ঘৃণা

খ. ভালোবাসা

গ. জাত্যভিমান

ঘ. লোভ-লালসা



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. ‘সেই অস্ত্র’ কবিতাটি কবি আহসান হাবীবের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?

ক. বিদীর্ণ দর্পণে মুখ

খ. রাত্রিশেষ

গ. সারাদুপুর

ঘ. ছায়াহরিণ



বিরাজ করবে শান্তি এবং সমৃদ্ধি। আর তা করা সম্ভব একমাত্র ভালোবাসা নামক অস্ত্র দিয়ে। কবি আহসান হাবীব ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার জয়গান গেয়েছেন। তাঁর মতে ভালোবাসা নামের অমোঘ অস্ত্র উত্তোলিত হলে তা মানববিন্দুসী অন্য সকল মারণাস্ত্রকে পরাস্ত করবে। ফলে পৃথিবীতে শান্তি নেমে আসবে। ভালোবাসার অভাবে মানুষের মধ্যে মানবিকতা লোপ পায় যার পরিণতিতে সে যুদ্ধের মতো অমানবিক কর্মকাণ্ডে যোগ দিতে পারে। তাই কবি মানুষকে ভালোবাসার সংস্পর্শে এনে মানুষকে সত্যিকার অর্থে পরিবর্তন করতে চেয়েছেন। কবি জানেন মানুষ হিংসা আর স্বার্থপরতার করালগ্রাসে নিপতিত হয়ে অনেক মানবিকতাসূন্য কাজ করে। কবি মানুষের সেই মানবিকতাবোধকে মানবসমাজে ফিরিয়ে দিতে চান। অন্যদিকে উদ্দীপকে দেখা যায়, আফ্রিকার জাতিগত দাঙ্গা গৃহযুদ্ধে রূপ নিলে সেখানে অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। অনেকের ধারণা সেখানে আর্থ-সামাজিক অন্য কারণ থাকলেও পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ ও সৌহার্দ্যের অভাবে এ ধরনের ঘটনা ঘটে। আফ্রিকার এ ঘটনাটিই ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় উপজীব্য হয়েছে। বস্তুত ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় জাতিগত হিংসা-বিদ্বেষ তথা জাত্যভিমান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, যা উদ্দীপকেও চিত্রিত হয়েছে।

ঘ.

“উদ্দীপক ও ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় যুদ্ধবিরোধী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে।” –মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

কবি আহসান হাবীব ভালোবাসার শক্তিতে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। কেননা হিংসা ও বিদ্বেষের কারণে পৃথিবীতে মানুষ দিন দিন আরও কঠিন সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে। মানবীয় মূল্যবোধের অভাবে মানুষ একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আর অশুভ শক্তিগুলো পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করছে। এজন্য কবি ভালোবাসার মতো অমোঘ অস্ত্রের প্রত্যাশী হয়েছেন।

‘সেই অস্ত্র’ কবিতার কবি পৃথিবীতে ভালোবাসা নামের অমোঘ অস্ত্র পুনরায় মানবসমাজে ফিরে পেতে চেয়েছেন। ভালোবাসার সংস্পর্শে আসতে না পারার কারণেই পৃথিবীতে এত যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে। মানুষ ভালোবাসার স্পর্শ পায় না বলেই মানুষকে শত্রু ভাবছে। প্রসিদ্ধ ট্রয় নগরী যুদ্ধের শিকার হয়েছে বার বার। উদ্দীপকেও দেখা যায় আফ্রিকার একটি দেশে জাতিগত দাঙ্গা গৃহযুদ্ধে রূপ নিয়েছে। যুদ্ধের কারণে সেখানে অসংখ্য মানুষ মারা যায়। অনেকে মনে করছেন, সেখানে আর্থ-সামাজিক কারণের বাইরে মানুষের মনুষ্যত্ববোধ তথা ভ্রাতৃত্ববোধ ও সৌহার্দ্যের অভাবে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় মানুষে মানুষে যে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে তা গড়ে ওঠার প্রাথমিক শর্ত হলো ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌহার্দ্য ও মানবতাবোধ যা উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে। ভালোবাসার অভাবেই হিংসা-দ্বেষ-ঘৃণা বৃদ্ধি পায়। একসময় তা উদ্দীপকের মতো মানুষের জাত্যভিমানের কারণে জাতিগত দাঙ্গার সৃষ্টি করে। কিন্তু উদ্দীপকের ও ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার কবি চূড়ান্ত বিচারে শান্তির প্রত্যাশী। তাই বলা যায়, উদ্দীপক ও ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় যুদ্ধবিরোধী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

জন্মদের শাণিত অস্ত্র

সভ্যতার নির্মল পুষ্পকে আহত করার পূর্বে

সঙ্গীত ও চিত্রকলাকে ধ্বংস করার পূর্বে

ছাড়পত্রহীন সূর্যকিরণকে বিষাক্ত করার পূর্বে

এসো, বারবারা, বজ্র হয়ে বিদ্রুপ করি তাকে।

ক. ট্রয় নগরী কোথায়?

খ. ‘লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্গু- বিকৃত’ –ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকের ধ্বংসের চিত্রটি ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় কবির হৃদয়ের প্রত্যাশা প্রশান্তি।” –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।



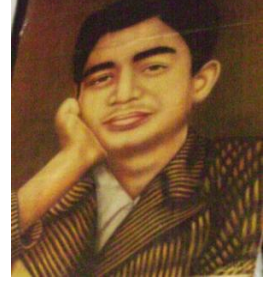
উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. ক ৩. ঘ ৪. খ ৫. ক ৬. ক ৭. ক ৮. ক



আঠারো বছর বয়স

সুকান্ত ভট্টাচার্য



কবি-পরিচিতি

সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯২৬ সালের ১৫ আগস্ট কলকাতায় এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়ার উনশিয়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য ও মায়ের নাম সুনীতি দেবী। সুকান্ত ভট্টাচার্য ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন মার্কসবাদী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ও প্রগতিশীল চেতনার অধিকারী একজন তরুণ কবি। সে-সময়ের দৈনিক পত্রিকা ‘স্বাধীনতা’র কিশোরসভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সম্পাদক ছিলেন। তেতাল্লিশের মন্বন্তর, ফ্যাসিবাদী আত্মশাসন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছিলেন। তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে যাবতীয় অনাচার, বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ। দরিদ্র ও নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কথা বলার জন্য তিনি কবিতাকে হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ছিন্নভিন্ন মানুষ, যারা অভাব-অনটন, রোগ-শোকে ধুঁকে বুকের মাত্র ক’খানা হাড় নিয়ে বেঁচে আছে অদম্য বাসনায়— সুকান্ত সেইসব গণমানুষের বন্ধু। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর কবিতা স্বাধীনতাকামী মানুষের মনে সাহস ও উদ্দীপনা জুগিয়েছে। সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯৪৭ সালের ১৩ মে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মাত্র একুশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ:

- কাব্যগ্রন্থ : ছাড়পত্র (১৯৪৭), ঘুম নেই (১৯৫০), পূর্বাভাস (১৯৫০);
 ছড়া : মিঠে কড়া (১৯৫২),
 গীতিনাট্য : অভিযান (১৯৫৩), সূর্য-প্রণাম (১৯৫৩);
 সংগীত : গীতিগুচ্ছ (১৯৬৫);
 গল্পগ্রন্থ : হরতাল (১৯৬২)।

ভূমিকা

‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতাটি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত ‘ছাড়পত্র’ নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এ কবিতায় কবি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যকে এবং আঠারো বছর বয়সের বিভিন্ন গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করেছেন।



উদ্দেশ্য

সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতাটি পড়ার পর আপনি—

- ✚ কবিতার মূলভাবটি বুঝে লিখতে পারবেন।
- ✚ আঠারো বছর বয়সী তরুণদের মানসিক শক্তি ও চেতনাগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ✚ ‘এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে’। —কবির এই প্রত্যাশার যৌক্তিকতা বিচার করতে পারবেন।



মূলপাঠ

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়—
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাম্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে,
প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।

আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর
তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা,
এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর
এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।

আঠারো বছর বয়স যে দুর্বীর
পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান,
দুর্যোগে হাল ঠিকমতো রাখা ভার
ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।

আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত; একে একে হয় জড়ো,
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।

তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।

এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে
এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়—
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে ॥



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ- এ বয়স মানবজীবনের এক উত্তরণকালীন পর্যায়। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে মানুষ এ বয়সে। অন্যদের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিতে হয় তাকে। এদিন থেকে তাকে এক কঠিন সময়ের দুঃসহ অবস্থায় পড়তে হয়। **আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা-** যৌবনে পদার্পণ করে এ বয়সে মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী হয়। জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ায় স্বাধীনভাবে। শৈশব-কৈশোরের পরনির্ভরতার দিনগুলোতে যে কান্না ছিল এ বয়সের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য তাকে সচেতনভাবে মুছে ফেলতে উদ্যোগী হয়। **এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর-** অনুভূতির তীব্রতা ও সুগভীর সংবেদনশীলতা এ বয়সেই মানুষের জীবনে বিশেষ তীব্র হয়ে দেখা দেয় এবং মনোজগতে তার প্রতিক্রিয়াও হয় গভীর। **এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা-** ভালো-মন্দ, ইতিবাচক-নেতিবাচক নানা তত্ত্ব, মতবাদ, ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে এই বয়সের তরুণেরা। **এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য-** দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য যুগে যুগে এ বয়সের মানুষই এগিয়ে গেছে সবচেয়ে বেশি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়িয়েছে সমস্ত বিপদ মোকাবেলায়। প্রাণ দিয়েছে অজানাকে জানবার জন্য, দেশ ও জনগণের মুক্তি ও কল্যাণের সংগ্রামে। তাই এ বয়স সুন্দর, শুভ ও কল্যাণের জন্য রক্তমূল্য দিতে জানে। **এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে-** সচেতন ও সচেষ্টিত হয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে জীবন পরিচালনা করতে না পারার অজস্র ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে এ বয়স নেতিবাচক কালো অধ্যায় হয়ে উঠতে পারে। **এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে-** আঠারো বছর বয়স বহু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। জড় নিশ্চল প্রথাবদ্ধ জীবনকে পেছনে ফেলে নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন, কল্যাণ ও সেবাব্রত, উদ্দীপনা, সাহসিকতা, চলার দুর্বার গতি- এসবই আঠারো বছর বয়সের বৈশিষ্ট্য। কবি প্রার্থনা করেন, এসব বৈশিষ্ট্য যেন জাতীয় জীবনে চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়। **তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা-** চারপাশে অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন, সামাজিক বৈষম্য ও ভেদাভেদ ইত্যাদি দেখে প্রাণবন্ত তরুণেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। **দুর্যোগে হাল ঠিক মতো রাখা ভার-** জীবনের এই সন্ধিক্ষণে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা জটিলতাকে অতিক্রম করতে হয়। এই সময় সচেতন ও সচেষ্টিতভাবে নিজেকে পরিচালনা করতে না পারলে পদস্খলন হতে পারে। জীবনে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। **বিরাত দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি-** নানা দুঃসাহসী স্বপ্ন, কল্পনা ও উদ্যোগ এ বয়সের তরুণদের মনকে ঘিরে ধরে। **পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে-** এ বয়স দেহ ও মনের স্থবিরতা, নিশ্চলতা, জরাজীর্ণতাকে অতিক্রম করে দুর্বার গতিতে। প্রগতি ও অগ্রগতির পথে নিরন্তর ধাবমানতাই এ বয়সের বৈশিষ্ট্য। **সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে-** তারুণ্য স্বপ্ন দেখে নতুন জীবনের, নব নব অগ্রগতি সাধনের। তাই সেইসব স্বপ্ন বাস্তবায়নে, নিত্য-নতুন করণীয় সম্পাদনের জন্য নব নব শপথে বলীয়ান হয়ে তরুণ-প্রাণ এগিয়ে যায় দৃঢ় পদক্ষেপে। **স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি-** অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে মাথা উঁচু করে স্বাধীনভাবে চলার ঝুঁকি এ বয়সেই মানুষ নিয়ে থাকে।



সারসংক্ষেপ

‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতায় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যকে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে তুলে ধরেছেন। আঠারো বছর বয়সে পদার্পণের মধ্য দিয়ে মানুষ যৌবনপ্রাপ্ত হয়। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের এ বয়সটি উত্তেজনার, প্রবল আবেগ ও উচ্ছ্বাসে জীবনে ঝুঁকি নেবার উপযোগী। অদম্য দুঃসাহসে সকল বাধা বিপদ অতিক্রম করে এরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত। আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া এ বয়সের ধর্ম। অদম্য মনোবল, অপ্রতিরোধ্য গতিতে তরুণ সমাজ দেশ ও জাতির প্রয়োজনে অকাতরে প্রাণ দিতে পারে। আমাদের কাছে তাই তারুণ্যই জীবন, তারুণ্যই কাজক্ষিত। কারণ সৃষ্টিধর্মী ও কল্যাণকর সব কিছু তরুণদেরই দান। তাই কবি প্রত্যাশা করেছেন নানা সমস্যাপিড়িত এ দেশে তারুণ্য ও যৌবনশক্তি যেন জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়। এ বয়সে নিজের চিন্তার চেয়ে সমাজের চিন্তা প্রবল, সমাজের উন্নতির জন্য প্রতিবাদী হয়ে ওঠে এ বয়সীরা, আবার সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধাচরণ করে এ বয়সেই। কবির আহ্বান, এ দেশের মাটি ও মানুষের চেতনা আঠারোকে ধারণ করুক।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

ক. ঋরবৃত্ত	খ. মাত্রাবৃত্ত
গ. অক্ষরবৃত্ত	ঘ. স্বরমাত্রিক

২. আঠারো বছর বয়স কিসের প্রতীক?

ক. বিপদের	খ. যৌবনের
গ. বেদনার	ঘ. নিশ্চলতার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

স্বাধীনতার প্রত্যাশায় দেশে চলছে মুক্তিযুদ্ধ। আর এ সময় দেশ আশা করে সমস্ত তরুণের আঠারো বছর তার বুকে নেমে আসুক।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে নিচের কোন চরণের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়	খ. বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে
গ. এ বয়স নতুন কিছু করে	ঘ. এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়

৪. উদ্দীপক ও ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতায় ফুটে উঠেছে—

ক. তারুণ্যের উদ্দীপনা	খ. কল্যাণ চেষ্টা
গ. ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস	ঘ. সৃষ্টিশীলতা



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. আঠারো বছর বয়স—

- দুঃসহ
- নির্ভয়
- দুর্বীর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. i, ii ও iii

৬. ‘এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা’ বলতে তারুণ্যের যে বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে—

ক. ইতি- নেতি নানা ভাবনাকে	খ. দুর্বীর গतिकে
গ. সেবাব্রতকে	ঘ. নির্ভীকতাকে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

কাজী নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’ কবিতার দুটি চরণ এ রকম—

‘আমি দুর্বীর
আমি ভেঙে করি সব চুরমার।’

৭. উদ্দীপকের কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে আপনার পঠিত কোন কবির সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. আল মাহমুদ	খ. সুফিয়া কামাল
গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য	ঘ. বিষ্ণু দে

৮. উদ্দীপকের কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

ক. জন্মভূমি প্রীতি	খ. নাগরিক জীবনবোধ
গ. সাহসী অভিযাত্রা	ঘ. অন্যায়ের বিরুদ্ধে দ্রোহ



সৃজনশীল প্রশ্ন :

মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম
মোরা ঝরনার মতো চঞ্চল
মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়
মোরা প্রকৃতির মতো উচ্ছল
মোরা আকাশের মতো বাঁধাহীন
মোরা মরু সঞ্চরী বেদুঈন।

ক. ‘রক্তদান’ কী কাজ?

খ. ‘শপথের কোলাহল’ বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতাটি কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপকে ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতার মর্মবাণী প্রকাশিত হয়েছে।” –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.

রক্তদান পুণ্যের কাজ।

খ.

‘শপথের কোলাহল’ শব্দগুচ্ছ দ্বারা মানব জীবনে প্রতিজ্ঞার গাঢ়তাকে বোঝানো হয়েছে।

আঠারো বছর বয়স মিথ্যা ও অপশক্তির সামনে নির্ভীক চিন্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু যারা ভীরা তারা লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে আবার পিছু হটে যায়। আঠারো বছর বয়সের তারুণ্য একবার যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে তারা সে উদ্দেশ্যে কখনোই বিসর্জন দেয় না। দুরন্ত শক্তি আর দুর্বীর সাহস নিয়ে সে তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে সর্বদা উদযীব থাকে। ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতায় ‘শপথের কোলাহল’ বলতে কবি তারুণ্যের এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের দুর্বীর মানসিকতাকে বুঝিয়েছেন।

গ.

উদ্দীপকের সঙ্গে ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতার নবীনদের অদম্য প্রাণশক্তি আর তরুণ চিন্তের দুর্বীর গতির দিক থেকে সাদৃশ্য রয়েছে।

আঠারো বছর বয়স অদম্য প্রাণশক্তি আর উদ্দীপনায় ভরা থাকে। নানা দুঃসাহসী স্বপ্ন, কল্পনা ও উদ্যোগ এ সময় শরীর ও মনে যৌবনের মাদকতায় ভর করে। এ সময় মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াবার ঝুঁকি গ্রহণ করে। বদ্ধ চিন্তা এবং জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার অভিপ্রায়ে তারা নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে। নবীনদের ধর্মই হলো নিজেকে নিবেদন করে দুর্বীর বেগে প্রগতির পথে এগিয়ে চলা।

উদ্দীপকে নবীনদের অফুরন্ত প্রাণশক্তি প্রকাশিত হয়েছে। তারা স্বপ্ন দেখে নতুন জীবনের, সভ্যতার নব নব অগ্রগতি সাধনের। এসব স্বপ্ন বাস্তবায়নে তারা দৃঢ় পদক্ষেপে নতুন শপথে বলীয়ান হয়ে ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম গতিতে এগিয়ে চলে। এই নবীনরা আকাশের মতো বাঁধাহীন, তারা মরু সঞ্চরী বেদুঈন। তাদের দুর্বীর গতির সামনে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে না। এই নবীনরা মানুষের কল্যাণে স্বাধীনভাবে এগিয়ে চলার ঝুঁকি নেয়। ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতায়ও বর্ণিত হয়েছে যৌবনই মানুষের জীবনে শ্রেষ্ঠ সময়। এ বয়স কোনো বাধার কাছে মাথা নত করে না। এ সময় মানুষ সব বাধা-বিঘ্ন দুমড়ে মুচড়ে এগিয়ে চলে সামনের দিকে। যৌবন স্বপ্ন দেখে বিশ্ব জয়ের। উদ্দীপকের সঙ্গে ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতাটি এভাবেই সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ঘ.

‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতায় বর্ণিত যৌবনের স্বরূপ উদ্দীপকেও ফুটে উঠেছে— মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

আঠারো বছর বয়স তারুণ্যের বয়স, যৌবনের বয়স। এ বয়সে বৃকের ভেতর বাসা বাঁধে যত রকমের দুরন্তপনা আর নব নব ইচ্ছা। মানুষ স্বাধীনভাবে চলার ঝুঁকি নেয় এ বয়সেই। এ বয়সে আছে সব দুর্যোগ আর দুর্বিপাক মোকাবেলা করার অফুরন্ত প্রাণশক্তি। ফলে তারুণ্য এগিয়ে যায় দুর্বীর গতিতে নব সভ্যতার পানে।



উদ্দীপকে তরুণ প্রাণের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। এই নবীন তরুণদের দূরন্তপনায় সৃষ্টি হয় স্বপ্নের নতুন সমাজ। আরবের যাযাবর বেদুঈনদের দাপটে যেমন উষর মরুও বশীভূত হয়, সেখানে প্রকৃতি যেমন বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তেমনি তারুণ্যও রক্তশপথ নিয়ে সব বিপত্তি এড়িয়ে এগিয়ে চলে। ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতায়ও যৌবনের এই প্রশস্তি গাওয়া হয়েছে। কবিতায় যৌবন নির্ভীক, উদ্দাম, চঞ্চল এবং আকাশের মতো বন্ধনহীন। মানুষের কল্যাণে নির্ভীক চিন্তে এগিয়ে যাওয়াই যৌবনের ধর্ম।

উদ্দীপক এবং ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতা উভয়টিতে নবীন এবং তারুণ্যের প্রাণধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। প্রগতি এবং সভ্যতার পথে নিরন্তর অভিযাত্রা দুইয়েরই মূল কথা। উদ্দীপকের নবীনরা যেমন অশুভ শক্তির বিনাশ সাধন করে সত্য আর সুন্দরের বারতা আনতে অগ্রাহী তেমনি কবিতার যৌবনও পৃথিবীতে শান্তির বারতা বইয়ে দিতে উৎসুক। বস্তুত বিশ্বকে সুন্দর ও সত্যের পথে পরিচালিত করতে যে যৌবন ধর্মের বিকল্প নেই সে সত্যটি প্রকাশিত হয়েছে উদ্দীপকে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটিতে ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতার মর্মবাণী প্রকাশিত হয়েছে।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ফ্রন্দন
হেরিব না দিক—
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার
উদ্দাম পথিক।

ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন?

খ. ‘এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা’ –ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতার যে বিষয়ে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তা তুলে ধরুন।

ঘ. “উদ্দীপকে ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতার মূলভাব অনুরণিত হয়েছে।” –স্বীকার করেন কি? যুক্তিসহ আপনার মতামত তুলে ধরুন।



উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খ ২. খ ৩. ক ৪. ক ৫. ঘ ৬. ক ৭. গ ৮. গ



ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

শামসুর রাহমান



কবি-পরিচিতি

শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালের ২৪ অক্টোবর ঢাকা শহরে তাঁর নানাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার পাড়াতলী গ্রাম। তাঁর পিতা মোখলেসুর রহমান চৌধুরী ও মাতা আমেনা খাতুন। শামসুর রাহমান তাঁর তেরো ভাই-বোনের মধ্যে চতুর্থ। তিনি ১৯৪৫ সালে ঢাকার পোগোজ ইংলিশ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে আইএ পাশ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হয়েও চূড়ান্ত পরীক্ষা না দিয়ে পাস কোর্সে বিএ পাশ করেন। তাঁর পেশা ছিল সাংবাদিকতা। ১৯৫৭ সালে ‘দৈনিক মর্নিং নিউজ’-এ সাংবাদিকতা দিয়ে শুরু এবং ১৯৬৪ সালে ‘দৈনিক পাকিস্তান’ (পরে ‘দৈনিক বাংলা’)-এ যোগ দিয়ে ১৯৮৭ সালে প্রধান সম্পাদক থেকে পদত্যাগ। আঠারো বছর বয়সে তিনি লেখালেখি শুরু করেন। ১৯৫৮ সালে স্বৈরশাসক আইয়ুব খানকে বিদ্রূপ করে ‘হাতির গুঁড়’ নামক কবিতা লিখে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। দেশ, দেশের মানুষ, স্বাধীনতা আর মাতৃভাষাকে নিয়ে তাঁর রচিত কবিতাগুলো ইতিহাস হয়ে থাকবে। তাঁর ‘বর্ণমালা আমার দুগ্ধখিনী বর্ণমালা’, ‘স্বাধীনতা তুমি’, ‘তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা’, ‘সফেদ পাঞ্জাবি’, ‘আসাদের শার্ট’ প্রভৃতি কবিতায় উঠে এসেছে বাঙালি জাতির স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ। বিষয়ে, আঙ্গিকে, উপস্থাপনায় তাঁর কবিতা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের প্রত্যাশা, হতাশা, বিচ্ছিন্নতা, বৈরাগ্য ও সংগ্রাম তাঁর কবিতায় সার্থকভাবে বিধৃত। উপমা ও চিত্রকল্পে তিনি প্রকৃতিনির্ভর এবং বিষয় ও উপাদানে শহরকেন্দ্রিক। বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে দুই বাংলায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত। ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট উপাধিতে ভূষিত করে। এছাড়া তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০০৬ সালের ১৭ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ:

কাব্যগ্রন্থ : প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৬০), রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩), বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৭), নিরালোকে দিব্যরথ (১৯৬৮), নিজ বাসভূমে (১৯৭০), বন্দি শিবির থেকে (১৯৭২), ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা (১৯৭৪), উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ (১৯৮২), বুক তার বাংলাদেশের হৃদয় (১৯৮৮);

শিশুতোষ : এলাটিং বেলাটিং (১৯৭৫), ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো (১৯৭৭), স্মৃতির শহর (১৯৭৯)।

ভূমিকা

শামসুর রাহমান রচিত ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ শীর্ষক কবিতাটি নিজ বাসভূমে কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। গদ্যছন্দ ও প্রবাহমান ভাষার সুষ্ঠু বিকাশে কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সংযোজন। কবিতাটিতে গণজাগরণ, সংগ্রামী চেতনা ও দেশপ্রেমের প্রতিফলন ঘটেছে। কবিতাটিতে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনে সকল শ্রেণি পেশার মানুষের অবদান ফুটে উঠেছে।



উদ্দেশ্য

শামসুর রাহমানের ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতাটি পড়ার পর আপনি—

- কবির দেশাত্মবোধক চেতনা বর্ণনা করতে পারবেন।
- এ দেশের সংগ্রামী মানুষের আত্মত্যাগের কথা আলোচনা করতে পারবেন।
- বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন ও উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের চেতনাগত ঐক্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।



মূলপাঠ

আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে
কেমন নিবিড় হয়ে। কখনো মিছিলে কখনো-বা
একা হেঁটে যেতে যেতে মনে হয়- ফুল নয়, ওরা
শহিদের বলকিত রক্তের বুদ্ধদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।
একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রং।
এ-রঙের বিপরীত আছে অন্য রং,
যে-রং লাগে না ভালো চোখে, যে-রং সন্ত্রাস আনে
প্রাত্যহিকতায় আমাদের মনে সকাল-সন্ধ্যায়-
এখন সে রঙে ছেয়ে গেছে পথ-ঘাট, সারা দেশ
ঘাতকের অশুভ আস্তানা।
আমি আর আমার মতোই বহু লোক
রাত্রি-দিন ভুলুপ্তিত ঘাতকের আস্তানায়, কেউ মরা, আধমরা কেউ,
কেউ বা ভীষণ জেদি, দারুণ বিপ্লবে ফেটে পড়া। চতুর্দিকে
মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ।
বুঝি তাই উনিশশো উনসত্তরেও
আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফ্ল্যাগ,
বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।
সালামের চোখে আজ আলোচিত ঢাকা,
সালামের মুখে আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা।
দেখলাম রাজপথে, দেখলাম আমরা সবাই
জনসাধারণ
দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো
ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা
আর বরকত বলে গাঢ় উচ্চারণে
এখনো বীরের রক্তে দুগ্ধিনি মাতার অশ্রুজলে
ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে
হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায় সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ,
শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়।

[সংক্ষেপিত]



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

আস্তানা- আখড়া, আশ্রম। আবার ফুটেছে দ্যাখো...আমাদের চেতনারই রং- প্রতি বছর শহরের পথে পথে কৃষ্ণচূড়া ফুল ফোটে। কবির মনে হয় যেন ভাষা শহিদের রক্তের বুদ্ধদ কৃষ্ণচূড়া ফুল হয়ে ফুটেছে। তাই একুশের কৃষ্ণচূড়াকে কবি আমাদের চেতনার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চান। ভাষার জন্য যারা রক্ত দিয়েছেন, জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের ত্যাগ আর মহিমা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে থরে থরে ফুটে থাকা লাল কৃষ্ণচূড়ার স্তবকে-স্তবকে। উপত্যকা- দুই পর্বতের মাঝখানের নিচু



সমতলভূমি। **কমলবন**— কবি মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে ‘কমলবন’ প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন। **চর্যাপদ**— বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন। **ফানুস**— বেলুন যা বাষ্পের সাহায্যে আকাশে উড়তে পারে। **বুঝি তাই উনিশশো...থাবার সম্মুখে**— ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের ক্রমধারায় ছাত্র-অসন্তোষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলন উনিশশো উনসত্তরে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। শহর ও গ্রামের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ছয় দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই আন্দোলন ছিল অপ্রতিরোধ্য। এই আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন আসাদুজ্জামান, মতিউর, ড. শামসুজ্জাহা প্রমুখ। এ অংশে কবি শোষণ আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও আত্মাহুতি দেওয়া বীর জনতাকে ভাষা-শহিদ সালাম ও বরকতের প্রতীকে তাৎপর্যময় করে তুলেছেন। **মানবিক বাগান**— মানবিক জগৎ। মনুষ্যত্ব, ন্যায় ও মঙ্গলের জগৎ। **মৈত্রী**— মিত্রতা, বন্ধুত্ব। **শাসনতন্ত্র**— শাসনপদ্ধতি, রাষ্ট্রশাসন প্রণালি। **শিহরি**— কম্পিত, শিউরে, উঠেছে এমন। **সহচর**— সাথি, সঙ্গী। **হরিৎ**— সবুজ।



সারসংক্ষেপ

কবি শামসুর রাহমানের ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ সংগ্রামী চেতনা, দেশপ্রেম ও গণজাগরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করার মতো একটি কবিতা। ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানিদের শাসন, শোষণ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলন ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। এদেশের সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ঢাকার রাজপথে জনগণের ঢল নামে। এ কাতারে সামিল হয় গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষ, কলকারখানার শ্রমিক, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শ্রেণিপেশার মানুষ। কবি এ কবিতায় পরম মমতায়, শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় সকল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনাকে শৈল্পিক রূপ দিয়েছেন। এই আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে আসাদুজ্জামান, মতিউর, ড. শামসুজ্জাহা প্রমুখের মৃত্যুকে ভাষা-শহিদ সালাম ও বরকতের প্রতীকে তাৎপর্যময় করে তুলেছেন। কবি ভাষা-শহিদদের রক্তের বুদ্ধদকে কৃষ্ণচূড়া ফুলের সাথে তুলনা করেছেন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নাগরিক কবি কে?

ক. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

খ. আল মাহমুদ

গ. শামসুর রাহমান

ঘ. নির্মলেন্দু গুণ

২. একুশের ‘কৃষ্ণচূড়া’ বাঙালির কিসের প্রতীক?

ক. চেতনার

খ. স্বপ্নের

গ. রক্তের

ঘ. বেদনার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

বীরের মতো রুখে দাঁড়ায় বিজলী হয়ে ছোটে

মারের চোটে বর্গীরা সব ধুলো কাদায় লোটে।

৩. উদ্দীপকের বর্গীরা ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতায় কার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. শোষক

খ. মেঘনার মাঝি

গ. ঘাতক

ঘ. সংগ্রামী জনতা

৪. উদ্দীপক ও ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতায় যে ভাবটি ফুটে উঠেছে—

i. সংগ্রাম

ii. বঞ্চনা

iii. মহামারী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. ii ও iii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?

ক. নিরালোকে দিব্যরথ	খ. বিধ্বস্ত নীলিমা
গ. নিজ বাসভূমে	ঘ. বন্দি শিবির থেকে

৬. ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতায় ‘মানবিক বাগান’ বলতে বোঝানো হয়েছে—

ক. মানবিক জগৎ	খ. মনোহর বাগান
গ. মানুষের বাগান	ঘ. কল্যাণের জগৎ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮-নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো

একুশে ফেব্রুয়ারি

আমি কি ভুলিতে পারি।

৭. উদ্দীপকে ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতার কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?

ক. স্বাধীনতা সংগ্রাম	খ. ভাষা আন্দোলন
গ. গণ অভ্যুত্থান	ঘ. ছয় দফা আন্দোলন

৮. উদ্দীপক ও ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে—

- শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা
- কৃষ্ণচূড়া বন্দনা
- সংগ্রামী চেতনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য

ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা।

চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য

কাঠফাটা রোদ সঁকে চামড়া।

ক. ‘কমলবন’ প্রতীকটি কেন ব্যবহার করা হয়েছে?

খ. ‘আবার সালাম নামবে রাজপথে’ –উক্তিটি বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকে ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতার কোন বিষয়টি উঠে এসেছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. “‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতায় বাঙালির সংগ্রামী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে।” –উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.

কবি মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে ‘কমলবন’ প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন।

খ.

‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতায় কবি ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে রক্তঝরা বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলনকে স্মরণ করেছেন সালামের মাধ্যমে।



ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৪৮ সালে গড়ে উঠা ছাত্র- আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে সালাম, বরকত, রফিকসহ আরো অনেকে শহিদ হয়েছিলেন। মাতৃভাষার জন্য এঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানেও তাদের ন্যায় অনেক তাজাপ্রাণ তরুণ রাজপথে নেমেছিল প্রতিবাদের ঝাণ্ডা তুলে ধরতে। কবির নিকট এই তাজা প্রাণ তরুণদেরকে সালামের মতোই মনে হয়েছে। তাই কবি বলেছেন, ‘আবার সালাম নামবে রাজপথে।’

গ.

উদ্দীপকে ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতার প্রতিবাদী চেতনার বিষয়টি উঠে এসেছে।

মানুষ যখন অস্তিত্ব সংকটে পতিত হয় তখন তা রক্ষার বিষয়টি সামনে চলে আসে। এ সময় সে আর কোন অন্যায়-অত্যাচারকে মাথা পেতে নেয় না। সঙ্গতকারণেই সে সোচ্চার হয়ে উঠে সমস্ত অন্যায় এবং নির্মমতার বিরুদ্ধে। উদ্দীপক এবং ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতায় কবির চেতনায় এই বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে একটি বৈরি সময়ে জাতির সংকটময় অবস্থাকে তুলে ধরা হয়েছে। যখন সবাই ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে, তখন ফুল নিয়ে খেলা করবার আর সময় নেই। কথাটির মধ্য দিয়ে কবি একটি বিরূপ সময়ের ছবির ইঙ্গিত দিয়েছেন। ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতায়ও আমরা এমন একটি বিরূপ সময়ের চিত্র দেখি। যখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালির ভাষা- সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে, তখন নিশ্চিত, নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকা সম্ভব হয়নি বাঙালির পক্ষে। বাঙালিকে অচিরেই নেমে আসতে হয় রাজপথে। তারা জেনে যায়, অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে সংগ্রাম করতে হবে, অধিকার আদায়ে সচেতন হতে হবে। বস্তুত ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতার বিরূপ সময়টিই উদ্দীপকে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ঘ.

উদ্দীপক ও ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতাটি আমাদের সমাজ বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে, উভয় ক্ষেত্রেই আমরা এর প্রবল উপস্থিতি লক্ষ্য করি।

‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতাটি বাংলার ইতিহাসের উনসত্তর কালপর্বের এক শিল্পভাষ্য। এ সময়ে জাতিগত শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এ দেশের সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। সারাদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ জড়ো হয় ঢাকার রাজপথ ও শহিদ মিনারের পাদদেশে। কবি শামসুর রাহমান পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার অসাধারণ এক ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন এ কবিতায়।

‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতায় কবি ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতিচারণ করেছেন। এ আন্দোলনের পটভূমিতে ছিল অগণিত মানুষের সংগ্রামী চেতনা। পূর্ববাংলার মানুষ ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যের কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বলাবাহুল্য যে, পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলার মানুষ নানাভাবে পাকিস্তানি শাসকচক্রের দ্বারা নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। ফলে ১৯৬৯ সালে এদেশের মানুষ গণ-আন্দোলনের ডাক দেয়। যার সফল পরিণতি ঘটে এক গণ-অভ্যুত্থানে। উদ্দীপকেও একটি সমাজের অস্থিরতার চিত্র ফুটে উঠেছে যা কোনোক্রমেই সুখকর নয়। বেঁচে থাকার জন্য সুকুমার জীবনের যে স্বপ্ন তা এখানে সুদূর পরাহত। এখানে মানুষের গায়ের চামড়া কাঠফাটা রোদ সেকে। উদ্দীপকে ফুল নিয়ে খেলার দিন নয় বলার মধ্য দিয়ে কবি সবাইকে প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়েছেন।

‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতায় উঠে এসেছে নষ্ট সময়ের আলোচনা। সেখানে বাঙালির মুখের ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছে একটি সামন্তবাদী অপশক্তি। নির্বিচার হত্যা এবং অন্যায়-অত্যাচার দ্বারা সামন্তবাদী অপশক্তি মানুষের বেঁচে থাকার স্বাভাবিক অধিকারকেও নষ্ট করে দিতে চায়। ফলে বাঙালি হয়ে ওঠে প্রতিবাদী। আর উদ্দীপকেও কবি প্রতিবাদের মাধ্যমে দাবি-দাওয়াকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। প্রিয় ফুলকে নিয়ে খেলার আকাঙ্ক্ষা পরিহার করেছেন। তাই বলা যায়, ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতায় বাঙালির সংগ্রামী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা

শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাংক এলো

দানবের মতো চিৎকার করতে করতে,



তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা
ছাত্রাবাস বস্তু উজাড় হলো।

ক. আমাদের চেতনার রঙ কী?

খ. ‘ঘাতকের অশুভ আস্তানা’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতার সাদৃশ্যগুলো তুলে ধরুন।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯’ কবিতার মূলসূর একই প্রেরণা হতে উৎসারিত।” –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।



উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫. গ ৬. ঘ ৭. খ ৮. ক



আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ



কবি-পরিচিতি

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ১৯৩৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জের বহেরচর-ক্ষুদ্রকাঠি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আব্দুল জব্বার খান ছিলেন প্রথমে হাইকোর্টের বিচারপতি ও পরে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পিকার এবং মা সালেহা খাতুন ছিলেন গৃহিণী। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক, ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে বিএ (অনার্স), এমএ পাশ করে একই বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। পরে সিএসপি কর্মকর্তা হয়ে ১৯৮২ সালে সচিব হিসেবে অবসর নেন এবং বাংলাদেশ সরকারের কৃষি ও পানিসম্পদ মন্ত্রী হন। ১৯৮৪ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পঞ্চাশ দশকের অন্যতম কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে তাঁর কবিতার বিকাশ এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের আশা-নিরাশা ও স্বপ্ন-বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে তাঁর কবিতার পরিণতি। এছাড়া লোকজ ঐতিহ্যের ব্যবহার করে ছড়ার আঙ্গিকে তিনি কবিতা লিখেছেন। প্রকৃতির রূপ ও রঙের বিচিত্র ছবি তাঁর কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে। ইংরেজি ভাষায়ও তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ১৯৭৯ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও ১৯৮৫ সালে একুশে পদক প্রাপ্ত হন। ২০০১ সালের ১৯ মার্চ তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ:

কাব্যগ্রন্থ : সাত নরী হার (১৯৫৫), কখনো রং কখনো সুর (১৯৭০), কমলের চোখ (১৯৭৪) আমি কিংবদন্তির কথা বলছি (১৯৮১), বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা (১৯৮৩), আমার সময় (১৯৮৭), আমার সকল কথা (১৯৯৩), মসৃণ কৃষ্ণ গোলাপ (২০০২);

ভূমিকা

কবিতাটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কাব্যগ্রন্থের নামকবিতা। কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত। কবিতাটিতে বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস, সংগ্রাম, বিজয় এবং মানবিক উদ্ভাসনের অনিন্দ্য অনুষ্ঙ্গসমূহ ফুটে উঠেছে। এই কবিতায় কবি মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন।



সাধারণ উদ্দেশ্য

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' কবিতাটি পড়ার পর আপনি—

- ✚ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ✚ বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের সংগ্রাম ও বিজয়ের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- ✚ 'কবিতা' কীভাবে কবির প্রত্যাশিত মুক্তির প্রতীক হয়ে উঠলো, তা বুঝতে পারবেন।
- ✚ 'কিংবদন্তি' শব্দটি কীভাবে আমাদের ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে উঠলো, তা বুঝতে পারবেন।
- ✚ বাংলার ভূমিজীবী অনার্য ক্রীতদাসের লড়াই করে টিকে থাকার কথা ব্যক্ত করতে পারবেন।

পাঠ-১



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ার পর আপনি—

- ‘কিংবদন্তি’ শব্দটির অর্থ জানাসহ বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- কবিতা আমাদের সংগ্রামী জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
তঁার করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল
তঁার পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল।
তিনি অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন
অরণ্য এবং স্থাপদের কথা বলতেন
পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন
তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।
জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা
কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।

যে কবিতা শুনতে জানে না
সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে।
আমি উচ্চারিত সত্যের মতো
স্বপ্নের কথা বলছি।
উনোনের আগুনে আলোকিত
একটি উজ্জ্বল জানালার কথা বলছি।
আমি আমার মায়ের কথা বলছি,
তিনি বলতেন প্রবহমাণ নদী
যে সাঁতার জানে না তাকেও ভাসিয়ে রাখে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে নদীতে ভাসতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে মাছের সঙ্গে খেলা করতে পারে না।
যে কবিতা শুনতে জানে না



সে মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে না।

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।

আমি বিচলিত স্নেহের কথা বলছি

গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা বলছি

আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

উনোনের আগুনে আলোকিত একটি উজ্জ্বল জানালা- আগুনে সবকিছু গুচি হয়ে ওঠে। তাই আগুনের উত্তাপে পরিশুদ্ধ হয়ে সকল গ্লানি মুছে ফেলে আলোয় ভরা মুক্তজীবনের প্রত্যাশা জানাতে উজ্জ্বল জানালার অনুষ্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। **কিংবদন্তি**- জনশ্রুতি। লোকপরম্পরায় শ্রুত ও কথিত বিষয় যা একটি জাতির ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী। **পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত**- মানুষের ওপর অত্যাচারের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এখানে। সেই অত্যাচারের আঘাত যে এখনও তাজা রয়েছে তা বোঝাতেই রক্তজবার প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। আরও লক্ষণীয়, আঘাত রয়েছে পিঠে। অর্থাৎ, শত্রুরা ভীরা কাপুরুষের মতো পিছন থেকে আক্রমণ করেছে কিংবা বন্দি ক্রীতদাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, মুক্তমানুষের সঙ্গে সম্মুখ লড়াইয়ে বীরোচিত সাহস দেখায়নি। **বিচলিত স্নেহ**- আপনজনের উৎকণ্ঠা। মুক্তিপ্রত্যাশী মানুষের আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তাদের স্বজনরা উদ্বিগ্ন হন। ভালোবাসা আর শঙ্কা একসঙ্গে মিশে যায়। **শ্বাপদ**- হিংস্র মাংসাশী শিকারি জন্তু।



সারসংক্ষেপ

‘কিংবদন্তি’ শব্দটি দ্বারা লোকপরম্পরায় শ্রুত ও কথিত এমন কোনো বিষয় বুঝায়, যা একটি জাতির ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী। ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতাটিতে কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ঐতিহ্যসচেতন শিকড়সন্ধানী মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির ঘোষণা দিয়েছেন। বাঙালি জাতির হাজার বছরের সংগ্রাম ও বিজয়ের ইতিহাস এ কবিতার প্রেক্ষাপট তৈরিতে উদ্দীপক হিসেবে কাজ করেছে। এ কবিতায় কবি মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁর পূর্বপুরুষের সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা বলেছেন। শত্রুরা কীভাবে ভীরা কাপুরুষের মতো পেছন থেকে আক্রমণ করে বা বন্দি ক্রীতদাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তা কবি তুলে ধরেছেন। কবি মাটির কাছাকাছি মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে বাংলার ভূমিজীবী অনার্য-ক্রীতদাসের লড়াই করে টিকে থাকার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। তিনি কবি ও কবিতার কথা বলেছেন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় কে ‘কিংবদন্তির কথা’ বলেছেন?

ক. আহসান কবির

খ. আহসান হাবীব

গ. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

ঘ. আবু জাফর শামসুদ্দিন

২. ‘শ্বাপদ’ বলতে বোঝায়-

ক. ইম্পাতের তরবারী

খ. মৎস্য কন্যা

গ. হিংস্র মাংসাশী প্রাণী

ঘ. শস্যের সম্ভার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমিতো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে

আমিতো এসেছি পালযুগ নামে চিত্রকলা থেকে।

৩. উদ্দীপকে কবিতার যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে-

ক. প্রকৃতিচেতনা

খ. ঐতিহ্যচেতনা

গ. ইতিহাসচেতনা

ঘ. ভূগোলচেতনা



৪. উদ্দীপক এবং ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে—

- i. ধর্মীয় সত্তা
- ii. জাতীয় সত্তা
- iii. সাংস্কৃতিক সত্তা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. iii
- ঘ. ii ও iii

পাঠ-২



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ার পর আপনি—

- কবি কীভাবে কবিতা ও সত্যের অভেদ কল্পনায় সচেষ্টি ছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন চিত্রকল্পের মাধ্যমে কবি কীভাবে ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীতের দ্যোতনা সৃষ্টি করেছেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ‘সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান’ ঘটাতে কবিতার সচেতন প্রয়াস সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।



মূলপাঠ

ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়
 যুদ্ধ আসে ভালোবেসে
 মায়ের ছেলেরা চলে যায়,
 আমি আমার ভাইয়ের কথা বলছি।
 যে কবিতা শুনতে জানে না
 সে সন্তানের জন্য মরতে পারে না।
 যে কবিতা শুনতে জানে না
 সে ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না।
 যে কবিতা শুনতে জানে না
 সে সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখতে পারে না।
 আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
 আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
 তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল
 কারণ তিনি ক্রীতদাস ছিলেন।
 যে কর্ষণ করে
 শস্যের সম্ভার তাকে সমৃদ্ধ করবে।
 যে মৎস্য লালন করে
 প্রবহমাণ নদী তাকে পুরস্কৃত করবে।
 যে গাভীর পরিচর্যা করে



জননীর আশীর্বাদ তাকে দীর্ঘায়ু করবে।

যে লৌহখণ্ডকে প্রজ্বলিত করে

ইম্পাতের তরবারি তাকে সশস্ত্র করবে।

দীর্ঘদেহ পুত্রগণ

আমি তোমাদের বলছি।

আমি আমার মায়ের কথা বলছি

বোনের মৃত্যুর কথা বলছি

ভাইয়ের যুদ্ধের কথা বলছি

আমি আমার ভালোবাসার কথা বলছি।

আমি কবি এবং কবিতার কথা বলছি।

সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান কবিতা

সুপুরুষ ভালোবাসার সুকণ্ঠ সংগীত কবিতা

জিস্মায় উচ্চারিত প্রতিটি মুক্ত শব্দ কবিতা

রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণ কবিতা।

আমরা কি তাঁর মতো কবিতার কথা বলতে পারবো

আমরা কি তাঁর মতো স্বাধীনতার কথা বলতে পারবো।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

ক্রীতদাস- কেনা গোলাম। পূর্বপুরুষ- কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন সংকট অতিক্রমকারী জাতির পূর্বগামী সন্তানদের বুঝিয়েছেন। মায়ের ছেলেরা চলে যায়- দেশের ক্রান্তিকালে দেশ মাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করতে মায়ের ছেলেরা যুদ্ধে যায়।

সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখা- সূর্য সকল শক্তির উৎস। তাই এই সর্বশক্তির আধারকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারলে মুক্তি অনিবার্য। কবির মতে, এই সামর্থ্য অর্জনের একমাত্র উপায় হলো কবিতা শোনা; কবিতাকে আত্মস্থ করা। কেননা, কবির কাছে শুধু কবিতাই সত্য আর সত্যই শক্তি।



সারসংক্ষেপ

কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ 'কবিতা' ও সত্যের অভেদ কল্পনার মাধ্যমে মায়ের কথা, বোনের কথা, ভাইয়ের কথা বলেন। তাঁর বিশ্বাস যুদ্ধই মুক্তি আনতে পারে। যুদ্ধ শুরু হলে মানুষকে পরিবার থেকে দূরে যেতে হয়, ভালোবাসার মানুষকে মুক্ত করতে তাদের ছেড়ে যেতে হয়। এ সত্য আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত।

কবি 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' এবং 'যে কবিতা শুনতে জানে না' পঙ্ক্তিমালার মাধ্যমে কবিতা আর মুক্তির আবেগকে একত্রে শিল্পরূপ দিয়েছেন। এ কবিতায় কবি একাধিক চিত্রকল্পের মাধ্যমে [যেমন, "কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা"] ইন্দ্রিয় থেকে ইন্দ্রিয়াতীতের দ্যোতনা সৃষ্টি করেছেন। কবির বিশ্বাস, যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত এ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এ-দেশের দামাল ছেলেরা। তাদের পরিশ্রমের ফসল হিসেবে সাফল্য আসবেই। কবিতাই পারে সেই সশস্ত্র সুন্দরের অনিবার্য অভ্যুত্থান ঘটাতে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. যে কবিতা শোনে না সে সন্তানের জন্য কী করতে পারে না?

ক. লড়তে

খ. মরতে

গ. ত্যাগ

ঘ. আশীর্বাদ

৬. কবি কেন তাঁর পূর্বপুরুষের কথা বলেছেন?

ক. উচ্চ বংশমর্যাদা ছিল বলে

খ. নিপীড়িত হয়েছে বলে

গ. সংস্কৃতিচর্চা করত বলে

ঘ. গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে বলে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

জাহানারা ইমামের বড় ছেলে রুমি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অভূতপূর্ব দেশপ্রেম তাকে মায়ের কোল ত্যাগ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

৭. উদ্দীপকের চরিত্রটির সঙ্গে ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় কার সঙ্গে মিল রয়েছে?

ক. নূরুলদীন

খ. কবি

গ. আনোয়ার

ঘ. কলিম

৮. উদ্দীপক ও ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে—

i. শঙ্কা

ii. করুণা

iii. ভালবাসা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও ii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. কবির পূর্বপুরুষের করতলে কিসের সৌরভ ছিল?

ক. পলিমাটির

খ. শস্যদানার

গ. মৎস্যকন্যার

ঘ. রক্তজবার

১০. কবি কেন ‘বিচলিত স্নেহের’ কথা বলেছেন?

ক. শঙ্কায়

খ. বিপদে

গ. ভালবাসায়

ঘ. কল্পনায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

‘স্মৃতিস্তম্ভ’ কবিতায় বর্ণিত হয়েছে মাটির কাছাকাছি মানুষের ইতিহাস। এই ইতিহাস বাংলার ভূমিকেন্দ্রিক অনার্য ক্রীতদাসদের লড়াই করে টিকে থাকার ইতিহাস।

১১. উদ্দীপকের সঙ্গে আপনার পঠিত কোন কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে—

ক. বঙ্গভাষা

খ. সাম্যবাদী

গ. আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

ঘ. আঠারো বছর বয়স

১২. এরূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় যে বিষয়ে—

i. বাঙালির ইতিহাসে

ii. লড়াইয়ে

iii. বিজয়ে



নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

স্বাধীনতা তুমি

ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি

স্বাধীনতা তুমি

রোদেলা দুপুরে মধ্য পুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।

ক. প্রবহমাণ নদী কাকে ভাসিয়ে রাখে?

খ. পূর্বপুরুষদের কেন ক্রীতদাস বলা হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার সঙ্গে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।

ঘ. ‘স্বাধীনতায় আনন্দময় মুক্ত জীবনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।’ –উদ্দীপক ও ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :

৯ অক্টোবর চলে গেল চের প্রয়াণ দিবস। চে গুয়েভারার নাম শুনলেই চোখে ভাসে এক রোমান্টিক বিপ্লবীর অবয়ব। সারা বিশ্বের শোষিত, নিপীড়িত ও মুক্তিকামী মানুষের প্রদীপ্ত প্রতীক তিনি। সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের কাছেও সমানভাবে পরিচিত এই নামটি। চে দশকের পর দশক, বছরের পর বছর জুড়ে রয়ে গেছেন তারুণ্যের প্রতীক হয়ে। যে তরুণ স্বপ্ন দেখে, যে তরুণ সবার জন্য সমান একটি পৃথিবীকে আলিঙ্গন করতে চায়, তার সবচেয়ে বড় অবলম্বন চে।

ক. ‘কিংবদন্তি’ শব্দের অর্থ কী?

খ. ‘তার করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল’ –কেন?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করুন।

ঘ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার মূল ভাব প্রকাশ করে কী? –আপনার মন্তব্যের সপক্ষে কিংবা বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.

যে সাঁতার জানে না প্রবহমাণ নদী তাকে ভাসিয়ে রাখে।

খ.

বংশপরম্পরায় যারা অন্যের দ্বারা শাসিত হয় কবিতায় তাদেরকে ক্রীতদাস বলা হয়েছে।

ক্রীতদাস হলো মনিবের অর্থে ক্রয় করা মানুষ। মনিব দাসকে যা করতে বলে ক্রীতদাস সেটা করতে বাধ্য থাকে। আলোচ্য কবিতায় আমাদের পিতা-পিতামহগণ ঔপনিবেশিক শক্তির হাতে বাধ্য ছিলেন। তারা নিজের জমিতে ফসল ফলালেও সেটা নিজেদের মত করে ভোগ করতে পারতেন না। শত্রুশক্তির সঙ্গে পেরে উঠতে না পেরে তারা নিজীব পাথরের মতো নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতেন। প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে তারা প্রভুর শক্তিকে নিয়তি মনে করে সব নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করতেন। এজন্য কবিতায় পূর্বপুরুষদের ক্রীতদাস বলা হয়েছে।

গ.

‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় বর্ণিত স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিষয়টি উদ্দীপকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।



‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় কবি প্রতারক ও অত্যাচারী ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কথা বলেছেন। জনতা যখন এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তখন সম্মিলিত কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা ধ্বনিত হয়। কবির উপলব্ধিতে সে প্রতিবাদের ধ্বনি বজ্রকণ্ঠের ন্যায়। আর মহাত্মা গুণে সে প্রতিবাদের ভাষাই হয়ে উঠে কবিতা।

কবিতায় কবি বলেছেন, তিনি তাঁর পূর্বপুরুষের কথা থেকে তাঁদের সংগ্রামী ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন। সে ইতিহাস ক্রীতদাসের জীবন থেকে মুক্তিলাভের ইতিহাস। কবি বলেছেন, যখন যুদ্ধ আসে তখন মায়ের ছেলেরা যুদ্ধে চলে যায়। যুদ্ধের সময় মা-বোনের মৃত্যু হয়, জনবসতি ও ছাত্রাবাস ধ্বংস হয়। কিন্তু সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধারণ করে মহা আনন্দে মুক্তিকে ছিনিয়ে আনে মায়ের ছেলেরা। অন্যদিকে উদ্দীপকে স্বাধীনতাকে দেখা হয়েছে কৃষকের মুখের হাসির মধ্য দিয়ে। এখানে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতারও স্বাধীনতার মোহময় প্রকাশ। তাই উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের সঙ্গে ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ.

উদ্দীপক ও ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় স্বাধীনতার আনন্দময় মুক্তজীবনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় কবির মতে নিবেদিতপ্রাণ প্রত্যেক কৃষকই কবি। কবিতা কৃষকের পতিত জমি আবাদের প্রেরণা যোগায়। কবিতা শোনা মানুষ মুক্তমনে মাছের সঙ্গে খেলা করতে পারে। আর মায়ের কোলে শুয়ে গল্প করতে পারে।

উদ্দীপকে স্বাধীনতার আনন্দকে কৃষকের মুখের হাসির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কৃষকের শস্যক্ষেতে ফলন ভালো হলে তার মুখে হাসি ফোটে। এই নির্মল হাসি স্বাধীনতার প্রতীক। উদ্দীপকে গ্রাম্য মেয়ের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে স্বাধীনতাকে খোঁজা হয়েছে। উদ্দীপকের কবির মতে রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে অবাধ সাঁতার কাটাও স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ। অন্যদিকে ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায় কবি তাঁর পূর্বপুরুষদের সংগ্রামী ও গৌরবময় জীবনের ইতিহাস বলেছেন। কবির মতে কবিতা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে, মুক্তজীবনের স্বপ্ন দেখায়।

উদ্দীপকে কৃষকের হাসিমাখা মুখে মুক্তজীবনের আনন্দ ফুটে উঠেছে। গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার কাটাতেও স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। উদ্দীপকের কবির মতে স্বাধীনতা হলো আনন্দময় মুক্তজীবনের প্রতীক। ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতায়ও উল্লিখিত ‘কবিতা’ শব্দটি আনন্দময় মুক্তজীবনের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে বলা যায়, স্বাধীনতায় আনন্দময় জীবনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে
আমি তো এসেছি সওদাগরের ডিঙ্গার বহর থেকে।
আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে
আমি তো এসেছি পাল যুগ নামে চিত্রকলা থেকে।

ক. কে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে?

খ. ‘সূর্যকে হৃৎপিণ্ডে ধরে রাখা’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকটি কোন দিক থেকে ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. “উদ্দীপকে ‘আমি কিংবদন্তির কথা বলছি’ কবিতার মূলভাব পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়নি।” –মন্তব্যটি বিচার করুন।



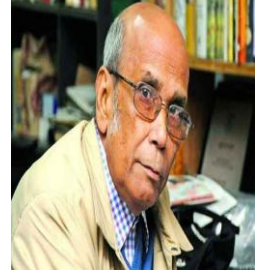
উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. গ ৩. গ ৪. ঘ ৫. খ ৬. ঘ ৭. খ ৮. গ ৯. ঘ ১০. ক ১১. গ ১২. ঘ



নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়

সৈয়দ শামসুল হক



কবি-পরিচিতি

সৈয়দ শামসুল হক ১৯৩৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর কুড়িগ্রাম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ডা. সৈয়দ সিদ্দিক হুসাইন এবং মা সৈয়দা হালিমা খাতুন। তিনি ১৯৫০ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং এক বছর বিরতি দিয়ে জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন ও সেখান থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হয়ে কিছুদিন পড়াশুনা করেন কিন্তু তা শেষ করেননি। কর্মজীবনের প্রথমে কিছুদিন সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিছুদিন ছিলেন বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রযোজক। পরে তিনি লেখালেখিকে একমাত্র ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে ব্যক্তিগত খাতায় তিনি প্রায় দুইশটির মতো কবিতা লিখে ফেলেন। কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, চিত্রকর, ভাস্কর এবং আরো বিচিত্র সাহিত্য-শিল্পধারার কীর্তিমান স্রষ্টা তিনি। সব্যসাচী লেখক হিসেবে তিনি অধিক পরিচিত। অবিরাম বিচিত্রতার পথে চলমান এই কবি ও লেখকের সৃষ্টিতে উঠে এসেছে নানা বিষয়। আঞ্চলিক ত্রিষাপদের চমৎকার ব্যবহার শুধু কাব্যনাট্যেই নয়, কোনো কোনো কবিতায় তিনি সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছেন। শুধু লেখক বা কবি হিসেবেই নয়, দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে একজন প্রগতিশীল মানুষ হিসেবে তিনি এখনো ভূমিকা রেখে চলেছেন। মাত্র ২৯ বছর বয়সে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান। এছাড়াও তিনি একুশে পদক, স্বাধীনতা পদক, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, নাসিরুদ্দিন স্বর্ণপদকসহ বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। ২০১৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা:

কাব্যগ্রন্থ : একদা এক রাজ্যে (১৯৬১), বিরতিহীন উৎসব (১৯৬৯), বৈশাখে রচিত পঙ্কজমালা (১৯৭০), প্রতিধ্বনিগণ (১৯৭৩), পরাণের গহীন ভিতর (১৯৮০), রজ্জুপথে চলেছি (১৯৮৮), আমি জন্মগ্রহণ করিনি (১৯৯০), রাজনৈতিক কবিতা (১৯৯১);

ছোটগল্প : তাস (১৯৫৪), রক্তগোলাপ (১৯৬৪), প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান (১৯৮২), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৯০);

উপন্যাস: এক মহিলার ছবি (১৯৫৯), সীমানা ছাড়িয়ে (১৯৬৪), বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ (১৯৮৯), খেলারাম খেলে যা (১৯৯১);

কাব্যনাটক : পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৬), গণনায়ক (১৯৭৬), নূরলদীনের সারাজীবন (১৯৮২);

শিশুতোষ : সীমান্তের সিংহাসন (১৯৮৮)।

ভূমিকা

সৈয়দ শামসুল হকের বিখ্যাত ‘নূরলদীনের সারাজীবন’ শীর্ষক কাব্যনাটক থেকে রচনাটি সংকলিত হয়েছে। এটি এই নাটকের প্রস্তাবনা অংশ। কবি এই রচনায় ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সাহসী কৃষক নেতা নূরলদীনের সাহস ও ক্ষোভকে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে অসামান্য নৈপুণ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন। তিনি নূরলদীনকে চিরায়ত প্রতিবাদের প্রতীকে উপস্থাপন করেছেন।



উদ্দেশ্য

সৈয়দ শামসুল হকের ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতাটি পড়ার পর আপনি-

- 🚩 নূরলদীনের সংগ্রামী জীবনের কথা নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন।
- 🚩 বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে কবি কীভাবে নূরলদীনের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের চেতনাগত মিল খুঁজে পেয়েছেন তা আলোচনা করতে পারবেন।
- 🚩 “জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়” -উক্তিটির প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে পারবেন।



মূলপাঠ

নিলক্ষা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগণিত আর
নিচে গ্রাম, গঞ্জ, হাট, জনপদ, লোকালয় আছে উনসত্তর হাজার।
ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্না তার ঢালিতেছে চাঁদ-পূর্ণিমার।
নষ্ট ক্ষেত, নষ্ট মাঠ, নদী নষ্ট, বীজ নষ্ট, বড় নষ্ট যখন সংসার
তখন হঠাৎ কেন দেখা দেয় নিলক্ষার নীলে তীব্র শিশ
দিয়ে এত বড় চাঁদ?
অতি অকস্মাৎ
স্তম্ভতার দেহ ছিঁড়ে কোন ধ্বনি? কোন শব্দ? কিসের প্রপাত?
গোল হয়ে আসুন সকলে,
ঘন হয়ে আসুন সকলে,
আমার মিনতি আজ স্থির হয়ে বসুন সকলে।
অতীত হঠাৎ হাতে হানা দেয় মানুষের বন্ধ দরোজায়
এই তীব্র স্বচ্ছ পূর্ণিমায়
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
কালঘুম যখন বাংলায়
তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে আবার নূরলদীন দেখা দেয় মরা আঙিনায়।
নূরলদীনের বাড়ি রংপুরে যে ছিল,
রংপুরে নূরলদীন একদিন ডাক দিয়েছিল
১১৮৯ সনে।
আবার বাংলার বুঝি পড়ে যায় মনে,
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমারই দেশে এ আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায়
ইতিহাসে, প্রতিটি পৃষ্ঠায়।
আসুন, আসুন তবে, আজ এই প্রশস্ত প্রান্তরে;
যখন স্মৃতির দুধ জ্যোৎস্নার সাথে ঝরে পড়ে,
তখন কে থাকে ঘুমে? কে থাকে ভেতরে?



কে একা নিঃসঙ্গ বসে অশ্রুপাত করে?
সমস্ত নদীর অশ্রু অবশেষে ব্রহ্মপুত্রে মেশে।
নূরলদীনেরও কথা যেন সারা দেশে
পাহাড়ি ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাসায়,
অভাগা মানুষ যে জেগে ওঠে আবার এ আশায়
যে, আবার নূরলদীন একদিন আসিবে বাংলায়,
আবার নূরলদীন একদিন কাল পূর্ণিমায়
দিবে ডাক, “জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?”



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অকস্মাৎ- সহসা, হঠাৎ। কালঘুম- মৃত্যু, চিরনিদ্রা। কোনঠে- কোথায়। ধবল- শুভ্র, সাদা। ধবল দুধের মতো জ্যোৎস্না- সাদা দুধের মতো জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার রঙকে দুধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। নিলক্ষা- দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী। প্রপাত- নির্বারের পতনের স্থান, জলপ্রপাত। প্রান্তর- বিস্তীর্ণ মাঠ, যে বড় মাঠে গাছপালা বা বসতি নেই। বাহে- বাপুহে, দিনাজপুর, রংপুর এলাকার সম্বোধন বিশেষ। বাজেয়াপ্ত- সরকার কর্তৃক কোনো কিছু নিয়ে নেওয়া বা অধিকৃত। মরা আঙিনায়- মৃত্যু নিখর অঙ্গনে। মিনতি- অনুনয়, বিনয়। শুদ্ধতার দেহ- এখানে নীরব নিস্তর্র পরিবেশ বোঝানো হয়েছে। হানা দেয়- আক্রমণ করে, আবির্ভূত হয় অর্থে ব্যবহৃত।



সারসংক্ষেপ

‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতাটির মাধ্যমে কবি সৈয়দ শামসুল হক নাট্যকাহিনিকে দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছেন। সাহসী কৃষক নেতা নূরলদীনের সংগ্রামের কথা ১৭৮৩ সালে (১১৮৯ বঙ্গাব্দ) রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। কবি বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নূরলদীনের সাহস এবং ক্ষোভকে অসামান্য দক্ষতায় মিলিয়ে দেখিয়েছেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে নয়টি মাস ধরে বাংলাদেশকে পাকিস্তানি হায়েনারা মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে। ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠা যখন রক্তে রঞ্জিত হতে থাকে তখন কবির মনে পড়ে ইতিহাসের প্রতিবাদী নায়ক নূরলদীনকে। ১৭৮৩ সালে নূরলদীনের ডাকে মানুষ যেভাবে জেগেছিল, কবির বিশ্বাস এখনো মানুষকে সেভাবে জাগতে হবে। নূরলদীন হয়ে ওঠে এক চিরায়ত প্রতিবাদের প্রতীক। ইতিহাসের পাতা থেকে নূরলদীন মিশে যায় বাংলার শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের ভিড়ে। কবির প্রত্যাশা, ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষ নূরলদীনের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে একদিন পাহাড়ি ঢলের মতো ভাসিয়ে দেবে সকল অনিয়ম, যখন নূরলদীন দেবে ডাক- “জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়।”



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কৃষকনেতা ছিলেন কে?

ক. সুকান্ত ভট্টাচার্য	খ. নূরলদীন
গ. নূরলদীন	ঘ. শামসুল হক

২. ‘কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত’ বলতে বোঝানো হয়েছে-

ক. লেখার স্বাধীনতা হরণ	খ. চিন্তার স্বাধীনতা লঙ্ঘন
গ. বাক স্বাধীনতা হরণ	ঘ. রাজনীতির স্বাধীনতায় বাধা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মুক্তিযুদ্ধের সময় পলি ভাবীকে এদেশের ঘৃণ্য দালালদের সহযোগিতায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয় রাজাকারদের ক্যাম্পে। সপ্তাহান্তে তার লাশ পাওয়া যায় পার্শ্ববর্তী নালাতে। পলি ভাবীর অপরাধ তিনি রাজাকারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।



৩. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে ‘নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার কোন চরণের সাদৃশ্য রয়েছে—

- ক. যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায় খ. যখন আমার কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়
গ. যখন আমার স্বপ্ন লুট হয় ঘ. যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লায়

৪. উদ্দীপক ও ‘নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতায় ফুটে উঠেছে—

- i. রাজাকারদের দালালি
ii. স্বাধিকার আন্দোলন
iii. বাকস্বাধীনতা হরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. ‘কোনঠে’ শব্দের প্রমিত রূপ কোনটি?

- ক. কেন খ. কবে
গ. কোথায় ঘ. কখন

৬. ‘বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম’ বলতে বোঝায় যে যুদ্ধকে—

- ক. ১৯৫২ খ. ১৯৫৪
গ. ১৯৬৯ ঘ. ১৯৭১

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃষ্ট পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মধ্যে দাঁড়ালেন।

৭. উদ্দীপকের কবির সঙ্গে আপনার পঠিত কবিতায় কার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে?

- ক. নূরুলদীন খ. রবীন্দ্রনাথ
গ. মাহমুদ দীন ঘ. নূরুলদীন

৮. এরূপ সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে—

- ক. ধর্মীয় চেতনা খ. মুক্তির প্রত্যাশা
গ. ভাষার সংগ্রাম ঘ. সংস্কৃতির লড়াই

সৃজনশীল প্রশ্ন :

তিতুমির বাংলার একজন অকুতোভয় বীর। তিনি ভারতবর্ষে অন্যায়, নিপীড়ন আর শোষণবিরোধী সংগ্রামের ছবি।
ঔপনিবেশিক শক্তি ইংরেজ আর স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই এখনও এ মাটির সন্তানদের বুকে শিহরণ জাগায়।
এদেশ এখনও নানা সংকট ও সংগ্রামে তাঁকে স্মরণ করে। তিতুমির আমাদের জাতীয় চেতনার প্রতীক।

- ক. ‘নিরক্ষ’ শব্দের অর্থ কী?
খ. নূরুলদীন ইতিহাসে বিখ্যাত কেন?
গ. উদ্দীপকটি ‘নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার সঙ্গে কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ? –তুলে ধরুন।
ঘ. “উদ্দীপকে ‘নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার পূর্ণ অনুরণন ঘটেনি।” –আলোচনা করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.

‘নিলক্ষ’ শব্দের অর্থ দৃষ্টিসীমা অতিক্রমকারী।

খ.

বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার কারণে নূরলদীন ইতিহাসে বিখ্যাত।

নূরলদীনের বাড়ি রংপুরে। তিনি একজন বিপ্লবী পুরুষ। নূরলদীন ১৭৮৩ সালে ব্রিটিশশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ সারা বাংলায় সাড়া জাগিয়েছিল। নূরলদীন শোষকের বিরুদ্ধে বাংলার প্রতিবাদী চেতনার প্রতীক।

গ.

উদ্দীপকের তিতুমিরের সঙ্গে ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতায় নূরলদীনের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে।

নূরলদীন রংপুরের একজন কৃষক নেতা। তিনি রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সামন্তবাদবিরোধী কৃষক আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। ১৭৮৩ সালে নূরলদীনের ডাকে সে অঞ্চলের কৃষক-জনতা জেগে উঠেছিল। তিনি ব্রিটিশশাসিত বাংলায় মুক্তিচেতনার প্রতীক। কবি সৈয়দ শামসুল হক ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নূরলদীনের চেতনাকে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে অসামান্য নৈপুণ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন।

উদ্দীপকের ঐতিহাসিক চরিত্র তিতুমির আমাদের জাতীয় চেতনার প্রতীক। তিনি ছিলেন সামন্তবাদবিরোধী আন্দোলনের এক লড়াকু সৈনিক। তিতুমির ইংরেজ শাসন ও জমিদারদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এদেশবাসীকে লড়াই করার ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর সে আহ্বান ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল। ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতায় কবি একজন সাহসী কৃষকনেতা নূরলদীনকে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বাংলাদেশের রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। স্থানীয় সাধারণ মানুষকে একত্রিত করে তিনি ব্রিটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। সুতরাং বলা যায়, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের দিক থেকে উদ্দীপক এবং ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ.

উদ্দীপকে তিতুমিরকে জাতীয় চেতনার প্রতীক হিসাবে স্মরণ করা হয়েছে যা ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার পূর্ণ অনুরণন ঘটায় না।

নূরলদীন রংপুর অঞ্চলের একজন কৃষকনেতা। তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৭৮৩ সালে তাঁর ডাকে সাধারণ মানুষ জেগে উঠেছিল। আলোচ্য কবিতায় কবি নূরলদীনের সেই ডাকের প্রত্যাশা করেছেন যে ডাক শুনে সাধারণ মানুষ আবার সকল অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

উদ্দীপকে তিতুমিরকে বাঙালির জাতীয় বীর হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ভারতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বীর সেনানী। সামন্তবাদবিরোধী আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তিতুমির বাঙালি জাতির সংগ্রামী চেতনায় চিরপ্রেরণার উৎস। ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতায় কবি সৈয়দ শামসুল হক একজন বীর সেনানী রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের কৃষকনেতা নূরলদীনের কথা বলেছেন। তাঁর সংগ্রামী চেতনা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক নূরলদীনের ব্রিটিশবিরোধী চেতনাকে শিল্পকৌশলে মিশিয়ে দিয়েছেন বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে। কবি মনে করেন নূরলদীনের একটি ডাকই পারে দেশ থেকে অন্যায় ও অনাচার দূর করতে।

উদ্দীপকে তিতুমির বাঙালির জাতীয় চেতনার প্রতীক। জাতির নানা সংকট, সংগ্রাম ও আন্দোলনে মানুষ এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতায় কবির হৃদয়ে একটি প্রত্যাশা কাজ করেছে। কবির এই প্রত্যাশা হচ্ছে নূরলদীন আবার ফিরে আসবেন। তিনি ফিরে আসবেন দেশের আপামর শ্রমজীবী মানুষকে জাগাতে। আর এভাবেই বাংলা থেকে অবসান হবে সকল অন্যায় ও অত্যাচারের। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার পূর্ণ অনুরণন ঘটেনি।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

ম্যাক্সিম গোর্কীকে সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় তার কারণ এই নয় যে গোর্কী সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভা ছিলেন। তাঁকে এই আখ্যা দেওয়ার কারণ পূর্ববর্তীদের মতো সমাজের দুঃখ-দুর্দশা দেখে করুণা আপ্ত হয়ে তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি। তিনি তা করেছিলেন সচেতনভাবে। শ্রেণিসংগ্রামের বাস্তব চিত্রকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরে তিনি তাদের সেই সংগ্রামকে তার পরিণতির দিকে এগিয়ে নিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

ক. নূরলদীনের বাড়ি কোথায় ছিল?

খ. ‘কালঘুম যখন বাংলায়’ –কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকটি ‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার কোন বিষয়টির প্রতিনিধিত্ব করে? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. “উদ্দীপকে নূরলদীনের বিপ্লবী চেতনার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে।” –‘নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতারআলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করুন।



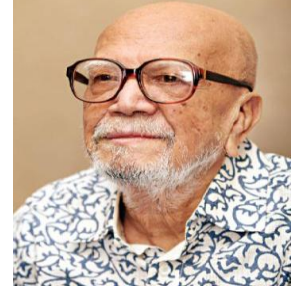
উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. গ ৩. ঘ ৪. ক ৫. গ ৬. ঘ ৭. ক ৮. খ



লোক-লোকান্তর

আল মাহমুদ



কবি-পরিচিতি

আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালে ১১ জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মৌড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মীর আব্দুস শুকুর আল মাহমুদ। তাঁর পিতা আদুর রব মীর ও মাতা রওশন আরা মীর। আল মাহমুদ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় লেখাপড়া করেছেন। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গঠিত ভাষা-কমিটির প্রচারিত লিফলেটে তাঁর চার লাইন কবিতা ছাপা হয় এবং সে-কারণে পুলিশের হয়রানিতে ঢাকায় পলায়ন করেন ও প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখার সমাপ্তি ঘটে। তিনি স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে দৈনিক মিল্লাত, সাপ্তাহিক কাফেলা ও দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় কাজ করেছেন এবং পরে দৈনিক গণকণ্ঠ ও দৈনিক কর্ণফুলী পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিচালক হিসেবে ১৯৯৩ সালে অবসরে যান। আধুনিক বাংলা কবিতায় আল মাহমুদ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি ভাটি-বাংলার জনজীবন, গ্রামীণ দৃশ্যপট, নদীনির্ভর জনপদ, চরাঞ্চলের কর্মমুখর জীবন চাঞ্চল্য ও নর-নারীর চিরন্তন প্রেম-বিরহকে অবলম্বন করে কাব্যসাধনা করেছেন। তাঁর লেখায় অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততায় লোকজ ও আঞ্চলিক শব্দের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। কবিতার পাশাপাশি কথাসাহিত্যেও তিনি সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ২০১৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহ:

কাব্যগ্রন্থ : লোক-লোকান্তর (১৯৬৩), কালের কলস (১৯৬৬), সোনালী কাবিন(১৯৬৬), মায়াবি পর্দা দুলে ওঠে (১৯৭৬), অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না (১৯৮০), বখতিয়ারের ঘোড়া (১৯৮৬), আরব্য রজনীর রাজহাঁস (১৯৮৭);

ছোটগল্প : পানকৌড়ির রক্ত (১৯৭৫), সৌরভের কাছে পরাজিত (১৯৮২), গন্ধবণিক (১৯৮৮), ছোট বড় (২০০৬);

উপন্যাস : ডাহুকী (১৯৯২), কবি ও কোলাহল (১৯৯৩), নিশিন্দা নারী (১৯৯৫), আগুনের মেয়ে (১৯৯৫);

শিশুতোষ : পাখির কাছে ফুলের কাছে (২০০২)।

ভূমিকা

‘লোক-লোকান্তর’ আল মাহমুদ রচিত ‘লোক লোকান্তর’ কাব্যের নামকবিতা। এটি কবির আত্মপরিচয়মূলক কবিতা। কবির উল্লেখযোগ্য সনেটের মধ্যে এটি একটি। এর অষ্টকে বাংলার অপরূপ রূপের সঙ্গে কবির সম্পর্ক ফুটে উঠেছে। আর ষটকে ক্ষণস্থায়ী জীবনের কথা এবং সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে বেঁচে থাকার কথা ব্যক্ত হয়েছে।



উদ্দেশ্য

আল মাহমুদের ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতাটি পড়ার পর আপনি—

- ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতা অবলম্বনে প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে পারবেন।
- কবি তাঁর কাব্যবোধ ও কাব্যচেতনাকে কীভাবে পাখির প্রতিমায় উপস্থাপন করেছেন, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



কবিতার আসন্ন বিজয়ের মধ্য দিয়ে কবির বিচ্ছিন্নতাবোধের বেদনা কীভাবে প্রশমিত হয়েছিল, তা লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।



মূলপাঠ

আমার চেতনা যেন একটি শাদা সত্যিকার পাখি,
বসে আছে সবুজ অরণ্যে এক চন্দনের ডালে;
মাথার ওপরে নিচে বনচারী বাতাসের তালে
দোলে বন্য পানলতা, সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি
হয়ে আছে ঠোঁট তার। আর দুটি চোখের কোটরে
কাটা সুপারির রং, পা সবুজ, নখ তীব্র লাল
যেন তার তন্ত্রে মন্ত্রে ভরে আছে চন্দনের ডাল
চোখ যে রাখতে নারি এত বন্য ঝোপের ওপরে।
তাকাতে পারি না আমি রূপে তার যেন এত ভয়
যখনি উজ্জ্বল হয় আমার এ চেতনার মণি,
মনে হয় কেটে যাবে, ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি
সংসার সমাজ ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে লোকালয়।
লোক থেকে লোকান্তরে আমি যেন শুদ্ধ হয়ে শুনি
আহত কবির গান। কবিতার আসন্ন বিজয়।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

আমরা চেতনায়েন একটি শাদা সত্যিকার পাখি,
বসে আছে সবুজ অরণ্যে একচন্দনের ডালে

—কবি তাঁর কাব্যবোধ ও কাব্যচেতনাকে সাদা এক সত্যিকার পাখির প্রতিমায় উপস্থাপন করেছেন। কবির এই চেতনা-পাখি বসে আছে সবুজ অরণ্যের কোনো এক চন্দনের ডালে। এই চন্দন সুগন্ধি কাঠের গাছ। আর এর ফুল ঝাল-মিষ্টি লবঙ্গ। কবির কাব্যসত্তার মধুরতার সঙ্গে চন্দনের সম্পর্ক নিহিত।

আর দুটি চোখের কোটরে
কাটা সুপারির রং, পা সবুজ, নখ তীব্র লাল
যেন তার তন্ত্রে মন্ত্রে ভরে আছে চন্দনের ডাল
চোখ যে রাখতে নারি এত বন্য ঝোপের ওপরে

—কবির অস্তিত্ব জুড়ে চিরায়ত গ্রামবাংলা, দৃষ্টিতে কাটা সুপারির রং। এ যেন চিরায়ত বাংলার রূপ। যতদূর চোখ যায়, কেবল চোখে পড়ে বাংলার অফুরন্ত রং। তার পা সবুজ, নখ তীব্র লাল— এ যেন মাটি আর আকাশে মেলে ধরা কবির নিসর্গ-উপলব্ধির অনিন্দ্যপ্রকাশ। আর সেই সমবেত সৌন্দর্যের তন্ত্রে-মন্ত্রে, রহস্যময়তায় ভরে উঠেছে কবির সৃষ্টি।

আসন্ন— আগত প্রায়, নিকটবর্তী।

চন্দন— স্বনামখ্যাত সুগন্ধি কাঠ বিশেষ ও তার গাছ।

তাকাতে পারি না আমি রূপে তার যেন এত ভয়
যখনি উজ্জ্বল হয় আমার এ চেতনার মণি,
মনে হয় কেটে যাবে, ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি
সংসার সমাজ ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে লোকালয়।



লোক থেকে লোকান্তরে আমি যেন স্তব্ধ হয়ে শুনি

আহত কবির গান। কবিতার আসন্ন বিজয়।

—সৃষ্টির প্রেরণায় কবি চিরকালই উদ্বুদ্ধ হন, উজ্জ্বল হয় তাঁর চেতনার মণি। পৃথিবীর কোনো বিধিবিধান, কোনো নিয়মকানুন, কোনো ধর্ম, কোনো সমাজ-সংস্কার বা লোকালয়ের অধীন তিনি আর তখন থাকেন না। তখন সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে চেতনার জগৎ, শব্দসৌধ। তাঁর সেই সৃষ্টির পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বিচিত্র টানাপোড়েন ও জীবন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তাকে উত্তীর্ণ হতে হয় কবিতার সার্বভৌমত্বে এবং জয় হয় কবিতার।

পরাগ- ফুলের রেণু।

মাথার ওপরে নিচে বনচারী বাতাসের তালে

দোলে বন্য পানলতা, সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি

হয়ে আছে ঠোঁট তার।

—চন্দনের ডালে বসে থাকা কবির চেতনা-পাখির ওপরে-নিচে বনচারী বাতাসের সঙ্গে দোল খায় পানলতা। প্রকৃতির এই রহস্যময়-সৌন্দর্যের মধ্যে সুগন্ধি পরাগে মাখামাখি হয়ে ওঠে কবির ঠোঁট, অস্তিত্বের স্বরূপ, কাব্যভাষা।

লোকান্তর- ভিন্ন জগৎ, অন্যলোক।

শাদা- সাদা, সফেদ।



সারসংক্ষেপ

কবি আল মাহমুদের ‘লোক-লোকান্তর’ আত্মপরিচয়মূলক কবিতা। এ কবিতায় কবি নিজের অভিব্যক্তিকে প্রকৃতির সাথে একাত্ম করে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি প্রকাশ করেছেন কাব্যচেতনার স্বরূপ। কবি সাদা এক সত্যিকার পাখির প্রতিমায় উপস্থাপন করেছেন তাঁর কাব্যবোধ ও কাব্যচেতনাকে। কবির এই চেতনা-পাখি বসে আছে সবুজ অরণ্যের কোনো এক চন্দনের ডালে। কবির কাছে একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে চেতনার জগৎ, চেতনার রং-রূপ-রেখা। এ কবিতায় এক সুগভীর বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণা কবিকে কাতর করে, আহত করে। তবু কবি সৃষ্টির আনন্দকে উপভোগ করতে আগ্রহী। পৃথিবীর কোনো নিয়ম-কানুন, ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, লোকালয়, কোনো বিধিবিধানের অধীনে তিনি আর থাকেন না। তিনি বিচিত্র টানাপোড়েন এবং জীবন-সংগ্রামের ভেতর দিয়ে উত্তীর্ণ হন কবিতার সার্বভৌমত্বে এবং জয় হয় কবিতার। এ কবিতায় কবি চিত্রকল্পের মালা গাঁথে তাঁর কাব্য চেতনাকে মূর্ত করে তুলতে চান। কবি সৃষ্টির এই আনন্দের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতাবোধের বেদনাকে প্রশমিত করেন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবি আল মাহমুদের প্রকৃত নাম কী?

ক. মীর আব্দুস শুকুর আল মাহমুদ

খ. মীর আব্দুস শুকুর মাহমুদ

গ. মীর আব্দুল শুকুর আল মাহমুদ

ঘ. মীর শুকুর আল মাহমুদ

২. ‘লোক-লোকান্তর’ কাব্যগ্রন্থে কবি তাঁর চেতনাকে পাখির সঙ্গে তুলনা করেছেন কেন?

ক. পাখির মতো প্রাণবন্ত

খ. পাখির মতো ডাকাডাকি করে

গ. পাখা পেয়েছে বলে

ঘ. চেতনা উড়ন্ত বলে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

কবরী এলো করে আকাশ দেখার মুহূর্ত

অশেষ অনুভব নিয়ে পুলকিত স্বচ্ছলতা।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে—

ক. চিত্রকল্প নির্মাণে

খ. শব্দ বিন্যাসে

গ. আঙ্গিকে

ঘ. অনুপ্রাস সৃষ্টিতে

৪. উদ্দীপক ও ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় ফুটে উঠেছে—

i. প্রকৃতিপ্রীতি



- ii. জীবন সংগ্রাম
iii. টানাপোড়েন
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
গ. i ও iii

খ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৫. বনচারী বাতাসের তালে কী দোলে?

ক. উঁচু বৃক্ষশাখা
খ. বন্য পানলতা

খ. চন্দনের ডাল
ঘ. গাছের নিচু ডাল

৬. ‘ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি’ এখানে ‘বাঁধুনি’ বলতে বোঝানো হয়েছে—

ক. সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা
গ. চেতনাকে আটকে রাখা

খ. মনকে বেঁধে রাখা
ঘ. রাজনীতির জটিল বন্ধন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার কোন চরণের?

ক. মনে হয় কেটে যাবে, ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি
গ. আমার চেতনা যেন একটি শাদা সত্যিকার পাখি

খ. চোখ যে রাখতে নারি এত বন্য ঝোপের ওপরি
ঘ. কাটা সুপারির রং, পা সবুজ, নখ তীব্র লাল

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

কবিতা রচনার অন্তরালে কাজ করে এক সৃষ্টিশীল গতিময় প্রেরণা। তখন কবির কাছে সমাজ, সংসার, ধর্ম সব কিছুই
অন্যরকম মনে হয়।

৮. উদ্দীপক ও ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে—

i. কবিতা সৃষ্টির গুরুত্ব
ii. কবিতার জন্যকথা
iii. কবির কল্পনাপ্রবণতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
গ. iii

খ. ii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

গীতিকবিতার একটি বিশেষ প্রকরণ সনেট। সনেটে সাধারণত চৌদ্দটি পংক্তি এবং প্রতি পংক্তিতে চৌদ্দটি মাত্রা থাকে। তবে আঠারো মাত্রার সনেটও প্রচলিত রয়েছে। সনেটের প্রথম আট পংক্তির স্তবককে অষ্টক এবং শেষ ছয় পংক্তির স্তবককে ষটক বলা হয়। অষ্টকে থাকে ভাবের প্রবর্তনা আর ষটকে তার পরিণতি। অষ্টক আর ষটক মিলিয়ে সনেটে একটি অখণ্ড ভাবকল্পনা বিকশিত হয়।

ক. ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় কোনটিকে সাদা পাখি বলা হয়েছে?

খ. সমাজ-সংসার কখন তুচ্ছ হয়ে ওঠে?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পংক্তিবিন্যাস ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় কীভাবে প্রযুক্ত হয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. “আল মাহমুদ রচিত ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতাটিকে একটি সনেট হিসাবে বিবেচনা করা যায়।” –উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করুন।



নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক

‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় কবি তাঁর চেতনাকে সাদা পাখি বলেছেন।

খ.

কবির কাছে যখন তাঁর চেতনার জগৎ একমাত্র সত্য হয়ে উঠে তখন সমাজ-সংসার সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়।

‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় কবি আল মাহমুদ সৃষ্টিশীল প্রেরণায় উদ্ভুদ্ধ হয়েছেন। এখানে তাঁর চেতনার মণি উজ্জ্বল হয়েছে। এসময়ে কবি পৃথিবীর কোনো বিধিবিধান, কোনো নিয়মকানুন, কোনো ধর্ম, কোনো সমাজ-সংস্কার বা লোকালয়ের অধীন থাকেন না। এ সময় সমাজ-সংসার সবকিছুই তাঁর নিকট অর্থহীন হয়ে ওঠে। তাঁর নিকট একমাত্র সত্য হয়ে উঠে চেতনার রঙ, চেতনার রূপরেখা। আর কবি পরম আনন্দে গড়ে তোলেন তাঁর প্রেরণার শব্দসৌধ। একেই বলা হয়েছে সমাজ-সংসার তুচ্ছ হয়ে উঠা।

গ.

উদ্দীপকে বর্ণিত সনেটের পংক্তিবিন্যাসের সঙ্গে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার পংক্তিবিন্যাসের সাদৃশ্য রয়েছে।

‘লোক-লোকান্তর’ একটি বিশেষ ধরনের গীতিকবিতা। কবিতাটি একটি মাত্র অখণ্ড ভাবকল্পনা বা অনুভূতি আঠার মাত্রার সমন্বয়ে বিশেষ আঙ্গিক ও ছন্দরীতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভাবগত দিক থেকে এর মধ্যে দুটি স্তবক দেখা যায়— প্রথম আট পংক্তি নিয়ে গঠিত অষ্টকে ভাবের বিস্তার এবং শেষ ছয় পংক্তি নিয়ে রচিত ষটকে ভাবের পরিণতি।

উদ্দীপকে সনেটের গঠন কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে একটি আদর্শ সনেটে চৌদ্দটি পংক্তি থাকবে। এই পংক্তিগুলো আট ও ছয় পংক্তির দুটি স্তবকে বিন্যস্ত হয়। আরো বলা হয়েছে সনেটের প্রতিটি পংক্তি সাধারণত চৌদ্দ মাত্রায় গঠিত হয়। তবে আঠারো মাত্রার সনেটেরও প্রচলন রয়েছে। ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায়ও চৌদ্দটি পংক্তি রয়েছে। এর পংক্তিগুলো আট ও দশ মাত্রার দুটি পর্বে গঠিত। দুটি পর্ব মিলিয়ে মোট মাত্রা সংখ্যা হচ্ছে আঠারো। যেমন—

মাথার ওপরে নিচে বনচারী বাতাসের তালে $৮+১০=১৮$

দোলে বন্য পানলতা সুগন্ধি পরাগে মাখা মাখি $৮+১০=১৮$

এছাড়া ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় সনেটের গঠনরীতি অনুযায়ী আট পংক্তির অষ্টক এবং ছয় পংক্তির ষটক-এরও বিন্যাস দেখা যায়। উপরের আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় সুপ্রযুক্ত হয়েছে।

ঘ.

আল মাহমুদ রচিত ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতাটিকে একটি সনেট হিসাবে বিবেচনা করা যায়— মন্তব্যটি যথার্থ।

সনেট গীতিকবিতার একটি বিশেষ রূপ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট রচনা করেন। তিনি সনেটের নাম দিয়েছিলেন চতুর্দশপদী কবিতা। সনেটে সাধারণত চৌদ্দটি পংক্তি ও মাত্রা থাকে। অবশ্য আঠারো মাত্রার সনেটেরও প্রচলন রয়েছে। সনেটে একজন কবির ভাবকল্পনা অখণ্ডভাবে বিস্তার লাভ করে।

উদ্দীপকে সনেটের গঠনরীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে সনেটে সাধারণত চৌদ্দটি পংক্তি ও চৌদ্দটি মাত্রা থাকে। কখনো কখনো অবশ্য আঠারো মাত্রার পংক্তিও পরিলক্ষিত হয়। সনেটের চৌদ্দটি পংক্তি আবার আট ও ছয় পংক্তির দুটি স্তবকে বিন্যস্ত হয়। এর আট পংক্তির স্তবককে অষ্টক ও ছয় পংক্তির স্তবককে ষটক বলা হয়। অষ্টকে থাকে ভাবের বিস্তার আর ষটকে দেখা যায় তার পরিণতি। এভাবে ষটক আর অষ্টক মিলে সনেটে একটি অখণ্ড ভাব দ্যোতনা লাভ করে। কবি আল মাহমুদ রচিত ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতায় উদ্দীপকে উপস্থাপিত সনেটের গঠন কৌশল প্রযুক্ত হয়েছে। অবশ্য কবি এ কবিতায় আঠারো মাত্রার পংক্তি ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ হিসাবে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার দুটি চরণ উল্লেখ করা যায়—

মনে হয় কেটে যাবে, ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি $৮+১০=১৮$

সংসার সমাজ ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে লোকালয়। $৮+১০=১৮$

উদ্ধৃত পংক্তি দুটোতে আঠারোটি মাত্রা রয়েছে। পংক্তি দুটো আট ও দশ মাত্রার দুটি পর্বে গঠিত। এছাড়া কবিতায় পংক্তিগুলোর অষ্টক ও ষটকের বিন্যাস রয়েছে।



উদ্দীপকের আলোকে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতাটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এতে সনেটের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। কবিতায় কবি তাঁর চেতনাকে একটি অখণ্ড ভাবকল্পনায় প্রকাশ করেছেন। এখানে কবির ভাবকল্পনা হচ্ছে জীবনের যত সুখ-শান্তি, আনন্দ-উল্লাস সবই ক্ষণস্থায়ী। কবি সাদা পাখির প্রতীকে তাঁর এই ভাবচেতনাকে অনিন্দ্য সুন্দররূপে উপস্থাপন করেছেন। পরিশেষে বলা যায়, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু বিচারে ‘লোক-লোকান্তর’ একটি সার্থক সনেট।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

সে দিনে দেখিবে স্বপ্ন-

সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে।

আমি চলে যাব বলে

চলতামু কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে

নরম গন্ধের ঢেউয়ে?

লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে?

সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে।

ক. ‘লোক-লোকান্তর’ কোন জাতীয় কবিতা?

খ. ‘মাথার ওপরে নিচে বনচারী বাতাস’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার সাদৃশ্য নির্ণয় করুন।

ঘ. “উদ্দীপকে ‘লোক-লোকান্তর’ কবিতার আংশিক ভাব প্রতিফলিত হয়েছে।” –মন্তব্যটি বিচার করুন।



উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক ২. ক ৩. ক ৪. ক ৫. গ ৬. ক ৭. গ ৮. ঘ



উপন্যাস



লালসালু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্



লালসালু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ



ঔপন্যাসিক-পরিচিতি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯২২ সালের ১৫ আগস্ট চট্টগ্রামের ষোলশহরে এক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আহমদউল্লাহ ময়মনসিংহে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বয়স যখন আট বছর তখন তাঁর মা মারা যান। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পিতার বিভিন্ন কর্মস্থলে তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয়। তিনি ১৯৩৯ সালে কুড়িগ্রাম হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪১ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আইএ, আনন্দমোহন কলেজ থেকে বিএ পাস করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হলেও তা শেষ করতে পারেননি। কেননা এমএ ডিগ্রি নেওয়ার আগেই ১৯৪৫ সালে তিনি বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা ‘দি স্টেটসম্যান’ এর সাংবাদিক হন এবং সাংবাদিকতার সূত্রেই কলকাতার সাহিত্যিক মহলে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকার সাব-এডিটর ছিলেন। তখন থেকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। *সওগাত*, *মোহাম্মদী*, *বুলবুল*, *পরিচয়*, *অরণি*, *পূর্বাশা* প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতো। ফেনি হাইস্কুলে পড়ার সময়েই তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত ঘটে। তাঁর প্রথম গল্প ‘হঠাৎ আলোর ঝলকানি’ ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি ঢাকায় এসে বেতার কেন্দ্রে সহকারী বার্তা সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫০ সালে তিনি করাচি বেতারের বার্তা সম্পাদক হন এবং তারপর তিনি কূটনৈতিক দায়িত্বে নিয়োজিত হন। প্রথমে নয়াদিল্লিতে ও পরে ঢাকা, সিডনি, করাচি জাকার্তা, বন, লন্ডন এবং প্যারিসে তিনি চাকরি করেন। ১৯৬০-১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি প্যারিসে পাকিস্তান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি এবং ১৯৬৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করার জন্য তিনি পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ শুরু করে বিশ্বজনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ফরাসি নাগরিক এ্যান মেরির সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন আত্মমুখী, নিঃসঙ্গ এবং অতিমাত্রায় সলজ্জ ও সঙ্কোচপরায়ণ একজন ব্যক্তি। তিনি খুব কম কথা বলতেন এবং কথা বলার চেয়ে কাজ করার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিলো বেশি। তাঁর চরিত্রের আভিজাত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো ব্যাপক অনুশীলন, অধ্যয়নস্পৃহা ও কল্পনাশ্রিয়তা। তাঁর আরেকটি বিশেষ গুণ ছিলো যে তিনি খুব ভালো ছবি আঁকতে পারতেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কম হলেও তাঁর সাহিত্যকর্ম সমগ্র বাংলা সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। বিশেষত তাঁর গল্প এবং উপন্যাসে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বহির্লোক এবং অন্তর্লোকের যে সূক্ষ্ম ও গভীর রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। কুসংস্কার ও অন্ধ ধর্মবিশ্বাসে আচ্ছন্ন, বিপর্যস্ত, আশাহীন ও মৃতপ্রায় সমাজজীবনের চিত্র যেমন এঁকেছেন, তেমনি মানুষের মনের ভেতরকার লোভ, প্রতারণা, ভীতি, ঈর্ষা প্রভৃতি প্রবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিজ্ঞানীর মতোই উদ্ঘাটন করেছেন। শুধু উপভোগ্য মজাদার গল্প রচনা তাঁর অভীষ্ট কখনোই ছিল না। তিনি মানব জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *লালসালু* প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। এটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ-উপন্যাসে তিনি গ্রাম-বাংলার সমাজ-জীবনের এক ধ্রুপদী জীবনধারাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর অন্য দুটি উপন্যাস *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪) ও *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮)-তে চেতনা-প্রবাহ রীতি ও অস্তিত্ববাদের ধারণাকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থ *নয়নচারা* ও দুই তীর প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৪৬ ও ১৯৬৫ সালে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ নিরীক্ষামূলক চারখানি নাটকও লিখেছেন। সেগুলি হলো *বহিপীর*, *তরঙ্গভঙ্গ*, *সুড়ঙ্গ* এবং *উজানে মৃত্যু*। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেই ১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবর তিনি প্যারিসে পরলোকগমন করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।



সাধারণ উদ্দেশ্য

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘লালসালু’ উপন্যাসটি পড়ার পর আপনি-

- উপন্যাসের শব্দগত অর্থ এবং তার সংজ্ঞার্থ বা উপন্যাস কাকে বলে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- বিষয় ও আঙ্গিক ভেদে উপন্যাস কত প্রকার হতে পারে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- লালসালু উপন্যাস সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করতে পারবেন।

পাঠ-১



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- উপন্যাসের শব্দগত অর্থ এবং তার সংজ্ঞার্থ বা উপন্যাস কাকে বলে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- উপন্যাসের উপাদান সম্পর্কে আপনি একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- বিষয় ও আঙ্গিক ভেদে উপন্যাস কত প্রকার হতে পারে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় লিখিত উপন্যাস সাহিত্য সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।
- উপন্যাসের সঙ্গে আখ্যান কাব্য, নাটক ও ছোটগল্পের পার্থক্য কী তা লিখতে পারবেন।



মূলপাঠ

কবিতা, গীতিকাব্য, মহাকাব্য, নাটক, ছোটগল্প ইত্যাদির মতো উপন্যাসও সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপ। এর অর্থ হচ্ছে, উপযুক্ত বা বিশেষ রূপে ন্যাস বা স্থাপন। অর্থাৎ উপন্যাস এমন এক কাহিনি যা বিশেষ কৌশলে উপস্থাপন করা হয়। বাংলা উপন্যাস শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Novel এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, a fictitious prose narrative or tale presenting picture of real life of the men and women portrayed-অর্থাৎ উপন্যাস হচ্ছে গদ্যে লিখিত সেই রকম এক বর্ণনা বা কাহিনি যার মধ্যে বর্ণিত মানব-মানবীর জীবন যাপনের বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

উপন্যাস শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণ করলে আমরা উপন্যাসের সংজ্ঞা পেয়ে যাই। আমরা বুঝতে পারি যে, মানব-মানবীর জীবন যাপনের বাস্তবতা অবলম্বনে যে কল্পিত উপাখ্যান পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য বিশেষভাবে বিন্যস্ত করে গদ্যে লিপিবদ্ধ হয় তাকেই উপন্যাস বলা যায়। যেহেতু মানব-মানবীর জীবন যাপনের বিষয়টি উপন্যাসে প্রধান, সেহেতু উপন্যাসের কাহিনি যেমন বিশ্লেষণাত্মক হয়, তেমনই তা হয় দীর্ঘ। বিখ্যাত ইংরেজ উপন্যাসিক E.M. Forster মনে করেন, কমপক্ষে ৫০ হাজার শব্দ দিয়ে উপন্যাস রচিত হওয়া উচিত।

উল্লিখিত সংজ্ঞার মধ্যেই আমরা উপন্যাসের উপাদানগুলির সন্ধান পেয়ে যাই। যেমন-

- উপন্যাসে একটি দীর্ঘ কাহিনি থাকা প্রয়োজন। তবে কাহিনি মাত্রই উপন্যাস হয় না। মানব-মানবীর অর্থাৎ ব্যক্তির সুখ-দুঃখ, সাধ, ঘৃণা, হিংসা, ভালোবাসা ঐ কাহিনিতে প্রাধান্য লাভ করে। তবে কাহিনি মাত্রই উপন্যাস হয় না, যেমন- দেবতা, ভূতপ্রেত, জম্বু, জানোয়ারের কাহিনি তো নয়ই এমন কি যে কাহিনিতে কেবল রাজার ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার দাপট কিংবা পুরোহিতের অনুশাসন প্রধান হয়ে ওঠে, ব্যক্তি মানুষের ঘাত-সংঘাতময় জীবনের কিংবা তার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাধান্য থাকে না, তেমন কাহিনিকে উপন্যাস বলা যায় না।



২. ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি কিংবা সমাজের সম্পর্কজাত বাস্তব ঘটনাবলি ও ঘাত সংঘাতই যেহেতু উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণ করে সেহেতু ব্যক্তির আচরণ এবং ক্রিয়াকাণ্ডই হয়ে যায় উপন্যাসের প্রধান বর্ণনার বিষয়। উপন্যাসের এ ব্যক্তিকেই বলা হয় চরিত্র বা Character.
৩. উপন্যাসের কাহিনিতে Plot বা সুপরিকল্পিত একটি বিষয় থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ ঘটনা ও চরিত্রের ক্রিয়াকাণ্ডকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে তা বাস্তব জীবনকে তো প্রতিফলিত করেই, উপরন্তু তা কাহিনির আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও বাস্তব পরিণতি সম্পাদন করে থাকে।
৪. মানুষ দৈনন্দিন জীবনে যে ভঙ্গির ভাষা ব্যবহার করে, সেই ভঙ্গির ভাষা অর্থাৎ গদ্যভাষাতেই উপন্যাস লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে।
৫. উপন্যাসের মধ্যদিয়ে মানবজীবন সংক্রান্ত কোন সত্যের উদ্ঘাটন অথবা উদ্ভাবন ঘটানো হয়ে থাকে। তাই সার্থক উপন্যাস পাঠ করলে পাঠক মানবজীবন সংক্রান্ত কোন সত্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। এ ভাবেই উপন্যাস শিল্প মানুষের মন ও মননকে প্রসারিত এবং গভীরতা-স্পর্শী করে তোলে।

মানুষের গল্প শোনার আগ্রহ থেকেই কাহিনির উদ্ভব। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মানুষের এ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। সে সময় প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক হিসেবে দেবদেবী, পুরোহিত, গোষ্ঠিপতি ও রাজাদের কীর্তিকাণ্ড কাহিনির বিষয় হয়ে ওঠে। লিপির উদ্ভাবন ও ব্যবহার শুরু হতে হতে বহু শতাব্দী গত হয়। ততদিনে মানবসমাজে সম্রাট, পুরোহিত ও ভূ-স্বামীদের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে দেবতা ও রাজার কাহিনিই লিপিবদ্ধ হয় ছন্দোবদ্ধ অলঙ্কৃত ভাষায়। প্রাচীনকালে মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনের ভাষা গদ্যে কাহিনি লেখা হয়েছে অনেক পরে। মুখে মুখে রচিত কাহিনি যেমন রূপকথা, উপকথা, পুরাণ, জাতকের গল্প ইত্যাদি গদ্যে লিপিবদ্ধ হয় প্রাচীন কালেই। কিন্তু মানুষ এবং মানুষের জীবন ঐসব কাহিনির বিষয় হতে পারে না, পাত্রপাত্রী মানুষ থাকলেও প্রাধান্য থাকে হুর, পরি, জীন, ভূত, প্রেত দেবদেবী ইত্যাদির। কারণ সমাজে ব্যক্তি মানুষের অধিকার স্বীকৃত না থাকায় ব্যক্তিরও কাহিনিতে প্রাধান্য লাভের উপায় ছিল না।

ইউরোপে মধ্যযুগের অবসানে বাণিজ্য পুঁজির বিকাশ আরম্ভ হয়। অজ্ঞতা, কুসংস্কার পরিহার করে জ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা, বিজ্ঞান ও যুক্তিনির্ভরতা এবং মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা এ সবই হয়ে ওঠে শিক্ষিত সমাজের জীবনযাপনের অঙ্গ। একই সময়ে বাণিজ্য পুঁজির বিকাশ আরম্ভ হলে সমাজে বণিক শ্রেণির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং রাজা, সামন্তভূস্বামী এবং পুরোহিতদের সামাজিক গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। এ পরিমণ্ডলে ভাগ্য ও ঈশ্বরনির্ভরতা পরিহার করে মানুষ হয়ে ওঠে স্বাবলম্বী, অধিকার সচেতন এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় উন্মুখ। সমাজে ব্যক্তিমানুষ হয়ে উঠে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যক্তির জীবনই হয়ে ওঠে সাহিত্যের প্রধান বিষয়। এ ভাবেই সমাজ পরিবর্তন ও ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের পটভূমিকাতেই উপন্যাস-এর উদ্ভব ও বিকাশ।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির অধিকাংশই লেখা হয়ে যায় উনিশ শতকের মধ্যে। ফরাসি, ইংরেজি ও রুশ ভাষায় লেখা উপন্যাসসমূহ যেমন ফ্রান্সের স্তাঁধাল ও এমিলি জোন্সার ‘স্কারলেট এ্যান্ড ব্ল্যাক’ এবং ‘দি জারমিনাল’, বৃটেনের হেনরি ফিল্ডিং ও চার্লস ডিকেন্সের ‘টম জোন্স’ এবং ‘এ টেল অফ টু সিটিজ’, রাশিয়ার লিও তলস্তয় ও ফিয়োদর দস্তয়ভস্কির ‘ওয়ার এ্যান্ড পীস’ এবং ‘ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট’ উপন্যাস শিল্পকে বিকাশের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। এ সব মহৎ উপন্যাস পাঠকের মনকে বৃহত্তর জগৎ ও জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়।

বিষয়, চরিত্র এবং আঙ্গিকের ভিত্তিতে উপন্যাসকে কয়েক শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন-

১. সামাজিক উপন্যাস : যে উপন্যাসে সামাজিক বিষয়াদি প্রাধান্য লাভ করে, তাকে সামাজিক উপন্যাস বলা হয়। সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের দ্বন্দ্বের কাহিনিই প্রধান হয়ে থাকে এ জাতীয় উপন্যাসে। যেমন- রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’ কিংবা শরৎচন্দ্রের ‘গৃহদাহ’। নজিবুর রহমানের ‘আনোয়ারা’, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘লালসালু’ও সামাজিক উপন্যাস।

২. ঐতিহাসিক উপন্যাস : ইতিহাসের কোন পর্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে লিখিত উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা হয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে লেখকের কল্পিত ঘটনা বা চরিত্র সৃষ্টির অবকাশ আছে। কিন্তু এসব চরিত্র বা ঘটনার মাধ্যমে প্রচলিত ঐতিহাসিক সত্য থেকে লেখক বিচ্যুত হতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের



‘রাজসিংহ’, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ধর্মপাল’ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে বিবেচিত। রুশ ভাষায় লিখিত তলস্তয়ের কালজয়ী গ্রন্থ ‘ওয়ার এ্যান্ড পিস’ একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস।

৩। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস : যে উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর মনোজগতের ঘাতসংঘাত ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রধান হয়ে ওঠে, তাকে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলা হয়। অবশ্য সামাজিক উপন্যাসে যেমন মনস্তাত্ত্বিক ঘাত সংঘাত থাকতে পারে, তেমনি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসেও থাকতে পারে সামাজিক ঘাত-সংঘাত। ফরাসি লেখক গুস্তভ ফ্লভেরার লিখিত ‘মাদাম বোভারি’, দস্তয়ভস্কি লিখিত ‘ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট’ এবং রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে বাইরে’ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের উজ্জ্বল উদাহরণ।

৪। রাজনৈতিক উপন্যাস : যে উপন্যাসে রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চরিত্রের কর্মকাণ্ড প্রাধান্য লাভ করে তাকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলে। যেমন— গোপাল হালদারের ‘ত্রয়ী’ উপন্যাস ‘একদা’, ‘অন্যদিন’, ‘আর একদিন’ এবং সতীনাথ ভাদুড়ির ‘জাগরী’।

৫। আঞ্চলিক উপন্যাস : কোনো বিশেষ অঞ্চলের মানুষ ও তাদের জীবন-সম্পর্কিত উপন্যাস হচ্ছে আঞ্চলিক উপন্যাস। যেমন— তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁসুলি বাঁকের উপকথা’ এবং অদ্বৈত মল্লবর্মনের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’।

৬। রহস্যোপন্যাস : যে উপন্যাসের গল্পে রহস্যময়তা সৃষ্টি করা হয় তেমন উপন্যাসকে রহস্যোপন্যাস বলা হয়। দীনেন্দ্র কুমার রায়, হেমেন্দ্র কুমার রায়, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ লেখক বাংলা ভাষায় বহু রহস্যোপন্যাস লিখেছেন।

এ ছাড়া বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও উপন্যাসের শ্রেণি বিভাগ করা যায়। যেমন ইংরেজ লেখক জর্জ অরওয়েল মানুষের বদলে জন্তু জানোয়ারকে পাত্রপাত্রী করে লিখেছেন রূপক উপন্যাস ‘এ্যানিমেল ফার্ম’। মানুষের মনোলোকে বর্তমানের অভিজ্ঞতা, অতীতের স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের কল্পনা একসঙ্গে প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহের ভাষিক বর্ণনা দিয়ে চেতনা প্রবাহমূলক উপন্যাস লিখিত হয়। আইরিশ লেখক জেমস জয়েসের বিখ্যাত গ্রন্থ ‘ইউলিসিস’ এমনই একখানি উপন্যাস। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত ‘চাঁদের অমাবস্যা’কেও চেতনা প্রবাহমূলক উপন্যাস বলা হয়।

বাংলা ভাষায় উপন্যাস লেখার সূচনা আধুনিক কালে। আমরা জানি গদ্যই হল উপন্যাসের একমাত্র প্রকাশ মাধ্যম। সুতরাং গদ্য সৃষ্টি না হলে উপন্যাস রচনার প্রশ্নই ওঠে না। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। এ কলেজে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শেখানোর লক্ষ্যে প্রথম বাংলা গদ্য লিখিত হয়। তবে গদ্যসাহিত্য রচনার উপযোগী হয়ে উঠতে বেশ সময় লাগে। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত প্যারিচাঁদ মিত্রের লিখিত “আলালের ঘরের দুলাল” নামক কাহিনিগ্রন্থে আধুনিক উপন্যাসের লক্ষণ প্রথম সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। তবে বাংলা সাহিত্যে সুন্দর গদ্যে উপভোগ্য যথাযথ কাহিনিসমৃদ্ধ সার্থক উপন্যাস লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’ একটি সার্থক রচনা। পুট বা কাহিনির যথার্থবিন্যাস এবং চরিত্রসৃষ্টিসহ উপন্যাস রচনার আঙ্গিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে বক্তব্য সমন্বিত ব্যক্তি-মানুষের কাহিনি তিনিই প্রথম যথার্থ গদ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন।

তবে বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসেই দূর অতীতের কল্পনা বেশি— সমকালীন জীবন প্রায় অনুপস্থিত। কেবল ‘বিষবৃক্ষ’ ও ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ এ দুটি উপন্যাসে সমকালীন জীবন বাস্তবতা মোটামুটি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিধবা রমণীর প্রণয় এবং বিবাহ সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কী রকমের জটিল সমস্যা এবং তীব্র সংকট সৃষ্টি করতে পারে তারই কাহিনি তিনি ঐ দুই উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। বলাবাহুল্য তাঁর বক্তব্যে বিধবা নারীর মানবিক অধিকার স্বীকৃত হয়নি। এরূপ রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও বলতে হবে বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা উপন্যাসের বিকাশের পথটি খুলে দিয়েছেন। তারপরে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংকটাপন্ন ব্যক্তিজীবনের কাহিনিগুলি রচনা করেন ‘চোখের বালি’, ‘ঘরে বাইরে’, ‘যোগাযোগ’ প্রভৃতি উপন্যাসে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথই বাংলা উপন্যাসে প্রকৃত আধুনিক চিন্তা ভাবনার প্রসার ঘটান। উদার মানবতাবাদী জীবনদর্শে বিশ্বাসী লেখকের দৃষ্টিতে বিধবার প্রণয় পাপকার্য বলে স্বীকৃত হয়নি এবং সেই কারণে প্রণয়িনী বিধবাকে প্রাণ দিয়ে ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্তও করতে হয়নি। সংস্কার ধর্ম ও আদর্শের চাইতে মানুষের জীবন যে অনেক বেশি মূল্যবান— এ বিবেচনা রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল উপন্যাসেই উপস্থিত। ‘গোরা’, ‘চার অধ্যায়’ প্রভৃতি উপন্যাসে আবার ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। ব্যক্তি জীবনের অভিপ্রায় ও বাসনার প্রতিক্রিয়া যেমন ব্যক্ত হয়েছে তেমনই জগৎ ও বৃহত্তর জীবনের যাবতীয় প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে আমরা প্রতিফলিত হতে দেখি।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পরে বাংলা উপন্যাস অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে। তিনি বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত হিন্দু গ্রামীণ সমাজের গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখের কাহিনি এমন অন্তরঙ্গ ভাষায় লিপিবদ্ধ



করেছেন, যার তুলনা বাংলা সাহিত্যে খুব কম। সামাজিক সংস্কারের পীড়নে নারীর অসহায়তার এমন করুণ চিত্রও আর কোনো লেখক আঁকেননি। বাস্তবতা থেকে উদ্ধৃত মানব মনের জটিল-কুটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধারণ করে আছে তাঁর ‘গৃহদাহ’, ‘শ্রীকান্ত’, ‘চরিত্রহীন’ প্রভৃতি উপন্যাস।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যে সামাজিক বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত তা দ্রুত বদলে যাচ্ছিল। একদিকে শিক্ষার প্রসার, বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রসার এবং অর্থনৈতিক সংকট যেমন মানুষের পারিবারিক জীবনকে জটিল করে তুলছিল, তেমনি অন্যদিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধী আন্দোলনের ফলে সাধারণ মানুষ ক্রমেই হয়ে উঠছিল অধিকার সচেতন। এ নতুন সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত সন্ধানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা নবীন লেখকদের অগ্রসর করে তোলে। তাঁদের কাছে সমাজের দরিদ্র এবং অজ্ঞাত মানুষের জীবন সাহিত্যের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়— এ তিন লেখক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর বাংলা সাহিত্যে প্রধান উপন্যাসকার হয়ে ওঠেন, তারাশঙ্করের ‘হাসুলি বাঁকের উপকথা’, বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত।

বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল ঔপনিবেশিক আমলে ইংরেজদের গড়া নতুন নগরী ও রাজধানী কলকাতা। সেখানে সমাগত হিন্দু মধ্যবিত্তই আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে এবং বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চায় তাদেরই ভূমিকা অনেকদিন পর্যন্ত অগ্রগণ্য ছিল। মুসলমান লেখকদের আবির্ভাব হয় পরবর্তীকালে। প্রথম পর্যায়ে আমরা মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, কাজী ইমদাদুল হক, নজিবুর রহমান প্রমুখ লেখককে পাই। এ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই আমরা পেয়ে যাই কাজী আব্দুল ওদুদ, কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবীর প্রমুখ লেখককে। এঁরা সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় বেশি কাজ করলেও উপন্যাস রচনার ধারাবাহিকতায় এঁদের নাম স্মরণীয়। সাহিত্য ক্ষেত্রে এঁদের উত্তরসূরী শওকত ওসমান, আবু রুশদ এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। এঁরা আধুনিক চিন্তা ও ভাবধারার লেখক। ব্যক্তি, সমাজ, এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জীবনকে বিশ্লেষণ করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এঁরা উপন্যাস রচনা করেছেন। বলা যায়, এঁদের এবং এঁদের পরবর্তী প্রজন্মের লেখার মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষায় উপন্যাসের ব্যাপক বিকাশ সাধিত হয়েছে।

‘লালসালু’ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রথম উপন্যাস। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। প্রথম উপন্যাস হলেও এটিকে আমরা একজন প্রতিভাবান লেখকের দুঃসাহসী প্রচেষ্টার সার্থক ফসল বলে বিবেচনা করতে পারি। আধুনিক ও নাগরিক রুচির অধিকারী উচ্চশিক্ষিত এ লেখক তখন কলকাতার অভিজাত ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র The Statesman-এর সাংবাদিক। ঐ সময় নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন নানা ঘাত সংঘাতে হয়ে ওঠে অস্থির ও চঞ্চল। ব্রিটিশ শাসনবিরোধী আন্দোলন, দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের কারণে মধ্যবিত্তের জীবন টালমাটাল— এমন এক ক্রান্তিকালে একজন নবীন লেখকের পক্ষে তাঁর চারদিকের পরিচিত জীবন ও মানুষ নিয়ে উপন্যাস লেখাই ছিল স্বাভাবিক ও সহজতর। কিন্তু তা না করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এমন একটি পটভূমি বেছে নিলেন তার প্রথম উপন্যাসের জন্য, যার অবস্থান শহর নয়, প্রধানত গ্রাম। সমসাময়িকতা থেকে যেমন, তেমনি পাঠকের প্রত্যক্ষতা থেকে দূরবর্তী।

আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোকই গ্রামে থাকে। সেখানেই তাদের বাঁচা-মরা এবং জীবন যাপন। সেই সমাজে এমন সব রীতিনীতি, ধারণা ও বিশ্বাস জন্মলাভ করে, চালু থাকে যা শহরবাসী শিক্ষিত লোকের অভিজ্ঞতার বাইরে। দুঃসাহসী তরুণ লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর প্রথম উপন্যাসের পটভূমি, পাত্রপাত্রী ও বিষয়বস্তু সবই গ্রহণ করলেন সেই গ্রামীণ জীবন থেকে। তাঁর উপন্যাসের পটভূমি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল এবং তার সমাজচরিত্র একদিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মতীর্থ, শোষিত ও দরিদ্র গ্রামবাসী এবং অন্যদিকে শঠ, প্রতারক, ধর্মব্যবসায়ী ও শোষক-ভূস্বামী। তাঁর উপন্যাসের বিষয় যুগযুগব্যাপী শেকড় গাড়া কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ভীতির সঙ্গে সুস্থ জীবনের দ্বন্দ্ব।

লালসালু উপন্যাসে লেখক আমাদের এমন এক গ্রামীণ সমাজে নিয়ে যান, যেখানে যুগযুগ ধরে মানুষের মনের চারদিক ঘিরে আছে অসম্ভব শক্তি, অথচ অদৃশ্য এক বেঁটনী - মানুষ যেখানে সমস্ত কিছুই ভাগ্য বলে মেনে নেয়, আর তার অগাধ বিশ্বাস অলৌকিকত্বে। সমস্ত ঘটনার মধ্যেই সে পারলৌকিক শক্তির লীলা দেখতে পায়, আর তাতে নিদারুণ শ্রদ্ধা-ভক্তিতে আপ্ত হয়ে একেবারে ভূমিতে নুয়ে পড়ে। কাহিনি যতই উন্মোচিত হতে থাকে ততই দেখা যায়— “শস্যের চাইতে টুপির সংখ্যা বেশি।” কেবলই কুসংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাস সেই সঙ্গে অনিবার্য পরিণতি ভীতি এবং আত্মসমর্পণ। বিরুদ্ধে যায় না কেউ— গেলে তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। লেখক দেখান, এ এমনই এক সমাজ যার পরতে-পরতে কেবলই শোষণ আর শোষণ। দেহের, মনের এবং সামগ্রিক জীবনের। প্রতারণা, শঠতা, আর শাসনের জটিল এবং সংখ্যাবিহীন শেকড় জীবনের শেষপ্রান্ত



পর্যন্ত ছড়ানো। আর ঐ সব শেকড় দিয়ে গ্রামের সহজ-সরল মানুষের জীবনের প্রাণরস প্রতিনিয়তই শুষে নেওয়া হয়। আনন্দ, প্রেম, প্রতিবাদ, সততা- এসব বোধ এবং বুদ্ধি ঐ অদৃশ্য দেওয়ালে ঘেরা সমাজের ভেতরে প্রায়শই ঢাকা পড়ে যায়।

আবার এ সামাজিক অবস্থার ভেতরেও একটি বিপরীত দিক আছে। আর তা হল, মানুষের প্রাণধর্মের দিকটি। মানুষ ভালবাসে, প্লেহ করে, কামনা বাসনা এবং আনন্দ বেদনায় উদ্বেল হয়। আবার ক্ষেত্রবিশেষে উল্লাসে-উচ্ছ্বাসে একেবারে ফেটে পড়ে। নিজের স্বাভাবিক ইচ্ছা ও বাসনার কারণেই সে নিজেকে আলোকিত ও বিকশিত করতে চায়। সংস্কার যতো শক্ত হোক, অন্ধবিশ্বাস যতো দৃঢ় হোক, ভয় যতো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখুক, প্রাণধর্মের সহজ প্রেরণা সমস্ত কিছু ছিঁড়ে ফেলে বেরিয়ে আসবে। যদি সফল নাও হয় তবু দ্বন্দ্বটি কখনও পরিত্যক্ত হয় না। জন্ম থেকে জন্মান্তরে তা চলতে থাকে- এই দ্বন্দ্ব দৈনন্দিন ও পারিবারিক জীবনে যেমন থাকে, তেমনিভাবে থাকে একই ব্যক্তির মনোলোকেও। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এ দ্বন্দ্বময় সামাজিক বাস্তবতার চিত্রই এঁকেছেন তাঁর ‘লালসালু’ উপন্যাসে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মানবতাবাদী লেখক। মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তি ও স্বাভাবিক বিকাশের আকাঙ্ক্ষা তাঁর সাহিত্য সাধনার পশ্চাতে যে সক্রিয় ছিল এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। আমাদের দেশের সামাজিক বাস্তবতায় যা মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের অন্তরায় সেগুলিকে তিনি চিহ্নিত করেছেন, দেখিয়েছেন কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের প্রচণ্ড-দাপটে সরল ও ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ কীভাবে বিভ্রান্ত হয় এবং শোষণের প্রক্রিয়া চালু থাকে। তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ধর্মবিশ্বাস নয়- ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কার। তিনি সেই সমাজের চিত্র তুলে ধরেন যেখানে ‘শস্যের চেয়ে টুপী বেশি, ধর্মের চেয়ে ধর্মের আগাছা বেশি’। ধর্ম মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে এসেছে কিন্তু কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস ধর্মের মূল ভিত্তিটাকেই করে দিয়েছে দুর্বল। মানুষের মনকে আলোড়িত তো করেইনি বরং করে তুলেছে অধিকতর অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং ভীত। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আঘাত সেখানে।

গভীর মনোযোগ এবং অত্যন্ত যত্নের কাজ ‘লালসালু’। গতানুগতিক ঘটনা নির্বাচন ও উপভোগ্য কাহিনির জন্য ঘটনা বিন্যাসের পথে অগ্রসর হননি লেখক। নরনারীর প্রেম কিংবা দুই প্রতিপক্ষের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঘটনাবলুল কাহিনিও ফুটিয়ে তোলা হয়নি এ উপন্যাসে। অথচ মানব জীবনেরই প্রতিচ্ছবি দেখাতে চান তিনি- মানুষেরই কাহিনি বর্ণনা করার অভিলাষ তাঁর। ফলে চরিত্র ও ঘটনার সেই সব গূঢ় ও রহস্যময় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি দেখতে ও দেখাতে হয়েছে তাঁকে যা জীবনকে চালায় এবং থামায়। মানুষের মনে লোভ, ঈর্ষা, লালসা, বিশ্বাস, ভয়, কামনা-বাসনা আছে বলেই বিচিত্রসব ঘটনা ঘটে। ধর্ম ব্যবসায়ীকে মানুষ ভয় পায়। কেন? কারণ তার বিশ্বাস লোকটির পেছনে রহস্যময় একটি দৈবশক্তি কাজ করছে। আবার ধর্ম ব্যবসায়ী ভণ্ডটির ভয় কিসে? সে জানে, কোনো মানুষ স্বাভাবিক প্রেরণা ও বুদ্ধি বলে তার প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠার ভিত্তিটাকে ধরসিয়ে দিতে পারে। সমাজে প্রচলিত এই ধর্মাত্মতা, ধর্মবিশ্বাস, ভণ্ডামি, কুসংস্কার এবং নরনারীর মনের নানান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলিই লেখকের বিষয় হয়ে উঠেছে ‘লালসালু’তে।

এমনিতে উপরিকাঠামোর সাধারণ বিচারে আমরা বলতে পারি যে ‘লালসালু’ একটি সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাস। নিরক্ষর দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীর সরলতা ও ধর্ম বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এক ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ী তার জটিল, কুটিল ছলনা-জাল বিস্তার করে কীভাবে নিজের শাসন ও শোষণের ভিত প্রতিষ্ঠিত করেছে, তারই চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে ‘লালসালু’ উপন্যাসে। কাহিনি বড় নয় কিন্তু এর মজবুত বিন্যাসে এমন এক ধরনের বিশ্লেষণমূলক বিস্তার লক্ষ করা যায় যে, তাতেই অতি সাধারণ কাহিনি এবং ঘটনা দুই-ই অসামান্য এবং তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

গদ্যে লেখা মানবজীবনের বাস্তবতাভিত্তিক দীর্ঘ কাহিনিকেই আমরা উপন্যাস বলে থাকি। মানুষের জীবন ও বাস্তবতা অবলম্বনে আরও এক ধরনের গদ্যকাহিনি আছে যার বিস্তার দীর্ঘ নয় এবং যার অবলম্বন মানুষের সমগ্র জীবন নয়। মানব জীবনের এই বিশেষ কোনো দিক অথবা জীবন সম্পর্কিত কোনো সত্য কিংবা কোনো আনন্দ বা বেদনাঘন মুহূর্তকে যখন স্বল্প পরিসর গদ্যকাহিনির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয় তখন তা হয় ছোটগল্প। সুতরাং উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে উপাদানগত মিল থাকলেও দুইয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভিন্ন হওয়ায় দুটিকেই আলাদা আঙ্গিকের শিল্প বলে বিশেষজ্ঞরা নির্ধারণ করেছেন।

আখ্যান কাব্য এবং মহাকাব্যে চরিত্র ও কাহিনি দুই-ই আছে, তা সত্ত্বেও এ দুই শ্রেণির সাহিত্য উপন্যাসের বিকল্প হতে পারে না। কারণ গদ্যে লিখিত উপন্যাসে জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়াদি এবং মানব চরিত্রের জটিল ও রহস্যময় আচরণ বিশ্লেষণ ও উত্থাপন করা সম্ভব, যা কাব্যে বা মহাকাব্যে সম্ভব হয়নি।

আবার উপন্যাস এবং নাটকের মধ্যে বিষয়গত কিছু সাদৃশ্য থাকলেও উপাদান ও উপস্থাপনের দিক থেকে দুটি সম্পূর্ণ আলাদা। নাটকে একটি কাহিনিকে মঞ্চের ওপর পাত্রপাত্রীর অভিনয়ের মাধ্যমে জীবন্ত করে হয়। অধিকন্তু যে কাহিনিটি



নাট্যকার করেন তাতে বিশ্লেষণ বা বর্ণনার কোনো সুযোগ নেই, সবই প্রকাশ করা হয় পাত্রপাত্রীর সংলাপের মাধ্যমে। সুতরাং মানবিক কোনো কাহিনি এবং সমাজের উল্লেখযোগ্য চরিত্রের সমন্বয় ঘটলেও নাটক ও উপন্যাসের পার্থক্য দুস্তর, যদিও বহু বিখ্যাত উপন্যাসকে সার্থকভাবে নাটকে রূপান্তরিত করা হয়েছে।



সারসংক্ষেপ

কবিতা, গীতিকাব্য, মহাকাব্য, নাটক, ছোটগল্প ইত্যাদির মতো উপন্যাসও সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপ। মানব-মানবীর জীবন যাপনের বাস্তবতা অবলম্বনে যে কল্পিত উপাখ্যান পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য বিশেষভাবে বিন্যস্ত করে গদ্যে লিপিবদ্ধ হয় সাধারণভাবেই তাকে উপন্যাস বলা যায়। বিষয়, চরিত্র এবং আঙ্গিকের ভিত্তিতে উপন্যাসকে কয়েক শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন- সামাজিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস, আঞ্চলিক উপন্যাস, রহস্যোপন্যাস। বাংলা ভাষায় উপন্যাস লেখার সূচনা আধুনিক কালে। গদ্যই হল উপন্যাসের একমাত্র প্রকাশ মাধ্যম। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শেখানোর লক্ষ্যে প্রথম বাংলা গদ্য লিখিত হয়। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত প্যারিচাঁদ মিত্রের লিখিত ‘আলালের ঘরের দুলাল’ নামক কাহিনিগ্রন্থে আধুনিক উপন্যাসের লক্ষণ প্রথম সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। তবে বাংলা সাহিত্যে সুন্দর গদ্যে উপভোগ্য যথাযথ কাহিনিসমৃদ্ধ সার্থক উপন্যাস লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’ একটি সার্থক রচনা। প্লট বা কাহিনির যথার্থবিন্যাস এবং চরিত্রসৃষ্টিসহ উপন্যাস রচনার আঙ্গিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে বক্তব্য সমন্বিত ব্যক্তি-মানুষের কাহিনি তিনিই প্রথম যথার্থ গদ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। এরপরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা উপন্যাসের সমৃদ্ধি ঘটান। সংস্কার ধর্ম ও আদর্শের চাইতে মানুষের জীবন যে অনেক বেশি মূল্যবান- এ বিবেচনা রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল উপন্যাসেই উপস্থিত। তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তিজীবনের অভিপ্রায় ও বাসনার প্রতিক্রিয়া যেমন ব্যক্ত হয়েছে তেমনই জগৎ ও বৃহত্তর জীবনের যাবতীয় প্রসঙ্গ তাঁর উপন্যাসের মধ্যে আমরা প্রতিফলিত হতে দেখি। এরপরে বাংলা উপন্যাস অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে। তিনি বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত হিন্দু গ্রামীণ সমাজের গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখের কাহিনি এমন অন্তরঙ্গ ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন, তিনি যার তুলনা বাংলা সাহিত্যে খুব কম। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়- এ তিন লেখক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর বাংলা সাহিত্যে প্রধান উপন্যাসকার হয়ে ওঠেন, তারাক্ষরের ‘হাঁসুলি বাঁকের উপকথা’, বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত। বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চায় মুসলমান লেখকদের আবির্ভাব হয় পরবর্তী কালে। প্রথম পর্যায়ে আমরা মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, কাজী ইমদাদুল হক, নজিবুর রহমান প্রমুখ লেখককে পাই। এ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই আমরা পেয়ে যাই কাজী আব্দুল ওদুদ, কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবীর প্রমুখ লেখককে। সাহিত্য ক্ষেত্রে এঁদের উত্তরসূরী শওকত ওসমান, আবু রুশদ এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। এঁরা আধুনিক চিন্তা ও ভাবধারার লেখক। ‘লালসালু’ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রথম উপন্যাস। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। প্রথম উপন্যাস হলেও আমরা একজন প্রতিভাবান লেখকের দুঃসাহসী প্রচেষ্টার সার্থক ফসল বলে বিবেচনা করতে পারি।

তাঁর উপন্যাসের পটভূমি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল এবং তার সমাজচরিত্র একদিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মভীরু, শোষিত ও দরিদ্র গ্রামবাসী এবং অন্যদিকে শঠ, প্রতারক, ধর্মব্যবসায়ী ও শোষক-ভূস্বামী। তাঁর উপন্যাসের বিষয় যুগযুগব্যাপী শেকড় গাড়া কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ভীতির সঙ্গে সুস্থ জীবনের দ্বন্দ্ব। ‘লালসালু’ একটি সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাস। নিরক্ষর দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীর সরলতা ও ধর্ম বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এক ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ী তার জটিল, কুটিল ছলনাজাল বিস্তার করে কীভাবে নিজের শাসন ও শোষণের ভিত প্রতিষ্ঠিত করেছে, তারই চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে ‘লালসালু’ উপন্যাসে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উপন্যাস হচ্ছে-

- ক. দীর্ঘ রচনা
- গ. সৃষ্টিশীল রচনা

- খ. সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ
- ঘ. চিন্তামূলক রচনা



২. উপন্যাসের কাহিনি হতে হয়-

- i. কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ
- ii. সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতপূর্ণ
- iii. অনেকগুলো শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. i ও iii
গ. ii	ঘ. ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

উপন্যাস আধুনিক কালের একটি বিশিষ্ট শিল্পরীতি। এটা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। উপন্যাস কখনও কাহিনি-নির্ভর, কখনও চরিত্র-নির্ভর, কখনও বা সমাজ সমস্যা-নির্ভর। সমাজ-নির্ভর উপন্যাসে সামাজিক বিষয়, রীতি-নীতি, ব্যক্তি মানুষের দ্বন্দ্ব, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাধান্য থাকে।

৩. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু যে রচনার বৈশিষ্ট্য-

ক. সিরাজউদ্দৌলা	খ. লালসালু
গ. বিড়াল	ঘ. বিলাসী

৪. উদ্দীপকের আলোকে 'লালসালু'-কে যে ধরনের উপন্যাস বলা যায়-

ক. সামাজিক উপন্যাস	ক. ঐতিহাসিক উপন্যাস
গ. আত্মজৈবনিক উপন্যাস	ঘ. আঞ্চলিক উপন্যাস



লালসালু

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

পাঠ-২



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- গ্রাম বাংলার একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- এ অঞ্চলের মানুষের ধর্মসংলগ্নতা, পশ্চাদপদতা ও জীবনসংগ্রাম সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- মজিদের মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশ ও প্রথম জমায়েতের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত যেন সদাসম্ভ্রান্ত করে রাখে। ঘরে কিছু নেই। ভাগাভাগি, লুটালুটি, আর স্থানবিশেষে খুনাখুনি করে সর্বপ্রচেষ্টার শেষ। দৃষ্টি বাইরের পানে, মস্ত নদীটির ওপারে, জেলার বাইরে- প্রদেশেরও; হয়তো-বা আরো দূরে। যারা নলি বানিয়ে ভেসে পড়ে তাদের দৃষ্টি দিগন্তে আটকায় না। জ্বালাময়ী আশা; ঘরে হা-শূন্য মুখ খোবড়ানো নিরাশা বলে তাতে মাত্রাতিরিক্ত প্রখরতা। দূরে তাকিয়ে যাদের চোখে আশা জ্বলে তাদের আর তর সয় না, দিনমানক্ষণের সবুর ফাঁসির সামিল। তাই তারা ছোট্টে, ছোট্টে।

অন্য অঞ্চল থেকে গভীর রাতে যখন ঝিমঝরি রেলগাড়ি সর্পিলা গতিতে এসে পৌঁছোয় এ-দেশে, তখন হঠাৎ আগাগোড়া তার দীর্ঘ দেহে ঝাকুনি লাগে, ঝনঝন করে ওঠে লোহালক্কড়। রাতের অন্ধকারে লণ্ঠন জ্বালানো ঘুমন্ত কত স্টেশন পেরিয়ে এসে এইখানে নিদ্রাচ্ছন্ন ট্রেনটির সমস্ত চেতনা জেগে সজারু-কাঁটা হয়ে ওঠে। তাছাড়া এদের বহির্মুখ উন্মত্ততা আগুনের হস্কার মতো পুড়িয়ে দেয় দেহ। রেলগাড়ির খুপরিগুলো থেকে আচমকা জেগে-ওঠা যাত্রীরা কেউ বা ভয় পেয়ে কেউ-বা অপরিসীম কৌতূহলে মুখ বাড়ায়, দেখে আবছা-অন্ধকারে ছোটোছুটি করতে থাকা লোকদের। কোথায় যাবে তারা? কিসের এত উন্মত্ততা, কিসের এত অধীরতা? এ লাইনে যারা নোতুন তারা চেয়ে চেয়ে দেখে। কিন্তু এরা ছোট্টে। ছোট্টে আর চীৎকার করে। গাড়ির এ-মাথা থেকে ও-মাথা। এতগুলো খুপির মধ্যে কোনটাতে চড়লে কপাল ফাটবে- তাই যেন খুঁজে দেখে। ইতোমধ্যে আত্মীয়-স্বজন, জান-পছানের লোক হারিয়ে যায়। কারো জামা ছেঁড়ে, কারো টুপিটা অন্যের পায়ের তলায় দুমড়ে যায়। কারো-বা আসল জিনিসটা, অর্থাৎ বদনাটা- যা না হলে বিদেশে এক পা চলে না- কী করে আলগোছে হারিয়ে যায়। হারাবে না কেন? দেহটা গেলেই হয়- এমন একটা মনোভাব নিয়ে ছোটোছুটি করলে হারাবেই তো। অনেকের অনেক সময় গলায় ঝোলানো তাবিজের থোকাটা ছাড়া দেহে বিন্দুমাত্র বস্ত্র থাকে না শেষ পর্যন্ত। তারা অবশ্য বয়সে ছোকড়া। বয়স হলে এরা আর কিছু না হোক শক্ত করে গিরেটা দিতে শেখে।

অজগরের মতো দীর্ঘ রেলগাড়ির কিন্তু ধৈর্যের সীমা নেই। তার দেহ ঝনঝন করে লোহালক্কড়ের ঝঙ্কারে, উত্তাপলাগা দেহ কেঁপে কেঁপে ওঠে, কিন্তু হঠাৎ উঠে ছোট্টে পালায় না। দেহচ্যুত হয়ে অদূরে অস্পষ্ট আলোয় ইঞ্জিনটা পানি খায়। পানি খায় ঠিক মানুষের মতোই। আর অপেক্ষা করে। ধৈর্যের কাঁটা নড়ে না।

কেনই বা নড়বে? নিশ্চিতি রাতে যে-দেশে এসে পৌঁছেছে সে-দেশ এখন অন্ধকারে ঢাকা থাকলেও সে জানে যে, তাতে শস্য নেই। বিরাণ মাঠ, সর-ভাঙ্গা পাড় আর বন্যা-ভাসানো ক্ষেত। নদীগহ্বরেও জমি কম নেই।



সত্যি শস্য নেই। যা আছে তা যত্সামান্য। শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি। ভোর বেলায় এত মজ্জবে আত্ননাদ ওঠে যে, মনে হয় এটা খোদাতা'লার বিশেষ দেশ। ন্যাংটা ছেলেও আমসিপারা পড়ে, গলা ফাটিয়ে মৌলবির বয়স্ক গলাকে ডুবিয়ে সমস্বরে চোঁচিয়ে পড়ে। গৌফ উঠতে না উঠতেই কোরান হেফজ করা সারা। সঙ্গে সঙ্গে মুখেও কেমন একটা ভাব জাগে। হাফেজ তারা। বেহেস্তে তাদের স্থান নির্দিষ্ট।

কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ। শস্যশূন্য। শস্য যা বা হয় তা জনবহুলতার তুলনায় যত্সামান্য। সেই হচ্ছে মুশকিল। এবং তাই খোদার পথে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসার চেতনায় যেমন একটা বিশিষ্টভাব ফুটে ওঠে, তেমনি না খেতে পেয়ে চোখে আবার কেমন একটা ভাব জাগে। শীর্ণদেহ নরম হয়ে ওঠে, আর স্বাভাবিক সরুগলা কেরাতের সময় মধু ছড়ালেও এদিকে দীনতায় আর অসহায়তায় ক্ষীণতর হয়ে ওঠে। তাতে দিন-কে দিন ব্যথা-বেদনা আঁকিবুকি কাটে। শীর্ণ চিবুকের আশে-পাশে যে-কটা ফিকে দাড়ি অসংযত দৌর্বল্যে ঝুলে থাকে তাতে মাহাত্ম্য ফোটাতে চায়, কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখের তলে চামড়াটে চোয়ালের দীনতা ঘোচে না। কেউ কেউ আরো আশা নিয়ে আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ে। বিদেশে গিয়ে পোকায় খাওয়া মস্ত মস্ত কেতাব খতম করে। কিন্তু কেতাবে যে বিদ্যে লেখা তা কোনো এক বিগত যুগে চড়ায় পড়ে আটকে গেছে। চড়া কেটে সে-বিদ্যেকে এত যুগ অতিক্রম করিয়ে বর্তমান স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে এমন লোক আবার নেই। অতএব কেতাবগুলোর বিচিত্র অক্ষরগুলো দূরান্ত কোনো এক অতীতকালের অরণ্যে আত্ননাদ করে।

তবু আশা, কত আশা। খোদাতা'লার ওপর প্রগাঢ় ভরসা। দিন যায় অন্য এক রঙিন কল্পনায়। কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখ বৈরিভাবাপন্ন ব্যক্তিসুখ-উদাসীন দুনিয়ার পানে চেয়ে চেয়ে আরো ক্ষয়ে আসে। খোদার এলেমে বুক ভরে না তলায় পেট শূন্য বলে। মসজিদের বাঁধানো পুকুরপাড়ে চৌকোণ পাথরের খণ্ডটার ওপর বসে শীতল পানিতে অজু বানায়, টুপিটা ঝুলে তার গহ্বরে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে আবার পরে। কিন্তু শান্তি পায় না। মন থেকে থেকে খাবি খায়, দিগন্তে ঝলকানো রোদের পানে চেয়ে চোখ পুড়ে যায়।

এরা তাই দেশ ত্যাগ করে। ত্যাগ করে সদলবদলে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নলি বানিয়ে জাহাজের খালাসি হয়ে ভেসে যায়, কারখানার শ্রমিক হয়, বাসাবাড়ির চাকর, দফতরির এটকিনি, ছাপাখানার ম্যাশিনম্যান, টেনারিতে চামড়ার লোক। কেউ মসজিদে ইমাম হয়, কেউ মোয়াজ্জিন। দেশময় কত সহস্র মসজিদ। কিন্তু শহরের মসজিদ, শহরতলীর মসজিদ— এমনকি গ্রামে গ্রামে মসজিদগুলো পর্যন্ত আগে থেকে দখল হয়ে আছে। শেষে কেউ কেউ দূরদূরান্তে চলে যায়। হয়তো বাহে-মুলুকে, নয়তো মনিদের দেশে। দূর দূর গ্রামে— যে গ্রামে পৌঁছতে হলে, কত চড়া-পড়া শুষ্ক নদী পেরোতে হয়, মোষের গাড়িতে খড়ের গাদায় ঘুমোতে হয় কত রাত। গারো পাহাড়ে দুর্গম অঞ্চলে কে কবে বাঁশের মসজিদ করেছিল— সেখানেও।

এক সরকারি কর্মচারী সেখানে হয়তো একদিন পায়ে বুট এঁটে শিকারে যায়। বাইরে বিদেশি পোশাক, মুখমণ্ডলও মসৃণ। কিন্তু আসলে ভেতরে মুসলমান। কেবল নোতুন খোলস পরা নব্য শিক্ষিত মুসলমান।

সে এই দুর্গম অঞ্চলে মিহি কণ্ঠে আজান শুনে চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার শিকারের আশাও কিছু দমে যায়।

পরে মৌলবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে বনবাসে দিন কাটানোর ফলে লোকটার চোখেমুখে নিঃসঙ্গতার বন্য শূন্যতা।

—আপনার দৌলতখানা?

শিকারি বলে।

—আপনার নাম?

নাম শুনে মৌলবির চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাছাড়া মুহূর্তে খোদার দুনিয়া চোখের সামনে আলোকিত হয়ে ওঠে!

শিকারিও পাল্টা প্রশ্ন করে। বাড়ির কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ মৌলবির মনে স্মৃতি জাগে। কিন্তু সংযত হয়ে বলে, এধারের লোকদের মধ্যে খোদাতা'লার আলোর অভাব। লোকগুলো অশিক্ষিত কাফের। তাই এদের মধ্যে আলো ছড়াতে এসেছে। বলে না যে, দেশে শস্য নেই, দেশে নিরন্তর টানাটানি, মরার খরা।

দূর জঙ্গলে বাঘ ডাকে। কুচিং কখনো হাতিও দাবড়ে কুঁদে নেমে আসে। কিন্তু দিনে পাঁচ-পাঁচবার দীর্ঘ শালগাছ ছাড়িয়ে একটা ক্ষীণগলা জাগে— মৌলবির গলা। বুনো ভারি হাওয়ায় তার হাল্কা ক-গাছি দাড়ি ওড়ে এবং গভীর রাতে হয়তো চোখের কোণটা চকচক করে ওঠে বাড়ির ভিটেটার জন্যে।

কিন্তু সেটা শিকারির কল্পনা। আস্তানায় ফিরে এসে বন্দুকের নল সাফ করতে করতে শিকারি কল্পনা করে সে-কথা। তবে নোতুন এক আলোর ঝলকে মৌলবির চোখ যে দীপ্ত হয়ে ওঠে সে কথা জানে না; ভাবতেও পারে না হয়তো।



একদিন শ্রাবণের শেষাংশে নিরাক পড়েছে। হাওয়াশূন্য স্তব্ধতায়— মাঠপ্রান্তর আর বিস্তৃত ধান ক্ষেত নিখর, কোথাও একটু কম্পন নেই। আকাশে মেঘ নেই। তামাটে নীলাভ রঙ দিগন্ত পর্যন্ত স্থির হয়ে আছে।

এমনি দিনে লোকেরা ধানক্ষেতে নৌকা নিয়ে বেরোয়। ডিঙ্গিতে দু-দুজন করে, সঙ্গে কোঁচ-জুতি। নিষ্পন্দ ধান-ক্ষেতে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা। কোথাও একটা কাক আতর্নাদ করে উঠলে মনে হয় আকাশটা বুঝি চটের মতো চিরে গেলো। অতি সন্তর্পণে ধানের ফাঁকে ফাঁকে তারা নৌকা চালায়; ডেউ হয় না, শব্দ হয় না। গলুই-এ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে একজন— চোখে ধারালো দৃষ্টি। ধানের ফাঁকে ফাঁকে সাপের সর্পিলা সূক্ষ্মগতিতে সে-দৃষ্টি ঐক্যবৈক্যে চলে।

বিস্তৃত ধানক্ষেতের একপ্রান্তে তাহের-কাদেরও আছে। তাহের দাঁড়িয়ে সামনে— চোখে তার তেমনি শিকারির সুচক্র একাগ্রতা। পেছনে তেমনি মূর্তির মতো বসে কাদের ভাই-এর ইশারার অপেক্ষায় থাকে। দাঁড় বাইছে, কিন্তু এমন কৌশলে যে, মনে হয় নিচে পানি নয়, তুলো।

হঠাৎ তাহের ঈষৎ কেঁপে উঠে মুহূর্তে শব্দ হয়ে যায়। সামনের পানে চেয়ে থেকেই পেছনে আঙুল দিয়ে ইশারা করে। সামনে, বাঁয়ে। একটু বাঁয়ে ক-টা শিষ নড়ছে— নিরাকপড়া বিস্তৃত ধানক্ষেতকে কেমন স্পষ্ট দেখায় সে-নড়া। আরো বাঁয়ে। সাবধান, আস্তে। তাহেরের আঙুল অদ্ভুত ক্ষিপ্ৰতায় এসব নির্দেশই দেয়।

ততক্ষণে সে পাশ থেকে আলগোছে কোঁচটা তুলে নিয়েছে। নিতে একটুও শব্দ হয়নি। হয়নি তার প্রমাণ, ধানের শিষ এখনো ওখানে নড়ছে। তারপর কয়েকটা নিঃশ্বাসরুদ্ধ-করা মুহূর্ত। দূরে যে-কটা নৌকা ধান-ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে এমনি নিঃশব্দে ভাসছিলো, সেগুলো থেমে যায়। লোকেরা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ধনুকের মতো টান-হয়ে ওঠা তাহেরের কালো দেহটির পানে। তারপর দেখে, হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো সেই কালো দেহের উর্ধ্বাংশ কেঁপে উঠলো, তীরের মতো বেরিয়ে গেলো একটা কোঁচ। সা-ঝাক্।

একটু পরে একটা বৃহৎ রুই মুখ হাঁ-করে ভেসে ওঠে।

আবার নৌকা চলে। ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে।

এক সময় ঘুরতে ঘুরতে তাহেরদের নৌকা মতিগঞ্জের সড়কটার কাছে এসে পড়ে। কাদের পেছনে বসে তেমনি নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাহেরের পানে তার আঙুলের ইশারার জন্যে। হঠাৎ এক সময়ে দেখে, তাহের সড়কের পানে চেয়ে কী দেখছে, চোখে বিস্ময়ের ভাব। সেও সেদিকে তাকায়। দেখে, মতিগঞ্জের সড়কের ওপরেই একটি অপরিচিত লোক আকাশের পানে হাত তুলে মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, শীর্ণ মুখে ক-গাছি দাড়ি, চোখ নিমীলিত। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটে, লোকটির চেতনা নেই। নিরাকপড়া আকাশ যেন তাকে পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত করেছে।

কাদের আর তাহের অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। মাছকে সতর্ক করে দেবার ভয়ে কথা হয় না, কিন্তু পাশেই একবার ধানের শিষ স্পষ্টভাবে নড়ে ওঠে, ঈষৎ আওয়াজও হয়— সেদিকে দৃষ্টি নেই।

এক সময়ে লোকটি মোনাজাত শেষ করে। কিছুক্ষণ কী ভেবে ঝট করে পাশে নামিয়ে রাখা পুঁটলিটা তুলে নেয়। তারপর বড় বড় পা ফেলে উত্তর দিকে হাঁটতে থাকে। উত্তর দিকে খানিকটা এগিয়ে মন্ত্রনগর গ্রাম। তাহের ও কাদেরের বাড়ি সেখানে।

অপরাহ্নের দিকে মাছ নিয়ে দু-ভাই বাড়ি ফিরে দেখে খালেক ব্যাপারীর ঘরে কেমন একটা জটলা। সেখানে গ্রামের লোকেরা আছে, তাদের বাপও আছে। সকলের কেমন গম্ভীর ভাব, সবার মুখ চিন্তায় নত। ভেতরে উঁকি মেরে দেখে, একটু আলগা হয়ে বসে আছে সেই লোকটা— নৌকা থেকে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর তখন যাকে মোনাজাত করতে দেখেছিল। রোগা লোক, বয়সের ধারে যেন চোয়াল দুটো উজ্জ্বল। চোখ বুজে আছে। কোটরাগত নিমীলিত সে চোখে একটুও কম্পন নেই।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

আলগোছে— আলগাভাবে, পৃথকভাবে। একাগ্রতা— সূচের আগার মতো তীক্ষ্ণতা সম্পন্ন একমুখী দৃষ্টি। কুচিৎ— কদাচিত, কখনও কখনও। কোঁচ-জুতি— বিল থেকে মাছ ধরার জন্য লোহার তৈরি ধারালো ফলার বল্লম জাতীয় হাতিয়ার। কোটরাগত নিমীলিত চোখ— ভেতরে বাঁজা দুটি চোখ। খোদার এলেম— ধর্মীয় বিদ্যা। চড়া কেটে সে বিদ্যেকে এত যুগ অতিক্রম করিয়ে বর্তমান স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে— অতীতের ধর্মীয় শিক্ষাকে বর্তমানের যুগোপযোগী শিক্ষার সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে



উপযোগী করে তোলা। **জানপছানের লোক**– আত্মীয়স্বজন, প্রাণ প্রিয় লোক, প্রিয়জন। **জ্বালাময় আশা**– তীব্র জ্বালা ও ক্ষুধা মিশ্রিত আশা। **দিনমানক্ষণের সবুর**– সামান্য সময়ের জন্য অপেক্ষা। **দেবী করা সহ্য হয় না**। **দীপ্ত**– আলোয় ভরা। **দেহচ্যুত হয়ে**– ট্রেনের বগি থেকে ইঞ্জিন যখন পৃথক হয়ে পড়ে। **দৌলতখানা**– বাড়ি বা ঠিকানা। **ধর্মের আগাছা বেশি**– সত্যিকারের ধর্মভাবের চেয়ে কুসংস্কারের প্রাধান্যই বেশি। **ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত সদাসত্ত্ব করে রাখে**– ধোঁয়াটে আকাশ অজানা ভবিষ্যৎ, অনিশ্চয়তা ও আঁধারের প্রতীক। যে অঞ্চলের কথা লেখক এখানে বর্ণনা করেছেন তাদের অভাব অনটনের জীবন এতই অনিশ্চিত যে তা যেন ধোঁয়াটে আকাশকেও হার মানায়। **নলি**– নলের ন্যায় সরু ছোট নৌকা। **নিদ্রাচ্ছন্ন**– ঘুমে বিভোর, ঘুমন্ত। **নিথর**– নিস্তব্ধ, নিশ্চল। **নিরাক পড়া**– হাওয়া বাতাসহীন গুমোট আবহাওয়া। **নিষ্পন্দ**– কোনরূপ শব্দহীন সূচত্র। **নিষ্পলক**– চোখের পাতা না ফেলা। **পানি নয় তুলো**– বিলে নৌকা এত সাবধানে ও নিঃশব্দে চলে যেন মনে হয় পানির ওপর দিয়ে নয় তুলোর ওপর দিয়েই চলছে নৌকা। **ফাঁসির সামিল**– ফাঁসির শাস্তির ন্যায় কষ্টকর। **ফিকে দাড়ি**– পাতলা দাড়ি। **বহিমুখী উন্মত্ততা**– বাইরে ছুটে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে ওঠা। **বাহে মুলুকে**– উত্তরবঙ্গে। **বিরান**– ফাঁকা, খালি। **বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা**– কাজের খোঁজে বা চাকরির সন্ধানে বাইরে ছুটে যাওয়ার জন্য আগ্রহ। **বৈরিভাবাপন্ন**– শত্রুভাবাপন্ন। **মুখখোবড়ানো**– পর্যুদস্ত, ক্লান্ত। **শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের**– বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেছেন– এখানে খাদ্যশস্যের প্রকট অভাব অথচ জনসংখ্যার ভারে মানুষ গিজ গিজ করছে। **শস্যের চেয়ে টুপি বেশি**– খাদ্যশস্যের অভাব হলেও মাথায় টুপি পরা মুসলমানের সংখ্যা বেশি। **শীর্ণ দেহ**– চিকন দুর্বল শরীর। **সজারু কাঁটা হয়ে ওঠে**– আচমকা জেগে ওঠে। **সরভাঙা পাড়**– নদীর প্রবল স্রোতে ভেঙে যাওয়া পাড়। **সরুগলা কেরাত**– চিকন মিহি সুরে কোরানের সুরা পড়া। **সন্তর্পণে**– সাবধানে। **সর্পিল গতিতে**– সাপের চলার মতো আঁকাবাঁকা গতিতে, আস্তে আস্তে। **হা শূন্য**– অভাবহস্ত।



সারসংক্ষেপ

দারিদ্র্য, অভাব ও ক্ষুধাক্লিষ্ট নোয়াখালি জেলার গ্রামাঞ্চল। এ অঞ্চল যেমন জনবহুল তেমনি নদীবহুল। তবে খেতে শস্য নেই, কর্মসংস্থানের কোনো সুযোগ নেই। তাই লোকজন দেশের নানা অঞ্চলে সামান্য কাজের জন্য ছুটে বেড়ায়। যত দুর্গম অঞ্চল হোক সেখানে ছুটে যায়, কাজের আশায়। নিবিড় রাতে রেলগাড়ির খুপরিতে ঢুকে অজানা পথে তারা পাড়ি জমায়। পথের সম্মল তাদের পুটলি-বদনা, কারও কারও পুঁথিগত কিছু ধর্মবিদ্যা। কেউ আমসিপারা পড়া, কেউ কোরানে হাফেজ, কেউ বা আলীয়া মাদরাসা ডিঙানো। যদিও এসব গ্রন্থের অর্থ কোনোদিন তারা বোঝেনি। শহরে-বন্দরে-গ্রামে, নদীতে-সমুদ্রে যেখানেই হোক, কাজ চাই। হোক না এ কাজ জাহাজের খালাসি, কারখানার শ্রমিক, ছাপাখানার মেশিনম্যান, মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জিন। শহর-বন্দরে হাজারো মসজিদ, তারপরও কর্মসংস্থান হয় না। যমুনা পার হয়ে কেউ চলে যায় উত্তরবঙ্গে, কেউ বা গারো পাহাড়ের দুর্গম জঙ্গলে। এমনি জঙ্গলময় নিভৃত গারো অঞ্চলে এক বাঁশের তৈরি মসজিদ আঁকড়ে পড়ে আছে একজন, সেও সূদূর নোয়াখালি থেকে আসা এ-মসজিদের ইমাম। নাম তার মজিদ। মজিদ বলে, খোদা তালার আলো ছড়াতে সে এসেছে এখানে। গ্রামের ছেলে তাহের ও কাদের ডিঙিতে করে মাছ ধরতে বেরিয়েছে বিলে। ধানক্ষেত দিয়ে সাবধানে নৌকা চালাতে চালাতে তারা দেখে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর একটি লোক মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটি বোঁজা, মুখে কগাছি দাড়ি। কিছুক্ষণ পর লোকটি উত্তর দিকে হেঁটে মহক্কাতনগর গ্রামে প্রবেশ করে। এখানেই তাহের-কাদেরের বাড়ি। লোকটিকে তারা বিকেলে গ্রামের জোতদার খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে নানা বয়সী লোকের সমাগমে দেখতে পায়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. 'লালসালু' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশকাল হচ্ছে–

ক. ১৯৪৮

খ. ১৯৫২

গ. ১৯৬১

ঘ. ১৯৬৭

৬. কাদের আর তাহের কীভাবে লোকটিকে চেয়ে দেখে?

ক. নির্ভীক দৃষ্টিতে

খ. নিষ্পলক দৃষ্টিতে

গ. অবাক দৃষ্টিতে

ঘ. তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে



নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

আকালের এলাকার মানুষ সুমন। ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সে গিয়েছে দূরের গ্রাম উনশিয়ায়। সেখানে সে একটি জঙ্গলাকীর্ণ জায়গাকে তীর্থস্থান বলে শনাক্ত করে। গোটা কয়েক চেলা জোগাড় করে সেখানে সুমন শুরু করে তার কথিত তীর্থসেবা।

৭. উদ্দীপকের চরিত্রটির সঙ্গে ‘লালসালু’ উপন্যাসে কার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. আকাস মিঞা	খ. খালেক ব্যাপারি
গ. মজিদ	ঘ. কাদের

৮. এরূপ সাদৃশ্য রয়েছে—

- পীর সাজার চেষ্টায়
- ভাগ্য পরিবর্তনে
- ধর্ম ব্যবসা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. ii ও iii
গ. i ও iii	ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৩



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- ✚ মহব্বতনগর গ্রামের লোকদের জীবনধারা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ✚ মজিদের বৈষয়িক উন্নতি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- ✚ গ্রামের লোকদের সঙ্গে ফসলি জমির সম্পর্ককে মজিদ কোন দৃষ্টিতে দেখে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ✚ রহীমা চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

এভাবেই মজিদের প্রবেশ হলো মহব্বতনগর গ্রামে। প্রবেশটা নাটকীয় হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্রামের লোকেরা নাটকেরই পক্ষপাতি। সরাসরি মতিগঞ্জের সড়ক দিয়ে যে গ্রামে এসে ঢুকবে তার চেয়ে বেশি পছন্দ হবে তাকে, যে বিলটার বড় অশ্বখ গাছ থেকে নেমে আসবে। মজিদের আগমনটা তেমনি চমকপ্রদ। চমকপ্রদ এ জন্যে যে, তার আগমন, মুহূর্তে সমগ্র গ্রামকে চমকে দেয়। শুধু তাই নয়, গ্রামবাসীদের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে তাদের সচেতন করে দেয়, অনুশোচনায় জর্জরিত করে দেয় তাদের অন্তর।

শীর্ণ লোকটি চীৎকার করে গালাগাল করে লোকদের। খালেক ব্যাপারী ও মাতব্বর রেহান আলী ছিলো। জোয়ান মদ কালু মতি, তারাও ছিলো। কিন্তু লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট। নবাগত লোকটির কোটরাগত চোখে আগুন।

-আপনারা জাহেল, বেএলম, আন্পাড়হ্। মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন?

গ্রাম থেকে একটু বাইরে একটা বৃহৎ বাঁশঝাড়। মোটাসোটা হলদে তার গুঁড়ি। সেই বাঁশঝাড়ের ক-গজ ওধারে একটা পরিত্যক্ত পুকুরের পাশে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে গাছপালা। যেন একদিন কার বাগান ছিলো সেখানে। তারই একধারে টালখাওয়া ভাঙ্গা এক প্রাচীন কবর। ছোট ছোট ইটগুলো বিবর্ণ শ্যাওলায় সবুজ, যুগযুগের হাওয়ায় কালচে। ভেতরে সুড়ঙ্গের মতো। শেয়ালের বাসা হয়তো। ওরা কী করে জানবে যে, ওটা মোদাচ্ছের পীরের মাজার?

সভায় অশীতিপর বৃদ্ধ সলেমনের বাপও ছিলো। হাঁপানির রোগী। সে দম খিঁচে লজ্জায় নত করে রাখে চোখ।

-আমি ছিলাম গারো পাহাড়ে, মধুপুরগড় থেকে তিন দিনের পথ। -মজিদ বলে। বলে যে, সেখানে সুখে শান্তিতেই ছিলো। গোলাভরা ধান, গরু-ছাগল। তবে সেখানকার মানুষরা কিন্তু অশিক্ষিত, বর্বর। তাদের মধ্যে কিষ্টিং খোদার আলো ছড়াবার জন্যেই অমন বিদেশ-বিভূই-এ সে বসবাস করছিলো। তারা বর্বর হলে কী হবে, দিল তাদের সাচ্চা, খাঁটি সোনার মতো। খোদা-রসুলের ডাক একবার দিলে পৌঁছে দিতে পারলে তারা বেচাইন হয়ে যায়। তাছাড়া তাদের খাতির যত্ন ও স্নেহ-মমতার মধ্যে বেশ দিন কাটছিলো; কিন্তু সে একদিন স্বপ্ন দেখে। সে-স্বপ্নই তাকে নিয়ে এসেছে এত দূরে। মধুপুর গড় থেকে তিন দিনের পথ সে দুর্গম অঞ্চলে মজিদ যে বাড়ি গড়ে তুলেছিলো তা নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে ছুটে চলে এসেছে।

লোকেরা ইতোমধ্যে বার কয়েক শুনেছে সে-কথা, তবু আবার উৎকর্ষ হয়ে ওঠে।

-উনি একদিন স্বপ্নে ডাকি বললেন...

বলতে বলতে মজিদের কোটরাগত ক্ষুদ্র চোখ দুটো পানিতে ছাপিয়ে ওঠে।

গ্রামের লোকগুলি ইদানীং অবস্থাপন্ন হয়ে উঠেছে। জোতজমি করেছে, বাড়ি-ঘর করে গরুছাগল আর মেয়েমানুষ পুষে চড়াই-উতরাই ভাব ছেড়ে ধীরস্থির হয়ে উঠেছে, মুখে চিকনাই হয়েছে। কিন্তু খোদার দিকে তাদের নজর কম। এখানে ধানক্ষেতে হাওয়া গান তোলে বটে কিন্তু মুসল্লিদের গলা আকাশে ভাসে না। গ্রামের প্রান্তে সেই জঙ্গলের মধ্যে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বুকো কোলানো তামার দাঁত-খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বর খোঁচাতে খোঁচাতে মজিদ সেদিন সে কথা স্পষ্ট বুঝেছিলো। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বুঝেছিলো যে, দুনিয়ায় সচ্ছলভাবে দু-বেলা খেয়ে বাঁচবার জন্যে যে-খেলা খেলতে যাচ্ছে সে-খেলা



সাংঘাতিক। মনে সন্দেহ ছিলো, ভয়ও ছিলো। কিন্তু জমায়েতের অধোবদন চেহারা দেখে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো অন্তর। হাঁপানি-রোগগ্রস্ত অশীতিপর বৃদ্ধের চোখের পানে চেয়েও তাতে লজ্জা ছাড়া কিছু দেখেনি।

জঙ্গল সাফ হয়ে গেলো। ইট-সুরকি নিয়ে সেই প্রাচীন কবর সদ্যমৃত কোনো মানুষের কবরের মতো নোতুন দেহ ধারণ করলো। ঝালরওয়ালা সালু দ্বারা আবৃত হলো মাছের পিঠের মতো সে কবর। আগরবাতি গন্ধ ছড়াতে লাগলো, মোমবাতি জ্বলতে লাগলো রাতদিন। গাছপালায় ঢাকা স্থানটি আগে সঁাতসেঁতে ছিলো, এখন রোদ পড়ে খটখটে হয়ে উঠলো; হাওয়ার ভাঁপসা গন্ধ খড়ের মতো গুরু হয়ে উঠলো।

এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে লোকেরা আসতে লাগলো। তাদের মর্মস্ফুট কান্না, অশ্রুসজল কৃতজ্ঞতা, আশার কথা, ব্যর্থতার কথা সালুতে আবৃত মাছের পিঠের মতো অজ্ঞাত ব্যক্তির সেই কবরের কোলে ব্যক্ত হতে লাগলো দিনের পর দিন। তার সঙ্গে পয়সা-ঝকঝকে পয়সা, ঘষা পয়সা, সিকি-দুয়ানি-আধুলি, সাচ্চা টাকা, নকল টাকা ছড়াছড়ি যেতে লাগলো।

ক্রমে ক্রমে মজিদের ঘরবাড়ি উঠলো। বাহির ঘর, অন্দর ঘর, গোয়াল ঘর, আওলা-ঘর। জমি হলো, গৃহস্থালি হলো। নিরাকপড়া শ্রাবণের সেই হাওয়া-শূন্য স্তব্ধ দিনে তার জীবনের যে নোতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিলো, মাছের পিঠের মতো সালু কাপড়ে আবৃত নশ্বর জীবনের প্রতীকটির পাশে সে জীবন পদে পদে এগিয়ে চললো। হয়তো সামনের দিকে, হয়তো কোথাও নয়। সে-কথা ভেবে দেখবার লোক সে নয়। বতোর দিনে মগরা-মগরা ধান আসে ঘরে, তাই যথেষ্ট। তথাকথিত মাজারের পানে চেয়ে ক্লিষ্ট কখনো সে যে ভাবিত না হয় তা নয়। কিন্তু তারও যে বাঁচবার অধিকার আছে সেই কথাটাই সে সাময়িক চিন্তার মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে। তাছাড়া গারো পাহাড়ের শ্রমক্লান্ত হাড় বের করা দিনের কথা স্মরণ হলে সে শিউরে ওঠে। ভাবে, খোদার বান্দা সে নির্বোধ ও জীবনের জন্য অন্ধ। তার ভুলভ্রান্তি তিনি মাফ করে দেবেন। তাঁর করুণা অপার, সীমাহীন।

একদিন মজিদ বিয়েও করে। অনেকদিন থেকে আলি-ঝালি একটি চওড়া বেওয়া মেয়েকে দেখছিলো।

দেহে যৌবন যেন ব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে, বিশাল তার রূপ। দূর থেকে আবছা আবছা তার প্রশস্ত দেহ দেখে শীর্ণ মজিদ জ্বলে উঠেছিলো।

শেষে সেই প্রশস্ত ব্যাপ্ত যৌবনা মেয়েলোকটিই বিবি হয়ে তার ঘরে এলো। নাম তার রহীমা। সত্যি সে লম্বা চওড়া মানুষ! হাড়-চওড়া মাংসল দেহ। শীঘ্র দেখা গেলো, তার শক্তিও কম নয়। বড় বড় হাঁড়ি সে অনায়াসে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তুলে নিয়ে যায়, গৌয়ার ধামড়া গাইকেও স্বচ্ছন্দে গোয়াল থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসে। হাঁটে যখন, মাটিতে আওয়াজ হয়, কথা কয় যখন, মাঠ থেকে শোনা যায় গলা।

তবে তার শক্তি, তার চওড়া দেহ-যে-দেহ দূর থেকে আলি-ঝালি দেখে মজিদের বুকে আগুন ধরেছিলো- তা বাইরের খোলস মাত্র। আসলে সে ঠাণ্ডা, ভীতু মানুষ। দশ কথায় রা নেই, রক্তে রাগ নেই। মজিদের প্রতি তার সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভয়। শীর্ণ মানুষটির পেছনে মাছের পিঠের মতো মাজারটির বৃহৎ ছায়া দেখে।

ও যখন উঠানে হাঁটে তখন মজিদ চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর মধুর হেসে আস্তে মাথা নেড়ে বলে,

—অমন করি হাঁটে নাই।

থমকে গিয়ে রহীমা তার দিকে তাকায়।

মজিদ বলে,

—অমন করে হাঁটে নাই বিবি, মাটি-এ গোঁষা করে। এ মাটিতেই তো একদিন ফিরি যাইবা- থেমে আবার বলে, মাটির কষ্ট দেওন গুণাহ।

এ-কথা আগেও শুনেছে রহীমা। মুরগিররা বলেছে, বাড়ির আত্মীয়রা বলেছে। মজিদের কথায় বাইরে সালু কাপড়ে আবৃত মাজারটির কথা স্মরণ হয়।

মজিদ নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখে। দেখে রহীমার চোখে ভয়। মধুরভাবে হেসে আবার বলে,

—অমন করি কখনো হাঁটিও না। কবরে আজাব হইব।

শক্তিমত্তা নারীর উজ্জ্বল পরিষ্কার চোখে ঘনায়মান ভয়ের ছায়া দেখে মজিদ খুশি হয়। তারপর বাইরে গিয়ে কোরান তেলাওয়াৎ শুরু করে। গলা ভালো তার, পড়বার ভঙ্গিও মধুর। একটা চমৎকার সুরে সারা বাড়ি ভরে যায়। যেন হান্নাহেনার মিষ্টি মধুর গন্ধ ছড়ায়।



কাজ করতে করতে রহীমা থমকে যায়; কান পেতে শোনে। খোদাতা'আলার রহস্যময় দিগন্ত তার অন্তরে যেন বিদ্যুতের মতো থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। একটি অব্যক্ত ভীতিও ঘনিয়ে আসে মনে। সে খোদাকে ভয় পায়, মাজারকে ভয় পায়, স্বামী মজিদকে ভয় পায়।

পুকুরে গোসল করে সিক্ত বসনে উঠানে দাঁড়িয়ে রহীমা যখন চুল ঝাড়ে তখনো চেয়ে চেয়ে দেখে মজিদ। বিছানার পাশে যে-দেহটির তাল পায় না, সে দেহটিই এখন সিক্ত কাপড় ভেদ করে অদ্ভুত সুন্দর হয়ে ওঠে। তার চোখ চকচক করে। কিন্তু রহীমার চেতনা নেই।

গলা কেশে মজিদ বলে,

—খোলা জাগায় অমন বেশরমের মতো দাঁড়াইও না বিবি।

সচকিত হয়ে রহীমা হাত নামায়, বুকে ভালো করে আঁচল দেয়, পেছনে সাপ্টে থাকা কাপড় আলগা করে দিয়ে এধার-ওধার যেন বেগানা-বেগায়ের লোকের সন্ধানে তাকায়। কিন্তু ঐ তো কেবল মজিদ বসে আছে দরজার পাশে, হাতে ছকা। গলা সীসার মতো অবশেষে লজ্জা আসে রহীমার সারা দেহে। দ্রুত পায়ে সে আড়ালে চলে যায়।

মজিদের সামনে এমনভাবে আর দাঁড়ায় না কখনো।

গ্রামের লোকেরা যেন রহীমারই অন্য সংস্করণ। তাগড়া-তাগড়া দেহ— চেনে জমি আর ধান, চেনে পেট। খোদার কথা নেই। স্মরণ করিয়ে দিলে আছে, নচেৎ ভুল মেরে থাকে। জমির জন্যে প্রাণ। সে-জমিতে বর্ষগহীন খরার দিনে ফাটল ধরলে তখন কেবল স্মরণ হয় খোদাকে।

কিন্তু জমি এধারে উর্বর, চারা ছড়িয়েছে কি সোনা ফলবে। মানুষরাও পরিশ্রম করে, জমিও সে শ্রমের সম্মান দেয়। দেয় তো বুক উজাড় করে দেয়।

মাঠে গিয়ে মানুষ মেঠো হয়ে ওঠে। কখনো ঘরোয়া হিংসা-বিদ্বেষের জন্যে, বা আত্মমর্যাদার ভুয়ো ঝাঙা উঁচিয়ে রাখবার জন্যে তারা জমিকে দাবার ছকের মতো ভাগ করে ফেলে। সে জমিকেই আবার রক্ত দিয়ে রক্ষা করতে দ্বিধা করে না। হয়তো দুনিয়ার দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে তারা বর্বরতার নিচতায় নেমে আসে, কিন্তু যখন জমির গন্ধ নাকে লাগে, মাটির এলো খাবড়া দলাগুলোর পানে চেয়ে আপন রক্তমাংসের কথা স্মরণ হয়, তখন ভুলে যায় সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ। সিপাইর খণ্ডিত ছিন্ন দেহের একতাল অর্থহীন মাংসের মতো জমিও তখন প্রাণের চাইতে বড় হয়ে ওঠে। খাবলা খাবলা রুঠাজমি, ডোবাজমি, কাদাজমি-ফাটলধরা জৈয়ষ্ঠের জমি— সব জমি একান্ত আপন; কোনোটার প্রতি অবহেলা নেই। যেমন সুস্থ মুমূর্ষু বা জরাজর্জর আত্মীয়জনের প্রতি দৃষ্টিভেদ থাকে না মানুষের। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তারা খাটে। হয়তো কাঠফাটা রোদ, হয়তো মুষলধারে বৃষ্টি— তারা পরিশ্রম করে চলে। অগ্রহায়ণের শীত খোলামাঠে হাড় কাঁপায়, রোদ পানি-খাওয়া মোটা কর্কশ ত্বকের ডাসা লোমগুলো পর্যন্ত জলো শীতল হাওয়ায় খাড়া হয়ে ওঠে— তবু কোমর পরিমাণ পানিতে ডুবে থাকা মাঠ সাফ করে। সযত্নে, স্নেহে সাফ করে যত জঞ্জাল। কিন্তু জঞ্জালের আবার শেষ নেই। কার্তিকের পানি সরে এলেও কচুরিপানা জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে জমিতে। তখন আবার দল বেঁধে লেগে যায় তারা। ভাগ্যকে ঘষে সাফ করবার উপায় নেই, কিন্তু যে-জমি জীবন সে জমিকে জঞ্জালমুক্ত করে ফসলের জন্যে তৈরি করে। তার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রমকে ভয় নেই। এদিকে সূর্য ক্রমশ দূরপথ ভ্রমণে বেরোয়, ঝিমিয়ে আসে তাপ, মেঘশূন্য আকাশের জমাট ঢালা নীলিমার মধ্যে শুকিয়ে ওঠে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। তখন শুরু হয় আরেক দফা পরিশ্রম। রাত নেই দিন নেই হাল দেয়। তারপর ছড়ায় চারা— ছড়াবার সময় না-তাকায় দিগন্তের পানে, না-স্মরণ করে খোদাকে। এবং খোদাকে স্মরণ করে না বলেই হয়তো চারা ছড়ানো জমি শুকিয়ে কঠিন হতে থাকে। রোদ চড়া হয়ে আসে, শূন্য আকাশ বিশাল নগ্নতায় নীল হয়ে জ্বলেপুড়ে মরে। নধর নধর হয়ে ওঠা কচি কচি ধানের ডগার পানে চেয়ে বুক কেঁপে ওঠে তাদের। তারা দল বেঁধে আবার ছোটে। তারপর রাত নেই দিন নেই বিল থেকে কোঁদে কোঁদে পানি তোলে। সামান্য ছুতোয় প্রতিবেশীর মাথায় দা বসাতে যাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না, তাদেরই বুক বিমর্ষ আকাশের তলে কচি-নধর ধান দেখে শঙ্কিত হয়ে ওঠে, মাটির তৃষ্ণায় তাদেরও অন্তর খাঁ খাঁ করে। রাত নেই দিন নেই, কোঁদে করে পানি তোলে— মণ-কে-মণ।

এত শ্রম এত কষ্ট, তবু ভাগ্যের ঠিকঠিকানা নেই। চৈত্রের শেষ দিক বা বৈশাখের শুরু। ধান ওঠে-ওঠে, এমন সময়ে কোনো এক দুপুরে কালো মেঘের সাথে আসে ঝড়, আসে শিলাবৃষ্টি, হয়তো না বলে না কয়ে নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করে দিয়ে যায় মাঠ। কোচবিদ্ধ হয়ে নিহত ছমিরুদ্দিনের রক্তাপুত দেহের পানে চেয়ে আবেদ-জাবেদের মনে দানবীয় উল্লাস হতে পারে, কিন্তু এখন তারা পাথর হয়ে যায়। যার একরত্তি জমিও নেই, তারও চোখ ছলছল করে ওঠে এবং হয়তো তখন খোদাকে স্মরণ করে, হয়তো করে না।



মাঠের প্রান্তে একাকী দাঁড়িয়ে মজিদ দাঁত খেলাল করে আর সে-কথাই ভাবে। কাতারে কাতারে সারবন্দি হয়ে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কাস্তে নিয়ে মজুররা যখন ধান কাটে আর বুক ফাটিয়ে গীত গায় তখনো মজিদ দূরে দাঁড়িয়ে দেখে আর ভাবে। গলার তামার খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বর গুতোয় আর ভাবে। কিসের এত গান, এত আনন্দ? মজিদের চোখ ছোট হয়ে আসে। রহীমার শরীরে তো এদেরই রক্ত, আর তার মতোই এরা তাগড়া গাউগোটা ও প্রশস্ত। রহীমার চোখে ভয় দেখেছে মজিদ। এরা কি ভয় পাবে না? ওদের গান আকাশে ভাসে, ঝিলমিল করতে থাকা ধানের শিষে এদের আকর্ষণ হাসির ঝলক লাগে। ওদের খোদার ভয় নেই। মজিদও চায়, তার গোলা ভরে উঠুক ধানে। কিন্তু সে তো জমিকে ধন মনে করে না, আপন রক্তমাংসের সামিল খেয়াল করে না? শ্যেন দৃষ্টিতে অবশ্যি চেয়ে চেয়ে দেখে ধানকাটা; কিন্তু তাদের মতো লোম-জাগানো পুলক লাগে না তার অন্তরে। হাসি তাদের প্রাণ, এ কথা মজিদের ভালো লাগে না। তাদের গীত ও হাসিও ভালো লাগে না। ঝালরওয়ালা সালু কাপড়ে আবৃত মাজারটিকে তাদের হাসি আর গীত অবজ্ঞা করে যেন।

জমায়েতকে মজিদ বলে, খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা।

শুনে, সালুকাপড়ের ঢাকা রহস্যময়, চিরনীরব মাজারের পাশে তারা স্তব্ধ হয়ে যায়।

মজিদ বলে, মাঠভরা ধান দেখে যাদের মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে তারা ভূত-পূজারী। তারা গুণাগার। জমায়েত মাথা হেঁট করে থাকে!

বতোর দিন ঘুরে আসে, আবার পেরিয়ে যায়। মজিদের জমিজোত বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সম্মানও বাড়ে। গাঁয়ের মাতব্বর ওর কথা ছাড়া কথা কয় না; সলাপরামর্শ, আদেশ-উপদেশ, নছিহতের জন্যে তার কাছেই আসে, চিরনীরব সালু কাপড়ে আবৃত মাজারের মুখপাত্র হিসেবে তার কথা সাগ্রহে শোনে, খরা পড়লে তারই কাছে ছুটে আসে খতম পড়াবার জন্যে। খোদা রিজিক দেনেওয়ালা –এ কথা তারা আজ বোঝে। মাঠের বুকে গান গেয়ে গজব কাটানো যায় না, বোঝে। মজিদও আত্মবিশ্বাস পায়।

মজিদ সাত ছেলের বাপ দুদু মিঞাকে প্রশ্ন করে,

–কলমা জানো মিঞা?

ঘাড় গুজে আধাপাকা মাথা চুলকায় দুদু মিয়া। মুখে লজ্জার হাসি।

গর্জে উঠে মজিদ বলে,

–হাসিও না মিঞা!

খতমত খেয়ে হাসি বন্ধ করে দুদু মিঞা।

সাত ছেলের এক ছেলে সঙ্গে এসেছিলো। সে বাপের অবস্থা দেখে খিলখিল করে হাসে। বাপের মাথা নত করে থাকার ভঙ্গিটা যেন গাধার ভঙ্গির মতো হয়ে উঠেছে। চোখ কিন্তু তার পিটিপিটি করে। বলে,

–আমি গরিব মুরুক্ষু মানুষ।

খোদাকে হয়তো সে জানে। কিন্তু জ্বলন্ত পেটের মধ্যে সব কিছু যেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যায়। ভেতরে গনগনে আগুন, সব উড়ে যায়, পুড়ে যায়। আজ লজ্জায় মাথা নত করে রাখে– গাধার মতো পিঠে-ঘাড় সমান।

এবার খালেক ব্যাপারী ধমকে ওঠে,

–কলমা জানস্ না ব্যাটা?

সে আর মাথা তোলে না। ছেলেটা হাসে।

খালেক ব্যাপারী একটি মন্তব্য দিয়েছে। এরই মধ্যে একপাল ছেলে-মেয়ে জুটে গেছে। ভোরে যখন কলতান করে আমসিপারা পড়ে তখন কখনো মজিদের মনে স্মৃতি জাগে। শৈশবের স্মৃতি– যে দেশ ছেড়ে এসেছে, যে শস্যহীন দেশ তার জন্মস্থান –সেখানে একদা এক মন্তব্যে এই রকম করে সে আমসিপারা পড়তো।

অবশেষে মজিদ আদেশ দেয়।

–ব্যাপারীর মন্তব্যে তুমি কলমা শিখবা। ঘাড় নেড়ে তখনি রাজি হয়ে যায় লোকটি। শেষে মুখ তুলে বোকার মতো বলে,

–গরিব মানুষ, খাইবার পাই না।



লোকটির মাথায় যেন ছিট। যত্রতত্র কারণে-অকারণে না খেতে পাওয়ার কথাটি শোনানো অভ্যাস তার। শুনিয়ে হয়তো মানুষের সমবেদনা আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু লোকে খেতে পায়, পায় না; এতে সমবেদনার কী আছে? প্রশ্ন থাকলে তো সমবেদনা থাকবে। ও কী করে অমন গাধার মতো ঘাড়-পিঠ সমান করতে পারে সে কথা তো কেউ জিজ্ঞেস করে না। দৃশ্যটি অবশ্য উপভোগ করে।

মজিদের পক্ষ থেকে খালেক ব্যাপারী ধমকে বলে,

—হইছে হইছে, ভাগ্।

একদিন ধাড়িধাড়ি ছেলে কয়েকটি পাকড়াও করে মজিদ।

—কীরে ব্যাটা, খৎনা হইছে?

একটি ছেলে আরেকটিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে,

—অর অয় নাই।

সে রেগে বলে, —অরও অয় নাই।

শুনে আগুন হয়ে যায় মজিদ। বলে, পরশুদিন জুম্মাবার, সেদিন যদি দুজনেরই একসাথে খৎনা না হয় তবে মুশ্কিল হবে।

একবার একটি ছেলে বলে,

—হেই কবে আমার খৎনা হইছে।

তারপর বাপও মাথা নেড়ে সায় দেয়,

—ছোট থাকতেই খৎনা দিছি। মিছা কথা না হুজুর।

কিন্তু মজিদ বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছে, ছেলেটির খৎনা হয়নি। গর্জন করে উঠে বলে,

—তোল্ লুঙ্গি?

বাপ আবার বলে, খোদার কসম, ওর খৎনা হইছে। কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে মজিদ বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে ধাঁ করে তুলে ফেলে তার লুঙ্গি। ছেলেটি পালাবার উপক্রম করছিলো, থাবা দিয়ে তার ঘাড় ধরে ফেলে মজিদ। বাপও পালাই পালাই করছিলো, কিন্তু কীভাবে পালায় ভেবে না পেয়ে ওখানেই বোকার মতো চোখ মেলে বসে থাকে। খানিকক্ষণ বাপ-পুতকে একসঙ্গে গালাগাল করে ছেলেটিকে ধরে নিয়ে এসে মজিদ নিজের বাইরের ঘরে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। বলে,

—আইজ নামাজের পর আমিই তোর খৎনা দিমু।

দাড়িগোঁফ ওঠা মন্দের মতো ছেলে ঠির ঠির করে কাঁপতে থাকে। বাপের মুখে রা নেই। শুকিয়ে সে-মুখ আমসি হয়ে গেছে।

সারাটি দুপুর কোরবানীর ছাগলের মতো খুঁটিবন্দি হয়ে থাকে ছেলেটি। আছরের নামাজের পর মজিদ ছুরি-তেনা নিয়ে আসতেই সে তারস্বরে আত্ননাদ করে উঠে কান্না জুড়ে দেয়। দেখে বাপের আর সয় না, সেও হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে।

বাইরে লোক জমে গিয়েছিল। খালেক ব্যাপারীও এসেছিলো ব্যাপার দেখতে। তারা ধমকাতে থাকে বাপকে।

দাঁত কড়মড় করে মজিদের। মাঠে শয়তানের মতো গান যখন ধরে, তখন খোদার কথা আর মনে হয় না? বুড়ো ধামড়া ছেলে, খৎনা হয়নি। ভাবতেও কেমন লাগে। তওবা, তওবা! ব্যাপারীকে শুনিয়ে মজিদ বলে,

—আপনাগো দেশটা বড় জাহেলের দেশ।

ছেলের কান্না থামে না। মজিদ যখন বাঁশের কঞ্চি ছিলছে তখন সে আরেকবার তারস্বরে আত্ননাদ করে উঠে বলে,

—আমার বাপেরও খৎনা অয় নাই— তাঁনারে আগে দেন।

মজিদ বিস্ময়ে হতভম্ব। খালেক ব্যাপারীর পানে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত নিম্পলক হয়ে থাকে, মুখে ভাষা জোগায় না। লজ্জায় ব্যাপারীর কান পর্যন্ত লাল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে দু-দুটো খৎনা হয়ে গেলো। ব্যাপারটা ঠিক হাটবাজারের মধ্যে যেন হলো। কারণ বাপ-বেটাকে ধরবার জন্যে লোকের প্রয়োজন ছিলো বলে, এবং এসব দৃশ্য না দেখে থাকা যায় না বলে ঘরটায় ভিড় জমে গিয়েছিলো। শুধু তাই নয়, পেছনে বেড়ার ফুটো দিয়ে দেখলো পাড়ার যত মেয়েরা— ছুকড়ি, জোয়ান, বুড়ি। রহীমা পর্যন্ত না দেখে পারলো না। স্বামীর কীর্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা চোখে অন্য মেয়েদের সঙ্গে সেও মুখে আঁচল দিয়ে খানিকটা হাসলো।



সে-রাতে দোয়া-দরুদ সেরে মাজারঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাঁ পাশের খোলা মাঠের পানে তাকিয়ে মজিদ কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দিগন্ত-বিস্তৃত হয়ে যে মাঠ দূরে আবছাভাবে মিলিয়ে গেছে সেখান থেকে তারার রাজ্য। ওধারে গ্রামে নিস্তন্ধ। দু-একটা পাড়ায় কেবল কুত্তা ঘেউ ঘেউ করে।

নীরবতার মধ্যে হঠাৎ মজিদ একটা শক্তি বোধ করে অন্তরে। মন্ত্রবতনগর গ্রামে সে শক্তির শিকড় গেড়েছে। আর সে-শক্তি শাখাপ্রশাখা মেলে সারা গ্রামকে আচ্ছন্ন করে লোকদের জীবনকে জড়িয়ে ধরেছে সবলভাবে। প্রতিপত্তিশালী খালেক ব্যাপারী আছে বটে, কিন্তু তার শক্তিতে আর মজিদের শক্তিতে প্রভেদ আছে। আজ অপরাহ্নে যে-দুটি লোককে মজিদ কষ্ট দিয়েছে তারা নির্ভেজাল কষ্টই পেয়েছে। সে-কষ্ট পাওয়ার পেছনে ক্রোধ নেই, দ্বেষ নেই। আজ সেই লোকদেরই খালেক ব্যাপারী চাবুক মারুক, প্রতিপত্তির ভয়ে তারা মুখে রা না-করলেও অন্তরে ঘনিয়ে উঠবে দ্বেষ, প্রতিহিংসার আগুন। মজিদের শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ঐ সালু কাপড়ে আবৃত মাজার থেকে। মাজারটি তার শক্তির মূল।

মজিদের সে-শক্তি প্রতিফলিত হয় রহীমার ওপর। মেয়েমানুষরা আসে তার কাছে। এ-গ্রামেরই মেয়ে রহীমা। ছোটবেলায় নাকে নোলক পরে হলদে শাড়ি পৈঁচিয়ে পরে ছুটোছুটি করতো- সবার মনে সে-ছবি এখনো স্পষ্ট। প্রথম বিয়ের সময় তারা তাকে দেখেছে, স্বামীর মৃত্যুর পরও তাকে দেখেছে। কিন্তু ওরাই আজ এসে চেনে না। কথা কয় অন্যভাবে, গলা নরম করে সুপারিশের জন্যে ধরে। খিড়কির দরজা দিয়ে আসে তারা, এসে সন্তর্পণে কথা কয়। কাঁদলেও চেপে চেপে কাঁদে। বাইরে মাজার যেমন রহস্যময় তাদের কাছে, মজিদও তেমনি রহস্যময়।

মজিদ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যোগসূত্র হচ্ছে রহীমা। রহীমা শোনে তাদের কথা। কখনো হৃদয় গলে আসে অপরের দুঃখের কথা শুনে, কখনো ছলছল করে ওঠে চোখ। গভীর রাতে কখনো মাজারের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে মাছের পিঠের মতো স্তব্ধ, বিচিত্র সেই মাজারের পানে। মাথায় কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা, দেহ নিশ্চল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘোর লাগে, চোখ অবশ হয়ে আসে, মহাশক্তির কাছে পাছে কোনো বেয়াদবি করে বসে সে-ভয়ে বুক কঁপে ওঠে কখনো। তবু মুহূর্তের পর মুহূর্ত মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে, কোন মারুফ ওখানে ঘুমিয়ে আছেন- যার রুহ এখনো মানুষের দুঃখ যাতনায় কাঁদে, তাদের মঙ্গলের জন্যে আকুল হয়ে থাকে সদাসর্বদা?

কখনো কখনো অতি সঙ্গোপনে রহীমা একটা আর্জি জানায়। বলে, তার সন্তান নেই; সন্তানশূন্য কোলটি খাঁ-খাঁ করে। তিনি তাকে যেন একটি সন্তান দেন। আর্জি জানায় চোখের আকুলতায়, এদিকে ঠোঁট পর্যন্ত কাঁপে না। অতি গোপন মনের কথা শিশুর সরলতায়, সালু কাপড়ে ঢাকা রহস্যময় মাজারের পানে চেয়ে বলে- না হয় লজ্জা, না হয় দ্বিধা। একদিন হঠাৎ এ সময় দমকা হাওয়া ছোট্টে, জঙ্গলের যে-কটা গাছ আজো অতর্কিত অবস্থায় বিরাজমান তাতে আচমকা গোঙানি ধরে। হাওয়া এসে এখানে সালুকাপড়ের প্রান্ত নাড়ে; কঁপে ওঠা মোমবাতির আলোয় বলমল করে ওঠে রূপালি ঝালর। রহীমাও কঁপে ওঠে, কী একটা মহাভয় তার রক্ত শীতল করে দেয়। মনে হয়, কে যেন কথা কইবে, আকাশের মহা-তমিস্রার বুক থেকে বিচিত্র এক কণ্ঠ সহসা জেগে উঠবে। আবার স্থির হয়ে যায়, মোমবাতির শিখাও নিষ্কম্প, স্থির হয়ে ওঠে। ওপরে আকাশভরা তারা তেমনি নীরব।

কোনোদিন রহীমা সারা মানবজাতির জন্যে দোয়া করে। ও-পাড়ার ছনুর বাপ মরণরোগে যন্ত্রণা পাচ্ছে, তাকে শান্তি দাও। খেতানির মা পক্ষাঘাতে কষ্ট পাচ্ছে- তার ওপর করুণা করো। যারা একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে ভাতে কষ্ট পাচ্ছে তাদের ওপরও করুণা করো, রহমত করো। চার গ্রাম পরে বড় নদী। ক-দিন আগে সে-নদীতে ঝড়ের মুখে ডুবে মারা গেছে ক-টি লোক। তাদের কথা স্মরণ করে বলে, ঘরে স্ত্রী-পুত্র রেখে নৌকা নিয়ে যারা নদীতে যায় তাদের ওপর যেন তোমার রহমত হয়।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অবজ্ঞা- অমর্যাদা, বিদ্রূপ। **অব্যক্ত**- অপ্রকাশিত। **অশ্রুসজলকৃতজ্ঞতা**- চোখের পানিতে ভেজা কৃতজ্ঞতা, গভীর কৃতজ্ঞতা। **অশীতিপর**- আশি বছরেরও বেশি বয়সের। **আকাশ বিশাল নগ্নতায় জলেপুড়ে মরে**- মেঘ বৃষ্টি হীন নীল আকাশকে লেখক এ উপমায় চিত্রিত করেছেন। **আত্মমর্যাদার ভূয়োবাণী উচিয়ে রাখবার জন্য**- গ্রামে জমিজমার অধিকারের সঙ্গে মর্যাদার সম্পর্ক অত্যন্ত বেশি। তাই জমির প্রতি টান ও জমিকে ধরে রাখার জন্য প্রাণপাত করতেও তাদের দ্বিধা নেই। জমির অধিকারের এ আত্মমর্যাদাকে ঔপন্যাসিক ‘বাণী’ বা পতাকার সঙ্গে তুলনা করেছেন। নিজের ভূখণ্ডে পতাকা উচিয়ে রাখার মতো এটা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। তবে এ আত্মমর্যাদার মধ্যে কিছুটা প্রবঞ্চনাও আছে। তাই লেখক এটাকে ‘ভূয়ো’ বা নিরর্থক বলেছেন।



আনপড়াহ- যাদের কোন পড়াশোনা নেই। আবছা আবছা- অস্পষ্ট। যা পরিস্কারভাবে দেখা যায় না। আমসিপারা- আরবি বর্ণমালা এর উচ্চারণ সংবলিত সুরা সংকলন। কুরআন শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ। আর্জি- আবেদন, অভিযোগ। ইদানীং- আজকাল, সম্প্রতি। উৎকর্ষ- সজাগ। কলতান করে- উচ্চস্বরে এক সঙ্গে সুর মিলিয়ে। কলমা- মূল শব্দ আরবি ‘কলমহ’। শব্দ, উক্তি, বাণী, মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস পরিজ্ঞাপক উক্তি-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদ রসুলুল্লাহ - আল্লাহ ভিন্ন আর কোন উপাস্য নাই; মুহম্মদ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। কবর আজাব- কবরে শাস্তি। খোদা তালার রহস্যময় দিগন্ত তার অন্তরে যেন বিদ্যুতের মত থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে- মজিদের কুরআন তেলায়াতের ফলে এবং মাজারের রহস্যময় পরিবেশে তার প্রভাব পড়ার আলোকে মজিদের যুবতী স্ত্রী রহীমার মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়। রহীমার মনের এ প্রতিক্রিয়াকে ঔপন্যাসিক বিদ্যুতের আলোর ঝলকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। খরাপড়া- অনাবৃষ্টি দেখা দেয়া। খতম পড়বার জন্য- গ্রামে যখন অনাবৃষ্টি বা কোনো বিপদ আপদ দেখা দেয় ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা পবিত্র কুরআন পড়বার ব্যবস্থা করে। কুরআনের ৩০ অধ্যায় পড়ে শেষ করাকে কোরান খতম করা বলে। এর মধ্যে যে মঙ্গল ও কল্যাণ বয়ে আসবে এটাই ধর্মপ্রাণ মানুষের বিশ্বাস। গাউগোটা- শক্ত বাঁধুনিতে গড়া শরীর। গুণাহ- পাপ (ফারসি শব্দ)। গৌয়ার- এক রোখা স্বভাবের। গোছা- রাগ (ফারসি শব্দ)। ঘনায়মান- যা চোখের সামনে ঘনিয়ে আসছে। ঘাড়গুঁজে- হাঁটুর ভেতর ঘাড় ঢুকিয়ে বসা। চিকনাই- উজ্জ্বলতা, সতেজভাব। ছাপিয়ে ওঠা- ভরে ওঠে। জমায়েতের- সমাবেশের, সভার। জ্বলন্ত পেট- ক্ষুধার্ত পেট। জাহেল (আরবি শব্দ)- মূর্খ। জোয়ান মন্দ- যুবক ছেলে। ঠির ঠির করে- ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। তাল পায় না- কোনো কূল কিনারা পায় না, হৃদিস পায় না। তাগড়া-তাগড়া- মোটা তাজা, শক্তিশালী। তারস্বরে- তীব্র শব্দে। দম খিঁচে- নিশ্বাস বন্ধ করে। দলাগুলো- মাটির ঢেলা। দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কাস্তে- সরু চিকন কাস্তে। ধামড়া- বয়স্ক। ধাড়িধাড়ি ছেলে- বয়স্ক ছেলে। ধা করে- হঠাৎ করে তীব্র গতিতে। নছিহত- উপদেশ। নজর- দৃষ্টি, মনোযোগ। নির্নিমেষ চোখে- এক দৃষ্টিতে, চোখের পলক না ফেলে তাকানো। পক্ষপাতি- চমকপ্রদ কোনো ঘটনা অত্যন্ত সহজেই গ্রামের সাধারণ লোকদের আকর্ষণ করে। তাই লেখক কিছুটা ব্যঙ্গ করেই বলেছেন গ্রামের লোকেরা নাটকের পক্ষপাতি। প্রশস্ত ব্যাপ্ত যৌবনা- যার যৌবন উপচে পড়ছে। পাথর হয়ে যায়- নির্বাক ও স্তব্ধ হয়ে যায়। বতোর দিনে- ধান কাটার মৌসুমের দিনে। ‘বতর’ শব্দটি কুমিল্লা, রাজশাহী ও খুলনা অঞ্চলে ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ। বে-এলেম- বিদ্যাহীন, লেখাপড়া না জানা। বেওয়া- সন্তানহীনা বিধবা। বেশরম- নির্লজ্জ। বেগানা- বেগায়ের- অনাত্মীয়, অপরিচিত। বৃত পূজারী- মূর্তি পূজক। সিপাইর খণ্ডিত- ছিন্ন দেহের একতাল অর্থহীন। মগরা মগরা ধান- মগরা শব্দটি আঞ্চলিক। এখানে ভরে ভরে বা প্রচুর ধান ওঠার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দ- বয়স্ক পুরুষ। ‘মরদ’ শব্দ থেকে এ আরবি শব্দটি এসেছে। মর্মস্তদ কান্না- মর্মভেদকারী কান্না, যে কান্না হৃদয় স্পর্শ করে। মহাতমিষ্টা- ঘোর অন্ধকার। মাংসের মতো- ঔপন্যাসিক জমির ঢেলা ঢেলা মাটির খণ্ডকে অত্যন্ত অর্থপূর্ণভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের টুকরো টুকরো একত্রিত মাংসখণ্ডের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ এ মাটির ঢেলার জন্যও যুদ্ধ হয়, হানাহানি হয়, প্রাণপাত হয়। মাথায় ছিট- মাথা খারাপ। মুখে রা নেই- নিঃশব্দ, নির্বাক। যত্রতত্র- যেখানে সেখানে। যে খেলা খেলতে যাচ্ছে- এখানে ‘খেলা’ শব্দের অর্থ এক ধরনের প্রতারণা, মিথ্যা ছল-চাতুরি। রিজিক দেনেওয়ালা- খাদ্য যোগানদানকারী। রুঠা জমি- নিষ্ফলা জমি। শক্তিমত্তা- প্রচণ্ড শক্তি, গায়ের জোর। শীর্ণ- চিকন, সরু। সন্নিবিষ্ট- সঙ্গে লাগানো, সন্নিহিত। অনুর্বর জমি। হাড় চওড়া- শক্ত দেহের বাঁধন। সাচা- পরিস্কার। হাল্লাহেনার মিষ্ট মধুর গন্ধ ছড়ায়- মজিদের সুরেলা কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে মিষ্টি মধুর সুরের হাওয়া বইছিল লেখক তাকে যথার্থভাবে হাল্লাহেনা ফুলের স্নিগ্ধ খুশবুর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

বাগধারা

মাথা হেঁট হওয়া- সম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়া। চোখে আগুন- প্রচণ্ড রাগ। চড়াই উতরাই ভাব- বিক্ষিপ্ত মনোভাব। আকাশে ভাসে- দূরে ছড়িয়ে পড়ে।



সারসংক্ষেপ

মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশ করে মজিদ গ্রামের সবাইকে চমক লাগিয়ে দেয়। সে এসেই ধর্মে অবহেলার জন্য তাদের গালাগাল করে। গ্রামবাসী মজিদের তিরস্কারে বিমূঢ় ও স্তব্ধ হয়ে যায়। তারা গ্রামের একটু বাইরে পুকুরপাড়ের একটা বড়ো বাঁশঝাড়ের কাছে একটা প্রাচীন পরিত্যক্ত শেওলাধরা কবর দেখেছে বটে, তবে এটা যে কোনো পীরের কবর হতে পারে তা তারা কোনোদিন ভাবেনি। অচেনা মৌলবী মজিদ এসেই প্রথম জানালো যে এটা মোদাচ্ছের পীরের কবর। মজিদ



জানায় সে ময়মনসিংহের মধুপুরের গারো পাহাড়ে ভালোই ছিল। কিন্তু এতসুখ শান্তি ফেলে সে চলে এসেছে, কারণ- এক রাতে সে স্বপ্ন দেখেছে মোদাচ্ছের পীর তাকে ডাকছেন। সে ডাকেই সে এখানে এসেছে। মজিদ মহব্বত নগরে এসেই বুঝে নিয়েছে এ অঞ্চল শস্যশ্যামল, অফুরন্ত সম্ভাবনা আছে এখানে। কিন্তু লোকজন ধর্মকর্মের প্রতি অত মনোযোগী নয়। সুতরাং ওখানেই তাকে ঘা দিতে হবে। গ্রামের লোকজনের চোখে পানি দেখে সে বুঝেছে তার ওষুধ ধরেছে। দেখতে না দেখতে দীর্ঘদিনের জঙ্গল সাফ হয়ে গেল। সেই অজ্ঞাত-অখ্যাত জীর্ণ কবর ঝালরওয়ালা লালসালুতে আচ্ছাদিত হয়ে নতুন হয়ে ওঠে। কবরের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আশপাশের গ্রাম থেকেও লোকজন আসতে লাগল। এতে মজিদের কবর-বাণিজ্য আন্তে আন্তে চাপা হয়ে উঠল। মজিদের ঘর হলো, গৃহস্থালী হলো। মজিদ নিজের অবস্থানকে সুসংহত করে নেয়। তারপর যৌবনদীপ্ত গ্রাম্য তরুণী রহীমাকে বিয়ে করে। মজিদ তাকে খোদার ভয় দেখিয়ে তার মনে প্রভাব বিস্তার করে। মজিদ দেখে গ্রামের লোকগুলো রহীমার মতোই। তাদের মধ্যে খোদার ভয় কম। জমি ছাড়া তারা কিছু চেনে না। খরার সময় জমি শুকিয়ে যায়। খরার পর, পানি সেচার ফলে যখন প্রচুর ধান জন্মে, গ্রামের মানুষ তখন হাসতে হাসতে গান গাইতে গাইতে ধান কাটতে যায়। এ দৃশ্য দেখে মজিদের ভালো লাগে না। তার চোখে ভেসে ওঠে ‘লালসালু’তে ঢাকা কবর। কারণ এটাই তার প্রধান সম্পদ। মজিদ গ্রামের লোকদের বলে ফসলের মাঠে ধান দেখে যারা ভক্তি শ্রদ্ধায় নত হয়। তারা মূলত মূর্তি পূজক। তার কথায় কাজ হয়। গ্রামের ধর্মভীরু নিরীহ মানুষগুলো লালসালু আবৃত কবরের কাছে ফিরে আসে। সে আত্মবিশ্বাস খুঁজে পায়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯. মজিদের পূর্বের আবাস কোথায় ছিল?

ক. গারো পাহাড়	খ. খাসিয়া পাহাড়
গ. ময়মনসিংহে	ঘ. মধুপুরে

১০. গভীর রাতে মাজারের সামনে রহীমার বুক কেঁপে উঠে কেন?

ক. মজিদের ভয়ে	খ. মাজারের ভয়ে
গ. মহাশক্তির ভয়ে	ঘ. মানুষের ভয়ে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

ভক্তিবাদের জোয়ার এদেশে প্রবল। তাই এখানে পীর, দরবেশ, ফকির, সন্ন্যাসীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আর এইসব ফকির, সন্ন্যাসীদের প্রতি সাধারণ মানুষের অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস বিশেষভাবে দৃষ্টি কাড়ে।

১১. উদ্দীপকের কোন দিকটির সঙ্গে ‘লালসালু’ উপন্যাসের মিল রয়েছে?

ক. পীর, দরবেশের প্রতি বিশ্বাস	খ. পীর, দরবেশের প্রতি অবিশ্বাস
গ. পীরপূজা, মাজারে অবিশ্বাস	ঘ. পীরপূজা, মাজারে বিশ্বাস

১২. এরূপ সাদৃশ্যের পেছনে যে কারণ, তা হচ্ছে—

- পীর-দরবেশের প্রভাব
 - পীর-দরবেশের প্রতি অগাধ আস্থা
 - অশিক্ষা ও কুসংস্কার
- নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৪



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- হাসুনির মা ও তার বাবা-মায়ের জীবন সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- হাসুনির মা-বাবাকে ঘিরে মজিদের ভূমিকা ও অবস্থান সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- তাহের বাপের নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

অনেক সময় অদ্ভুত আর্জি নিয়ে মেয়েলোকেরা আসে রহীমার কাছে। যেমন আসে ধান-ভাননি হাসুনির মা। বহুদিন আগে নিরাকপড়া এক শ্রাবণের দুপুরে মাছ ধরতে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর যারা প্রথম মজিদকে দেখেছিলো, সেই তাহের আর কাদেরের বোন হাসুনির মা। সে এসে বলে,

-আমার এক আর্জি।

এমন এক ভঙ্গিতে বলে যে রহীমার হাসি পায়। কিন্তু মনে মনেই হাসে, গম্ভীর হয়ে থাকে বাইরে। হাসুনির মা বলে,

-আমার আর্জি- ওনারে কইবেন, আমার যেন মওত হয়।

এবার ঈষৎ হেসে রহীমা বলে;

-ক্যান গো বিটি?

-জ্বালা আর সইহ্য হয় না বুবু। আল্লায় যেন আমারে সত্ত্বর দুনিয়া থিকা লইয়া যায়।

সকৌতুকে রহীমা প্রশ্ন করে,

-তোমার হাসুনির কী হইব তুমি মরলে?

সেদিকে তার ভাবনা নেই। আপনা থেকেই যেন উত্তর যোগায় মুখে।

-তুমি নিবা বুবু। তোমারই হাতে সোপর্দ কইরা আমি খালাস হমু। রহীমা হাসে। হাতে কাঁথার কাজ। হাসে আর মাথা নত করে কাঁথা সেলাই করে।

একদিন হাসুনির মা এসে বলে,

-আমার এক আর্জি বুবু।

-কও?

ওনারে কইবেন- বুড়াবুড়ি দুইগারে যানি দুনিয়ার থন লইয়া যায় খোদাতা'লা।

কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ তুলে চেয়ে রহীমা প্রশ্ন করে,

-ওইটা আবার কেমন কথা হইল?

-হ, খাঁটি কথা কইলাম বুবু। দুইটার লাঠালাঠি চুলাচুলি আর ভাল্ লাগে না।

বুড়ো বাপ তার ঢেঙা দীর্ঘ মানুষ; মা ছোটখাটো, কুঁকড়ানো। কিন্তু দুজনের মুখে বিষ; ঝগড়া-ফ্যাসাদ লেগেই আছে। তবে এক-একদিন এমন লাগা লাগে যে, খুনাখুনি হবার জোগাড়। ঢেঙা লোকটি তেড়ে আসে বারবার, ঘুণ-ধরা হাড় কড়কড় করে। বুড়ি ওদিকে নড়েচড়ে না। এক জায়গায় বসে থেকে মাথা ঝাঁপিয়ে-ঝাঁপিয়ে রাজ্যের গালাগাল জুড়ে দেয়। গালাগাল দিয়ে বুড়োকে যখন বিন্দুমাত্র ঘায়েল করতে পারে না তখন শেষ অস্ত্র হানে।

-ওরে মরার ব্যাটা, তুই কী ভাবছস? ভাবছস বুঝি পোলাগুলি তোর জন্নোর? আল্লা সাক্ষী- হেগুলি তোর জন্নোর না, তোর জন্নোর না!

শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে, আর আঁচলে মুখ লুকিয়ে হাসে।



তাহের-কাদের আর কনিষ্ঠ ভাই রতন-তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা থাকলেও তা আবার স্বার্থের ঘোরে ঢাকা। সামান্য হলেও বাপের জমি আছে, ঘর আছে, লাঙল-গরু আছে। তার দিনও ঘনিয়ে এসেছে- আর বর্ষায় টেকে কিনা সন্দেহ। তারা চুপ করে শোনে।

অন্ধ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো বাপ এগিয়ে আসে। ছেলেদের পানে চেয়ে বলে,

-হুনছস্ কথা, হুনছস্?

ছেলেরা সমস্বরে বলে,

-ঠ্যাঙা বেটিরে, ঠ্যাঙা।

সমর্থন পেয়ে বুড়ো চেলা নিয়ে দৌড়ে আসে। তাহের শেষে জমিজোতের মায়া ছেড়ে বাপের হাত ধরে ফেলে। কাদের বোঝায়,

-থাক, কইবার দেও। খোদাই তার শাস্তি করবো।

জন্মের কথা নিয়ে মায়ের উক্তি শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে, কিন্তু পরে বুকে যন্ত্রণা হয়। তাই রহীমাকে এসে বলে কথাটা।

-হয় বুড়াবুড়ি দুইটাই মরুক- নয় ওনারে কন, এর একটা বিহিত করবার। হঠাৎ সমবেদনায় রহীমার চোখ ছল ছল করে ওঠে। বলে,

-তুমি দুঃখ করিও না বিটি। আমি কমুনে।

মেয়েটাকে তার ভালোই লাগে। দুঃস্থা মেয়ে। স্বামীর মারা যাবার পর থেকে বাপের বাড়িতে আছে। বাড়িতে তিনতিনটে মর্দ ছেলে, বসে-বসে খায়। এক মুঠোর মতো যে-জমি, সে-জমিতে ওদের পেট ভরে না। তাই টানাটানি, আধ-পেটা খেয়ে দিন গুজরান। বসে বসে অল্প ধ্বংস করতে লজ্জা লাগে হাসুনির মায়ের। সে তো একা নয়, তার হাসুনিও আছে। তাই বাড়িতে-বাড়িতে ধান ভানে। কিন্তু কিছু একটা মুখ ফুটে চাইতে আবার লজ্জায় মরে যায়।

রহীমা বলে,

শুগুর বাড়িতে যাওনা ক্যান?

-অরা মনুষ্য না।

-নিকা কর না ক্যান?

কয়েক মুহূর্ত থেমে হাসুনির মা বলে, দিলে চায় না বুবু।

জীবনে তার আর সখ নেই। তবে গাঁয়ের আর মানুষের রক্ত তারও দেহে বয় বলে মাঠ ভরে ধান ফললে অন্তরে তার রঙ ধরে। বতোর দিনে বাড়ি-বাড়ি কাজ করে হাসুনির মায়ের ক্লান্তি নেই। মুখে বরঞ্চ চিকনাই-ই দেখা দেয়। এমনি কোনো দিনে তাহের খোশ মেজাজে বলে,

-শরীলে রঙ ধরছে ক্যান, নিকা করবি নাকি?

বুড়ি আমের আঁটির মতো মুখটা বাড়িয়ে বলে,

-খানকির বেটি নিকা করবো বলাই তো মানুষটারে খাইছে!

মানুষটা মানে তার মৃত স্বামী। তাহের কৌতুক বোধ করে। বলে, ক্যামনে খাইছস্?

হাসুনির মায়ের অন্তর তখন খুশিতে টলমল। কথা গায়ে মাখে না। হেসে বলে- গিলা খাইছি! মা-বুড়ি আছে সামনে, নইলে গিলে খাওয়ার ভঙ্গিটাও একবার দেখিয়ে দিতো।

দূরে ধানক্ষেতে ঝড় ওঠে, বন্যা আসে পথভোলা অন্ধ হাওয়ায়, দিগন্ত থেকে গড়িয়ে-গড়িয়ে আসে অফুরন্ত ঢেউ। ধানক্ষেতের তাজা রঙে হাসুনির মায়ের মনে পুলক জাগে। আপন মনকেই ঠাট্টা করে বারবার শুধায়; নিকা করবি মাগি, নিকা করবি?

কিন্তু কাকে করে? ওই বাড়ির মানুষকে পেলে করে কি? তেল-চকচকে জোয়ান কালো ছেলে। গলা ছেড়ে যখন গান ধরে তখন ধানের ক্ষেতে যেন ঢেউ ওঠে।

পরদিন তাহেরের বুড়ো বাপকে মজিদ ডেকে পাঠায়। এলে বলে, -তোমার বিবি কী কয়?

বুড়ো ইতস্তত করে, ঘাড় চুলকে এধার-ওধার চেয়ে আমতা-আমতা করে। মজিদ ধমকে ওঠে।



—কও না ক্যান?

ধমক খেয়ে ঢোক গিলে বুড়ো বলে,

—তা হুজুর ঘরের কথা আপনারে ক্যামনে কই?

কতক্ষণ চুপ থেকে মজিদ ভারি গলায় বলে,

—আমি জানি কী কয়। কিন্তু তুমি কেমন মন্দ, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শোনো হেই কথা?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে এ-কথা ঠিক নয়। তখন রাগে সে চোখে অন্ধকার দেখে, চেলা কাঠ নিয়ে ছুটে যায় বুড়িকে শেষ করবার জন্য। এর মধ্যে একদিন হয়তো সে শেষই হয়ে যেতো— যদি না ছেলেরা এসে বাধা দিতো। কিন্তু সে-কথাও বলতে পারে না মজিদের সামনে। কেবল আন্তে বলে,

—বুড়ির দেমাক খারাপ হইছে হুজুর। আপনে যদি দোয়া পানি দ্যান—

আবার কতকক্ষণ নীরব থেকে মজিদ বলে,

—বিবিরে কইয়া দিও, অমন কথা যদি আর কোনো দিন কয় তাইলে মছিবৎ হইব।

মাথা নেড়ে বুড়ো চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। কয়েক পা গিয়ে থামে, থেমে মাথা চুলকে বলে,

—হুজুর, কোথিকা হুনলেন বেটির কথা?

—তা দিয়া তোমার দরকার কী? কিন্তু এই কথা জাইনো— কোনো কথা আমার অজানা থাকে না।

সারাপথ ভাবে বুড়ো। কে বললো কথাটা? বাড়ির গায়ে আর কোনো বাড়ি নেই যে, কেউ আড়ি পেতে শুনবে।

এককালে বুড়ো বুদ্ধিমান লোকই ছিলো। সারাজীবন দুষ্ট প্রকৃতির বৈমাত্র্যে এক ভাই-এর সাথে জায়গাজমি-সম্পত্তি নিয়ে মারামারি মামলা মকদ্দমা করে আজ সব দিক দিয়ে সে নিঃস্ব। জায়গাজমির মধ্যে আছে একমুঠো পরিমাণ জমি— যা দিয়ে একজনেরই পেট ভরে না। আর এদিকে পেয়েছে খিটখিটে মেজাজ। সবাইকে দুচোখের বিষ মনে হয়। বুড়িটার হয়তো তার ছোঁয়াচ লেগেই অমন হয়েছে। নইলে বহুদিন আগে যৌবনে কেমন হাসিখুশি ছটফটে মেয়ে ছিলো সে। স্থির থাকতো না এক মুহূর্ত, নাচতো কেবল নাচতো, আর খই-এর মতো কথা ফুটতো মুখ দিয়ে আজ তার সুন্দর দেহমন পচে গিয়ে এই হাল হয়েছে।

বুড়ি যে ছেলেরদের জন্ম নিয়ে কথাটা বলতে শুরু করেছে তা বেশিদিন নয়। সাধারণ গালাগালি দিয়ে আর স্বাদ হয় না; তাই এমন এক কথা বের করেছে যা বুড়োর আত্মায় গিয়ে খচ করে ধরে। কথাটা মিথ্যা জেনেও প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে ওঠে অন্তরটা।

বুড়ো ভাবে, ছেলেরা বলতে পারে না কথাটা। সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। তবে কী হাসুনির মা বলেছে? তার তো ও বাড়িতে যাতায়াত আছে।

একটা বিষয়ে কিন্তু গোলমাল নেই তার মনে। অন্তরের শক্তিতে মজিদ ব্যাপারটা জানতে পেরেছে সে কথা সে বিশ্বাস করে না।

যত ভাবে কথাটা, তত জ্বলে ওঠে বুড়ো। যে বলেছে সে কি কথাটার গুরুত্ব বোঝে না? কথাটা কি বাইরে ছড়াবার মতো? এর বিহিত ঘরেই হয়, বাইরে হয় না— তা যতই আলেম-খোদাবন্দ মানুষ তার বিহিত করতে আসুক না কেন। তাছাড়া, কথাটায় যে বিন্দু মাত্র সত্য নেই কে বলতে পারে। এককালে বুড়ি উডুনি মেয়ে ছিলো, তার হাসি আর নাচন দেখে পাগল হতো কত লোক। বৈমাত্র্যে ভাইটির সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদের শুরুতে একবার একটা লোক ঘরে ঢোকান জনরব উঠেছিলো। একদিন তার অনুপস্থিতিতে সে-কাণ্ডটি নাকি ঘটেছিলো। কিন্তু ঘরের বউ অনেক ঠ্যাঙানি খেয়েও কথাটা যখন স্বীকার করেনি তখন সে বিশ্বাস করে নিয়েছিলো যে, তা দুষ্ট প্রকৃতির বৈমাত্র্যে ভাইটির সৃষ্টি ছাড়া কিছু নয়।

অন্দরে ঢুকেই সামনে দেখলে হাসুনির মাকে। দেখেই চড় চড় করে মেজাজ গরম হয়ে ওঠে, ঘূর্ণি খেয়ে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়। বকের মতো গলা বাড়িয়ে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে এক আছাড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর শুরু হয় প্রহার। প্রহার করতে করতে বুড়োর মুখে ফেনা ছুটে যায়। আর বলে কেবল একটি কথা— ওরে ভাতার খাইকা জারুনি, তোর বাপরে গিয়া কইলি ক্যামনে ওই কথা?

প্রাণের আশ মিটিয়ে বুড়ো তার মেয়েকে মারে। ছেলেরা তখন ঘরে ছিলো না বলে তাকে রক্ষা করবার কেউ ছিলো না। বুড়ি অবশ্য ওধারে পা ছড়িয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বিলাপ জুড়ে দেয়, কিন্তু বিলাপ শুনে দমবার পাত্র বুড়ো নয়।



সেদিন দুপুরে মুখে আঘাতের চিহ্ন ও সারা দেহে ব্যথা নিয়ে চুপি-চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে হাসুনির মা সোজা চলে গেলো মজিদের বাড়ি। মজিদ তখন জিরুচ্ছে, আর, সে-ঘরেই নিচে পাটিতে বসে রহীমা কাঁথায় শেষ কটা ফোঁড় দিচ্ছে।

হাসুনির মা মজিদের সামনে আসে না। কিন্তু আজ সটান ঘরে ঢুকে তার সামনেই রহীমার পাশে বসে মরাকান্না জুড়ে দিলো। প্রথমে কিছু বোঝা গেলো না। কথা স্পষ্টতর হয়ে এলে এটুকু বোঝা গেলো যে, সে রহীমাকে বলেছে; ওনারে কন্, আমার মওতের জন্য যানি দোয়া করে।

মজিদ হুকা টানে আর চেয়ে-চেয়ে দেখে। ক্রন্দনরতা মেয়ে তার ভালোই লাগে। কথায় কথায় ঠোঁট ফুলাবে, লুটিয়ে পড়ে কাঁদবে- এমন একটা বৌ-এর স্বপ্ন দেখতো প্রথম যৌবনে। রহীমার না আছে অভিমান, না আছে চপলতা। অপরাধ না করে থাকলেও মজিদ বলছে বলে যে-কোনো কথা নির্বিবাদে মেনে নেয়। অমন মানুষ ভালো লাগে না তার।

পরে সব কথা শুনে মজিদের মুখ কিন্তু হঠাৎ কঠিন হয়ে যায়। বুড়ো গিয়ে তার মেয়েকে মেরেছে। মেরেছে এ জন্য যে, সে এসে তাকে কথাটা বলে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে মজিদ গম্ভীর কণ্ঠে রহীমাকে বলে,

-অরে যাইতে কও। আর কও, আমি দেখুম নি।

একটু পরে রহীমা বলে,

-ও যাইবার চায় না। ডরায়।

মজিদ আড়চোখে একবার তাকায় হাসুনির মায়ের দিকে। কান্না থামিয়ে মজিদের দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে, আর ঘোমটা-টানা মাথা নত করে নখ দিয়ে পাটি খুটছে। ওধারে ফেরানো মুখটি দেখবার জন্য এক মুহূর্ত কৌতূহল বোধ করে মজিদ। তারপর তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে বলে, -থাক তাইলে এখানে।

অপরাহ্নে জমায়েত হয়। একা বিচার করতে ভরসা হয় না যেন মজিদের। ঢেঙা বুড়ো লোকটা শয়তানের খাম্বা; অন্তরে তার কুটিলতা, আর অবিশ্বাস।

খালেক ব্যাপারীও এসেছে। মাতব্বর না হলে শাস্তিবিধান হয় না, বিচার চলে না। রায় অবশ্য মজিদই দেয়, কিন্তু সেটা মাতব্বরের মুখ দিয়ে বেরুলে ভালো দেখায়।

একটু তফাতে পাহার ওপর বসে চুপচাপ হয়ে আছে তাহেরের বাপ, মুখটি একদিকে সরানো।

খালেক ব্যাপারী বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন করে,

-তোমার বিবি কী বলে?

মুখ না তুলে বুড়ো বলে,

-হেই কথা আপনারা ব্যাক্কই জানেন।

কে একজন গলা উঠিয়ে বলে, কথা ঠিক কইরা কও মিঞা।

বুড়ো ওদিকে একবারে ফিরেও তাকায় না।

খালেক ব্যাপারী আবার প্রশ্ন করে,

-এহন কও, হেই কথা তুমি ঢাকবার চাও ক্যান?

কথাটা যেন বুঝলে না ঠিকমতো- এমন একটা ভঙ্গি করে বুড়ো তাকায় সকলের পানে। তারপর বলে,

-এইটা কি কওনের কথা? বুড়িমাগী বুটমুট একখান কথা কয়- তা বইলা আমি কী পাড়ায় ঢোল-সোহরত দিমু?

ওর কথা বলার ভঙ্গি ব্যাপারীর মোটেই ভালো লাগে না। মজিদ নীরব হয়ে থাকে, কিন্তু উত্তর শুনে তারও চোখ জ্বলে ধিকিধিকি।

লোকটির উত্তরে কিন্তু ভুল নেই। তাই প্রত্যুত্তরের জন্য সহসা কিছু না পেয়ে খালেক ব্যাপারী ধমকে উঠে বলে,

-কথা ঠিক কইরা কইবার পারো না?

জমায়েতের মধ্যে কয়েকটা গলা আবার চৈঁচিয়ে ওঠে, -কথা ঠিক কইরা কও মিঞা, কথা ঠিক কইরা কও। বৈঠক শান্ত হলে খালেক ব্যাপারী আবার বলে,

-তুমি তোমার মাইয়ারে ঠ্যাঙাইছ ক্যান?



—আমার মাইয়া আমি ঠ্যাঙাইছি! —লম্বামুখ খাড়া করে নির্বিকারভাবে উত্তর দেয় তাহেরের বাপ, যেন ভয় নেই ডর নেই। অবশ্য হাতের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, আঙুলগুলো কাঁপছে। ভেতরে তার ক্রোধের আগুন জ্বলছে— বাইরে যতই ঠাণ্ডা থাকুক না কেন?

ব্যাপারী কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এবার হাত নেড়ে মজিদ তাকে থামিয়ে নিজে বলবার জন্য তৈরি হয়। ব্যাপারটা আগে গোড়া থেকে ব্যাপারীকে বুঝিয়ে বলেছিলো সে, এবং ভেবেছিলো তার পক্ষ থেকে খালেক ব্যাপারীই কাজটা ঠিকমতো চালিয়ে নেবে। কিন্তু তার প্রশ্নগুলো তেমন জুতসই হচ্ছে না। বলছে আর যেন ঠাস্ করে মুখের ওপর চড় খাচ্ছে।

মজিদ গম্ভীর গলায় বলে, ভাই সকল! বলে থেমে তাকায় সবার পানে। পিঠ সোজা করে বসেছে, কোলের ওপর হাত। আসল কথা শুরু করবার আগে সে এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে যে, মনে হয় সে ছুরা ফাতেহা পড়ে তার বক্তব্য শুরু করবে। কিন্তু আরেকবার ‘ভাই সকল’ বলে সে কথা শুরু করে। বলে, খোদাতা’লার কুদরত মানুষের বুঝবার ক্ষমতা নাই। দোষগুণ সৃষ্ট মানুষ। মানুষের মধ্যে তাই শয়তান আছে, ফেরেস্টাও আছে। তাদের মধ্যে গুণাগার আছে, নেকবন্দ আছে। কুৎসা রটনাটা বড় গর্হিত কাজ। কিন্তু যারা শয়তানের চাতুরি বুঝতে পারে না, যারা তাদের লোভনীয় ফাঁদে ধরা দেয় এবং খোদার ভয়কে দিল থেকে মুছে ফেলে— তারা এসব গর্হিত কাজে নিজেদের লিপ্ত করে। মানুষের রসনা বড় ভয়ানক বস্তু; সে-রসনা বিষাক্ত সাপের রসনার চেয়েও ভয়ঙ্কর হতে পারে। প্রক্ষিপ্ত সে-রসনা তার বিষে পরিবারকে-পরিবার ধ্বংস করে দিতে পারে, নিমেষে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে সমগ্র পৃথিবীতে।

ঋজুভঙ্গিতে বসে গম্ভীর কণ্ঠে ঢালাসুরে মজিদ বলে চলে। কথায় তার মধু। স্তব্ধ ঘরে তার কণ্ঠে একটা সুর তোলে, যে-সুরে মোহিত হয়ে পড়ে শ্রোতারা।

একবার মজিদ থামে। শান্ত চোখ; কারো দিকে তাকায় না। দাড়িতে আলগোছে হাত বুলিয়ে তারপর আবার শুরু করে, —পৃথিবীর মধ্যে যিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁর ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধেও মানুষের সে-রসনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। পঞ্চম হিজরিতে প্রিয় পয়গম্বর বাণী-এল মুস্তালিখ-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রত্যাবর্তন করবার সময় তাঁর ছোট বিবি আয়েশা কী করে দলচ্যুত হয়ে পড়েন। তারপর তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন। এক নওজোয়ান সিপাই তাঁকে খুঁজে পায়। পেয়ে তাঁকে সসম্মানে নিজেরই উটে বসিয়ে আর নিজে পায়দল হেঁটে প্রিয় পয়গম্বরের কাছে পৌঁছে দিয়ে যায়। যাদের অন্তরে শয়তানের একচ্ছত্র প্রভুত্ব— যারা তারই চক্রান্তে খোদার রোশনাই থেকে নিজের হৃদয়কে বঞ্চিত করে রাখে, তাদেরই বিষাক্ত রসনা সেদিন কর্মতৎপর হয়ে উঠলো। হজরতের এতো পেয়ারা বিবির নামেও তারা কুৎসা রটাতে লাগলো। বড় ব্যথা পেলেন পয়গম্বর। খোদার কাছে কেঁদে বললেন, এয়া খোদা পরবন্দেগার, নির্দোষ আমার বিবি কেন এত লাঞ্ছনা ভোগ করবে, কেন এ-অকথ্য বদনাম সহ্য করবে? উত্তরে খোদাতা’লা মানবজাতিকে বললেন—

থেমে বিসমিল্লা পড়ে মজিদ ছুরায়ে আন-নূর থেকে খানিকটা কেরাত করে শোনায়। তার গম্ভীর কণ্ঠ হঠাৎ মিহি সুরে ভেঙে পড়ে। স্তব্ধ ঘরে বিচিত্র সুরঝঙ্কার ওঠে। শূনে জমায়েতের অনেকের চোখ ছলছল করে ওঠে।

হঠাৎ এক সময়ে মজিদ কেরাত বন্ধ করে, করে সরাসরি তাহেরের বাপের পানে তাকায়। যে লোকটা এতক্ষণ একটা বিদ্রোহী ভাব নিয়ে কঠিন হয়ে ছিলো, তার চোখ এখন নরম। বসে থাকার মধ্যে উদ্ধত ভাবটাও যেন নেই। চোখাচোখি হতে সে চোখ নাবায়।

কয়েক মুহূর্ত তার পানে তাকিয়ে থেকে গলা উঠিয়ে মজিদ বলে যে, খোদাতা’লার ভেদ তাঁরই সৃষ্ট বান্দার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে তিনি বিষময় রসনা দিয়েছেন, মধুময় রসনাও দিয়েছেন। উদ্ধত করেও সৃষ্টি করেছেন তাকে, মাটির মতো করেও সৃষ্টি করেছেন। সে যাই হোক, মানুষের কাছে আপন সংসার, আপন বালবাচ্চা দুনিয়ার সব চাইতে প্রিয়। তাদেরই সুখ শান্তির জন্য সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, জীবনের সঙ্গে লড়াই করে। আপন সংসারের ভালাই ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না সে। কিন্তু যে-মেয়েলোক আপন সংসার আপন হাতে ভাঙতে চায় এবং আপন সন্তানের জন্ম সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে, সে নিজের বিরুদ্ধে কাজ করে, খোদার বিরুদ্ধে আঙুল ওঠায়। তার গুনাহ্ বড় মস্ত গুনাহ্, তার শাস্তি বড় কঠিন শাস্তি।

হঠাৎ মজিদের গলা বানবান করে ওঠে।

—তুমি কী মনে করো মিঞা? তুমি কী মনে করো তোমার বিবি মিছা বদনাম করে? তুমি কী হলফ কইরা বলতে পারো তোমার দিলে ময়লা নাই?



যে-লোক কিছুক্ষণ আগে খালেক ব্যাপারীর মতো লোকের মুখের ওপর ঠাস্-ঠাস্ জবাব দিচ্ছিল, মজিদের প্রশ্নে সে এখন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কোথা দিয়ে কোথায় তাকে আনে মজিদ, সে বোঝে না। মন ঘাটতে গিয়ে দেখে সেখানে সন্দেহ- এতদিন পর আজ সন্দেহ! বহুদিন আগে তার বউ যখন চড়ুই পাখির মতো নাচতো, হাসিখুশি উজ্জ্বলতায় চারিদিকে আলো ছড়াতো, তখন যে-জনরব উঠেছিলো সে-কথাই তার স্মরণ হয়। কোনোদিন সে-কথা সে বিশ্বাস করেনি। তখন কথাটা যদি সত্যি বলে প্রমাণিত হতোও, সে তাকে তালুক দিতে পারতো। গলা টিপে খুন করে ফেললেও বেমানান দেখাতো না। কিন্তু আজ এতদিন পরে যদি দেখে সেদিন তারই ভুল হয়েছিলো, তবে সে কী করতে পারে? বউ আজ শুধু কঙ্কাল, পচনধরা মাংসের রসি খোলস- তাকে নিয়ে সে কী করবে? অন্ধকার ভবিষ্যতের মধ্যে যে-ভীতির সৃষ্টি হবে সে-ভীতি দূর করবে কী করে?

মজিদ গলা চড়িয়ে ধমকের সুরে আবার বলে,

—কী মিঞা? তোমার দিলে কি ময়লা আছে? তুমি কি ঢাকবার চাও কিছু, লুকাইবার চাও কোনো কথা?

মজিদ থামলে ঘরময় রুদ্ধনিঃশ্বাসের স্তব্ধতা নামে, এবং সে-স্তব্ধতার মধ্যে তার কেরাতের সুরব্যঞ্জনা আবার যেন আপনা থেকেই বাক্ত হয়ে ওঠে। সে-বাক্তর মানুষের কানে লাগে, প্রাণে লাগে।

তাহেরের বাপ এধার-ওধার তাকায়, অস্থির-অস্থির করে। একবার ভাবে বলে, না, তার দিলে কিছুই নাই, তার দিল সাফ। বুড়ি বেটির দেমাক খারাপ হয়েছে, তাকে কষ্ট দেবার জন্যই অমন বুটমুট কথা বানিয়ে বলে। কিন্তু কথাটা আসে না মুখ দিয়ে।

অবশেষে অসহায়ের মতো তাহেরের বাপ বলে,

—কী কমু? আমার দিলের কথা আমি জানি না। ক্যামনে কমু দিলের কথা?

—কিছু তুমি ঢাকবার চাও, লুকাইবার চাও?

অস্থির হয়ে ওঠা চোখে বুড়ো আবার তাকায় মজিদের পানে। তার মুখ বুলে পড়েছে, থই পাচ্ছে না কোথাও।

—তুমি কিছু লুকাইবার চাও, কিছু ছাপাইবার চাও? তুমি তোমার মাইয়ারে তাইলে ঠ্যাঙাইছ ক্যান? তার গায়ে দড়া পড়ছে ক্যান? তার গা নীল-নীল হইছে ক্যান?

সভা নিশ্বাস রুদ্ধ করে রাখে। লোকেরাও বোঝে না ঠিক কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছে ব্যাপারটা। তবে বিভ্রান্ত বুড়োটির পানে চেয়ে সমবেদনা হয় না। বরঞ্চ তাতে দেখে মনে এখন বিদ্বেষ আর ঘৃণা আসে। ও যেন ঘোর পাপী। পাপের জ্বালায় এখন ছটফট করছে। দোজখের লেলিহান শিখা যেন স্পর্শ করেছে তাকে।

হঠাৎ ঋজু হয়ে বসে মজিদ চোখ বোজে। তারপর সে বিসমিল্লাহ পড়ে আবার কেরাত শুরু করে। মুহূর্তে মিহি মধুর হয়ে ওঠে তার গলা, শান্তির ঝরনার মতো বেয়ে-বেয়ে আসে, ঝরে-ঝরে পড়ে অবিশ্রান্ত করুণায়।

তারপর সর্বসমক্ষে ঢেঙা বদমেজাজি বৃদ্ধ লোকটি কাঁদতে শুরু করে। সে কাঁদে, কাঁদে, ব্যাঘাত করে না তার কান্নায়। অবশেষে কান্না থামলে মজিদ শান্ত গলায় বলে,

—তুমি কিংবা তোমার বিবি গুনাহ্ কইরা থাকলে খোদা বিচার করবেন। কিন্তু তুমি তোমার মাইয়ার কাছে মাপ চাইবা, তারে ঘরে নিয়া যত্নে রাখবা। আর মাজারে সিল্লি দিবা পাঁচ পয়সার।

মজিদ নিজে তার মাফ দাবি করে না। কারণ মেয়ের কাছে চাইলে তারই কাছে চাওয়া হবে। নির্দেশ তো তারই। তারই হুকুম তামিল করবে সে।

বুড়ো বাড়ি গিয়ে সটান শুয়ে পড়ে। তারপর চোখ বুজে চুপচাপ ভাবে। মাথাটা যেন খোলাসা হয়ে এসেছে। হঠাৎ তার মনে হয়, সারা গ্রামের জমায়েতের সামনে দাঁড়িয়ে সে নির্লজ্জভাবে সায় দিয়ে এসেছে বুড়ির কথায়। সে কথার সত্যাসত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেনি, বরঞ্চ পরিস্কারভাবে বলে এসেছে সে কথা সত্যিই। এবং লোককে এ-কথাও জানিয়ে এসেছে যে, সে একটা দুর্বল মানুষ, এত বড় একটা অন্যায়ে কথা দোষিণীর আপন মুখ থেকে শুনেও চুপ করে আছে। কারণ তার মেরুদণ্ড নেই। সে-কথা সর্বসমক্ষে কেঁদে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে।

হঠাৎ রক্ত চড়চড় করে ওঠে। ভাবে, উঠে গিয়ে চেলাকাট দিয়ে এ-মুহূর্তেই বুড়ির আমসিপানা মুখখানা ফাটিয়ে উড়িয়ে দিয়ে আসে। কিন্তু কেমন একটা অবসাদে দেহ চেয়ে থাকে। চুপচাপ শুয়ে কেবল ভাবে। পৌরুষের গর্ব ধুলিসাৎ হয়ে আছে যেন।

আর সে ওঠে না। বুড়ি মাঝে মাঝে শান্ত গলায় ছেলেদের প্রশ্ন করে,



—দেখতো, ব্যাটা কি মরলো নাকি?

ছেলেরা ধমকে ওঠে মায়ের ওপর। বলে, কী যে, কও! মুখে লাগাম নাই তোমার? হতাশ হয়ে বুড়ি বলে,

—তাই ক। আমার কি তেমন কপালডা!

আর মারবে না প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ভয়ে ভয়ে হাসুনির মা ঘরে ফিরে এসেছিল। ভয় যে, সেখানে যা বলেছে, কিন্তু একবার হাতে-নাতে পেলে তাকে ঠিক খুন করে ফেলবে বুড়ো। সে এখন অবাক হয়ে ঘুরঘুর করে। উঁকি মেরে বাপের শায়িত নিশ্চল দেহটি চেয়ে দেখে কখনো-কখনো। কখনো-বা আড়াল থেকে শুষ্ক গলায় প্রশ্ন করে,

—বাপজান, খাইবা না?

বাপ কথা কয় না।

দু-দিন পরে ঝড় ওঠে। আকাশে দুরন্ত হাওয়া আর দলে-ভারি কালো কালো মেঘে লড়াই লাগে; মহব্বতনগরের সর্বোচ্চ তালগাছটি বন্দি পাখির মতো আছড়াতে থাকে। হাওয়া মাঠে ঘূর্ণিপাক খেয়ে আসে, তির্যক ভঙ্গিতে বাজপাখির মতো শৌ করে নেবে আসে, কখনো ভোঁতা প্রশস্ততায় হাতির মতো ঠেলে এগিয়ে যায়।

ঝড় এলে হাসুনির মার হৈ-হৈ করার অভ্যাস। হাসুনি কোথায় গেলো রে, ছাগলটা কোথায় গেলো রে, লাল ঝুঁটিওয়ালা মুরগিটা কোথায় গেলো রে। তীক্ষ্ণ গলায় চঁচামেচি করে, আথালি-পাথালি ছুটোছুটি করে, আর কী-একটা আদিম উল্লাসে তার দেহ নাচে।

ঝড় আসছে হু-হু করে, কিন্তু হাসুনির মা মুরগিটা খুঁজে পায় না। পেছনে ঝোপঝাড় দেখে, বাইরে যায়, ওধারে আমগাছে আশ্রয় নিয়েছে কিনা দেখে, বৃষ্টির ঝাপটায় বুজে আসা চোখে পিট-পিট করে তাকিয়ে কুর-কুর আওয়াজ করে ডাকে, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পায় না। শেষে ভাবে, কী জানি, হয়তো বাপের মাচার তলেই মুরগিটা গিয়ে লুকিয়েছে। পা টিপে-টিপে ঘরে ঢুকে মাচার তলে উঁকি মারতেই তার বাপ হঠাৎ কথা বলে। গলা দুর্বল, শূন্য-শূন্য ঠেকে। বলে,

—আমারে চাইরডা চিড়া আইনা দে।

মেয়ে ছুটে গিয়ে কিছু চিড়াগুড় এনে দেয়।

বাপ গবগব করে খায়। ক্ষিধা রান্ধসের মতো হয়ে উঠেছে।

চিড়া-কটা গলাধঃকরণ করে, বলে,

—পানি দে।

মেয়ে ছুটে পানি আনে। সর্বাঙ্গ তার ভিজে সপসপ করছে, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। অনুতাপ আর মায়ামমতায় বাপের কাছে সে গলে গেছে। বাপের ব্যথায় তার বুক চিনচিন করে। বুড়ো ঢকঢক করে পানি খায়।

তারপর একটু ভাবে। শেষে বলে,

—আর চাইরডা চিড়া দিবি মা?

মেয়ে আবার ছোটো। চিড়া আনে আরো, সঙ্গে আরেক লোটা পানিও আনে।

দু-দিনের রোজা ভেঙে বুড়ো ধনুকের মতো পিঠ বঁকিয়ে মাচার ওপর অনেকক্ষণ বসে-বসে ভাবে, দৃষ্টি কোণের অন্ধকারের মধ্যে নিবদ্ধ।

বাইরে হাওয়া গোঙিয়ে-গোঙিয়ে ওঠে, ঘরের চাল হাওয়া আর বৃষ্টির ঝাপটায় গুমরায়ে। সিক্ত কাপড়ে দূরে দাঁড়িয়ে মেয়ে নীরব হয়ে থাকে। হঠাৎ কেন তার চোখ ছলছল করে। তবে ঘরের অন্ধকার আর বৃষ্টির পানিতে ভেজা মুখের মধ্যে সে অশ্রু ধরা পড়বার কথা নয়।

অবশেষে বাপ বলে, —মাইয়া, তোর কাছে মাপ চাই। বুড়া মানুষ, মতিগতির আর ঠিক নাই। তোরে না বুইবা কষ্ট দিছি হে-দিন।

মেয়ে কী বলবে। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মুরগি খোঁজার অজুহাতে বাইরে ঝড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখে আরো পানি আসে, হুহু করে, অর্থহীনভাবে, আর বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় সে-পানি।

সেদিন সন্ধ্যায় বুড়ো কোথায় চলে গেলো। কেউ বলতে পারলো না গেলো কোথায়। ছেলেরা অনেক খোঁজে। আশেপাশে গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে, মতিগঞ্জের সড়ক ধরে তিন ক্রোশ দূরে গঞ্জে গিয়েও অনেক তালাশ করে। কেউ বলে,



নদীতে ডুবছে। তাই যদি হয় তবে সন্ধান পাবার জো নেই। খরস্রোতা বিশাল নদী, সে-নদী কোথায় কতদূরে তার দেহ ভাসিয়ে তুলেছে কে জানে।

ঘরে বুড়ি স্তব্ধ হয়ে থাকে। যে তার মৃত্যুর জন্য এত আগ্রহ দেখাতো, সে আর কথা কয় না। হাসুনির মা দূর থেকে মজিদের মিষ্টি-মধুর কোরান তেলাওয়াৎ শুনেছে অনেকদিন। সে আল্লার কথা স্মরণ করে বলে,

—আল্লা-আল্লা কও মা।

বুড়ি তখন জেগে উঠে কয়েকবার শিশুর মতো বলে, আল্লা, আল্লা—।

মজিদের শিক্ষায় গ্রামবাসীরা এ-কথা ভালোভাবে বুঝেছে, পৃথিবীতে যাই ঘটুক জন্ম-মৃত্যু শোক-দুঃখ— যার অর্থ অনেক সময় খুঁজে পাওয়া ভার হয়ে ওঠে— সব খোদা ভালোর জন্যই করেন। তাঁর সৃষ্টির মর্ম যেমন সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা দুষ্কর তেমন নিত্যনিয়ত তিনি যা করেন তার গূঢ়তত্ত্ব বোঝাও দুষ্কর। তবে এটা ঠিক, তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। ঘটনার রূপ অসহনীয় হতে পারে, কিন্তু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য শেষপর্যন্ত মানুষের মঙ্গল, তার ভালাই। অতএব যে জিনিস বোঝার জন্য নয়, তার জন্যে কৌতূহল প্রকাশ করা অর্থহীন।

ঠিক সে কারণেই বুড়ো কোথায় পালিয়েছে বা তার মৃতদেহ কোথাও ভেসে উঠেছে কি না জানবার জন্য কৌতূহল হতে পারে, কিন্তু কেন পালিয়েছে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র কৌতূহল হবার কথা নয়। যারা মজিদের শিক্ষার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি, তাদের মধ্যে অবশ্য প্রশ্নটি যে একেবারে জাগে না এমন নয়। কিন্তু সে প্রশ্ন দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো ক্ষীণ, উঠেই ডুবে যায়, ব্যাখ্যাতিত অজানা বিশাল আকাশের মধ্যে থই পায় না। যেখানে জন্ম মৃত্যু ফসল হওয়া না-হওয়া, বা খেতে পাওয়া-না পাওয়া একটা অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে একটি লোকের নিরুদ্দেশ হবার ঘটনা কতখানি আর কৌতূহল জাগাতে পারে। যা মানুষের স্মরণে জাহ্নত হয়ে থাকে বহুদিন, তা সে-অপরাধের ঘটনা। মজিদের সামনে সেদিন লোকটি কেমন ছটফট করেছিলো, পাপের জ্বালায় কেমন অস্থির-অস্থির করেছিলো— যেন দোজখের আগুনের লেলিহান শিখা তাকে স্পর্শ করেছে। তারপর তার কান্না। শয়তানের শক্তি ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিলো সে-কান্নার মধ্যে।

এ-বিচিত্র দুনিয়ায় যারা আবার আর দশজনের চাইতে বেশি জানে ও বোঝে, বিশাল রহস্যের প্রান্তটুকু অন্তত ধরতে পারে বলে দাবি করে, তাদের কদর প্রচুর। সালুতে ঢাকা মাছের পিঠের মতো চিরনীরব মাজারটি একটি দুর্ভেদ্য, দুর্লভ্য রহস্যে আবৃত। তারই ঘনিষ্ঠতার মধ্যে যে-মানুষ বসবাস করে তার দ্বারাই সম্ভব মহাসত্যকে ভেদ করা, অনাবৃত করা। মজিদের ক্ষুদ্র চোখ দুটি যখন ক্ষুদ্রতর হয়ে ওঠে আর দিগন্তের ধূসরতায় আবছা হয়ে আসে, তখনই তার সামনে সে-সৃষ্টি-রহস্য নিরাবরণ স্পষ্টতায় প্রতিভাত হয়— সে-কথা এরা বোঝে।

হাসুনির মার মনেও প্রশ্ন নেই। মাসগুলো ঘুরে এলে বরঞ্চ বাপের নিরুদ্দেশ হবার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে পায়।

—খোদার জিনিস খোদা তুইলা লইয়া গেছে!

তারপর মার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি হানে। বাপ আমাগো নেকবন্দ মানুষ আছিল।

বুড়ি কিছু বলে না। খেলোয়াড় চলে গেছে, খেলবে কার সাথে। তাই যেন চুপচাপ থাকে।

প্রথম প্রথম হাসুনির মা মজিদের বাসায় আসতো না। লজ্জা হতো। মার লজ্জা নেই বলে তার লজ্জা। তারপর ক্রমে-ক্রমে আসতে লাগলো। কখনো কৃচিৎ মজিদের সামনাসামনি হয়ে গেলে মাথায় আধহাত ঘোমটা টেনে আড়ালে গিয়ে দাঁড়াতে, আর বুকটা দুর্বুদ্রু কাঁপতো ভয়ে। বতোর দিনে এ-বাড়িতে যাতায়াত যখন বেড়ে গেলো তখন একদিন উঠানে একেবারে সামনাসামনি হয়ে গেলো। মজিদের হাতে হুকা। হাসুনির মা ফিরে দাঁড়িয়েছে এমন সময়ে মজিদ বলে,

—হুকায় এক ছিলিম তামাক ভইরা দেও গো বিটি।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে হুকাটা নেয়। বুক কাঁপতে থাকে ধপধপ করে, আর লজ্জায় চোখ বুজে আসতে চায়।

হুকাটা দিতে গিয়ে মজিদ কয়েক মুহূর্ত সেটা ধরে রাখে। তারপর হঠাৎ বলে, আহা!

তার গলা বেদনায় ছলছল করে।

তারপর থেকে সংকোচ আর ভয় কাটে। ক্রমে-ক্রমে সে খোলা মুখে সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া শুরু করে। না করে উপায় কী! বতোর দিনে কাজের অন্ত নেই। মানুষতো রহীমা আর সে। ধান এলানো-মাড়ানো, সিদ্ধ করা, ভানা-কত কাজ।



একদিন উঠানে ধান ছড়াতে ছড়াতে হঠাৎ বহুদিন পর হাসুনির মা তার পুরানো আর্জি জানায়। রহীমাকে বলে,
 -ওনারে কন, খোদায় যানি আমার মওত দেয়।
 হঠাৎ রহীমা রুগ্ন স্বরে বলে,
 -অমন কথা কইওনা বিটি, ঘরে বালা আইসে।
 পরদিন মজিদ একটা শাড়ি আনিয়ে দেয়। বেগুনি রঙ, কালো পাড়। খুশি হয়ে হাসুনির মা মুখ গম্ভীর করে। বলে,
 -আমার শাড়ির দরকার কী বুবু? হাসুনিরে একটা জামা দিলে ও পরত খন।
 হঠাৎ কী হয়, রহীমা কিছু বলে না। অন্যদিন হলে, কথা না বলুক অন্তত হাসতো। আজ হাসেও না।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অন্ন ধ্বংস করা- খেয়ে দেয়ে শেষ করা। অগ্নিদৃষ্টি- রাগান্বিত চোখে তাকানো। আমতা আমতা করে- কী করবে বুঝতে না পেরে সংকোচ বা ইতস্তত করা। আপসিপানা মুখ- শুকিয়ে যাওয়া মুখ। আশ মিটিয়ে- আশা বা সাধ পূরণ করে। আড়ি পেতে শুনবে- চুপ করে অগোচরে ওৎ পেতে শোনা। উদ্ধত- অবাধ্য, গোঁয়ার। ঝাজু ভঙ্গিতে- সোজাভাবে বসা। কুদরাত- শক্তি, লীলাখেলা। কুৎসা- অপরের নামে বদনাম রটানো। খচ করে ধরে- মনে কাঁটার মতো বিধে যায়। খালাস হমু- মুক্তি পাব। খোদাতালার ভেদ- খোদাতালার সৃষ্টির রহস্য। খোদাবন্দ- খোদার বান্দা থেকে শব্দটি এসেছে। খোদারভক্ত। গহিত- নিষিদ্ধ। গুজরান- অতিবাহিত করা, কাটানো। ঘূর্ণি খেয়ে- চক্রের মেরে বা ঘোরান দিয়ে। ঠ্যাঙাইছ- মেরেছ। মূল শব্দটি ঠেঙানো, সেখান থেকে আঞ্চলিক প্রয়োগে ঠ্যাঙাইছ হয়েছে। ঢেঙা- লম্বাটে, লম্বা। ঢোল-সোহরত- কোনো বিষয় ঢোল বাজিয়ে জানিয়ে দেয়া বা প্রচার করা। তালাশ- খোঁজ, অনুসন্ধান। দিলে ময়লা নাই- অন্তরে খারাপ কিছু নাই। দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো ক্ষীণ- দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী বুঝাবার জন্য এ উদাহরণ দেয়া হয়েছে। দুনিয়ার থন (আঞ্চলিক শব্দ)- দুনিয়ার থেকে। দেমাক- মূল শব্দ আরবি দেমাগ্ বা দিমাগ্। অহংকার, গর্ব, এখানে বিগড়ে গেছে বা বুদ্ধি লুপ্ত হয়েছে এ অর্থে ব্যবহৃত। নিত্য নিয়ত- সদাসর্বদা। পরবদেগার (আঞ্চলিক শব্দ)- প্রকৃত শব্দ পরওয়ার দিগার, ফার্সি এ শব্দের অর্থ দয়াময় আল্লাহ। প্রক্ষিপ্ত- নিক্ষিপ্ত, বেরিয়ে আসা। প্রত্যাশুর মুখে বিষ- কদর্য ও অশ্রাব্য ভাষা যা বিষের মতো কটু। পুলক- আনন্দ। ফুরণ- ফোড় দেয়া। বাজখাই- অত্যন্ত গম্ভীর ও কর্কশ আওয়াজ। বালা- (আরবি শব্দ) আপদ-বিপদ। ব্যাক্কই- সকলেই (আঞ্চলিক শব্দ)। বিভ্রান্ত- হতবুদ্ধি। মোহিত- মুগ্ধ। রক্ত চড়চড় করে ওঠে- রাগে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। রদ্দি- (আরবি শব্দ) নিকৃষ্ট বা অচল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসের স্তব্ধতা- নিঃশ্বাস বন্ধ বা দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো নীরবতা। রোশনাই- আলো। লেলিহান- দাউ দাউ করে জ্বলা। শয়তানের খাম্বা- খাম্বা শব্দটি হিন্দি ‘খম্বা’ শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ খুঁটি বা স্তম্ভ। এখানে হাসুনির মার বাপ অর্থাৎ তাহেরের বাপকেই মজিদের দৃষ্টিতে শয়তানের খুঁটি বলা হয়েছে। তাহেরের বাপ বুড়ো, তার বৃদ্ধা স্ত্রী সঙ্গে সদাসর্বদা ঝগড়া লেগেই আছে। এদিকে বুড়োর মেয়ে হাসুনির মা এসে মজিদের কাছে বাপের বিরুদ্ধে নালিশ দেয়। তাহেরের বাপ একটু বোকা ধরনের লোক, প্রতিবাদী। মজিদের এটা মোটেই পছন্দ হয় না। তাই তার দৃষ্টিতে দীর্ঘ এ লোকটা যেন শয়তানের প্রতিমূর্তি। শুধায়- জিজ্ঞাসা করে। সর্বসমক্ষে- সকলের সামনে। সমস্বরে- একই সঙ্গে শব্দ করে। সোপর্দ- সপে দেয়া, বুঝিয়ে দেয়া। হলফ- প্রতিজ্ঞা।



সারসংক্ষেপ

তাহের-কাদেরের বোন হাসুনির মা বিধবা। সে মজিদের স্ত্রী রহীমার কাছে এক আবেদন নিয়ে আসে। তার বৃদ্ধ বাবা মা সারাক্ষণ গালাগালি, ঝগড়াঝাটি ও মারামারি করে। ঝগড়াঝাটির এক পর্যায়ে অত্যন্ত কদর্য ভাষায় তার ছেলেপুলের জন্ম নিয়েও কথা তোলে। এসব শুনে রহীমা তাকে সান্ত্বনা দেয়। হাসুনির মার কথার সূত্র ধরে মজিদ তার বাপকে ডেকে পাঠায়। বুড়ো ভেবে অবাক হয় ঘরের কথা পরে জানল কীভাবে। হাসুনির মা ছাড়া মজিদের বাড়িতে তো কেউ আসে না। বাড়িতে ফিরে হাসুনির মাকে বেদম পেটায় সে। হাসুনির মা মার খেয়ে মজিদের ওখানে ছুটে গিয়ে মরাকান্না জুড়ে দেয়। মজিদ বলে হাসুনির মার ব্যাপারটা সে দেখবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মজিদের দরবারে বিচার বসে। এ বিচার সভায় মজিদের সর্বকর্মের সহায়ক খালেক ব্যাপারীও আসে। মজিদ ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়ে সুরেলা ভাষায় কুরআনের সুরা পড়ে সবার



মন ভিজিয়ে তোলে। তারপর তার অনুকূলে একটা পরিবেশ সৃষ্টি হলে বুড়ো তাহেরের বাপকে সরাসরি প্রশ্ন করে বুড়ির কথা সত্য কি না? বুড়ো এবারও অবাক বিস্ময়ে নিশ্চুপ হয়ে থাকে। বুড়ির যৌবন বয়সে তাদের সংসার জীবনের প্রথমে তার স্ত্রী সম্পর্কে একটা কথা উঠেছিল বটে, তবে সেসব কথা সে তখন পাত্তা দেয়নি। মজিদ নানাভাবে ঘুরে ফিরে তার মুখ থেকে সেসব কদর্য কথা বের করে আনতে চায়। অবশেষে বৃদ্ধ লোকটি অসহায়ের মতো কাঁদতে শুরু করে। মজিদ এবার খুশি হয়। সে বলে ভালো মন্দের বিচার খোদা করবেন। তবে বুড়ো যেন তার মেয়ের কাছে মাফ চায়। এ ঘটনার পর বুড়ো বাড়ি গিয়ে মনের দুঃখে শুয়ে পড়ে। রাগে ও অপমানে ছটফট করে। তবুও বুড়ো মেয়ের কাছে ক্ষমা চায় একদিন ঝড়ের সময়। হাসুনির মা অবাক হয় বাপের এ ক্ষমা চাওয়ায়। এ ঝড়ের মধ্যে বুড়ো এসময় নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা সবাই ভুলে যায়। হাসুনির মাও বাপের কথা আন্তে আন্তে ভুলে গিয়ে মজিদের সংসারের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩. হাসুনির মা কী আর্জি নিয়ে মজিদের কাছে আসে?

ক. নিজের মওতের	খ. সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষায়
গ. ধনদৌলত পেতে	ঘ. স্বামীর মৃত্যুর

১৪. “শরীলে রং ধরছে ক্যান, নিকা করবি নাকি?”- বাক্যটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে-

i. উপহাস	ii. বিদ্রূপ	iii. পরিহাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii	গ. iii	ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে প্রিয়াংকা বাবার বাড়িতে থাকে। কিন্তু বৃদ্ধ বাবা-মায়ের প্রতিদিনকার ঝগড়ায় সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আর না পেরে সে অভিযোগ জানাতে যায় স্থানীয় পৌর কমিশনারের কাছে।

১৫. উদ্দীপকের প্রিয়াংকার সঙ্গে ‘লালসালু’ উপন্যাসের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. আমেনা বিবি	খ. হাসুনির মা
গ. তানু বিবি	ঘ. জমিলা

১৬. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ-

- | |
|---------------------------------------|
| i. বিধবা মেয়ের বাপের বাড়ি থাকতে নেই |
| ii. মা-বাবার ঝগড়া পছন্দ নয় |
| iii. বৃদ্ধ মা-বাবার ঝগড়ার বিচার চায় |

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৫



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- হাসুনির মায়ের প্রতি মজিদের আকর্ষণে তার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বুড়ো পীরের প্রতি আকৃষ্ট লোকদের মজিদ কীভাবে তার প্রভাবে নিয়ে এল তা বর্ণনা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

পৌষের শীত। প্রান্তর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে হাড় কাঁপায়। গভীর রাতে রহীমা আর হাসুনির মা ধান সিদ্ধ করে। খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে, আলোকিত হয়ে উঠেছে সারা উঠানটা। ওপরে আকাশ অন্ধকার। গনগনে আগুনের শিখা যেন সে-কালো আকাশ গিয়ে ছোঁয়। ওধারে ধোঁয়া হয়, শব্দ হয় ভাঁপের। যেন শতসহস্র সাপ শিস দেয়।

শেষ রাতের দিকে মজিদ ঘর থেকে একবার বেরিয়ে আসে। খড়ের আগুনের উজ্জ্বল আলো লেপাজোকা সাদা উঠানটায় ঈষৎ লালচে হয়ে প্রতিফলিত হয়ে ঝকঝক করে। সে ঈষৎ লালচে উঠানের পশ্চাতে দেখে হাসুনির মাকে, তার পরনে বেগুনি শাড়িটা। যে-আলো সাদা মসৃণ উঠানটাকে গুঁত্রায় উজ্জ্বল করে তুলেছে, সে-আলোই তেমনি তার উন্মুক্ত গলা কাঁধের খানিকটা অংশ আর বাহু উজ্জ্বল করে তুলেছে। দেখে মজিদের চোখ এখানে অন্ধকারে চকচক করে।

কিছুক্ষণ পর ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে মজিদ আশ-পাশ করে। উঠান থেকে শিসের আওয়াজ এসে বেড়ার গায়ে সিরসির করে। তাই শোনে আর আশ-পাশ করে মজিদ। তারই মধ্যে কখন দ্রুততর, ঘনতর হয়ে ওঠে মুহূর্তগুলো।

এক সময় মজিদ আবার বেরিয়ে আসে। এসে কিছুক্ষণ আগে হাসুনির মায়ের উজ্জ্বল বাহু-কাঁধ-গলার জন্য যে-রহীমাকে সে লক্ষ করেনি, সে-রহীমাকেই ডাকে। ডাকের স্বরে প্রভুত্ব! দুনিয়ায় তার চাইতে এই মুহূর্তে অধিকতর শক্তিশালী অধিকতর ক্ষমতাবান আর কেউ নেই যেন। খড়কুটোর আলোর জন্য ওপরে আকাশ তেমনি অন্ধকার। সীমাহীন সে-আকাশ এখন কালো আবরণে সীমাবদ্ধ। মানুষের দুনিয়া আর খোদার দুনিয়া আলাদা হয়ে গেছে।

রহীমা ঘরে এলে মজিদ বলে,

—পা-টা একটু টিপা দিবো?

এ-গলার স্বর রহীমা চেনে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে মূর্তির মতো কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে বলে,

—ওইধারে এত কাম, ফজরের আগে শেষ করণ লাগবো।

—থোও তোমার কাজ! মজিদ গর্জে ওঠে। গর্জাবে না কেন। যে-ধান সিদ্ধ হচ্ছে সে-ধান তো তারই। এখানে সে মালিক। সে-মালিকানায় এক আনারও অংশীদার নেই কেউ।

রহীমার দেহভরা ধানের গন্ধ। যেন জমি ফসল ধরেছে। ঝুঁকে-ঝুঁকে সে পা টেপে। ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মজিদ, আর ধানের গন্ধ শোকে। শীতের রাতে ভারি হয়ে নাকে লাগে সে-গন্ধ!

অন্ধকারে সাপের মতো চকচক করে তার চোখ। মনের অস্থিরতা কাটে না। কাউকে সে জানাতে চায় কী কোনো কথা? তারই দেয়া বেগুনি রঙের শাড়ি পরা মেয়েলোকটিকে— খড়কুটোর আলোতে তখন যার দেহের কতক অংশ জ্বলজ্বল করছিলো উজ্জ্বল লালিত্যে— তাকে একটা কথা জানাতে চায় যেন। তবে জানানোর পথে বৃহৎ বাধার দেয়াল বলে রাত্রির এই মুহূর্তে অন্ধকার আকাশের তলে অসীম ক্ষমতাশীল প্রভুও অস্থির-অস্থির করে, দেয়াল ভেদ করার সূক্ষ্ম, ঘোরালো পন্থার সন্ধান করতে গিয়ে অধীর হয়ে পড়ে।

তখন পশ্চিম আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। উঠানে আগুন নিভে এসেছে, উত্তর থেকে জোর ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। রহীমা ফিরে এসে মুখ তুলে চায় না। হাসুনির মা দাঁতে চিবিয়ে দেখছিলো, ধান সিদ্ধ হয়েছে কিনা। সেও তাকায় না রহীমার পানে। কথা বলতে গিয়ে মুখে কথা বাধে।



তারপর পূব আকাশ হতে স্বপ্নের মতো ক্ষীণ, শূন্যগতি আলো এসে রাতের অন্ধকার যখন কাটিয়ে দেয় তখন হঠাৎ ওরা দুজনে চমকে ওঠে। মজিদ কখন উঠে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়তে শুরু করেছে। হালকা মধুর কণ্ঠ গ্রীষ্ম প্রত্যুষের ঝিরঝির হাওয়ার মতো ভেসে আসে!

ওরা তাকায় পরস্পরের পানে। নোতুন এক দিন শুরু হয়েছে খোদার নাম নিয়ে। তাঁর নামোচ্চারণে সংকোচ কাটে।

লোকদের সে যাই বলুক বতোর দিনে মজিদ কিন্তু ভুলে যায় গ্রামের অভিনয়ে তার কোনো পালা। মাজারের পাশে গত বছরে ওঠানো টিন আর বেড়ার ঘর মগড়ার পর মগড়া ধানে ভরে ওঠে। মাজার জেয়ারত করতে এসে লোকেরা চেয়ে চেয়ে দেখে তার ধান। গভীর বিস্ময়ে তারা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, মজিদকে অভিনন্দিত করে। শুনে মজিদ মুখ গম্ভীর করে। দাড়িতে হাত বুলিয়ে আকাশের পানে তাকায়। বলে, খোদার রহমত। খোদাই রিজিক দেনেওয়াল। তারপর ইঙ্গিতে মাজারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, আর তাঁনার দোয়া।

শুনে কারো কারো চোখ ছলছল করে ওঠে, আর আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ! কেন আসবে না। ধান হয়েছে এবার। মজিদের ঘরে যেমন মগড়াগুলো উপচে পড়ছে ধানের প্রাচুর্যে, তেমনি ঘরে-ঘরে ধানের বন্যা। তবে জীবনে যারা অনেক দেখেছে, যারা সমঝদার, তারা অহঙ্কার দাবিয়ে রাখে। ধানের প্রাচুর্যে কারো কারো বুকে আশঙ্কাও জাগে।

বস্তুত, মজিদকে দেখে তাদের আসল কথা স্মরণ হয়। খোদার রহমত না হলে মাঠে-মাঠে ধান হতে পারে না। তাঁর রহমত যদি শুকিয়ে যায়— বর্ষিত না হয়, তবে খামার শূন্য হয়ে খাঁ খাঁ করে। বিশেষ দিনে সে-কথাটা স্মরণ করবার জন্য মজিদের মতো লোকের সাহায্য নেয়। তার কাছেই শোকর গুজার করবার ভাষা শিখতে আসে।

অপূর্ব দীনতায় চোখ তুলে মজিদ বলে, দুনিয়াদারি কি তার কাজ? খোদাতা'লা অবশ্য দুনিয়ার কাজ কামকে অবহেলা করতে বলেননি, কিন্তু যার অন্তরে খোদা-রসুলের স্পর্শ লাগে, তার কী আর দুনিয়াদারি ভালো লাগে?

—ব'লে মজিদ চোখ পিট-পিট করে— যেন তার চোখ ছলছল করে উঠেছে। যে শোনে সে মাথা নাড়ে ঘন-ঘন। অস্পষ্ট গলায় সে আবার বলে,

—খোদার রহমত সব।

আরো বলে যে, সে রহমতের জন্য সে খোদার কাছে হাজারবার শোকর গুজারি করে। কিন্তু আবার দুমুঠো ভাত খেতে না পেলেও তার চিন্তা নেই। খোদার ওপর যার প্রাণ-মন-দেহ ন্যস্ত এবং খোদার ওপর যে তোয়াক্কা করে, তার আবার এসব তুচ্ছ কথা নিয়ে ভাবনা! বলতে বলতে এবার একটা বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে মজিদের মুখে, কোটরাগত চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে দিগন্তপ্রসারী দূরত্বে।

কিন্তু আজ সকালে মজিদের সে-চোখে একটা জ্বালাময় ছবি ভেসে ওঠে থেকে-থেকে। গনগনে আগুনের পাশে বেগুনি রঙের শাড়ি পরা একটি অস্পষ্ট নারীকে দেখে। স্মৃতিতে তার উলঙ্গ বাহু ও কাঁধ আরো শুভ্র হয়ে ওঠে। তার যে-চোখে দিগন্তপ্রসারী দূরত্ব জেগে ওঠে, সে-চোখ ক্রমশ সূক্ষ্ম ও সূচাত্মক হয়ে ওঠে।

হঠাৎ সচেতন হয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

—তোমার কেমন ধান হইল মিঞা?

তুমি বলুক আপনি বলুক সকলকে মিঞা বলে সম্বোধন করার অভ্যাস মজিদের। লোকটি ঘাড় চুলকে নিতি-বিত্তি করে বলে, —যা-ই হইছে তাই যথেষ্ট। ছেলেপুলে লইয়া দুই বেলা খাইবার পার্ফম।

আসলে এদের বড়াই করাই অভ্যাস। পঞ্চাশ মন ধান হলে অন্তত একশ মন বলা চাই। বতোর দিনে উঁচিয়ে উঁচিয়ে রাখা ধানের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করানো চাই। লোকটির ধান ভালোই হয়েছে, বলতে গেলে গত দশ বছরে এমন ফসল হয় নি। কিন্তু মজিদের সামনে বড়াই করা তো দূরের কথা, ন্যায্য কথাটা বলতেই তার মুখে কেমন বাধে। তাছাড়া, খোদার কালাম জানা লোকের সামনে ভাবনা কেমন যেন গুলিয়ে যায়। কী কথা বললে কী হবে বুঝে না উঠে সতর্কতা অবলম্বন করে।

কথার কথা কয় মজিদ, তাই উত্তরের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। তার অন্তরে ক্রমশ যে-আগুন জ্বলে উঠছে, তারই শিখার উত্তাপ অনুভব করে। সে-উত্তাপ ভালোই লাগে।

লোকটি অবশেষে উঠে দাঁড়ায়। তবে যাবার আগে হঠাৎ এমন একটা কথা বলে যে, মজিদ যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেখানেই বৃষ্টির মতো দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ এবং যে-আগুন জ্বলে উঠছিল অন্তরে, তা মুহূর্তে নির্বাপিত হয়।



সংক্ষেপে ব্যাপারটি হলো এই। -গৃহস্থদের গোলায়-গোলায় যখন ধান ভরে ওঠে তখন দেশময় আবার পীরদের সফর শুরু হয়। এই সময় খাতির যত্নটা হয়, মানুষের মেজাজটাও খোলাসা থাকে। যেবার আকাল পড়ে, সেবার অতি ভক্ত মুরিদের ঘরেও দুদিন গা ঢেলে থাকতে ভরসা হয় না পীর সাহেবদের।

দিন কয়েক হলো তিন গ্রাম পরে এক পীর সাহেব এসেছেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মতলুব খাঁ তাঁর পুরোনো মুরিদ। তিনি সেখানেই উঠেছেন।

পীর সাহেবের যথেষ্ট বয়স। লোকে বলে, এক কালে আঙুন ছিলো তাঁর চোখে, আর কণ্ঠে বজ্রনিবাদ। একথা তাঁর পূর্বপুরুষ মধ্যপ্রাচ্যের কোনো এক স্থান থেকে নাকি খোদার বাণী প্রচার করবার উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড পথশ্রম স্বীকার করে এ-দূর দেশে আসেন। সে কতদিন আগে তা পীর সাহেবও সঠিকভাবে জানেন না। কিন্তু এ-অজ্ঞতা স্বীকার্য নয় বলে কোনো এক পাঠান বাদশাহের মৃত্যুর সঙ্গে হিসেব মিলিয়ে সে-স্মরণীয় আগমনকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ণীত করা হয়।

যে-দেশ ছেড়ে এসেছেন, সে-দেশের সঙ্গে আজ অবশ্য কোনো সম্বন্ধ নেই- কেবল বৃহৎ খড়গনাসা গৌরবর্ণ চেহারাটি ছাড়া। ময়মনসিংহ জেলার কোনো এক অঞ্চলে বংশানুক্রমে বসবাস করছেন বলে তাঁদের ভাষাটাও এমন বিশুদ্ধভাবে স্থানীয় রূপ লাভ করেছে যে, মুরিদানির কাজ করবার প্রাক্কালে উত্তর-ভারতে কোনো এক স্থানে গিয়ে তাঁকে উর্দু জবান এস্তেমাল করে আসতে হয়েছিল।

পীর সাহেবের খ্যাতির শেষ নেই, তাঁর সম্বন্ধে গল্পেরও শেষ নেই। সে গল্প তাঁর রুহানি তা'কত ও কাশ্ফ নিয়ে। মাজারের ছায়ার তলে আছে বলে সমাজে জানাজা-পড়ানো খোন্কার মোল্লার চেয়ে মজিদের স্থান অনেক উঁচুতে, কিন্তু রুহানি তা'কত তার নেই বলে অন্তরে অন্তরে দীনতা বোধ করে। কখনো কখনো খোলাখুলিভাবে লোকসমক্ষে সে-দীনতা প্রকাশের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে এবং প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে মজিদ নিশ্চিত থাকে।

কিন্তু জাঁদরেল পীররা যখন আশে-পাশে এসে আস্তানা গাড়েন তখন মজিদ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ভয় হয়, তার বিস্তৃত প্রভাব কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো মিলিয়ে যাবে, অন্য এক ব্যক্তি এসে যে বৃহৎ মায়াজাল বিস্তার করবে তাতে সবাই একে-একে জড়িয়ে পড়বে।

অন্যের আত্মার শক্তিতে অবশ্য মজিদের খাঁটি বিশ্বাস নেই। আপন হাতে সৃষ্ট মাজারের পাশে বসে দুনিয়ার অনেক কিছুতেই তার বিশ্বাস হয় না। তবে এসব তার অন্তরের কথা, প্রকাশের কথা নয়। এতএব কিছুমাত্র বিশ্বাস ছাড়াও সে আশ্চর্য ধৈর্যসহকারে অন্যের ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করে। বলে, খোদাতা'লার ভেদ বোঝা কী সহজ কথা? কার মধ্যে তিনি কী বস্তু দিয়েছেন সে কেবল তিনিই বলতে পারেন।

এবার মজিদের মন কিন্তু কদিন ধরে থম থম করে। সব সময়েই হাওয়ায় ভেসে আসে পীর সাহেবের কার্যকলাপের কথা। এ-দিকে মাজারে লোকদের আসা-যাওয়াও প্রায় থেমে যায়। বতোর দিনে মানুষের কাজের অন্ত নেই ঠিক। কিন্তু যে-টুকু অবসর পায় তা তারা ব্যয় করতে থাকে পীর সাহেবের বাতরস-স্ফীত পদযুগলে একবার চুমু দেবার আশায়। পদচুম্বন অবশ্য সবার ভাগ্যে ঘটে না। দিনের পর দিন ভিড় ঠেলে অতি নিকটে পৌঁছেও অনেক সময় বাসনা চরিতার্থ হয় না। সন্নিহিতে গিয়ে তার নূরানি চেহারার দীপ্তি দেখে কারো চোখ ঝলসে যায়, কারো এমন চোখ ভাসানো কান্না পায় যে, আর এগোবার আশা ত্যাগ করতে হয়। ভাগ্যবান যারা, তারা পীর সাহেবের হাতের স্পর্শ হতে শুরু করে দু-এক শব্দ আদেশ-উপদেশ বা তামাক-গন্ধ-ভারি বুকের হাওয়াও লাভ করে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে মজিদ গম্ভীর হয়ে থাকে। রহীমা গা টেপে, কিন্তু টেপে যেন আস্ত পাথর। অবশেষে মজিদকে সে প্রশ্ন করে- আপনার কী হইছে?

মজিদ কিছু বলে না।

উত্তরের জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করে রহীমা হঠাৎ বলে,

-এক পীর সাহেব আইছেন না হেই গেরামে, তানি নাকি মরা মাইনষেরে জিন্দা কইরা দেন?

পাথর এবার হঠাৎ নড়ে। আবছা অন্ধকারে মজিদের চোখ জ্বলে ওঠে। ক্ষণকাল নীরব থেকে হঠাৎ কটমট করে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে,

-মরা মানুষ জিন্দা হয় ক্যামনে?

প্রশ্নটা কৌতূহলের নয় দেখে রহীমা দমে গেলো। তারপর আর কোনো কথা হয় না। এক সময় রহীমা পাশে শুয়ে আলগোছে ঘুমিয়ে পড়ে।



মজিদ ঘুমোয় না। সে বুঝেছে ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, এবার কিছু একটা না করলে নয়। আজও অপরাহ্নে সে দেখেছে, মতিগঞ্জের সড়কটা দিয়ে দলে দলে লোক চলছে উত্তর দিকে।

মজিদ ভাবে আর ভাবে। রাত যত গভীর হয় তত আগুন হয়ে ওঠে মাথা। মানুষের নির্বোধ বোকামির জন্য আর তার অকৃতজ্ঞতার জন্য একটা মারাত্মক ক্রোধ ও ঘৃণা উষ্ণ রক্তের মধ্যে টগবগ করতে থাকে। সে ছটফট করে একটা নিষ্ফল ক্রোধে।

একসময় ভাবে, ঝালর-দেয়া সালু কাপড়ে আবৃত নকল মাজারটিই এদের উপযুক্ত শিক্ষা, তাদের নিমকহারামির যথার্থ প্রতিদান। ভাবে, একদিন মাথার খুন চড়ে গেলে সে তাদের বলেই দেবে আসল কথা। বলে দিয়ে হাসবে হা-হা করে গগন বিদীর্ণ করে। শুনে যদি তাদের বুক ভেঙে যায় তবেই তৃপ্ত হবে তার রিক্ত মন। মজিদ তার ঘরবাড়ি বিক্রি করে সরে পড়বে দুনিয়ার অন্য পথে-ঘাটে। এ-বিচিত্র বিশাল দুনিয়ায় কি যাবার জায়গার কোনো অভাব আছে?

অবশ্য এ-ভাবনা গভীর রাতে নিজের বিছানায় শুয়েই সে ভাবে। যখন মাথা শীতল হয়, নিষ্ফল ক্রোধ হতাশায় গলে যায়, তখন সে আবার গুম হয়ে থাকে। তারপর শ্রান্ত, বিক্ষুব্ধ মনে হঠাৎ একটি চিকন বুদ্ধিরশি প্রতিফলিত হয়।

শীঘ্র তার চোখ চকচক করে ওঠে, শ্বাস দ্রুততর হয়। উত্তেজনায় আধা উঠে বসে অন্ধকার ভেদ করে রহীমার পানে তাকায়। পাশে সে অঘোর ঘুমে বেচাইন। একটি হাঁটু উলঙ্গ হয়ে মজিদের দেহে ঘেষে আছে।

তাকেই অকারণে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে-চেয়ে দেখে মজিদ, তারপর আবার চিং হয়ে শুয়ে চোখখোলা মৃতের মতো পড়ে থাকে।

মজিদ যখন আওয়ালপুর গ্রামে পৌঁছলো তখন সূর্য হেলে পড়েছে। মতলুব মিঞার বাড়ির সামনের মাঠটা লোকে লোকারণ্য। তার মধ্যে কোথায় যে পীর সাহেব বসে আছেন বোঝা মুশকিল। মজিদ বেঁটে মানুষ। পায়ের আঙুলে দাঁড়িয়ে বকের মতো গলা বাড়িয়ে পীর সাহেবকে একবার দেখবার চেষ্টা করে। কিন্তু কালো মাথার সমুদ্রে দৃষ্টি কেবল ব্যাহত হয়ে ফিরে আসে।

একজন বললে যে, বটগাছটার তলে তিনি বসে আছেন। তখন মাঘের শেষাংশে। তবু জন-সমুদ্রের উত্তাপে পীর সাহেবের গরম লেগেছে বলে তাঁর গায়ে হাতির কানের মতো মস্ত ঝালরওয়ালা পাখা নিয়ে হাওয়া করছে একটি লোক। কেবল সে-পাখাটা থেকে থেকে নজরে পড়ে।

মুখ তুলে রেখে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগলো মজিদ। সামনে শত শত লোক সব বিভোর হয়ে বসে আছে, কেউ কাউকে লক্ষ্য করবার কথা নয়। মজিদকে চেনে এমন লোক ভিড়ের মধ্যে অনেক আছে বটে, কিন্তু তারা কেউ আজ তাকে চেনে না। যেন বিশাল সূর্যোদয় হয়েছে, আর সে-আলোয় প্রদীপের আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

পীর সাহেব আজ দফায়-দফায় ওয়াজ করছেন। যখন ওয়াজ শেষ করে তিনি বসে পড়েন তখন অনেকক্ষণ ধরে তার বিশাল বপু দ্রুত শ্বসনের তালে-তালে ওঠা-নাবা করে, আর শুভ্র চণ্ডা কপালে জমে ওঠা বিন্দু-বিন্দু ঘাম খোলা মাঠের উজ্জ্বল আলোয় চকচক করে। পাখা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি জোরে হাত চালায়।

এ-সময় পীর সাহেবের প্রধান মুরিদ মতলুব মিয়া হুজুরের গুণাগুণ সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে বলে। একথা সর্বজনবিদিত যে, সে বলে, পীর সাহেব সূর্যকে ধরে রাখবার ক্ষমতা রাখেন। উদাহরণ দিয়ে বলে হয়তো তিনি এমন এক জরুরি কাজে আটকে আছেন যে ওধারে জোহরের নামাজের সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা হলে কী হবে, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত না হুকুম দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সূর্য এক আঙুল নড়তে পারে না। শুনে কেউ আহা-আহা করে, কারো-বা আবার ডুকরে কান্না আসে।

কেবল মজিদের চেহারা কঠিন হয়ে ওঠে। সজোরে নড়তে থাকা পাখাটার পানে তাকিয়ে সে মূর্তিবৎ বসে থাকে।

আধ ঘণ্টা পরে শীতের দ্বিপ্রাহরিক আমেজে জনতা ঈষৎ বিমিয়ে এসেছে, এমন সময় হঠাৎ জমায়েতের নানাস্থান থেকে রব উঠলো। একটা ঘোষণা মুখে-মুখে সারা ময়দানে ছড়িয়ে পড়লো। -পীর সাহেব আবার ওয়াজ করবেন।

পীর সাহেবের আর সে-গলা নেই। সূক্ষ্ম তারের কম্পনের মতো হাওয়ায় বাজে তাঁর গলা। জমায়েতের কেউ না কেউ প্রতি মুহূর্তে হা-হা করে উঠছে বলে সে-ক্ষীণ আওয়াজও সব প্রান্তে শোনা যায় না। কিন্তু মজিদ কান খাড়া করে শোনে, এবং শোনবার প্রচেষ্টার ফলে চোখ কুণ্ঠিত হয়ে ওঠে।

পীর সাহেবের গলার কম্পমান সূক্ষ্ম তারের মতো ক্ষীণ আওয়াজই আধ ঘণ্টা ধরে বাজে। তারপর বিচিত্র সুর করে তিনি একটা ফারসি বয়েত বলে ওয়াজ ক্ষান্ত করেন।



বলেন, সোহবতে সোয়ালে তুরা সোয়ালে কুনাদ (সুসঙ্গ মানুষকে ভালো করে)। শুনে জমায়েতের অর্ধেক লোক কেঁদে ওঠে। তারপর তিনি যখন বাকিটা বলেন— সোহবতে তোয়ালে তুরা তোয়ালে কুনাদ (কুসঙ্গ তেমনি তাকে আবার খারাপ করে) —তখন গোটা জমায়েতের সমস্ত সংঘর্ষের বাঁধ ভেঙে যায়, সকলে হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে।

বসে পড়ে পীর সাহেব পাখাওয়ালার পানে লাল-হয়ে ওঠা চোখে তাকিয়ে পাখা সঞ্চালন দ্রুততর করবার জন্য ইশারা করছেন এমন সময়ে সামনের লোকেরা সব ছুটে গিয়ে পীর সাহেবকে ঘেরাও করে ফেললো। হঠাৎ পাগল হয়ে উঠেছে তারা। যে যা পারলো ধরলো, —কেউ পা, কেউ হাত, কেউ আঙ্গিনের অংশ।

তারপর এক কাণ্ড ঘটলো। মানুষের ভাবমত্ততা দেখে পীর সাহেব অভ্যস্ত। কিন্তু আজকের ত্রন্দনরত জমায়েতের নিকটবর্তী লোকগুলোর সহসা এ আক্রমণ তাঁর বোধ হয় সহ্য হলো না। তিনি হঠাৎ নিজে থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যুবকের সাবলীল সহজ ভঙ্গিতে মাথার ওপরে গাছটার ডালে উঠে গেলেন। দেখে হায়-হায় করে উঠলো পীর সাহেবের সাজ-পাঙ্গরা, আর তা-শুনে জমায়েতও হায়-হায় করে উঠলো। সাজ-পাঙ্গরা তখন সুর করে গীত ধরলে এ মর্মে যে, তাদের পীর সাহেব তো শূন্যে উঠে গেছেন, এবার কী উপায়!

পীর সাহেব অবশ্য ডালে বসে তখন দিব্যি বাতরস-ভারি পা দোলাচ্ছেন।

ফাণ্ডনের আণ্ডনের দ্রুতবিস্তারের মতো পীর সাহেবের শূন্যে ওঠার কথা দেখতে-না দেখতে ছড়িয়ে গেলো। যারা তখন ফারসি বয়েতের অর্থ না বুঝে কেবল সুর শুনেই কেঁদে উঠেছিলো, এবার তারা মরা-কান্না জুড়ে বসলো। পীর সাহেব কী তাদের ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছেন? কিন্তু গেলে, অঙ্ক-মূর্খ তারা পথ দেখবে কী করে?

জোয়ারি ঢেউ-এর মতো সম্মুখে ভেঙে এলো জনস্রোত। অনেক মরা-কান্না ও আকুতি-বিকুতির পর পীর সাহেব বৃক্ষডাল হতে অবশেষে অবতরণ করলেন।

বেলা তখন বেশ গড়িয়ে এসেছে, আর মাঠের ধারে গাছগুলোর ছায়া দীর্ঘতর হয়ে সে মাঠেরই বুক পর্যন্ত পৌঁছেছে, এমন সময় পীর সাহেবের নির্দেশে একজন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে,

—ভাই সকল, আপনারা সব কাতারে দাঁড়াইয়া যান।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নামাজ শুরু হয়ে গেলো।

নামাজ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে এমন সময় হঠাৎ সারা মাঠটা যেন কেঁপে উঠলো। শত শত নামাজরত মানুষের নীরবতার মধ্যে খ্যাপা কুকুরের তীক্ষ্ণতায় নিঃসঙ্গ একটা গলা আর্তনাদ করে উঠলো।

সে-কণ্ঠ মজিদের।

—যতসব শয়তানি, বেদাতি কাজকারবার। খোদার সঙ্গে মস্করা! নামাজ ভেঙে কেউ কথা কইতে পারে না। তাই তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবাই নীরবে মজিদের অশ্রাব্য গালাগালি শুনলে।

মোনা জাত হয়ে গেলে সাজ-পাঙ্গদের তিনজন এগিয়ে এলো। একজন কঠিন গলায় প্রশ্ন করলো,

—চোঁচামিচি করতা কিছকা ওয়াস্তে?

লোকটি আবার পশ্চিমে এলেম শিখে এসে অবধি বাংলা জবানে কথা কয় না।

মজিদ বললে,

কোন্ নামাজ হইলো এটা?

—কাহে? জোহরকা নামাজ ছয়া। উত্তর শুনে আবার চিৎকার করে গালাগাল শুরু করলো মজিদ। বললে, এ কেমন বেশরিয়তি কারবার, আছরের সময় জোহরের নামাজ পড়া?

সাজ-পাঙ্গরা প্রথমে ভালোভাবেই বোঝাতে চেষ্টা করলো ব্যাপারটা। তারা বললে যে, মজিদ তো জানেই পীর সাহেবের হুকুম ব্যতীত জোহরের নামাজের সময় যেতে পারে না। পশ্চিম থেকে যে এলেম শিখে এসেছে সে বোঝানোর পন্থাটা প্রায় বৈজ্ঞানিক করে তোলে। সে বলে যে, যেহেতু ভাদ্র মাস ছেকে ছায়া আছিল এক-এক কদম করে বেড়ে যায়, সেহেতু দু-কদমের ওপর দুই লাঠি হিসেব করে চমৎকার জোহরের নামাজের সময় আছে।

মজিদ বলে, মাপো। এবং পীর সাহেবের সাজ-পাঙ্গরা যতদূর সম্ভব দীর্ঘ দীর্ঘ ছয় কদম ফেলে তার সঙ্গে দুই লাঠি যোগ করেও যখন ছায়ার নাগাল পেলো না তখন বললে, তর্ক যখন শুরু হয়েছিলো তখন ছায়া ঠিক নাগালের মধ্যে ছিলো।

শুনে মজিদ কুণ্ঠসিততমভাবে মুখ বিকৃত করে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার মুখ খিঁচি করে বলে,



—কেন, তখন তোগো পীর ধইরা রাখবার পারলো না সুরখটারে? তারপর সরে গিয়ে সে বজ্রকণ্ঠে ডাকলে,
মহব্বতনগর যাইবেন কে কে?

মহব্বতনগর গ্রামের লোকেরা এতক্ষণ বিমূঢ় হয়ে ব্যাপারটা দেখছিলো। কারো কারো মনে ভয়ও হয়েছিলো— এ বুঝি পীর সাহেবের সাজ-পাজরা ঠেঙিয়ে দেয় মজিদকে! এবার তার ডাক শুনে একে-একে তারা ভিড় থেকে খসে এলো। মতিগঞ্জের সড়কে উঠে ফিরতিমুখো পথ দিয়ে মজিদ একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে থুথু ফেলে, তওবা কেটে, নিঃশ্বাসের নিচে শয়তানকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করলো, তারপর দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগলো। সঙ্গে লোকেরা কিন্তু কিছু বললে না। তারা যদিও মজিদকে অনুসরণ করে বাড়ি ফিরে চলেছে কিন্তু মন তাদের দোটার দ্বন্দ্ব দোল খায়। চোখে তাদের এখনো অশ্রুর শুষ্ক রেখা।

সে-রাত্রে ব্যাপারীকে নিয়ে এক জরুরি বৈঠক বসলো। সবাই এসে জমলে, মজিদ সকলের পানে কয়েকবার তাকালো। তার চোখ জ্বলছে একটা জ্বালাময়ী অথচ পবিত্র ক্রোধে। শয়তানকে ধ্বংস করে মূর্খ, বিপথ চালিত মানুষদের রক্ষা করার কল্যাণকর বাসনায় সমস্ত সত্তা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মজিদ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে সংক্ষেপে তার বক্তব্য পেশ করলো— ভাই সকলরা সকলে অবগত আছেন যে, বেদাতি কোনো কিছু খোদাতা'লার অগ্রিয়, এবং সেই থেকে সত্যিকার মানুষ যারা তাদেরকে তিনি দূরে থাকতে বলেছেন। এ-কথাও তারা জানে যে, শয়তান মানুষকে প্রলুব্ধ করবার জন্য মনোমুগ্ধকর রূপ ধারণ করে তার সামনে উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত কৌশলসহকারে তাকে বিপথে চালিত করবার প্রয়াস পায়। শয়তানের সে-রূপ যতই মনোমুগ্ধকর হোক না কেন, খোদার পথে যারা চলাচল করে তাদের পক্ষে সে-মুখোশ চিনে ফেলতে বিন্দুমাত্র দেরি হয় না। তাছাড়া শয়তানের প্রচেষ্টা যতই নিপুণ হোক না কেন, একটি দুর্বলতার জন্য তার সমস্ত কারসাজি ভুল হয়ে যায়। তা হলো বেদাতি কাজকারবারের প্রতি শয়তানের প্রচণ্ড লোভ। এখানে এ-কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, শয়তান যদি মানুষকে খোদার পথেই নিয়ে গেলো, তাহলে তার শয়তানি রইলো কোথায়।

ভগিতার পর মজিদ আসল কথায় আসে। একটু দম নিয়ে সে আবার তার বক্তব্য শুরু করে। —আউয়ালপুরে তথাকথিত যে-পীর সাহেবের আগমন ঘটেছে তার কার্যকলাপ মনোযোগ নিয়ে লক্ষ করলে উক্ত মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। মুখোশ তাঁর ঠিক-ই আছে— যে মুখোশকে ভুল করে মানুষ তার কবলে পড়বে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য মানুষকে বিপথে নেয়া, খোদার পথ থেকে সরিয়ে জাহান্নামের দিকে চালিত করা। সে-উদ্দেশ্যে তথাকথিত পীরটি কৌশলে চরিতার্থ করার চেষ্টায় আছেন। পাঁচওয়াক্ত নামাজের জন্য খোদা সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু একটা ভুলো কথা বলে তিনি এতগুলো ভালো মানুষের নামাজ প্রতিদিন মকরুহ করে দিচ্ছেন। তাঁর চক্রান্তে পড়ে কত মুসল্লি ইমানদার মানুষ— যাঁরা জীবনে একটিবার নামাজ কাজা করেননি— তাঁরা খোদার কাছে গুণাহ করছেন।

এ পর্যন্ত বলে বিস্ময়াহত স্তব্ধ লোকগুলোর পানে মজিদ কতক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর আরো কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাড়িতে হাত বুলায়।

গলা কেশে এবার খালেক ব্যাপারী বৈঠকের পানে তাকিয়ে বাজখাই গলায় প্রশ্ন করে, হুঁলেন তো ভাই সকল?

সাব্যস্ত হলো, অন্তত, এ-গ্রামের কোনো মানুষ পীর সাহেবের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না।

এরপর মহব্বতনগরের লোক আউয়ালপুরে একেবারে গেলো যে না, তা নয়। কিন্তু গেলো অন্য মতলবে। পরদিন দুপুরেই একদল যুবক মজিদকে না জানিয়ে একটা জেহাদি জোশে বলীয়ান হয়ে পীর সাহেবের সভায় গিয়ে উপস্থিত হলো। এবং পরে তারা বড় সড়কটার উত্তর দিকে না গিয়ে গেলো দক্ষিণ দিকে করিমগঞ্জে। করিমগঞ্জে একটি হাসপাতাল আছে।

অপরাহ্নে সংবাদ পেয়ে মজিদ ক্যানভাসের জুতো পরে ছাতি বগলে করিমগঞ্জে গেলো। হাসপাতালে আহত ব্যক্তিদের পাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে শয়তান ও খোদার কাজের তারতম্য আরো বিশদভাবে বুঝিয়ে বললো, বেহেস্ত ও দোজখের জলজ্যন্ত বর্ণনাও করলো কতক্ষণ।

কালু মিঞা গোঙায়। চোখে তার বেদনার পানি। সে বলে শয়তানের চেলারা তার মাথাটা ফাটিয়ে দু-ফাঁক করে দিয়েছে। মজিদ তাকিয়ে দেখে মস্ত ব্যাভেজ তার মাথায়। দেখে সে মাথা নাড়ে, দাড়িতে হাত বুলায়, তারপর দুনিয়া যে মস্ত বড় পরীক্ষা-ক্ষেত্র তা মধুর সুললিত কণ্ঠে বুঝিয়ে বলে। কালু মিয়া শোনে কি-না কে জানে, একঘেয়ে সুরে গোঙাতে থাকে।

রাতে এশার নামাজ পড়ে বিদায় নিতে মজিদ হঠাৎ অন্তরে কেমন বিস্ময়কর ভাব বোধ করে। কম্পাউন্ডারকে ডাক্তার মনে করে, বলে, —পোলাগুলিরে একটু দেখবেন। ওরা বড় ছোয়াবের কাম করছে। ওদের যত্ন নিলে আপনারও ছোয়াব হইব।



ভাং-গাঁজা খাওয়া রসকসশূন্য হাড়গিলে চেহারা কম্পাউন্ডারের। প্রথম দুটো পয়সার লোভে তার চোখ চকচক করে উঠেছিল, কিন্তু ছোয়াবের কথা শুনে একবার আপাদমস্তক মজিদকে দেখে নেয়। তারপর নিরুত্তরে হাতের শিশিটা ঝাঁকতে ঝাঁকতে অন্যত্র চলে যায়।

গ্রামে ফিরে মজিদ কালু মিঞার বাপের সঙ্গে দু-চারটে কথা কয়। বুড়ো এক ছিলিম তামাক এনে দেয়। মজিদ নিজে গিয়ে ছেলেকে দেখে এসেছে বলে কৃতজ্ঞতায় তার চোখ ছলছল করে। হুকা তুলে নেবার আগে মজিদ বলে,

—কোন চিন্তা করবানা মিঞা। খোদা ভরসা। তারপর বলে যে হাসপাতালের বড় ডাক্তারকে সে নিজেই বলে এসেছে, ওদের যেন আদরযত্ন হয়। ডাক্তারকে অবশ্য কথাটা বলার কোনো প্রয়োজন ছিলো না, কারণ, গিয়ে দেখে, এমনতেই শাহি কাণ্ডকারখানা। ওষুধপত্র বা সেবা শুশ্রূষার শেষ নাই।

খুব জোরে দম কষে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে আরো শোনায় যে, তবু তার কথা শুনে ডাক্তার বসেন, তিনি দেখবেন ওদের যেন অযত্ন বা তকলিফ না হয়। তারপর আরেকটা কথার লেজুড় লাগায়। কথাটা অবশ্য মিথ্যে; এবং সজ্ঞানে সুস্থ দেহে মিথ্যে কথা কয় বলে মনে-মনে তওবা কাটে। কিন্তু কী করা যায়। দুনিয়াটা বড় বিচিত্র জায়গা। সময়-অসময়ে মিথ্যে কথা না বললে নয়।

বলে, ডাক্তার সাহেব তার মুরিদ কিনা তাই সেখানে মজিদের বড় খাতির।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অহঙ্কার দাবিয়ে রাখে— বড়াই করার ভাব গোপন রাখে। **অশ্রাব্য**— যা শোনার যোগ্য নয়। **আছলী**— পুরো, অবিকল, সঠিক। **এন্তেমাল**— ব্যবহার করা। **কম্পাউন্ডার**— ডাক্তারের সহকারী, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান অনুযায়ী যে লোক ওষুধ তৈরি করে। **কাতার**— সারি, লাইন। **কাশ্ফ**— উন্মোচিত। **কালো মাথার সমুদ্র**— অনেক লোকের মাথা এক দৃষ্টিতে কালো সমুদ্রের মতো দেখায়। **কারসাজি**— কৌশল, ফন্দি। **কাহে?** জোহরকা নামাজ হয়— কেন? জোহরের নামাজ হয়েছে। **কৃষ্ণপঙ্কের চাঁদের**— অত্যন্ত চোট ও ক্ষণ স্থায়ী। **খড়ুগনামা গৌরবর্ণ চেহারা**— ধারালো নাক আর সুন্দর উজ্জ্বল রঙের চেহারা। **খ্যাপা কুকুরের তীক্ষ্ণতায়**— পাগলা, বা উত্তেজিত কুকুর যে রকম তীক্ষ্ণ ভাবে ডাকে। **চরিতার্থ**— সফল। **চোঁচামেচি করতা কিছকা ওয়াস্তে**— কী জন্য চোঁচামেচি করছ। **জন সমুদ্রের উত্তাপ**— অনেক মানুষ এক সঙ্গে থাকতে জায়গাটা গরম হয়ে ওঠেছে। **জবান**— ভাষা। **জ্বালাময়ী অথচ পবিত্র ক্রোধে**— রাগের মধ্যে জ্বালা আছে, কিন্তু রাগের উদ্দেশ্য মানুষগুলোকে সুপথে আনা। **জেহাদি জোশ**— ধর্মযুদ্ধের প্রেরণা। **তওবা**— মুসলমান ধর্মমতে প্রায়শ্চিত্ত। **তকলিফ**— কষ্ট। **তখন তোগো পীর ধইরা রাখবার পারলো না সুরুষটারে**— তখন তাদের পীর সূর্যটাকে ধরে রাখতে পারলো না? **তানার দোয়া**— এখানে লালসালুর নিচে শায়িত বলে কল্পিত মোদাচ্ছের পীরের কথা বলা হয়েছে। **তামাক গন্ধ ভারী বুকুর হাওয়া**— পীর সাহেব প্রায় সময় যেহেতু সুগন্ধী তামাক পানে রত থাকেন তাই তাঁর দোওয়া চাওয়ার জন্য যে কেউ কাছে গেলেই বা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলে সেই মিষ্টি গন্ধে আবিষ্ট হতে হয়। **তামাকের সেই মিষ্টি গন্ধটা যেন পীর সাহেবের বুক থেকে বেরিয়ে আসে।** **তোয়াঙ্কল**— ভরসা বা নির্ভর। **দ্রুত বিস্তার**— তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যাওয়া। **দিগন্তপ্রসারী দূরত্বে**— অনেক দূরের সীমানায়। **দীনতাবোধ**— নিজেকে ছোট মনে করা নিজের ক্ষুদ্রতাবোধ। **দোটারান দ্বন্দ্ব দোল খায়**— পীর ও মজিদ এ দুইয়ের মধ্যে কাকে তারা মানবে সেই দ্বন্দ্ব তাদের মনে আসে। **নাগাল**— ধরা ছোঁয়া। **নিতিবিত্তি করে**— সংকোচ ও ইতস্তত করে। **নূরানী চেহারার দীপ্তি**— পীর সাহেবের চেহারার মধ্যে যে সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা তাকে নূরের ছটার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। **নির্ণীত করা**— স্থির বা ধার্য করা, ধরে নেওয়া। **প্রলুপ্ত করবার জন্য**— লোভ দেখানোর জন্য। **পাখা সঞ্চালন**— পাখা চালনা বা নাড়ানো। **বজ্রনিদাদ**— মেঘের প্রচণ্ড শব্দের মতো কণ্ঠের আওয়াজ। **বয়েত**— শ্লোক। **ব্যাপ্তেজ**— ক্ষতস্থানে লাগানোর জন্য কাপড়ের পটি। **বাজখাঁই**— উঁচু ও কর্কশ আওয়াজ। **বাতরসক্ষীত পদযুগলে**— পীর সাহেবের মোটাসোটা ফোলা পা। লেখক ব্যঙ্গ করে পীরের পায়ের মোটামোটা রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, বাতরসের জন্যই পীর সাহেবের পা দুটো অত মোটা। **বেদাতি**— ইসলাম ধর্মের প্রচলিত রীতিনীতির বাইরের কোন কিছু। **বেশরিয়তি**— ইসলাম ধর্মের আইন বিরুদ্ধ। **বৃহৎ মায়াজাল বিস্তার**— মিথ্যা আশ্বাস ও নানা প্রলোভনের দোহাই দিয়ে সরল লোকজনকে আকৃষ্ট করে ফেলা, অনেকটা মায়াজালে আবদ্ধ করার মত। **ভাবমগ্নতা**— ভাবের পাগলামি। **মকরুহ**— গর্হিত, নিষিদ্ধ। **মনোমুগ্ধকর**— মনকে যা মুগ্ধ করে। **মরা কান্না**— কেউ মারা যাওয়ার সময় নিকট জনেরা যেভাবে কাঁদে। **মূর্তিবৎ**— মূর্তির মতো। **মুখ খিঁচি**— মুখ বিকৃত করে খারাপ কথা বলা। **রুহানি তাকত**— আত্মার



শক্তি। **লেজুড়**– লেজ (আঞ্চলিক শব্দ)। **শক্তি**– ভীত। **শত সহস্র সাপ শিস দেয়**– গনগনে আগুনের উত্তাপে যে ধোয়া হয় এবং ভাষা ওঠে তাতে এক ধরনের শব্দ হয়। লেখক এই শব্দকে সাপের শিস দেয়ার শব্দের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ তুলনা আগুনের ভয়াবহতার সঙ্গে মজিদের মনে জাগ্রত কামুকতার চিত্র বলে ধারণা করা যায়। **শাহি কাণ্ডকারখানা**– বিরাট আয়োজন। **শোকর গুজার করবার ভাষা**– আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য দোয়া, যে ভাষায় ও প্রশংসায় আল্লাহ সন্তুষ্ট হন সেরকম ভাষা। **সর্বজনবিদিত**– সকলের জানা।



সারসংক্ষেপ

পৌষ মাসে নতুন ধান আসে মজিদের ঘরে। মজিদ বলে আল্লাহর রহমতেই এসব হয়েছে, তার ওপর রয়েছে লালসালুতে আবৃত কবরের নিচের মোদাচ্ছের পীরের বিশেষ দোয়া। মজিদের স্ত্রী রহীমা আর হাসুনীর মা রাত জেগে ধান সিদ্ধ করে। মজিদ তার কাছে আসা লোকজনদের খোদাতালার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে। কিন্তু এসব মাহাত্ম্য বর্ণনার সময় তার মনের গভীরে ভাসতে থাকে হাসুনির মায়ের চেহারা। যে বছর গ্রামে প্রচুর ধান হয় সে বছর পীরের আগমনও ঘটে বেশি। এবারও তিন গ্রাম দূরে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মতলুব খাঁর বাড়িতে এক বিরাট পীর এসেছেন। পীরের আগমনে চারদিকে যে একটা তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে মজিদ তা টের পায়। সবাই ছুটছে ঐ পীরের কাছে। মজিদ রাতে রহীমার মুখে সেই পীরের কথা শুনে জ্বলে ওঠে রাগে। এবার সে শক্তি না হয়ে পারে না। একদিন মজিদ ঐ পীরের আন্তানায় যায়। গিয়ে দেখে অসংখ্য লোক। মতলুব মিয়া হুজুরের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলে, তাঁর ক্ষমতা এত বেশি যে তিনি সূর্যকেও ধরে রাখতে পারেন। জোহরের বেলাশেষে পীর সাহেবের লোকেরা জোহরের নামাজ পড়ার জন্য সবাইকে কাতারে দাঁড়াতে বলে। মজিদ এবার চীৎকার করে প্রতিবাদ জানায়। পীরের লোকেরা লাঠি দিয়ে মেপেও জোহরের নামাজের সময় বের করতে পারে না। মজিদ তখন মুখ খিঁচি করে পীরের ক্ষমতা নিয়ে কটাক্ষ করে। আর মহব্বতনগরের লোকদের নিয়ে ফিরে আসে। মজিদ গ্রামের লোকজনকে বোঝায় যে, পীর সাহেব মানুষকে বিপথে নিচ্ছে। মহব্বতনগরের লোকজন দলবদ্ধ হয়ে পীরের আন্তানায় হামলা করতে গিয়ে আহত হয়ে হাসপাতালে যায়। খবর শুনে মজিদ তাদের দেখে আসে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৭. পীর সাহেবের প্রধান মুরিদের নাম কী?

- ক. ধলা মিয়া
গ. আকাস আলি

- খ. মতলুব খাঁ
ঘ. খালেক ব্যাপারি

১৮. মজিদের রাতে ঘুম হয় না কেন?

- ক. জাঁদরেল পীরের আগমনে
গ. বাড়ি ছেড়ে আসায়

- খ. সন্তানের আকাক্ষায়
ঘ. হাসুনির মা প্রশয় না দেয়ায়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

গতমাসে শূয়াগ্রামে একজন নতুন পীর এসেছেন। পীর সাহেব বড়ই কামেল এবং একজন পরহেজগার মানুষ। ফলে দলে দলে গ্রামের লোক তাঁর নিকট আসতে থাকে। এতে স্থানীয় মোল্লা-মৌলভিরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

১৯. উদ্দীপকের পীর সাহেবের সঙ্গে ‘লালসালু’ উপন্যাসের কোন চরিত্রটি সামঞ্জস্যপূর্ণ?

- ক. আওয়ালপুরের পীর
গ. ধলা মিঞা

- খ. খালেক ব্যাপারি
ঘ. কাদেরের পীর

২০. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ হল–

- i. সবলের ক্ষমতা চিরস্থায়ী হয়

- ii. প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা

- iii. প্রতিপক্ষের আবির্ভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i

- খ. ii

- গ. iii

- ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৬



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- আমেনা বিবির জন্য পীর সাহেবের পানি পড়া নিয়ে আসা সম্পর্কিত ঘটনাটি বিবৃত করতে পারবেন।
- আমেনা বিবির সন্তানলাভের উপায় হিসেবে মজিদের মতলবের একটি ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।



মূলপাঠ

বাইরে নিরুদ্দিগ্ন ও সচ্ছন্দ থাকলেও ভেতরে-ভেতরে মজিদের মন ক-দিন ধরে চিন্তায় ঘুরপাক খায়। আওয়ালপুরে যে-পীর সাহেব আস্তানা গেড়েছে তিনি সোজা লোক নন। বহু-পুরুষ আগে দীর্ঘ পথশ্রম স্বীকার করে আবক্ষ দাড়ি নিয়ে শানদার জোব্বাজুবা পরে যে-লোকটি এদেশে আসেন, তাঁর রক্ত ভাটির দেশের মেঘ পানিতেও একেবারে আ-নোনা হয়ে যায়নি। পান্সা হয়ে গিয়ে থাকলেও পীর সাহেবের শরীরে সে-ভাগ্যাবেষী দুঃসাহসী ব্যক্তিরই রক্ত। কাজেই একটা পাল্টা জবাবের অস্বস্তিকর প্রত্যাশায় থাকে মজিদ। মহব্বতনগরের লোকেরা আর ওদিকে যায় না। কাজেই, আক্রমণ যদি একান্ত আসেই আগে-ভাগে তার হদিশ পাবার জো নেই। সে জন্য মজিদের মনে অস্বস্তিটা রাত দিন আরো খচখচ করে।

মজিদ ও-তরফ থেকে কিছু একটা আশা করলে কী হবে, তিনগ্রাম ডিঙিয়ে মহব্বতনগরে এসে হামলা করার কোনো খেয়াল পীর সাহেবের মনে ছিলো না। তার প্রধান কারণ তাঁর জইফ অবস্থা। এ-বয়সে দাঙ্গাবাজি হৈ-হাঙ্গামা আর ভালো লাগে না। সাগরেদদের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে প্রধান মুরিদ মতলুব খাঁ, একটা জঙ্গি ভাব দেখালেও হুজুরের নিষ্পৃহতা দেখে শেষ পর্যন্ত তারা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। পীর সাহেব অপরিসীম উদারতা দেখিয়ে বলেন, কুত্তা তোমাকে কামড়ালে তুমিও কি উল্টো তাকে কামড়ে দেবে? যুক্তি উপলব্ধি করে সাগরেদরা নিরস্ত হয়। তবু স্থির করে যে, মজিদ কিংবা তার চেলারা যদি কেউ এধারে আসে তবে একহাত দেখে নেয়া যাবে। সেদিন কালুদের কল্লা যে ধড় থেকে আলাদা করতে পারেনি, সে-জন্য মনে প্রবল আফসোস হয়।

গ্রামের একটি ব্যক্তি কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ করে না। সে অন্দেরের লোক, আর তার তাগিদটা প্রায় বাঁচা-মরার মতো জোরালো। পীর সাহেবের সাহায্যের তার একান্ত প্রয়োজন। না হলে জীবন শেষ পর্যন্ত বিফলে যায়।

সে হলো খালেক ব্যাপারীর প্রথম পক্ষের বিবি আমেনা। নিঃসন্তান মানুষ। তের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিলো, আজ তিরিশ পেরিয়ে গেছে। শূন্য কোল নিয়ে হা-হুতাশের সঙ্গে বুক বেঁধে তবু থাকা যেতো, কিন্তু চোখের সামনে সতীন তানু বিবিকে ফি-বৎসর আস্ত-আস্ত সন্তানের জন্ম দিতে দেখে বড় বিবির আর সহ্য হয় না। দেখা-সওয়ার একটা সীমা আছে, যা পেরিয়ে গেলে তার একটা বিহিত করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আওয়ালপুরে পীর সাহেবের আগমন-সংবাদ পাওয়া অবধি আমেনা বিবি মনে একটা আশা পোষণ করছিলো যে, এবার হয়তো বা একটা বিহিত করা যাবে। আগামী বছর তানু বিবির কোলে যখন নোতুন এক আগন্তুক ট্যা-ট্যা করে উঠবে তখন সেও কণ্ঠ কাতর করে বলতে পারবে, তার গা-টা কেমন-কেমন করছে, বুক ঠেলে কেবল যেন বমি আসতে চায়। তখন নানি-বুড়ির ডাক পড়বে। শেষে নানি-বুড়ি মাথা নেড়ে হেসে রসিকতা করে বলবে, ওস্তাদের মার শেষ কাটালে। যৌবনের দিক থেকে সে তানু বিবির মতো জোয়ারলাগা ভরাগাঙ না হলেও একেবারে টস্কানো নয়, বোচা-চ্যাবকা কালো মানুষও নয়। রঙে ছায়া পড়বার উপক্রম করলেও এখনো সে-রঙ ধবধব করে; নাকে সতীনের মতো জ্বলজ্বলে নাকছাবি না থাকলেও তা খাড়া, টিকলো। তার সন্তান আকাশের চাঁদের মতো সুন্দর হবেই।

কিন্তু মুশকিল হলো কথাটা পাড়া নিয়ে। প্রথমত, ব্যাপারীকে নিরালা পাওয়া দুষ্কর। দ্বিতীয়ত, চোখের পলকের জন্য পেলেও তখন আবার জিহ্বা নড়ে না। ফিকিরফন্দি করতে-করতে এদিকে মজিদ কাণ্ডটা করে বসলো। কিন্তু আমেনা বিবি মরিয়া হয়ে উঠেছে। সুযোগটা ছাড়া যায় না। সারা জীবন যে-মেয়েলোকের সন্তান হয়নি, পীর সাহেবের পানিপড়া খেয়ে সে-ও কোলে ছেলে পেয়েছে।

একদিন লজ্জা-শরমের বালাই ছেড়ে আমেনা বিবি বলেই বসে, পীর সাবের থিকা একটু পানিপড়া আইনা দেন না।



শুনে অবাক হয় ব্যাপারী। নিটোল স্বাস্থ্য বিবির, কোনোদিন জ্বরজ্বারি, পেট কামড়ানি পর্যন্ত হয় না।

আমেনা বিবি লজ্জা পেয়ে আলগোছে ঘোমটা টেনে সেটি আরো দীর্ঘতর করে, আর তার মনের কথা ব্যাপারী যেন বিনা উত্তরেই বোঝে, –তাই দোয়া করে মনে মনে।

উত্তর পায় না বলেই ব্যাপারী বোঝে। তারপর বলে, –আইচ্ছা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে যে, পীর সাহেবের ত্রিসীমানায় আর তো ঘেঁষা যায় না। অবশ্য পীর সাহেবকে মজিদ খোদ ইবলিশ শয়তান বলে ঘোষণা করলেও তবু বউ-এর খাতিরে পানিপড়ার জন্য তাঁর কাছে যেতে বাধ্যতো না, কারণ পীর নামের এমন মাহাত্ম্য যে, শয়তান ডেকেও সে-নামকে অন্তরে-অন্তরে লেবাসমুক্ত করা যায় না। গাভুর-চাষা-মাঠাইলারা পারলেও অন্তত বিস্তর জমিজমার মালিক খালেক ব্যাপারী তা পারে না। কিন্তু সাধারণ লোকে যেটা সচ্ছন্দে করতে পারে সেটা আবার তার দ্বারা সম্ভব নয়। তা হলো শয়তানকে শয়তান ডেকে সমাজের সামনে ভরদুপুরে তাকে আবার পীর ডাকা এবং সমাজের মূল হলো একটি লোক- যার আঙুলের ইশারায় গ্রাম ওঠে-বসে, সাদাকে কালো বলে, আসমানকে জমিন বলে। সে হলো মজিদ। জীবনস্রোতে মজিদ আর খালেক ব্যাপারী কী করে এমন খাপে-খাপে মিলে গেছে যে, অজান্তে অনিচ্ছায়ও দুজনের পক্ষে উল্টো পথে যাওয়া সম্ভব নয়। এক জনের আছে মাজার, আরেক জনের জমি-জোতের প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।

সে-জন্য সে ভাবিত হয়, দু-দিন আমেনা বিবি কান্নাসজল কণ্ঠের আকুতি-মিনতি উপেক্ষা করে। অবশেষে-বিবির কাতর দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরেই হয়তো একটা উপায় ঠাহর করে ব্যাপারী।

ঘরে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর এক ভাই থাকে। নাম ধলমিঞা। বোকা কিছিমের মানুষ, পরের বাড়িতে নির্বিবাদে খায়-দায় ঘুমায়, আর বোন-জামাইয়ের ভাত এতই মিঠা লাগে যে, নড়ার নাম করে না বহরান্তেও। আড়ালে-আড়ালে থাকে। কচিং কখনো দেখা হয়ে গেলে দুটি কথা হয় কী হয় না, কোনোদিন মেজাজ ভালো থাকলে ব্যাপারী হয়তো-বা শালার সঙ্গে খানিক মস্করাও করে।

তাকে ডেকে ব্যাপারী বললে : একটা কাম করেন ধলমিঞা।

ব্যাপারীর সামনে বসে কথা কইতে হলে চরম অশ্রুতি বোধ করে সে। কেমন একটা পালাই-পালাই ভাব তাকে অস্থির করে রাখে। কোনোমতে বলে,

–কী কাম দুলামিঞা?

কী তার কাজ ব্যাপারী আগাগোড়া বুঝিয়ে বলে। আগে প্রথমে বিবির দিলের খায়েশের কথা দীর্ঘ ভণিতা সহকারে বর্ণনা করে। তারপর বলে, ব্যাপারীটা অত্যন্ত গোপনীয়, এবং আওয়ালপুর তাকে রওনা হতে হবে শেষরাতের অন্ধকারে- যাতে কাকপক্ষীও খবর না পায়। আর সেখানে গিয়ে তাকে প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এ-গ্রাম থেকে গেছে এ-কথা ঘুণাক্ষরেও বলতে পারবে না। বলবে যে, করিমগঞ্জের ওপারে তার বাড়ি। বড় বিপদে পড়ে এসেছে পীর সাহেবের দোয়া পানির জন্য। তার এক নিকটতম নিঃসন্তান আত্মীয়্যর একটা ছেলের জন্য বড় সখ হয়েছে। সখের চেয়েও যেটা বড় কথা, সেটা হলো এই যে, শেষপর্যন্ত কোনো ছেলে-পুলে যদি না-ই হয় তবে বংশে বাতি জ্বালাবার আর কেউ থাকবে না। মোট কথা, ব্যাপারীটা এমন করুণভাবে তাঁকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, শুনে পীর সাহেবের মন গলে যেন পানি হয়ে যায়।

বিবির বড় ভাই, কাজেই রেস্তায় মুকুবি। তবু ধমকে-ধামকে কথা বলে ব্যাপারী। পরগাছা মুকুবিকে আবার সম্মান, তার সঙ্গে আবার কেতাদুরস্ত কথা।

–কী গো ধলমিঞা, বুঝলান নি আমার কথাটা?

–জি, বুঝছি। কাঁধ পর্যন্ত ঘাড় কাৎ করে ধলমিঞা জবাব দেয়। প্রস্তাব শুনে মনে মনে কিন্তু ভাবিত হয়। ভাবনার মধ্যে এই যে, আওয়ালপুর ও মহকুতনগরের মাঝপথে একটা মস্ত তেঁতুলগাছ পড়ে এবং সবাই জানে যে সেটা সাধারণ গাছ নয়, দস্তুরমত দেবংশি।

কাকপক্ষী যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন অনেক রাত। অত রাতে কি একাকী ঐ তেঁতুল গাছের সন্নিগটে ঘেঁষা যায়? ভাবনার মধ্যে এও ছিলো যে, যে-সব দাঙ্গা হাঙ্গামার কথা শুনেছে, তারপর কোন সাহসে পা দেয় মতলুব খাঁর গ্রামে। তেঁতুল গাছের ফাড়াটা কাটলেও এখানে গিয়ে পীর সাহেবের দজ্জাল সাজ-পাঙ্গদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া নেহাৎ সহজ হবে না। নিজের পরিচয় নিশ্চয়ই সে লুকোবার চেষ্টা করবে, কিন্তু ধরা পড়ে যাবে না, কী বিশ্বাস! কে কখন চিনে ফেলে কিছু ঠিক নেই। যে চেষ্টা লম্বা ধলা মিঞা।



—ভাবেন কী? হুমকি দিয়ে ব্যাপারী প্রশ্ন করে।

—জি, কিছু না!

তবু কয়েক মুহূর্ত তার পানে চেয়ে থেকে ব্যাপারী বলে,

—আরেক কথা। কথাটা যানি আপনার বইনে না হুনে। আপনারে আমি বিশ্বাস করলাম।

—তা করবার পারেন।

সারাদিন ধলামিঞা ভাবে, ভাবে। ভাবতে-ভাবতে ধলামিঞার কালামিঞা বনে যাবার যোগাড়। বিকেলের দিকে কিন্তু একটা বুদ্ধি গজায়। ব্যাপারীর অনুপস্থিতির সুযোগে বাইরের ঘরে বসে নলের হুকায় টান দিচ্ছিলো, হঠাৎ সেটা নাবিয়ে রেখে সে সরাসরি বাইরে চলে যায়। তারপর দীর্ঘ দীর্ঘ পা ফেলে হাঁটতে থাকে মোদাচ্ছের পীরের মাজারের দিকে। হাঁটার চঙ দেখে পথে দু-চারজন লোক থ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়— তার ক্রক্ষেপ নেই।

বাইরেই দেখা হয় মজিদের সঙ্গে। গাছতলায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কইছে। কাছে গিয়ে গলা নিচু করে সে বললে,

—আপনার লগে একটু কথা আছিল।

গলাটা বিনয়ে নম্র হলেও উত্তেজনায় কাঁপছে।

খালেক ব্যাপারী তখন যে-দীর্ঘ ভণিতাসহকারে আমেনা বিবির মনের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছিলো, তারই ওপর রঙ ফলিয়ে, এখানে-সেখানে দরদের ফোঁটা ছিটিয়ে, এবং ফেনিয়ে ফুলিয়ে দীর্ঘতর করে ধলামিঞা কথা পাড়ে। বলে, মেয়েমানুষের মন, বড় অবুঝ। নইলে সাক্ষাৎ ইবলিশ শয়তান জেনেও তারই পানিপড়া খাবার সাধ জাগবে কেন আমেনা বিবির? কিন্তু মেয়েমানুষ যখন পুরুষের গলা জড়িয়ে ধরে তখন আর নিস্তার থাকে না। খালেক ব্যাপারী আর কী করে। ধলা মিঞাকে ডেকে বলে দিলে, আওয়ালপুরে গিয়ে পীরসাহেবটির কাছ থেকে সে যেন পানিপড়া নিয়ে আসে।

মজিদ নীরবে শোনে। হঠাৎ তার মুখে ছায়া পড়ে। কিন্তু ক্ষণকালের জন্য। তারপর সহজ গলায় প্রশ্ন করে,

—তা কখন যাইবেন আওয়ালপুর?

ধলামিঞা হঠাৎ ফিচকি দিয়ে হাসে।

—আওয়ালপুর গেলে কী আর আপনার কাছে আহি? কী কেলা পানি পড়া দিব হে লোকটা? বেচারির মনে মনে যখন একটা ইচ্ছা ধরছে তখন ফাঁকির কাম কি ঠিক হইব? —আমি কই, আপনাই দেন পানিপড়া— আর কথাটা একদম চাইপা যান।

অনেকক্ষণ মজিদ চুপ হয়ে থাকে। এর মধ্যে মুখে ছায়া আসে, যায়! তার পানে চেয়ে আর তার দীর্ঘ নীরবতা দেখে ধলামিঞার সব উত্তেজনা শীতল হয়ে আসে। অবশেষে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে,

—কী কন?

—কী আর কমু এই সব কাম কি চাপাচাপি দিয়া হয়। এ কি আইন-আদালত না মামলা মকদ্দমা? দলিল-দস্তাবেজ জাল হয়, কিন্তু খোদাতা'লার কালাম জাল হয় না। আপনে আওয়ালপুরেই যান।

মুহূর্তে ধলামিঞার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে ভয়ে। রাতের অন্ধকারে দেবংশি তেঁতুল গাছটা কী যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, ভাবতেই বুকের রক্ত শীতল হয়ে আসে। তাছাড়া পীর সাহেবের ডাঙাবাজ চেলাদের কথা ভাবলেও গলা শুকিয়ে আসে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হয়তো ভয়টাকে হজম করে নিয়ে ভগ্নগলায় ধলামিঞা বলে,

—আপনে না দিলে না দিলেন। কিন্তু হেই পীরের কাছে আমি যামু না।

—যাইবেন না ক্যান? এবার একটু রুগ্ন স্বরে মজিদ বলে, ব্যাপারী মিঞা যখন পাঠাইতেছেন তখন যাইবেন না ক্যান?

উজ্জ্বল দুইদিকে কাটে। কোনটা নিয়ে কোনটা ফেলে ঠিক করতে না পেরে ধলামিঞা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। অবশেষে কথাটার সঠিক মমার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা ছেড়ে সরাসরি বলে,

—হেই কথা আমি বুঝি না। কাইল সকালে এক বোতল পানি দিয়া যামু নে, আপনি পইড়া দিবেন।

ধলামিঞার মতলব, শেষরাতে উঠে গ্রামের বাইরে কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে, দুপুরের দিকে ফিরে এসে মজিদের কাছ থেকে বোতলটা নিয়ে যাবে। আর পীর সাহেবের খেদমতে পৌঁছে দেবার জন্য ব্যাপারী যে-টাকা দিবে তার অর্ধেক বেমালাম পকেটস্থ করে বাকিটা মজিদকে দেবে। মজিদ প্রায় ঘরের লোক। ব্যাপারীর কাছে তার দাবি-দাওয়া নেই। দিলেও চলে, না দিলেও চলে। তবু কথাটা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে হলে মজিদের মুখকেও চাপা দিতে হয়।



—তাইলে পাকাপাকি কথা হইল। ভরদুপুরে আমি আসুমনে পানি পড়া নিবার জন্য। তারপর তাড়াতাড়ি বলে, ঠগের পিছনে বেহুদা টাকা ঢালন কি বিবেক বিবেচনার কাম?

টাকার ইঙ্গিতটা স্পষ্ট এবং লোভনীয় বটে। কিন্তু তবু মজিদ তার কথায় অটল থাকে। নিমরাজিও হয় না। কঠিন গলায় বলে, —না, আপনে আওয়ালপুরেই যান।

এতক্ষণ পর ধলামিঞা বোঝে যে, মজিদের কথাটা রাগের। বিবির খাতিরে ব্যাপারী মজিদের নির্দেশের বরখেলাফ করে সে-ঠক-পীরের কাছেই লোক পাঠাবে পড়াপানি আনবার জন্য— সেটা তার পছন্দসই নয়। না হবারই কথা। ব্যাপারটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার মতো।

ধলামিঞা ভারি মুখ নিয়ে প্রস্থান করে। ঘরে ফিরে আবার ভাবতে শুরু করে। কিন্তু কোনো বুদ্ধি ঠাহর করবার আগেই মজিদ এসে উপস্থিত হয় ব্যাপারীর বৈঠকখানায়।

যতক্ষণ নোতুন এক ছিলাম তামাক সাজানো হয় কক্ষিতে, ততক্ষণ দু-জনে গরু-ছাগলের কথা কয়। দুয়েক বাড়িতে গরুর ব্যারামের কথা শোনা যাচ্ছে। মজিদের ধামড়া গাইটা পেট ফুলে ঢোল হয়ে আছে। রহীমা কত চেষ্টা করছে কিন্তু গাইটা দানা-পানি নিচ্ছে না মুখে। খাচ্ছেও না কিছু, দুধও দিচ্ছে না এক ফোঁটা।

তামাক এলে কতক্ষণ নীরবে ধূমপান করে মজিদ। তারপর এক সময় মুখ তুলে প্রশ্ন করে,

—হেই পীরের বাচ্চা পীর শয়তানের খবর কী? এহনো ইমানদার মানুষের সর্বনাশ করতাকে না সটকাইছে?

প্রশ্ন শুনে খালেক ব্যাপারী ঈষৎ চমকে ওঠে, তারপর তার চোখের পাতায় নাচুনি ধরে। চোখ অনেক কারণেই নাচে। তাই শুধু নাচলেই ঘাবড়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ব্যাপারীর মনে হয়, তামাক-ধোয়ার পশ্চাতে মজিদের চোখ হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে এবং সে-চোখ দিয়ে সে তার মনের কথা কেতাবের অক্ষরগুলোর মতো আগাগোড়া অনায়াসে পড়ে ফেলছে।

—কী জানি, কইবার পারি না। অবশেষে ব্যাপারী উত্তর দেয়। কিন্তু আওয়াজ শুনে মনে হয় গলাটা যেন ধসে গেছে হঠাৎ। সজোরে একবার কেশে নিয়ে বলে, হয়তো গেছে গিয়া।

মজিদ আস্তে বলে,

—তাইলে আর তাঁনার কাছে লোক পাঠাইয়া কী করবেন?

—লোক পাঠামু তাঁনার কাছে? বিস্ময়ে ব্যাপারী ফেটে পড়ে। কিন্তু মজিদের শীতল চোখদুটোর পানে তাকিয়ে হঠাৎ সে বোঝে যে, মিথ্যা কথা বলা বৃথা। শুধু বৃথা নয়, চেষ্টা করলে ব্যাপারটা বড় বিসদৃশও দেখাবে। যে করেই হোক, মজিদ খবরটা জেনেছে।

একবার সজোরে কেশে ধসে যাওয়া গলাকে অপেক্ষাকৃত চাঙা করে তুলে ব্যাপারী বলে,

—হেই কথা আমি ভাবতছি। আছে কী না আছে — হুদা হুদি পাঠান। তবু মেয়েমানুষের মন। সতীন আছে ঘরে। ক্যামনে কখন দিলে চোট পায় ডর লাগে। তা যাক। পাইলে পাইল, না পাইলে নাই। আসলে মন-বোঝান আর কী। ঠগ-পীরের পানিপড়ায় কি কোনো কাম হয়?

ধাক্কাটা সামলে নিয়ে ব্যাপারী ধীরে ধীরে সব বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করে। বলে, মজিদকে সে-বলে-বলে করেও বলতে পারেনি। আসল কথা তার সাহস হয়নি, পাছে মজিদ মনে ধরে কিছু। কথাটা মজিদের যে পছন্দ হয় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সে হুকায় জোর টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে চোখ গম্ভীর করে তোলে। ব্যাপারীর মতো বিস্তারিত জমিজমার মালিক ও প্রতিপত্তিশালী লোক তাকে ভয় পায়— শুনে পুলকিত হবারই কথা। ব্যাপারী আরো বলে যে, ধলামিঞাকে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছে— ঘুণাঙ্করেও কেউ যেন বুঝতে না পারে সে মহব্বতনগরের লোক। তাছাড়া, এ-গ্রামের কেউ যেন তাকে আওয়ালপুর যেতে না দেখে, কারণ তাহলে মজিদের নির্দেশের বরখেলাপ করা হয় খোলাখুলিভাবে।

ধলামিঞারে যতটা বেকুফ ভাবছিলাম, ব্যাপারী বলে, ততটা বেকুফ হে না। হে ভাবছে ভুয়া পানি আইনা ফায়দা কী। তাঁনার যখন একটা ছেলের সখ হইছেই—

মজিদ বাধা দেয়। ধলামিঞার গুণচর্চায় তার আকর্ষণ নেই। হঠাৎ মধুর হাসি হেসে বলে,

—খালি আমার দুঃখটা এই যে, আপনার বিবি আমারে একবার কইয়াও দেখলেন না। আমার থিকা ঠগ-পীর বেশি হইল? আমার মুখে কি জোর নাই?



—আহা-হা, মনে নিবেন না কিছু। মেয়েমানুষের মন। দূর থিকা যা হোনে তাতেই ঢলে।

—কথাটা ঠিক কইছেন। মজিদ মাথা নেড়ে স্বীকার করে। তারপর বলে, তয় কথা কী, তাগো কথা হুনলে পুরুষ থাকে না, মেয়েমানুষেরও অধম হয়। তাগো কথা হুনলে কি দুনিয়া চলে?

ব্যাপারীর মন্ত গৌফে আর ঘন দাড়িতে পাক ধরেছে। মজিদের কথায় সে গভীরভাবে লজ্জা পায়। তখনকার মতো মজিদের ভঙ্গিতেই বলে,

—ঠিকই কইছেন কথাটা। কিন্তু কী করি এখন। কাইন্দাকাইটা ধরছে বিবি।

—তানারে কন, পেটে যে বেড়ি পড়ছে হে বেড়ি না খোলন পর্যন্ত পোলাপাইনের আশা নাই। শয়তানের পানিপড়া খাইয়া কি হে-বেড়ি খুলবো?

পেটে বেড়ি পড়ার কথা সম্পূর্ণ নোতুন শোনায। শুনে ব্যাপারীর চোখ হঠাৎ কৌতূহলে ভরে ওঠে। সে ভাবে, বেড়ি, কিসের বেড়ি?

মজিদ হাসে। ব্যাপারীর অজ্ঞতা দেখেই তার হাসি পায়। তারপর বলে,

—পেটে বেড়ি পড়ে বইলাই তো জ্বীলোকের সন্তানাদি হয় না। কারো পড়ে সাত প্যাঁচ, কারো চোন্দো। একুশ বেড়িও দেখছি একটা। তয় সাতের উপরে হইলে ছাড়ান যায় না। আমার বিবির তো চোদ্দ প্যাঁচ!

ব্যাপারী উৎকর্ষিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

—আমার বিবিরটা ছাড়ান যায় না?

—ক্যান যায় না? তয় কথা হইতেছে, আগে দেখন লাগবো কয় প্যাঁচ তানার। কথাটা শুনে ব্যাপারী আবার না ভাবে যে মজিদ তার জ্বীর উদরাঞ্চল নগ্নদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখবে— তাই তাড়াতাড়ি বলে, এর একটা উপায় আছে।

উপায়টা কী, বলে মজিদ। একদিন সেহরি না খেয়ে আমেনা বিবিকে রোজা রাখতে হবে। সেদিন কারো সঙ্গে কথা কইতে পারবে না এবং শুদ্ধচিত্তে সারাদিন কোরান শরিফ পড়তে হবে। সন্ধ্যার দিকে এফতার না করে মাজার শরিফে আসতে হবে। সেখানে মজিদ বিশেষ ধরনের দোয়া দরুদ পড়ে একটা পড়াপানি তৈরি করে তাকে পান করতে দেবে। তারপর আমেনা বিবিকে মাজারের চারপাশে সাতবার ঘুরতে হবে।

যদি সাত প্যাঁচ হয় তবে সাত পাক দেবার পরই হঠাৎ তার পেট ব্যথায় টনটন করে উঠবে। ব্যাথাটা এমন হবে যে, মনে হবে প্রসববেদনা উপস্থিত হয়েছে।

ব্যাপারী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

—আর সাত পাকে যদি ব্যথা না ওঠে?

—তয় বুঝতে হইব যে, তানার চোদ্দ প্যাঁচ কী আরো বেশি। সাত প্যাঁচ হইলে দুশ্চিন্তার কারণ নাই।

তারপর মজিদ আবার গরুছাগলের কথা পাড়ে। এক সময় আড়-চোখে ব্যাপারীর পানে তাকিয়ে দেখে, গৃহপালিত জীবজন্তুর ব্যারামের কথায় তেমন মনোযোগ যেন নেই তার। আরো দু-চারটে অসংলগ্ন কথার পর মজিদ উঠে পড়ে।

ফেরবার পথে মোল্লা শেখের বাড়ির কাছে কাঁঠালগাছের তলে একটা মূর্তি নজরে পড়ে। মূর্তি ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিলো না, তাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়েছে। মগরেবের কিছু দেরি আছে, কিন্তু শীতসন্ধ্যা ধোঁয়াটে বলে দূর থেকে অস্পষ্ট দেখায় সে-মূর্তি। তবু তাকে চিনতে মজিদের এক পলক দেরি হয় না। সে হাসুনির মা। মুখটা ওপাশে ঘুরিয়ে আলতোভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

নিকটবর্তী হতেই হাসুনির মা কেমন এক কান্নার ভঙ্গিতে মুখ হাতে ঢাকে। আরো কাছে গিয়ে মজিদ থমকে দাঁড়ায়, দাড়িতে হাত সঞ্চালন করে কয়েক মুহূর্ত তাকে চেয়ে দেখে। তারপর বলে,

—কী গো হাসুনির মা?

যে-কান্নার ভঙ্গিতে তখন হাতে মুখ ঢেকেছিলো সে এবার মজিদের প্রশ্নে আন্তে নাকিসুরে কেঁদে ওঠে। কান্নাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; আসল উদ্দেশ্য এই বলা যে, যা ঘটেছে তা হাসবার নয়, কান্নার ব্যাপার।



আকস্মিক উদ্বেগ বোধ করে মজিদ। মেয়েটার চলন-বলন কেমন যেন নম্র। বয়স হলেও আনাড়ি বেঠিকপানা ভাব। হাতে নিলে যেন গলে যাবে। মাস-খানেক আগে একদিন শেষরাতে খড়কুটোর উজ্জ্বল আলোয় যার নগ্ন বাহু-পিঠ-কাঁধ দেখেছিলো মজিদ, সে যেন ভিন্ন কোনো মানুষ। এখন তাকে দেখে শ্বসন দ্রুততর হয় না।

কণ্ঠে দরদ মাখিয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

—কী হইছে তোমার বিটি?

এবার নাক ফ্যাৎ-ফ্যাৎ করে হাসুনির মা অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে,

—মা মরছে।

বজ্রাহত হবার ভান করে মজিদ। আর তার মুখ দিয়ে অভ্যাসবশত সে-কথাটাই নিঃসৃত হয়, যা আজ কতশত বছর যাবৎ কোটি কোটি খোদার বান্দারা অন্যের মৃত্যু-সংবাদ শুনে উচ্চারণ করে আসছে। তারপর বলে,

—আহা, ক্যামনে মরলো গো বিটি?

—এ্যামনে।

এমনি মারা গেছে কথাটা কেমন যেন শোনায। পলকের মধ্যে মজিদের স্মরণ হয় তাহেরের বৃদ্ধ ঢেঙা বাপের বিচারের দৃশ্য। তার জন্য অবশ্য অনুতাপ বোধ করে না মজিদ। কেবল মনে হয় কথাটা। থেমে আবার প্রশ্ন করে,

—ছ্যামরারা কই?

—আছে। ধান বিক্রি কইরা ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুইলা আছে। ছোটডি কয় কেয়া নায়ের মাঝি হইব।

—দাফন-কাফনের যোগাড়যন্ত্র করতাছে নি?

—করতাছে। মোল্লা শেখে জানাজা পড়বো।

খেলাল তুলে হঠাৎ দাঁত খোঁচাতে থাকে মজিদ, কপালে ক-টা রেখা ফোটে। তারপর চিন্তিত গলায় বলে,

—মওতের আগে খোদার কাছে মাফ চাইছিল নি তহুর মা?

ধাঁ করে হাসুনির মা মুখ ঘুরিয়ে তাকায় মজিদের পানে। দেখতে না দেখতে চোখে ভয় ঘনিয়ে ওঠে।

—মাফ চাইছিল কি না কইবার পারি না।

কয়েক মুহূর্ত মজিদ নীরব থাকে। এ-সময়ে কপালে আরো কয়েকটি রেখা ফুটে ওঠে। কিছু না বললেও হাসুনির মা বোঝে, মজিদ তার মায়ের কবরের আজাবের কথা ভাবে। মায়ের মৃত্যুতে সে তেমন কিছু শোক পেয়েছে বলা যায় না। বার্ষিক্যের শেষ স্তরে কারো মৃত্যু ঘটলে দুঃখটা তেমন জোরালোভাবে বুকে লাগে না। তবে মায়ের কুকড়ানো রগ-ঝোলা যে-মৃত দেহটি এখনো ঘরের কোণে নিষ্পন্দভাবে পড়ে আছে সে-দেহটিকে নিয়ে যখন পেছনের জঙ্গলের ধারে কদমগাছের তলে কবর দেয়া হবে, তখন হয়তো দমকা হাওয়ার মতো বুকে সহসা হাহাকার জাগবে। তারপর শীঘ্র আবার মিলিয়ে যাবে সে-হাহাকার। কিন্তু তার মা নিঃসঙ্গ সে কবরে লোক-চোখের অন্তরালে অকথ্য যন্ত্রণাভোগ করবে— এ-কথা ভাবতেই মেয়ের মন ভয়ে ও বেদনায় নীল হয়ে ওঠে। কলাপাতার মতো কেঁপে উঠে সে প্রশ্ন করে,

—মায়ের কবরে আজাব হইব?

সরাসরি কথাটার উত্তর দিতে মজিদের মুখে বাধে। থেমে বলে,

—খোদা তারে বেহেস্তে-নছিব কর, আহা।

একবার আড়চোখে তাকায় হাসুনির মা-র দিকে। চোখে মরণ-ভীতির মতো গাঢ় ছায়া দেখে হয়তো বা একটু দুঃখও হয়। ভাবে, তার জন্য লোকটি নিজেই দায়ী। আর যাই হোক, মজিদের কথাকে যে অবহেলা করে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে চায় তাকে সে মাফ করতে পারে না।

তারপর দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করে মজিদ। বাঁ ধারে মাঠ। দিগন্তের কাছে ধূসর ছায়া দেখে মনে ভয় হয়। নামাজ কাজা হবে না তো?



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অন্দর- ভিতর বাড়ি। অন্তরালে- আড়ালে। অসংলগ্ন- এলোমেলো। অস্বস্তিকর- অশান্তিপূর্ণ। আফসোস- অনুতাপ, দুঃখ। আন্তানা- স্থান। আবক্ষ- বুক পর্যন্ত। আলগোছে- আশ্তে করে। ঈমানদার- বিশ্বাসী। উপলব্ধি করা- বোঝা। উৎকর্ষিত- চিত্তিত, ব্যাকুল। উদরাঞ্চল- পেট। উদ্বেগ- দুশ্চিন্তা। কল্লা- মাথা। কালাম- বাণী। কিছিম- ধরন। কেয়া- ভাড়া। খচখচ- অস্বস্তির ভাব। খড়কুটো- শুকনো ঘাস। খাড়া হয়ে দাঁড়ানো- নিজের মতো কাজ করা, নিজের শক্তিতে দাঁড়ানো। খেদমতে- সেবায়। খোদ- স্বয়ং, নিজেই। গলা ধসে যাওয়া- গলা দিয়ে শব্দ না আসা। গাভুর- চাকর, শ্রমিক। গুণচর্চা- গুণের প্রশংসা। ঘাবড়াবার- ভয় পাওয়ার। চাঙ্গা- সজীব। চেলা- শিষ্য। ছাতা- ছত্রাক, ময়লা দাগ। ছিলিম- এক কণ্ঠে তামাক। জুইফ- অতি বৃদ্ধ, শক্তিহীন। জোব্বা জুব্বা- জোব্বা ও জুব্বা একই অর্থবোধক শব্দ। এর অর্থ লম্বা আলখাল্লা জাতীয় চিলে জামা। জো- উপায়। টসকানো- দুমড়ানো। ঠাহর- অনুমান, খোঁজ। ত্রিসীমানায়- কাছে কিনারে। দজ্জাল- দুষ্ট, অত্যাচারী। দরদ- সহানুভূতি। দাঙ্গাবাজি- মারপিট। দানাপানি- খাদ্য। দাফন-কাফন- মৃত মানুষকে ধুয়ে কাপড় পরিয়ে কবর দেয়া, মৃতদেহের সৎকার। দিগন্ত- আকাশ ও মাটির মিলন রেখা। দেবংশি- দেও-দানবের অংশ, ভুতের আশ্রয়। ধড়- শরীর। ধাক্কা সামলানো- স্বাভাবিক হওয়া। নগ্ন দৃষ্টি- খোলা চোখ। নিমরাজি- অর্ধেক রাজি। নিরস্ত- ক্ষান্ত। নিস্পৃহতা- ইচ্ছার অভাব। নাকছাবি- নাকের অলংকার। নানি বুড়ি- নানি দাদী জাতীয় গ্রাম্য ধাত্রী। নিরালা- একলা, নির্জনে। নির্বিবাদে- শান্তিতে। নিস্তার- অব্যাহতি। নিষ্পন্দভাবে- প্রাণহীনভাবে। নীল হয়ে ওঠা- যন্ত্রার প্রকাশ। পলক- অতি সামান্য সময়, চোখের পাতা পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ। পাক ধরেছে- পেকে উঠছে। প্রতিপত্তিশালী- শক্তিমান। প্রতিপত্তি- ক্ষমতা, দাপট। ফিকির ফন্দি- কৌশল, বুদ্ধি। ফিচকি দিয়ে হাসা- দুষ্টের মতো হাসা। ফি-বৎসর- প্রত্যেক বৎসর। বরখেলার- অমান্য। বজ্রাহত- বাজ পড়েছে এমন। বিসদৃশ- উল্টাপাল্টা। বেঠিকপানা- ভুলযুক্ত। বেমালাম- অগোচরে, অজ্ঞাতে। বেহেস্ত-নছিব- বেহেস্তে যাওয়ার ভাগ্য। বেড়ি- বেটনি, বন্ধনি। ব্যারাম- অসুখ। ভাটির দেশ- নদী বিধৌত অঞ্চল, বাংলাদেশ অর্থে। ভারি মুখ- বেজার, অখুশি মুখ। মর্মার্থ- মূল কথা। মতলব- উদ্দেশ্য। মনের কথা পড়া- মনের ভেতরে কী আছে তা জেনে ফেলা। মনে ধরা- মনে কষ্ট পাওয়া। মাঠাইল- মাঠচাষী। রেস্তা- সম্পর্ক, আত্মীয়তা। লেবাস মুক্ত- পোশাকহীন। শানদার- উজ্জ্বল, জৌলুশপূর্ণ। শুদ্ধচিত্তে- পবিত্র মনে। শ্বসন- শ্বাস-প্রশ্বাস। সঞ্চালন- নাড়ানো, চালানো। সন্দিগ্ধ- সন্দেহযুক্ত। সাকরেন্দ- শিষ্য। হদিশ- সংবাদ, খবর। হাহাকার- দুঃখ, শোক।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যের অর্থ

উপন্যাসকে জীবনধর্মী করার জন্য চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার হয়। ‘লালসালু’ একটি বাস্তব জীবনধর্মী উপন্যাস, সেজন্য এ উপন্যাসেও আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ হয়েছে। আপনি ‘লালসালু’ উপন্যাসের আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যরীতি ভালো করে দেখুন এবং বুঝতে চেষ্টা করুন।

‘লালসালু’ উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা সবাই গ্রামের, সুতরাং এটা স্বাভাবিক। ওয়ালীউল্লাহ তাঁর ‘লালসালু’ উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার চমৎকার ব্যবহার করেছেন। মজিদ মাজারের খাদেম এবং একজন মোল্লা। তার মুখের কথা মোল্লা-মৌলবির মতো হয়েছে; এতে মাঝে মাঝে আরবি ফারসি শব্দের মিশেল আছে। গ্রামের অন্যান্য চরিত্রের সংলাপও যথাযথ হয়েছে। ‘লালসালু’ উপন্যাসের আঞ্চলিক ভাষা বাংলাদেশের কোন্ অঞ্চলের ভাষা সে প্রশ্ন করা যায়। আমাদের মনে হয়, ঢাকা অঞ্চলের ভাষার আদল এতে আছে। এ-ভাষার ক্রিয়াপদের রূপ প্রায় ক্ষেত্রে অপিনিহিতজাত, -যেমন ‘পড়ের বদলে পইড়া’, ‘করের বদলে কইরা’, ‘কেঁদে কেটে’ হয় ‘কাইন্দা কাইটা’, এ ছাড়া রয়েছে ‘করতের বদলে করবার’, নেওয়ার বদলে নিবার, যাবোর পরিবর্তে ‘যামু’, ‘স’র জায়গায় ‘হ’, যেমন ‘সেই’-এর বদলে ‘যেই’, শুনি হয় হুনি, সর্বনাম ‘তিনি’ ও তাঁর ‘তানি’ ও ‘তানার’ আমাদের বদলে ‘আমাগো’, নির্দেশক টা ও টি যথাক্রমে ‘ডা’ ও ‘ডি’- যেমন কথাটা ‘কথাডা’, ছোটটি ছোটডি প্রশ্নবোধক কেন হয় ক্যান, অব্যয় যেন ও থেকে হয় ‘যানি’ ও থিকা ইত্যাদি। আঞ্চলিক শব্দ তো আছেই, যেমন ছেলে অর্থে ‘ছ্যামরা’, শরীর অর্থে ‘শরীল’ আঞ্চলিক কথ্যবুলি উচ্চারণের টানটুনে বেশি স্পষ্ট হয়। আঞ্চলিক শব্দ, বাক্যরীতি ও উচ্চারণের স্বাতন্ত্র্য মিলিয়ে আঞ্চলিক ভাষার রূপ ফুটে ওঠে। আপনারা ‘লালসালু’র আঞ্চলিক ভাষারীতি লক্ষ্য করুন :

আইনা- এনে। আইছা- আচ্ছা। আছিল- ছিল। আহি- আসি। এহন- এখন। এ্যামনে- এমনি। কথাডা- কথাটা। কইবার পারি না- বলতে পারি না। করবার- করতে। কইয়াও দেখলেন না- বলেও দেখলেন না। কথাডা ঠিক কইছেন- কথাটা ঠিক



বলেছেন। করতাছে নি- করছে কী? কাইন্দা কাইটা- কেঁদেকেটে। কাম- কাজ। কী আর কমু- কি আর বলব। কেলা- কলা (তুচ্ছার্থে)। ক্যান- কেন। খোলন- খোলা। গেছে গিয়া- চলে গেছে। চাইপা- চেপে, গোপন করে। চাপাচাপি- গোপন করে। ছামরারা কই- ছেলেরা কোথায়। জী কন- কী বলেন। ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুইলা আছে- ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে আছে অর্থাৎ কাজ না করে আরাম আয়েশে আছে। তয়- তবে। তানার- তাঁর। তানারে কন- তাঁকে বলুন। তাগো- তাদের। থিকা- থেকে। দুলামিঞা- বোনের স্বামী, জামাই। দূর থেকে যা হোনে তাতেই চলে- দূর থেকে যা শোনে তা বিশ্বাস করে। দেখন লাগবো- দেখতে হবে। পইড়া- পড়ে। পাঠামু- পাঠাব। পোলা পাইন- ছেলিপিলে, সন্তান। বইনে- বোনে। বইলাই- বলেই। বুঝলান নি- বুঝলেন কি? বিটি- বেটি, কন্যা। মওত- মৃত্যু। যানি- যেন। লগে- সঙ্গে। শেষকাটালে- শেষ সময়ে। সটকাইছে- পালিয়ে গেছে। হুদাহদি- শুধু শুধু। হুনে- শোনে। হে ভাবছে ভুয়া পানি আইনা ফায়দা কী- সে ভেবেছে মিথ্যে পানি এনে লাভ কী? হেই পীরের কাছে আমি যামু না- সেই পীরের কাছে আমি যাব না। হেই কথা আমিও ভাবতছি- সে কথা আমিও ভাবছি।

বাগধারা

এক হাত দেখে নেওয়া-	প্রতিশোধ নেওয়া।	পরগাছা-	যে অন্যের খেয়ে বাঁচে
ওস্তাদের মার-	কুশলী ব্যক্তির নৈপুণ্য	পালাই-পালাই ভাব-	পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে
কথা পাড়া-	বিষয় উত্থাপন করা	ফাড়া কাটা-	বিপদ দূর হওয়া
কাক পক্ষীও খবর না পায়-	কেউ যাতে টের না পায়, সকলের অজ্ঞাতে	বংশে বাতি জ্বালা-	বংশ রক্ষা করা
কেতা দুরন্ত-	ফিটফাট	বুক বেঁধে থাকা-	ধৈর্য ধরে থাকা
খাপে খাপে মেলা-	সম্পূর্ণ রূপে মিলে যাওয়া	বুদ্ধি গজানো-	বুদ্ধির জন্ম
গলা শুকানো-	ভীত হওয়া	বুকের রক্ত শীতল হওয়া-	অতিরিক্ত ভয় পাওয়া
গা ঢাকা দেয়া-	লুকিয়ে থাকা	ভর দুপুরে-	ঠিক দুপুর বেলায়
ঘুণাঙ্করে-	আভাসে ইঙ্গিতে	মন গলে পানি হওয়া-	দয়ালু হওয়া
ঝোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া-	ওপরওয়ালাকে অগ্রাহ্য করে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা।	মরিয়া হয়ে ওঠা-	বেপরোয়া ভাব
জোয়ার লাগা ভরা গাঙ	পরিপূর্ণ যৌবন	মুখে ছায়া পড়া-	বিরজিতে কিংবা চিন্তায় মুখ অপ্রসন্ন হওয়া
ঠাঙা হয়ে যাওয়া-	রাগ বা উত্তেজনা কমানো	রঙ ফলানোর	বাড়িয়ে বলা
থ হওয়া-	হতবাক হওয়া, বিস্মিত হওয়া	লজ্জা-শরমের বালাই-	লজ্জার বোধ।
ধামাচাপা দিয়ে রাখা-	গোপন করা	শূন্য কোল-	সন্তানহীন



সারসংক্ষেপ

মজিদের মনের ভেতরে ভয় থাকলেও আওয়ালপুরের বুড়ো পীর সাহেবের কাছ থেকে পাল্টা হামলা হয়নি। খালেক ব্যাপারীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী নিঃসন্তান আমেনা বিবি সন্তান লাভের কামনায় সে স্বামীকে অনুরোধ করে ঐ পীরের কাছ থেকে পানি পড়া আনতে। মজিদ এর আগে পীর সাহেবের কাছে যেতে সবাইকে মানা করে দিয়েছে। কিন্তু স্ত্রীর খাতিরে ব্যাপারী তার সম্বন্ধী ধলা মিঞাকে আওয়ালপুর থেকে রাতে গোপনে পীরের পানিপড়া আনতে বলে। ধলা মিয়া মজিদের কাছে গিয়ে সব কথা বলে দেয়। মজিদ খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে যায়। কথায় কথায় ব্যাপারী এটি বুঝতে পারে যে পানিপড়া আনার ঘটনা মজিদ জেনে গেছে। মেয়ে মানুষের মন বোঝানোর জন্য যে একাজ করেছে এমন একটা ধারণা দিতে ব্যাপারী চেষ্টা করে। মজিদের দুঃখ আমেনা বিবি তার চেয়ে ঠক-পীরকে বেশি বিশ্বাস করল। মজিদ ব্যাপারীকে এক অদ্ভুত কথা শোনায। বলে, আমেনা বিবির পেটে বেড়ি পড়েছে, সেজন্য তার সন্তান হচ্ছে না। কথটি সে এমনভাবে বলে যাতে তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। মজিদ উদ্বিগ্ন ব্যাপারীকে বেড়ি খোলার উপায়ও জানিয়ে দেয়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২১. ধলা মিয়া কোন ধরনের মানুষ?

ক. ধূর্ত	খ. বোকা
গ. চালাক	ঘ. জ্ঞানী

২২. আমেনা বিবির 'পড়া পানি' আনাটাকে মজিদ কী মনে করেছে?

ক. ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া	খ. ঘোড়ায় চড়ে ঘাস খাওয়া
গ. মাছ শিকার করে ঘাস খাওয়া	ঘ. মাছ ছেড়ে ঘাস খাওয়া

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

গফুর শ্যামপুরে একটি মাজারের সেবায়ত। ঘরে তার সুন্দরী স্ত্রী রয়েছে। তবুও মাজারে আগত সুন্দরী রমণী দেখলে তার জিভে আদিম কামনা সাপের মত লকলক করে।

২৩. উদ্দীপকের গফুরের সঙ্গে 'লালসালু' উপন্যাসের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?

ক. মজিদ	খ. আকাস
গ. খালেক ব্যাপারি	ঘ. মোদাবেবের মিশ্র

২৪. উভয়ের সাদৃশ্যের পশ্চাতে যে কারণ নিহিত রয়েছে—

- দুজনেই বিবাহিত
- নারী আসক্তি প্রবল
- ভালো মানুষ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. i ও ii

পাঠ-৭



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- ✚ মাজারে যাওয়ার জন্য আমেনা বিবির প্রস্তুতি ও তার মনোভাবের কথা জানতে পারবেন।
- ✚ মাজারে পাক দেয়ার সময় আমেনা বিবির মূর্ছা যাওয়ার ঘটনা বিবৃত করতে পারবেন।
- ✚ আমেনা বিবিকে খালেক ব্যাপারীর তালুক দেয়ার ঘটনাটি বর্ণনা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

পরের শুক্রবার আমেনা বিবি রোজা রাখে। পীর সাহেবের পানি পড়া পাবে না জেনে প্রথমে নিরাশ হয়েছিলো; কিন্তু পেটে বেড়ির কথা শুনে এবং পঁচা যদি সাতটির বেশি না হয় তবে মজিদ তার একটা বিহিত করতে পারবে শুনে শীঘ্র মন থেকে নিরাশা কেটে গিয়ে আশার সঞ্চারণ হলো। আন্তে-আন্তে একটা ভয়ও এলো মনে। পঁচা যদি সাতের বেশি হয়, চৌদ্দ কিংবা একুশ? মজিদের নিজের বউ-এর তো সাতের বেশি। সে নাকি একুশও দেখেছে।

ব্যাপারটা গোপন রাখবে স্থির করেছিলো আমেনা বিবি কিন্তু এসব কথা হলে বাতাসে কথা শুরু করে। তানু বিবিই গল্প ছড়ায় এবং শুক্রবার সকাল থেকে নানা মেয়েলোক আসতে থাকে দেখা করতে। আমেনা বিবি কারো সঙ্গে কথা কয় না। ঘরের কোণে আবছায়ার মধ্যে মাদুরে বসে গুনগুনিয়ে কোরান শরিফ পড়ে।

মাথায় ঘোমটা, মুখটা ইতোমধ্যে দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে উঠেছে। পাড়াপড়শিরা এসে দেখে-দেখে যায়, তারপর আড়ালে তানু বিবি সঙ্গে নিচু গলায় কথা কয়। তানু বিবি অবিশ্রান্ত পান বানায় আর মেহমানদের খাওয়ায়।

দুপুরের কিছু আগে মজিদের বাড়ি থেকে রহীমা আসে। হাতে ঘষা-মাজা তামার গ্লাসে পানি। এমনি পানি নয়- পড়াপানি। মজিদ বলে পাঠিয়েছে গোসল করার আগে আমেনা বিবি পেটে পানিটা যেন ঘষে। দোয়া-দরুদ পড়া পানি, তার প্রতিটি ফোঁটা পবিত্র। কাজেই মাখবার সময় পুকুরের পানিতে দাঁড়িয়েই যেন মাখে।

রহীমা সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে যায় না। পান-সাদা খায়, তানু বিবির সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা কয়। এক সময় তানু বিবি প্রশ্ন করে, -বইন, আপনেও তো মাজারের পাশে সাত পাক দিছেন, না?

-আমি দেই নাই।

-দেন নাই? বিস্মিত হয়ে তানু বিবি বলে। -তয় তানি ক্যামনে জানলেন আপনার চৌদ্দ পঁচা?

রহীমা লজ্জার হাসি হেসে বলে,

-তানি যে আমার স্বামী। স্বামী হইলে এ্যামনেই বোঝে।

তয় তানি বোঝেন না ক্যান? তানু বিবির তানি মানে খালেক ব্যাপারী।

রহীমা মুশকিলে পড়ে। দুই তানিতে যে প্রচুর তফাৎ আছে সে কথা কী করে বোঝায়। তানু বিবি একটু বোকা অথচ আবার দেমাকি কিছিমের মানুষ। স্বামী বিস্তর জমিজমার মালিক বলে ভাবে, তার তুলনায় আর কেউ নেই। শেষে রহীমা আন্তে বলে,

-তানি যে খোদার মানুষ।

আমেনা বিবিকে গোসল করিয়ে বাড়িতে ফেরে রহীমা। মজিদ উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে,

-পড়াপানিডা নাপাক জাগায় পড়ে নাই তো?

-না। যা পড়ছে তালাবের মধ্যেই পড়ছে।

সূর্য যখন দিগন্তসীমারেখার কাছাকাছি পৌঁছেছে তখন জোয়ান-মন্দ দুজন বেহারা পাক্কি এনে লাগালো অন্দের ঘরের বেড়ার পাশে।

এক ঢিলের পথ, কিন্তু ব্যাপারীর বউ হেঁটে যেতে পারে না।



ব্যাপারী হাঁকে, –কই, তৈয়ার হইছেননি?

আমেনা বিবি আবছায়ার মধ্যে তখনো গুনগুনিয়ে কোরান শরিফ পড়ছে। দুপুরের দিকে চেহায়ায় তবু কিছু জৌলুষ ছিল, এখন বেলাশেষের স্নান আলোয় একেবারে ফ্যাকাশে ঠেকে। তার চোখের সামনে আঁকাবাঁকা প্যাঁচানো অক্ষরগুলো নাচে, আবছা হয়ে গিয়ে আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ছোট হয়ে আবার হঠাৎ বড় হয়ে যায়। আর শুষ্ক ঠোঁট দুটো থেকে থেকে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে।

তানু বিবি গিয়ে ডাকে,

–ওঠ বুবু, সময় হইছে।

ডাক শুনে ফাঁসির আসামির মতো আমেনা বিবি চমকে উঠে ভীতবিস্মল দৃষ্টিতে একবার তাকায় সতীনের পানে। তারপর ছুরা শেষ করে কোরান শরিফ বন্ধ করে, গেলাফে ভরে, শেষে পালকস্পর্শের মতো আলগোছে তাতে চুমু খায়। সেটা ও রেহেল নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ তার মাথা ঘুরে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়, আর শরীরটা টাল খেয়ে প্রায় পড়ে যাবার উপক্রম করে। তানু বিবি ধরে ফেলে তাকে। তারপর একটু আদা-নুন মুখে দিয়ে ঘরের কোণেই মগরেবের নামাজটা আমেনা বিবি সেরে নেয়।

উঠানের পথটুকু অতিক্রম করতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ করে আমেনা বিবি। পুরা ত্রিশ দিন রোজা রেখেও যে বিন্দুমাত্র কাহিল হয় না সে একদিনের রোজাতেই একেবারে ভেঙে গেছে। গায়ে-মাথায় বুটিদার হলুদ রঙের একটা চাদর দিয়েছে। সেটা বুকের কাছে চেপে ধরে গুটি-গুটি পায়ে হাঁটে। কিসের এত ভয় তাকে পিষে ধরেছে— ক-ঘন্টায় যে ভয় দীর্ঘ রোগভোগ করা মানুষের মতো তাকে দুর্বল করে ফেলেছে? এক যুগেরও ওপরে যে নিঃসন্তান থাকতে পারলো সে যদি জানে যে, ভবিষ্যতেও সে তেমনি নিঃসন্তান থাকবে, তবে এমন মুষড়ে যাবার কী আছে? এ-প্রশ্ন আমেনা বিবি তার নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করে। তবে কথা হচ্ছে কী, তেরো বছরের কথা একদিনে জানেনি, জেনেছে ধাপে-ধাপে ধীরে-ধীরে, প্রতি বৎসরের শূন্যতা থেকে। সে-শূন্যতাও আবার পরবর্তী বছরের আশায় শীঘ্র ক্ষয়ে তেজশূন্য হয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ জীবনের শূন্যতার কথা তেমনি বছরে-বছরে যদি জানে তবে আঘাতটা দীর্ঘকালব্যাপী সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে তীব্রতায় হ্রাস পাবে, মনে কিছু-বা লাগলেও গায়ে লাগবে না। কিন্তু এক মুহূর্তে সে-কথা জানলে বুক ভেঙে যাবে না, বেঁচে থাকবার তাগিদ কি হঠাৎ ফুরিয়ে যাবে না?

সে-ভয়েই দু-কদমের পথ ঘাসশূন্য মসৃণ ক্ষুদ্র উঠানটা পেরুতে গিয়ে আমেনা বিবির পা চলে না; সে ভয়ের জন্যই জোর পায় না কোমরে, চোখে ঝাপসা দেখে। একবার ভাবে, ফিরে যায় ঘরে। কাজ কী জেনে ভবিষ্যতের কথা। যাই হোক, দয়ালুদের মধ্যে দয়ালুতম সে-খোদার ইচ্ছাই তো অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে।

কিন্তু গুটি-গুটি করে চললেও পা এগিয়ে চলে। মনের ইচ্ছায় না হলেও চলে লোকদের খাতিরে। ঢাকঢোল বাজিয়ে যোগাড়যন্ত্র করিয়ে এখন পিছিয়ে যেতে পারে না। পুরুষ হলে হয়তো-বা পারতো, মেয়েলোক হয়ে পারে না। সমাজ যাকেই ক্ষমা করুক না কেন, বিরুদ্ধ ইচ্ছা দ্বারা চালিত, দো-মনা খুশির বশের মানুষের আয়োজন ভঙ্গ করা নারীকে ক্ষমতা করে না। এ-সমাজে কোনো মেয়ে আত্মহত্যা করবে বলে একবার ঘোষণা করে সে মনের ভয়ে আবার বিপরীত কথা বলতে পারে না। সমাজই আত্মহত্যার মাল-মশলা জুগিয়ে দেবে, সর্বতোভাবে সাহায্য করবে যাতে তার নিয়ত হাসিল হয়, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে তাকে আবার বাঁচতে দেবে না। মেয়েলোকের মনের মঞ্চরা সহ্য করবে অতটা দুর্বল নয় সমাজ। এখানে তাদের বেহুদাপনার জায়গা নেই।

মজিদ অপেক্ষা করছিলো। বেহারারা পাক্কিটা মাজার ঘরের দরজার কাছে আস্তে নামিয়ে রাখলো।

ব্যাপারী মজিদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আস্তে বলে, –নামবো?

মজিদ আজ লম্বা কোর্তা পরেছে, মাথায় ছোটখাটো একটা পাগড়িও বেঁধেছে। মুখ গম্ভীর। বলে,

–তানারে নামাইয়া মাজার ঘরের ভিতরে নিয়া যান। থেমে বলে, তানার ওজু আছেন।

ব্যাপারী ছুটে যায় পাক্কির কাছে। পর্দা ঈষৎ ফাঁক করে নিচু গলায় প্রশ্ন করে,

–আছেন ওজু?

অস্পষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে আমেনা বিবি জানায়, আছে।

–তয় নামেন।



মজিদ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ সে চিকন সুরে দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করে, গলায় বিচিত্র সূক্ষ্ম কারুকার্যের খেলা হতে থাকে। কিন্তু তাতে চোখের তীক্ষ্ণতা কাটে না। চোখ হঠাৎ তার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। পাক্কির পর্দা ফাঁক করে নামবার জন্য আমেনা বিবি যখন এক পা বাড়ায় তখন সূচের তীক্ষ্ণতায় তার দৃষ্টি বিদ্ধ হয় সে পায়ে। সাদা মসৃণ পা, রোদ-পানি বা পথের কাদামাটি যেন কখনো স্পর্শ করেনি। মজিদের গলার কারুকার্য আরো সূক্ষ্ম হয়।

হলুদ রঙের বুটদার চাদরটা আমেনা বিবি ঘোমটার ওপরে টান করে ধরে রেখেছে। তবু পাক্কি থেকে নেমে সে যখন মাজার ঘরে গিয়ে দাঁড়ায় তখন আড়-চোখে তার পানে তাকিয়ে মজিদ কিছুটা বিস্মিত হয়। নোতুন বউ এর মতো চোখ তার বোজা। তবে লজ্জায় যে নয় তা দ্বিতীয়বার তাকালেই বোঝা যায়। লজ্জায় ম্রিয়মান নোতুন বউ এর আত্মসচেতন রক্তাভা তাতে নেই। সে-মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য, এবং সে-মুখে দুনিয়ার ছায়া নেই।

আমেনা বিবি কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখটা আধাআধি খোলে। ঘরে ইতোমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। দুটো মোমবাতি স্নানভাবে আলো ছড়ায়। সে-আলোয় সামনে সে দেখে ঝালরওয়ালা সাণু কাপড়ে আবৃত চিরনীরব মাজারটি। সে-নীরবতা যেন বিস্ময়করভাবে শক্তিমূলক। আর সে-শক্তি বিদ্যুৎ-চমকের মতো শত ফলায় বিচ্ছুরিত হয় প্রতি মুহূর্তে। মানুষের রক্তস্রোত যদি থেমেও থাকে তবে তার আঘাতে আশা ও বিশ্বাসের জোয়ার আসে ধমনিতে। তথাপি মহা-আকাশের মতই সে-মাজার প্রগাঢ়ভাবে নীরব, আর মহা-আকাশের মতই বিশাল ও অন্তহীন সে-নীরবতা। যে-আমেনা বিবি চোখ আধা খুলে তাকায় সেদিকে, সে আর পলক ফেলে না।

মজিদ আবার আড়চোখে তাকায় তার পানে। কী দেখে আমেনা বিবি? মাজারকে অমন করে কাউকে সে দেখতে দেখেনি। তার ঠোঁট বিড়বিড় করে, গলায় তেমনি সূক্ষ্মসুরের লহরি খেলে। কিন্তু এবার সে থামে, জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে গলা কাশে।

—তানারে বইবার কন

ব্যাপারী বিবিকে বলে,

—বহেন।

মাজারের ধারটিতে আমেনা বিবি আস্তে বসে। তাকায় না কারো পানে। মাজারের নীরবতা যেন তার বুক ভরিয়ে দিয়েছে। সন্তানের কামনা এক বৃহৎ সত্যের উপলব্ধির মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে, লোভ বাসনার অবসান হয়েছে। তাই হয়তো মজিদের ভয় হয়। সে আর তাকায় না এদিকে। তবু বিড়বিড় করে। নিজের ক্ষুদ্র কোটরাগত চোখে চমক জাগে থেকে থেকে।

ঘরের কোণে একটি পাত্রের পানি ছিলো। এবার সেটি তুলে নিয়ে মজিদ অন্য ধারে গিয়ে বসে। পানি পড়বে, যে-পড়াপানি খেয়ে আমেনা বিবি পাক দেবে। তার ঠোঁট তেমনি বিড়বিড় করে, হাতে পানির পাত্রটা তুলে নেয়া হয়তো-বা তা ঈষৎ দ্রুততর হয়। ঘরের মধ্যে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা। এ-নিঃশব্দতার মধ্যে তার গলার অস্পষ্ট মিহি আওয়াজ কোনো আদিম সাপের গতির মতো জীবন্ত হয়ে থাকে। তার কণ্ঠে যদি সাপের গতি থাকে তবে তার মনেও এক উদ্যত সাপ ফণা তুলে আছে ছোবল মারবার জন্য। আমেনা বিবির বোজা চোখ মজিদের ভালো লাগে না, কিন্তু পাক্কি থেকে নামবার সময় তার যে সাদা সুন্দর পা-টা দেখেছিলো, সে-পাই তার মনে সাপকে জাগিয়ে তুলেছে। সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারবার জন্য। তার জিহ্বা লিকলিক করে, উদ্যত দীর্ঘ গলা বেয়ে উঠে আসে বিষ। সুন্দর পা- দেখে স্নেহ-মমতা উঠে না এসে, আসে বিষ। স্নেহ-মমতাই যদি গলগলিয়ে, গদগদ হয়ে জেগে উঠতো তবে মজিদ রূপালি ঝালরওয়ালা চমৎকার সাণু কাপড়টাই ছিঁড়ে এখানকার ঘরবাড়ি ভেঙে অনেক আগে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যেতো। এবং যেতো সেখানেই যেখানে নির্মল আলো হাওয়া রোগ-জীবাণু ভরা লালাসিক্ত কেতাবের জালির মধ্য দিয়ে নিঃসৃত হয়ে আসে না, উন্মুক্ত বিশাল আকাশপথে- যেখানে কাদামাটি লাগেনি এমন পা দেখে অন্তরে বিষাক্ত সাপ জেগে উঠে ফণা ধরে না।

থেকে-থেকে মজিদ পানিতে ফুঁ দেয়। আর আবছা আলোয় তার ক্ষুদ্র চোখ চক্কর খায়। কখনো তার দৃষ্টি খালেক ব্যাপারীর ওপরও নিবদ্ধ হয়। আজ তার পানে তাকিয়ে মজিদের মনে হয়, ব্যাপারীর মেদবহুল স্ফীত উদরসম্বলিত দেহটি কেমন যেন অসহায়। একটু তফাতে সে যে মাথা নিচু করে বসে আছে, সে-বসে-থাকার মধ্যে শক্তি নেই। সে কেমন ধ্বসে আছে, বিস্তর জমিজমাও ঠেস দিয়ে ধরে রাখতে পারেনি তার স্কুল দেহটা। চোখ আবার ঘোরে, চক্কর খায়। হলুদ রঙের বুটদার চাদরে ঢাকা মুখটা এখান থেকে নজরে পড়ে না। তবু থেকে থেকে সেখানেই ঠক্কর খায় মজিদের ঘূর্ণমান দৃষ্টি।

এক সময় মজিদ উঠে দাঁড়ায়। গলা কেশে আস্তে বলে,

—পানিটা দেন।



ব্যাপারীও তার ছুল দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে এসে পানিটা নেয়, তারপর আমেনা বিবির মৃত মানুষের মতো শুক মুখের সামনে সেটা ধরে। আমেনা বিবি চোখ খুলে তাকায়, আস্তে, পাপড়ি খোলার মতো। তারপর চাদরের তলে একটা হাত নড়ে। সে হাতটি ধীরে ধীরে বেরিয়ে পাত্রটি যখন নেয় তখন একবার তার চুড়িতে অতি মৃদু ঝঙ্কার ওঠে।

আমেনা বিবি পাত্রটি কয়েক মুহূর্ত মুখের সামনে ধরে থাকে, তারপর তুলে ঠোঁটের কাছে ধরে। একটু পরে প্রগাঢ় নীরবতায় মজিদের সজাগ কানে সাবধানী বেড়ালের দুধ খাওয়ার মতো চুকচুক আওয়াজ এসে বাজে। পান করার অধীরতা নেই। খোদার নামছোঁয়া পানি, তালাবের সাধারণ পানি নয়। তাছাড়া তৃষ্ণার পানিও নয় যে, শুষ্ক গলা নিমেষে শুষ্ক নেবে সবটা। ধীরে ধীরে পান করে সে, বুকটা শীতল হয়। তারপর মুখ না ফিরিয়ে আস্তে শূন্য পাত্রটা বাড়িয়ে ধরে। পায়ের মতো সুন্দর হাত। মোমবাতির পান আলোয় মনে হয় সে হাত শুধু সাদা নয়, অদ্ভুতভাবে কোমল।

হাতটি যখন আবার চাদরের তলে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন মজিদ বলে, –তানারে উঠবার কন। এহন পাক দেওন লাগব।

আমেনা বিবি উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়েই মনে হয় বসে পড়বে, কিন্তু সামান্য দুলেই স্থির হয়ে যায়।

–আমি দোয়া-দরুদ পড়তাছি। তানারে পাক দিবার কন। ডাইন দিক থিকা পাক দিবেন, আগে ডাইন পা বাড়াইবেন। বাড়ানের আগে বিসমিল্লাহ কইবেন।

মজিদ কোণে বসে। একবার সামনে দিয়ে যখন আমেনা বিবি ঘুরে যায় তখন তার চোখ চকচক করে ওঠে আবছা অন্ধকারে। কালো রঙের পাড়ের তলে থেকে আমেনা বিবির পা নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে : একবার ডান পা, আরেকবার বাঁ। শব্দ হয় না। কাছাকাছি যখন আসে তখন মজিদের ভেতরে সাপের গলাটা সামান্য চমকে পেছনে যায়, যেন ছোবল দেবে। মজিদ একবার ঢোক গেলে, তারপর কণ্ঠের সুর আরো মিহি করে তোলে।

একপাক, দুইপাক। আমেনা বিবি স্বপ্নের ঘোরে যেন হাঁটে। যে শুক্লতায় তার মুখ জমে আছে, সে শুক্লতায় বিন্দুমাত্র প্রাণ নেই। ও মুখ কখনো যেন কথা কয়নি, হাসেনি, কাঁদেনি। মনেও তার কিছু নেই। অতীতের স্মৃতির মতো মনে পড়ে কী একটা বাসনার কথা– বছরে বছরে যে-বাসনা অপূর্ণ থেকে আরো তীব্রতর হয়েছে। কী একটা অভাবের কথা, কী একটা শূন্যতার কথা। কিন্তু সে-সব অতীতের স্মৃতির মতো অস্পষ্ট। একটা মহাশক্তির সন্নিহিতে এসে মানুষ আমেনা বিবির আর সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগ নেই। একটা প্রখর-অত্যাশ্চর্য আলো তার ভেতরটা কানা করে দিয়েছে। সেখানে তার নিজের কথা আর চোখে পড়ে না।

একপাক, দুইপাক। তারপর তিন পাকের অর্ধেক। ক-পা এগুলোই মজিদকে পেরিয়ে যাবে। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ বৈশাখী মেঘের আকস্মিক আবির্ভাবের মতো কী একটা বৃহৎ ছায়া এসে আমেনা বিবিকে অন্ধকার করে দিলো। অর্থ না বুঝে মুখ ফিরিয়ে স্বামীর পানে তাকাবার চেষ্টা করলো, হয়তো-বা তাকে আলিঝালি দেখলেও। কিন্তু তারপর আর কিছু দেখলো না, জানলো না ক-পাঁচ পড়েছে তার পেটে, জানলো না-মাজারের মধ্যে শায়িত শক্তিশালী লোকটির কী বলবার আছে, ক-পাক দিলে তাঁর অন্তরে দয়া উথলে উঠতো।

ব্যাপারী বিদ্যুৎগতিতে উঠে পড়ে অস্ফুট কণ্ঠে আত্ননাদ করে বলে, –কী হইল?

চোখের সামনে আমেনা বিবি মূর্ছা গেছে। বুটিদার চাদরটা আর হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারেনি বলে তার মুখটা খোলা। সে-মুখে দাঁত লেগে আছে।

বাইরে মাজারে রহীমা আসে না। আজ আমেনা বিবি এসেছে বলে হয়তো আসতো যদি না সঙ্গে থাকতো ব্যাপারী। মাজার ঘরের বেড়ার ফুটোতে চোখ পেতে সে ব্যাপারীটা দেখছিলো। সঙ্গে হাসুনির মা-ও ছিলো। রহীমা মনে-মনে স্থির করেছিলো, পাক দেয়া চুকে গেলে আমেনা বিবিকে ভেতরে নিয়ে যাবে, সখ করে যে ফিরনিটা করেছে তা দেবে খেতে, তারপর দুয়েক খিলি পান চিবোতে চিবোতে দু-দণ্ড সুখ-দুঃখের গল্প করবে। নিজে সে স্বল্পভাষী মানুষ, কিন্তু আমেনা বিবির হৃদয়ের সঙ্গে তার হৃদয়ের কোথায় যেন সমতা, যাই কথা হোক না কেন দেখতে দেখতে আলাপ জমে ওঠে। কিন্তু ফুটো দিয়ে রহীমা যে-দৃশ্য দেখলো তারপর গল্প গুজবের আশা তাকে ত্যাগ করতে হলো। ব্যাপারীর লজ্জা কাটিয়ে বাইরে এসে সে আর হাসুনির মা অতিথিকে ভেতরে নিয়ে গেলো। নিয়ে গেলো পঁজাকোল করে, মুখে কথা ফোটার উদ্দেশ্যে। সখ করে তৈরি করা ফিরনির কথা বা পান খেয়ে দু-দণ্ড গল্প করার কথা ভুলে গেলো।



মজিদ আর ব্যাপারী মাজার ঘরেই চুপ হয়ে বসে রইলো, দুজনের মুখে চিন্তার রেখা। তারপর মজিদ আন্তে উঠে অন্তরঘরের বেড়ার পাশে বৈঠকখানায় গিয়ে হুকা ধরিয়ে আবার ফিরে এসে ব্যাপারীকে ডেকে নিয়ে গেলো। দু-জনেই এক এক করে হুকা টানে, কথা নেই কারো মুখে।

মজিদ ভাবে এক কথা। যে-আমেনা বিবির পীরের পানি পড়া খাবার সখ হয়েছিলো সে-আমেনা বিবির ওপর- আকার ইঙ্গিতে বা মুখের ভাবে প্রকাশ না করলেও- মজিদের মনে একটা নিষ্ঠুর রাগ দেখা দিয়েছিলো। তার একটা নিষ্ঠুর শান্তিও সে স্থির করেছিলো। আজ সন্ধ্যার আবছা অস্পষ্ট আলোয় আমেনা বিবির সাদা কোমল পা দেখে শান্তি বিধানের সে প্রবল ইচ্ছা বিন্দুমাত্র প্রশমিত না হয়ে বরঞ্চ আরো নিষ্ঠুরতমভাবে শাণিত হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে অসময়ে আমেনা বিবির মূর্তা যাওয়া সমস্ত কিছু যেন গোলমাল করে দিলো। মুঠোর মধ্যে এসেও সে যেন ফস্কে গেলো, যে-মজিদের ক্ষমতাকে সে এতদিন উপেক্ষা করেছে তার প্রতি আজও অবজ্ঞা দেখালো, তাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে সুযোগ দিয়েও দিলো না। দিয়েও দিলো না বলে মেয়েলোকটি যেন চরম বাহাদুরি দেখালো, সমস্ত আশ্ফালনের মুখে চুন দিলো।

হুকাটা রেখে হঠাৎ এবার ব্যাপারী কথা বলে। বলে,

—দিনভর রোজা রাখনে বড় দুর্বল হইছিল তানি।

মজিদ কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলে, —রোজা রাখনে দুর্বল হইছিল কথাটা ঠিক, কিন্তু আমি যে পানি পড়া দিলাম- তা কিসের জন্য? শরীলে তাকত হইবার জন্য না? এমন তাছির হেই পানিপড়ার যে পেটে গেলে একমাসের ভুখা মানুষও লগে লগে চাঙ্গা হইয়া ওঠে। শরীলের দুর্বলতার জন্য তিনি অজ্ঞান হন নাই।

মজিদ থামে। কী একটা কথা বলেও বলে না। ব্যাপারী মুখ ফিরিয়ে তাকায় মজিদের পানে, কতক্ষণ তার চিন্তিত-ব্যথিত চোখ চেয়ে-চেয়ে দেখে। তারপর প্রশ্ন করে,

—তয় ক্যান তানি অজ্ঞান হইছেন?

—আপনে তাঁনার স্বামী- ক্যামনে কই মুখের উপরে?

হঠাৎ ব্যাপারীর চোখ সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে এবং তা একবার কানিয়ে চেয়ে লক্ষ্য করে দেখে মজিদ। ব্যাপারীর চোখে সন্দেহের জোয়ার আসুক, আসুক ক্রোধের অনলকণা। মজিদ আন্তে হুকাটা তুলে নেয়। তাকে ভাবতে সময় দিতে হবে। বাইরে কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় জোৎস্না। তার আলোয় ঘরের কুপিটার শিখা মনে হয় একবিন্দু রক্ত- টাটকা, লাল টকটকে। খোলা দরজা দিয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন স্নান জোৎস্নার পানেই চেয়ে থাকে মজিদ, দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের ব্যর্থতার বোঝা। তাতে বিদ্বেষ নেই, পতিতের প্রতি ক্রোধ-ঘৃণা নেই, আছে শুধু অপরিসীম ব্যথাহত প্রশ্নের নিশ্চুপতা।

আচমকা ব্যাপারী মজিদের একটি হাত ধরে বসে। তার বয়স্ক গলায় শিশুর আকুলতা জাগে। বলে,

—কন, ক্যান তানি অজ্ঞান হইছেন? ভিতরে কী কোনো কথা আছে?

একবার বলে-বলে ভাব করে মজিদ, তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বসে রসনা সংযত করে। মাথা নেড়ে বলে,

—না। কওন যায় না। থেমে আবার বলে, তয় একটা কথা আমার কওন দরকার। তাঁনারে তালাক দেন।

আমেনা বিবিকে সে তালাক দেবে? তের বছর বয়সে ফুটফুটে যে মেয়েটি এসে তার সংসারে ঢোকে এবং যে এত বছর যাবৎ তার ঘরকন্না করছে, তাকে তালাক দেবে সে? সত্যি কথা, বড় বিবির প্রতি তার তেমন মায়া-মহব্বত নাই। কিছু থাকলেও তানু বিবির আসার পর থেকে তা ঢাকা পড়ে আছে, কিন্তু তবু বহুদিনের বসবাসের পর একটা সম্বন্ধ আড়ালে-আবডালে গজিয়ে না উঠেছে এমন নয়। তাই হঠাৎ তালাক দেবার কথা শুনে ব্যাপারী হকচকিয়ে ওঠে। তারপর কতক্ষণ সে বজ্রাহতের মতো বসে থাকে।

মজিদ কিছুই বলে না। বাইরের স্নান জোৎস্নার পানে বেদনাভারি চোখে চেয়ে তেমনি স্থিরভাবে বসে থাকে। আর অপেক্ষা করে। অনেকক্ষণ সময় কাটলেও ব্যাপারী যখন কিছু বলে না তখন সে আলগোছে বলে,

—কথাটা কইতাম, কিন্তু এক কারণে এখন না কওনই স্থির করছি। তহুর বাপের কথা মনে আছেন?

ব্যাপারী ভারি গলায় আন্তে বলে,

—আছে?

— হে তহুর বাপের কথা মাইন্সেরা ভুইলা গেছে। এমন কী তার রক্তের পোলা-মাইয়ারাও ভুইলা গেছে। কিন্তু আমি ভুলবার পারি নাই। ক্যান জানেন?



যন্ত্রচালিতের মতো ব্যাপারী প্রশ্ন করে,

—ক্যান?

—কারণ হেই ব্যাপার থিকা একটা সোনার মতো মূল্যবান কথা শিখছি আমি। কথাটা হইলো এই : পাক-দিল আর গুণাগার দিল যদি এক সুতায় বাঁধা থাকে আর কেউ যদি গুণাগার দিলের শান্তি দিবার চায় তখন পাক দিলই শান্তি পায়। তহর বাপের দিল সাফ আছিল, তাই শান্তি পাইল হেই। এদিকে তারে কষ্ট দিয়া আমি গুণাগার হইলাম।

বর্তমানে মনটা বিক্ষিপ্ত হলেও ব্যাপারী কথাটা বোঝে। তার ও আমেনা বিবির দিল এক সুতায় বাধা। আমেনা বিবিকে শান্তি দিতে হলে আগে সে বন্ধন ছিন্ন করা চাই। অতএব তাকে তালুক দেয়া প্রয়োজন। মজিদ একবার ভুল করে একজন নিষ্পাপ লোককে এমন নিদারুণ কষ্ট দিয়েছে যে, সে-কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্য অবশেষে তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। তাকে কষ্ট দিয়ে মজিদ নিজেও গুণাগার হয়েছে, পাপির ভাল মানুষের ওপর দুষ্ট আত্মার মতো ভর করে শান্তি থেকে বেঁচে গেছে। এমন ভুল মজিদ আর কখনো করবে না।

মজিদের হাত তখনো ব্যাপারী ছাড়েনি। সে-হাতে একটা টান দিয়ে ব্যাপারী অধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলে,

—আপনে কী কিছু সন্দেহ করেন?

—সন্দেহের কোনো কথা নাই। পানিপড়া খাইয়া তানি যখন সাত পাক দিবার পারলেন না, মূর্ছা গেলেন, তখন তাতে সন্দেহের আর কোনো কথা নাই। খোদার কালামের সাহায্যে যে-কথা জানা যায় তা সূর্যের রোশনাইর মতো সাফ। আর বেশি আমি কিছু কমু না। তাঁনারে তালুক দেন।

এ সময়ে হাসুনির মা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোমটা টেনে তেরছাভাবে দাঁড়ালো। ব্যাপারী প্রশ্ন করে,

—কী গো বিটি?

—তাঁনার হুস হইছে। বাড়িতে যাইবার চাইতাছেন।

—মজিদের হাত ছেড়ে ব্যাপারী উঠে দাঁড়ালো। মুখ কঠিন। বেহারাদের ডেকে পাঙ্কিটা অন্তরে পাঠিয়ে দিল।

আমেনা বিবিকে নিয়ে সে-পাঙ্কি যখন কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় চাঁদের আলোর মধ্যে দিয়ে চলে কিছুক্ষণ পরে গাছগাছলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো, তখন মজিদ বৈঠকখানা ঘরের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। অন্যমনস্কভাবে খেলাল দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে; দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার ভাব। কোনো কথা না কয়ে হঠাৎ ব্যাপারী চলে গেলো। তার মনের কথা জানা গেলো না।

হঠাৎ এক সময়ে একটা কথা স্মরণ হয় মজিদের। কথা কিছু না, একটা দৃশ্য—আবছা আলায়ে দেখা কালো পাড়ের নিচে একটি সাদা কোমল পা। সে-পা দ্বিতীয়বার দেখলো না বলে হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন আফসোস বোধ করে মজিদ। তারপর মনে মনেই সে হাসে। দুনিয়াটা বড় বিচিত্র। যেখানে সাপ জাগে সেখানে আবার কোমলতার ফুল ফোটে। কিন্তু সে-ফুল শয়তানের চক্রান্ত। মজিদ শক্ত লোক। সাত জনের চেষ্টায়ও শয়তান তাকে কোনো দুর্বল মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারবে না। সে সদা হুঁশিয়ার।

কণ্ঠে দোয়া-দরুদের মিহি সুর তুলে মজিদ ভেতরে যায়।

এতবড় সমস্যা ব্যাপারীর জীবনে কখনো দেখা দেয়নি। নিজের চোখে কোনো গুরুতর অন্যায় দেখে যদি শরীরে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠতো তাহলে ব্যাপারটা সমস্যাই হতো না। আসল কথা জানে না, আবার একটা কিছু গোলযোগ যে আছে এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মানুষ মজিদের কথা না হয় অবিশ্বাস করা যেতো, কিন্তু যে-কথা জেনেছে মজিদ তা তার নিজের বুদ্ধির জোরে জানেনি। খোদার কালামের সাহায্যেই সে-কথা জেনেছে এবং মানুষ মজিদ তার অন্তরের বিবেচনার জন্যই তা খুলে বলতে পারেনি। হাজার হলেও তারা বন্ধু মানুষ। ব্যাপারী কষ্ট পাবে এমন কথা কী করে বলে।

বৈঠকখানা হুকার নীলাভ ধোঁয়া অন্ধকার হয়ে ওঠে। ব্যাপারীর চোখে ধোঁয়া ভাসে, মগজেও কিছু গলিয়ে ঢুকে তার অন্তরদৃষ্টি আবছা করে দেয়। ব্যাপারী ভাবে আর ভাবে। মানুষের সঙ্গে হুঁ-হাঁ করে কথা কয়, দশ প্রশ্নে এক জবাব দেয়। একটা কথাই মনে ঘোরে। এক সময়ে সেটা সোজা মনে হয়, এক সময়ে কঠিন। একবার মনে হয় ব্যাপারটা হেস্ত-নেস্ত হয় একটি মাত্র শব্দের তিনবার উচ্চারণেই; আরেকবার মনে হয়, সে শব্দটা উচ্চারণ করাই ভয়ানক দুরূহ ব্যাপার। জিহ্বা খসে আসবে তবু সেটা বেরিয়ে আসবে না মুখ থেকে।



তের বছর বয়স থেকে যে তার ঘরে বসবাস করছে, তার জীবনের অলি-গলির সন্ধান করে। যদি কিছু নজরে পড়ে যায় হঠাৎ। দীর্ঘ বসবাসের সরল ও জানা পথ ছেড়ে ঝোপ-ঝাড় খোঁজে, ডালপালা সরিয়ে অন্ধকার স্থানে থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু আপত্তিকর কিছুই নজরে পড়ে না। আমেনা বিবি রূপবতী, কিন্তু কোনোদিন তার রূপের ঠাট ছিলো না, সৌন্দর্যের চেতনা ছিলো না; চলনে-বলনে বেহায়াপনাও ছিলো না। ঠাণ্ডা, শীতল, ধর্মভীরু ও স্বামীভীরু মানুষ। সে এমন কী অন্যায় করতে পারে?

প্রশ্নটা মনে জাগতেই মজিদের একটা কথা হৃদয় দিয়ে যেন তাকে সাবধান করে দেয়। কথাটা মজিদ প্রায়ই বলে। বলে, মানুষের চেহারা বা স্বভাব দেখে কিছু বিচার করা যায় না। তাকে দিয়ে কিছু বিশ্বাসও নেই। এমনকাজ নেই দুনিয়াতে যা সে না করতে পারে এবং করলে সব সময়ে যে সমাজের কাছে ধরা পড়বে এমন নয়। কিন্তু খোদার কাছে কোনো ফাঁকি নেই। তিনি সব দেখেন, সব জানেন। কথাটা ভাবতেই ব্যাপারীর কান দুটোতে রঙ ধরে। পশুপক্ষীকেও না জানতে দিয়ে কোনো গর্হিত কাজ ব্যাপারী কী কখনো করেনি? ব্যাপারীর মতো লোকও করেছে, যদিও আজ বললে হয়তো অনেকে তা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সে-কথা খোদাতা'লা ঠিক জানেন তাঁর কাছে ফাঁকি চলে না।

না, মজিদের কথায় ভুল নেই। সহসা খালেক ব্যাপারী মনস্থির করে ফেলে।

এবং এর তিন দিন পর যে-আমেনা বিবি হঠাৎ সন্তান-কামনায় অধীর হয়ে উঠেছিলো সে-ই সমস্ত কামনা-বাসনা বিবর্জিত একটা স্তব্ধ, বজ্রাহত মন নিয়ে সেদিনের পাক্ষিতে চড়ে বাপের বাড়ি রওয়ানা হয়। বহুদিন বাপের বাড়ি যায়নি। তবু সেখানে যাচ্ছে বলে মনে কিছু আনন্দ নেই। পাক্ষির ক্ষুদ্র সংকীর্ণতায় চোখ মেলে নাক বরাবর তাকিয়ে থাকে বটে কিন্তু তাতে অশ্রুও দেখা দেয় না।

তবে পথে একটা জিনিস দেখলে হয়তো হঠাৎ তার বুক ভাসিয়ে কান্না আসতো। সেটা হলো খোতামুখো তালগাছটা। বহু দিনের গাছ, ঝড়ে-পানিতে আরো লোহা হয়ে উঠেছে যেন। প্রথম যৌবনে নাইয়ের থেকে ফিরবার সময় পাক্ষির ফাঁক দিয়ে এ-গাছটা দেখেই সে বুঝতো যে, স্বামীর বাড়ি পৌঁছেছে। ওটা ছিলো নিশানা, আনন্দের আর সুখের।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অতুজ্জ্বল- তীক্ষ্ণ ও অতি উজ্জ্বল। অনলকণা- আগুনের ফুলিঙ্গ। অন্যমনস্কভাবে- আনমনাভঙ্গিতে। অবিশ্রান্ত- বিশ্রাম না নিয়ে। অন্তহীন- শেষ নাই যার। অন্তর দৃষ্টি- মনের চোখ। অন্দর ঘর- ভিতর বাড়ি। অনিশ্চয়তা- সংশয়, সন্দেহ। অবসান- শেষ। আচম্বিতে- হঠাৎ, আচমকা। আদিম- অতি পুরাতন। অপ্রত্যাশিতভাবে- আকস্মিকভাবে। অবজ্ঞা- অসম্মান, ঘৃণা। আপত্তিকর- দোষের। আবছায়া- আলো আঁধার। আবছা- অস্পষ্ট। আবির্ভাব- আগমন। আলিঝালি- অস্পষ্ট, এলোমেলো। আফালন- বাহাদুরি। আড়চোখে- চোরা দৃষ্টিতে। আড়ালে-আবডালে- অজান্তে, গোপনে। ঈষৎ- সামান্য। উপক্রম- অবস্থা। ওজু- নামাজ ও ধর্মীয় কাজ করার জন্য বিশেষ রীতিতে হাত পা ধোওয়া। কারুকার্য- সূক্ষ্ম কাজ। কান দুটোতে রঙ ধরে- লজ্জা হয়। কানিয়ে চেয়ে- আড়াচোখে দেখে। কাহিল- দুর্বল। কুপি- বাতি। কুয়াশাচ্ছন্ন- কুয়াশায় ঘেরা। কোটারাগত- গর্তে ঢোকানো। খসে আসবে- আলাদা হয়ে আসবে। খিলি- ভাঁজ করা সাজানো পান। গলিয়ে ঢোকা- কোন একটি পথে ঢুকে যাওয়া। গর্হিত- অন্যায়। গাছগাছলা- গাছ ও ঝোপঝাপ। গুটি গুটি পায়ে হাঁটা- খুব আন্তে আন্তে সাবধানে হাঁটা। গেলারফ- কাপড়ের আবরণ। গোলযোগ- গণ্ডগোল, বামেলা। ঘরকন্না- সংসার, ঘরের কাজ। ঘূর্ণমান- যা ঘুরছে। চক্কর খায়- চারদিকে ঘোরে। চক্রান্ত- দুষ্ট বুদ্ধি, ষড়যন্ত্র। চিকন- সূক্ষ্ম, মিহি। চুকে গেলে- শেষ হলে। চোখে ধোঁয়া ভাসে- চোখ ঝাপসা দেখে। ছোবল- সাপের কামড়। জালি- পোকায় কাটা ছিদ্র। জীবনের অলি-গলি- জীবনের নানা পথ। জৌলুষ- উজ্জ্বলতা। ঝঙ্কার- বাদ্যযন্ত্রের কিংবা চুড়ি জাতীয় অলঙ্কারের আওয়াজ। ঝড়ে-পানিতে- সকল আঘাতে। ঝালর- চাদর জাতীয় কাপড়ের বুলে থাকা অংশ এবং এটি কাজ করা থাকে। টকটকে- উজ্জ্বল। টাটকা- তাজা। টাল খেয়ে- ঘুরে। ঠক্কর- বাধা। ঠাট- গর্ব, আড়ম্বর। তাকত- শক্তি। তাগিদ- প্রেরণা, আশা। তাছির- প্রভাব। তালাব- পুকুর। তেরছাভাবে- বাঁকাভাবে। দয়া উথলে ওঠা- বেশি করে দয়া হওয়া। দাউ-দাউ- বেশি জোরে আগুন জ্বলার ভাব। দু'কদমের পথ- অল্প দূরত্বের পথ। দু-দণ্ড- সামান্য সময়। দুনিয়ার ছায়া নেই-মৃতের মতো। দুরূহ- কঠিন। দুষ্ট আত্মা- ভূত প্রেত। দেমাকি- দেমাক বা গর্ব আছে যার। ধমনি- শিরা। ধ্বসে আছে- ভেঙে পড়ে গেছে। ধাপে ধাপে- বিভিন্ন সময়ে। নাইয়ের- বাড়ি। নাক বরাবর- সোজা, সম্মুখ। নিশানা- চিহ্ন। নিঃসৃত- বের হওয়া। নীলাভ- নীল রঙের। পতিত- পাপী, ধর্মের পথ থেকে



বিচ্যুত। প্রখর দুনিয়ার ছায়া নেই-মৃতের মতো। প্রতি বৎসরের শূন্যতা- প্রতি বৎসর সন্তান না হওয়ার অভাব। প্রশমিত-
থেমে যাওয়া, বন্ধ। পাড়- শাড়ির প্রান্ত। পালক স্পর্শ- অতি হালকা স্পর্শ। পাজা কোল- দুহাত বাড়িয়ে টেনে কোলে নেয়া।
ফলা- অস্ত্রের তীক্ষ্ণ মুখ। ফস্কে গেল- হাতছাড়া হল। ফ্যাকাশে- স্নান, মলিন। ফুটফুটে- সুশ্রী, সুন্দর। বরঞ্চ- বরং।
বাসনা- ইচ্ছা। বিক্ষিপ্ত- অস্থির। বিচ্ছুরিত- ছড়িয়ে পড়া। বিন্দুমাত্র- সামান্য। বিস্তর- অনেক। বিহিত করা- সমাধান করা।
বিবর্জিত- সম্পর্করূপে বাদ। বিদ্রোহ- ঘৃণা। বুটিদার- বুটিওয়ালা, যে কাপড়ে সূচের তৈরি ফুল তোলা হয়। বেদনাভারি-
অতি ব্যথিত। বেহারা- পান্ডি বাহক। বেহুদাপনা- অকাজ। বেলা শেষের স্নান আলো- বিকেল বেলার নিস্তেজ আলো। ভীত
বিহ্বেল- ভয়ে কাতর। মসৃণ- তেলতেলে। মাদুর- পাটি। মাল মশলা- উপকরণ। ম্রিয়মান- মরে যাচ্ছে এমন। মিহি-
চিকন, সূক্ষ্ম। মুষড়ে যাওয়া- ভয় পাওয়া। মেদবহুল- চর্বিওয়ালা। ভুখা- ক্ষুধার্ত। মুখে চুন দেয়া- গর্ব খর্ব করা। মায়-
মহব্বত- প্রেম, ভালোবাসা। যন্ত্রচালিত- যন্ত্রের মত চলা। রক্তাভা- লালচে রঙ। রেহেল- কোরান শরীফ রাখার জন্য কাঠের
কাঠামো। রোশনাই- আলো, আলোর উজ্জ্বলতা। লম্বা কোর্তা- আল খাল্লা জাতীয় পোশাক। লহরি- ঢেউ। লালাসিক্ত-
পোকার শরীর থেকে নির্গত আঠায়ুক্ত। লিকলিক করা- চিকন ও লম্বা জিনিসের নড়ন। শানিত- তীক্ষ্ণ। শান্তি বিধান- শান্তির
ব্যবস্থা। শিখা- আগুনের শিষ। সখ- ইচ্ছা। সংকীর্ণতায়- অপরিসর জায়গায়। সংযত- দমন। সম্ভার- আবির্ভাব। শুদ্ধতা-
শব্দহীনতার অবস্থা। সর্বতোভাবে- সব দিক থেকে। স্বল্পভাষী- অল্প কথা বলে যে। সমতা- মিল। সালু কাপড়- লাল কাপড়।
স্ফীত উদর সম্বলিত- মোটা পেট যুক্ত। সূচের তীক্ষ্ণতায়- সূচের মতো তীক্ষ্ণ রূপে। হকচকিয়ে ওঠা- হতভম্ব হওয়া, বিস্মিত
হওয়া। হত প্রশ্নের নিশ্চুপতা- প্রশ্ন করে লাভ নেই, সেজন্য চুপ হয়ে থাকা। হাসিল- অর্জন। হুঙ্কার- সাবধান বাণী। হুস-
জ্ঞান। হেস্ত-নেস্ত- মীমাংসা, নিষ্পত্তি।

বিশিষ্টার্থক ব্যবহার

অক্ষরে অক্ষরে- পুরোপুরি।
এক টিলের পথ- অতি কাছে।
চোখ অন্ধকার হওয়া- চোখে কিছু না দেখা।
বাতাসে কথা শুরু করে- গোপন কথা অতি দ্রুত প্রকাশিত হয়।
পা চলে না- হাঁটার শক্তি নেই।
ফাঁসীর আসামী- কঠোর শাস্তি যার জন্য বরাদ্দ।
ভেঙে যাওয়া- শক্তিহীন হওয়া।
মুখ শুকিয়ে ওঠা- মুখের স্বাভাবিকতা নষ্ট হওয়া।
সুখ দুঃখের কথা- সংসারের কথা।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্য

আপনেও- আপনিও। এমন তাছির হেই পানি পড়ার যে পেটে গেলে এক মাসের ভুখা মানুষও লগে লগে চাপা হইয়া ওঠে-
সেই পানিপড়ার এমন প্রভাব যে, পেটে গেলে এক মাসের ক্ষুধার্ত মানুষও সঙ্গে সঙ্গে সতেজ হয়ে ওঠে। এহন- এখন। এহন
পাক দেওন লাগব- এখন ঘুরতে হবে তানারে বইবার কন- তাঁকে বসতে বলুন। কওন- বলা। কিছু কমু না- কিছু বলব না।
তয় কেন তানি অভ্জান হইছেন- তাহলে কেন তিনি অভ্জান হয়েছেন? তয় নামেন- তাহলে নামুন। তহুর বাপ- তাহেরের
বাপ, হাসুনির মায়ের বাপ। তানারে উঠবার কন- তাঁকে উঠতে বলুন। তানার হুস হইছে- তাঁর জ্ঞান ফিরেছে। তানি-
তিনি। তৈয়ার হইছেন নি- তৈরি হয়েছেন কী? দিছেন- দিয়েছেন। দিনভর রোজা রাখনে বড় দুর্বল হইছিল তানি- সারাদিন
রোজা রাখায় তিনি বড় দুর্বল হয়েছিলেন। দিবার চায়- দিতে চায়। নামাইয়া- নামিয়ে। পড়তাছি- পড়ছি। বইন- বোন।
বহেন- বসুন। বাড়িতে যাইবার চাইতাছেন- বাড়িতে যেতে চাইছেন। ভুলবার পারি নাই- ভুলতে পারিনি। মাইনুষেরা-
মানুষেরা। যা পড়ছে তালাবের মধ্যেই পড়ছে- যা পড়ছে পুকুরের মধ্যেই পড়ছে। রাখলে- রাখার জন্য। শরীল- শরীর।
শরীলে তাকত হইবার জন্য না?- শরীরে শক্তি হওয়ার জন্য নয়? শান্তি পাইল হেই- শান্তি পেল সেই। সময় হইছে- সময়
হয়েছে। হে তহুর বাপের কথা ভুইলা গেছে- সেই তাহেরের বাপের কথা মানুষেরা ভুলে গেছে।



সারসংক্ষেপ

শুক্রবারে আমেনা বিবি মজিদের নির্দেশ মতো রোজা রাখে, সারাক্ষণ কোরান পড়ে। দুপুরে মজিদের স্ত্রী রহীমা এসে আমেনা বিবিকে পেটে মাখার জন্য পানি পড়া দিয়ে যায়। সন্ধ্যার একটু আগে আমেনা বিবির জন্য পালকি আসে। আমেনা বিবির মাজারে যেতে অনিচ্ছা। তার ভয়, মাজারের চারধারে ঘুরেও যদি তার সন্তান না হয়। পালকি থেকে নামার সময় আমেনা বিবির সুন্দর পা দেখে মজিদের মনে কামভাব জাগে। তার পানিপড়া খেয়ে আমেনা বিবি মাজারের চারদিকে পাক দিতে শুরু করে। তৃতীয় বার পাক দেয়ার সময় আমেনা বিবি চোখে অন্ধকার দেখে এবং মূর্ছা যায়। মজিদ খালেক ব্যাপারীকে বোঝাতে চায় যে, রোজা রাখার জন্য দুর্বল হয়ে আমেনা বিবি মূর্ছা যায়নি; অন্য কারণ আছে। পানিপড়া খেয়ে আমেনা বিবি যখন সাত পাক দিতে পারল না তখন আর সন্দেহ নেই যে আমেনা বিবি অপবিত্র। মজিদ ব্যাপারীকে সরাসরি বলে আমেনা বিবিকে তালাক দিতে। ব্যাপারী অনেক চিন্তা করার পরেও মনে করে যে মজিদের কথাই ঠিক। এরপর ব্যাপারী আমেনা বিবিকে তালাক দেয়। বজ্রাহত মন নিয়ে আমেনা বিবি বাপের বাড়িতে চলে যায়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৫. রহীমার পেটে কয়টি প্যাচ?

ক. ১৪টি

খ. ১৫টি

গ. ১৬টি

ঘ. ১৭টি

২৬. আমেনা বিবিকে তালাক দেয়া হয় যে কারণে—

ক. সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা

খ. মজিদের অহমিকায় ঘা পড়ায়

গ. খালেক ব্যাপারির মানসিক যন্ত্রণা

ঘ. আমেনা বেগমের চারিত্রিক স্থলন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

এক আজব নগর অচিনপুর। এখানে এখনো মধ্যযুগের আবহ বিরাজ করে। বাচ্চারা স্কুলে যায় না। যায় মন্দির বা টোলে। সমাজ চলে পুরোহিতের কথা অনুযায়ী। তার সিদ্ধান্তই সেখানে আইন। জলপড়া, দেবতার চরণামৃত ইত্যাদি সেখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থা।

২৭. উদ্দীপকের অচিনপুরের সঙ্গে ‘লালসালু’ উপন্যাসের কোন গ্রামের মিল রয়েছে?

ক. মনোহরপুর

খ. মতিগঞ্জ

গ. মধুপুর

ঘ. মহকুবনগর

২৮. এরূপ সাদৃশ্য রয়েছে—

i. শিক্ষায়

ii. চিকিৎসায়

iii. ধর্মচিন্তায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৮



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- আক্কাসের একটি স্কুল করার প্রচেষ্টা ও তা ভুল হওয়ার কাহিনি লিখতে পারবেন।
- গ্রামে একটি পাকা মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাব সম্পর্কে একটি বিবরণ লিখতে পারবেন।
- মজিদের বিচিত্র মনোভাবের পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।



মূলপাঠ

সেদিন রাতে কে যেন একটা মস্ত মোমবাতি এনে জ্বালিয়ে দিয়েছে মাজারের পাদদেশে, ঘরটা রোশনাই হয়ে উঠেছে। সে-আলোয় রূপালি ঝালরটা আজ অত্যধিক উজ্জ্বল দেখায়। মজিদ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে সেদিকে। কিন্তু হঠাৎ তার নজরে পড়ে একটা জিনিস। ঝালরের একদিকে ঔজ্জ্বল্য যেন কম; উজ্জ্বলতার দীর্ঘ পাতের মধ্যে এখানে কেমন একটু অন্ধকার! কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখে, ঝালরটার রূপালি ঔজ্জ্বল্য সেখানে বিবর্ণ হয়ে গেছে, সুতাগুলো খসেও এসেছে। দেখে মুহূর্তে মজিদের মন অন্ধকার হয়ে আসে। তার ভুরু কুঁচকে যায়, ঝালরের বিবর্ণ অংশটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তার জীবনে সৌখিনতা কিছু যদি থাকে তবে তা এই কয়েক গজ রূপালি চাকচিক্য। এর ঔজ্জ্বল্যই তার মনকে উজ্জ্বল করে রাখে; এর বিবর্ণতা তার মনকে অন্ধকার করে দেয়।

অবশ্য দু-বছর তিন বছর অন্তর মাজারে গাত্রাবরণ বদলানো হয় এবং বদলাবার খরচ বহন করে খালেক ব্যাপারীই। খরচ করে তা আফসোস হয় না। বরঞ্চ সুযোগটা পেয়ে নিজেকে শতবার ধন্য মনে করে। এদিকে মজিদও লাভবান হয়, কারণ পুরানো গাত্রাবরণটি কেনবার জন্য এ-গ্রামে অনেক প্রার্থী গজিয়ে ওঠে এবং প্রার্থীদের মধ্যে উপযুক্ততা বিচার করে দেখতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে বেশ চড়া দামে বিক্রি করে সেটা। কাজেই ঝালরটার কোনোখানে যদি রঙ চটে যায়, বা সালু কাপড়ের কোনো স্থানে ফাট ধরে তবে মজিদের চিন্তা করার কারণ নেই। কিন্তু তবু জিনিসটার প্রতি কী যে মায়া- তার সামান্য ক্ষতি নজরে পড়লেও বুকটা কেমন কেমন করে ওঠে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মজিদের সামনেই রহীমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আমেনা বিবির জন্য সারাদিন আজ মনটা ভারি হয়ে আছে। একটা প্রশ্ন কেবল ঘুরে-ফিরে মনে আসে। কেউ যদি হঠাৎ কিছু অন্যায় করে ফেলেও, তার কী ক্ষমা নেই? কী অন্যায়ের জন্য আমেনা বিবির এত বড় শাস্তিটা হলো তা অবশ্য জানে না, তবু সে ভাবতে পারে না আমেনা বিবি কিছু গর্হিত কাজ করতে পারে। আবার, করেনি এ-কথাও বা ভাবে কী করে? কারণ খোদাই তো জানিয়ে দিয়েছেন মানুষকে সে অন্যায়ের কথা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রহীমা বিড়বিড় করে বলে, -তুমি এত দয়ালু খোদা, তবু তুমি কী কঠিন।

সে বিড়বিড় করে আর আওয়াজটা এমন শোনায যেন মাজারের সালু কাপড়টা ছেঁড়ে ফড়ফড় করে। মুহূর্তের জন্য চমকে ওঠে মজিদ। মন তার ভারি। রূপালি ঝালরের বিবর্ণ অংশটা কালো করে রেখেছে সে-মন।

হাওয়ায় ক-দিন ধরে একটা কথা ভাসে। মোদাঈবের মিঞার ছেলে আক্কাস নাকি গ্রামে একটি ইস্কুল বসাবে। আক্কাস বিদেশে ছিলো বহুদিন। তার আগে করিমগঞ্জের ইস্কুলে নিজে নাকি পড়াশুনা করেছে কিছু। তারপর কোথায় পাটের আড়তে না তামাকের আড়তে চাকরি করে কিছু পয়সা জমিয়ে দেশে ফিরেছে কেমন একটা লাট-বেলাটের ভাব নিয়ে। মোদাঈবের মিঞা ছেলের প্রত্যাবর্তনে খুশিই হয়েছিলো। ভেবেছিলো, এবার ছেলের একটা ভালো দেখে বিয়ে দিলে বাকি জীবনটা নিশ্চিত মনে তসবি টিপতে পারবে। বিয়ে দেবার তাগিদটা এ জন্য আরো বেশি বোধ করলো যে, ছেলেটির রকম-সকম মোটেই তার পছন্দ হচ্ছিলো না। ছোটবেলা থেকে আক্কাস কিছুটা উচক্কা ধরনের ছেলে। কিন্তু আজকাল মুরব্বিরদের বুদ্ধি সম্পর্কে পর্যন্ত ঘোরতর সন্দেহ নাকি প্রকাশ করতে শুরু করেছে। তবে তাকে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়তে দেখে মুরব্বিররা একেবারে নিরাশ হবার কোনো কারণ দেখলো না। ভালো, বিদেশি হাওয়ায় মাথাটা একটু গরম ধরেছে। তা দু-দিনেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।



কিন্তু নিজে ঠাণ্ডা হবার লক্ষণ না দেখিয়ে আক্কাস অন্যের মাথা গরম করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলো। বলে, ইঙ্কুল দেবে। কোথেকে শিখে এসেছে ইঙ্কুলে না পড়লে নাকি মুসলমানদের পরিত্রাণ নেই। হ্যাঁ, মুরুব্বির স্বীকার করে, শিক্ষা ব্যাপারটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু গ্রামে কী দু-দুটো মজব্ব বসানো হয়নি? সে কি বলতে পারবে এ-কথা যে, গ্রামবাসীদের শিক্ষার কোনোখান দিয়ে কিছুমাত্র অবহেলা হচ্ছে?

আক্কাস যুক্তিতর্কের ধার ধারে না। সে ঘুরতে লাগলো চরকির মতো। ইঙ্কুলের জন্য দস্তুরমত চাঁদা তোলার চেষ্টা চলতে লাগলো, এবং করিমগঞ্জে গিয়ে কাউকে দিয়ে একটা জোরালো গোছের আবেদনপত্র লিখিয়ে এনে সেটা সিধা সে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিলো। কথা এই যে, ইঙ্কুলের জন্য সরকারের সাহায্য চাই।

বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে। কাজেই একদিন মজিদ ব্যাপারীর বাড়িতে গিয়ে উঠলো। কোনোপ্রকার ভণিতার প্রয়োজন নেই বলে সরাসরি প্রশ্ন করলো,

—কী হুনি ব্যাপারী মিঞা?

ব্যাপারী বলে, কথাটা ঠিকই।

অতএব সন্ধ্যার পর বৈঠক ডাকা হলো। আক্কাস এলো, আক্কাসের বাপ মোদাঝের এলো।

আসল কথা শুরু করার আগে মজিদ আক্কাসকে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখলো। দৃষ্টিটা নিরীহ আর তাতে ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে থাকার অস্পষ্টতা।

সভা নীরব দেখে আক্কাস কী একটা কথা বলবার জন্য মুখ খুলেছে— এমন সময় মজিদ যেন হঠাৎ চেতনায় ফিরে এলো। তারপর মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠলো তার মুখ, খাড়া হয়ে উঠলো কপালের রং। ঠাস করে চড় মারা ভঙ্গিতে সে প্রশ্ন করলো,

—তোমার দাড়ি কই মিঞা?

আক্কাস সর্বপ্রকার প্রশ্নের জন্য তৈরি হয়ে এসেছিলো, কিন্তু এমন একটা অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। ইঙ্কুল হবে কী হবে না— সে আলোচনাই তো হবার কথা। তার সঙ্গে দাড়ির কী সম্বন্ধ?

সভায় উপস্থিত সকলের দিকে তাকালো আক্কাস। দাড়ি নেই এমন একটি লোক নেই। কারো ছাটা, কারো স্বভাবত হাক্কা ও ক্ষীণ; কারো-বা প্রচুর বৃষ্টি পানিসিঞ্চিত জঙ্গলের মতো একরাশ দাড়ি। মজিদ আসার আগে গ্রামের পথে-ঘাটে দাড়িবিহীন মানুষ নাকি দেখা যেতো। কিন্তু সেদিন গেছে।

পূর্বোক্ত সুরে মজিদ আবার প্রশ্ন করে,

—তুমি না মুসলমানের ছেলে— দাড়ি কই তোমার?

একবার আক্কাস ভাবে যে বলে, দাড়ির কথা তো বলতে আসেনি এখানে। কিন্তু মুরুব্বির সামনে আর যাই হোক, বেয়াদপিটা চলে না। কাজেই মাথা নত করে চুপ করে থাকে সে।

দেখে মোদাঝের মিঞা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গা ঢিলা করে। এতক্ষণ সে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে ছিলো এই ভয়ে যে, উত্তরে বেয়াড়া ছেলেটা কী না জানি বলে বসে। মোদাঝের মিঞা বলে,

—আমি কত কই দাড়ি রাখ ছ্যামড়া দাড়ি রাখ— তা হের কানে দিয়াই যায় না কথা।

খালেক ব্যাপারী বলে,

—হে নাকি ইংরাজি পড়ছে। তা পড়লে মাথা কী আর ঠাণ্ডা থাকে।

ইংরাজি শব্দটার সূত্র ধরে এবার মজিদ আসল কথা পাড়ে। বলে যে, সে শুনেছে আক্কাস নাকি একটা ইঙ্কুল বসাবার চেষ্টা করছে। সে-কথা কী সত্যি?

আক্কাস অশ্লান বদনে উত্তর দেয়,

—আপনি যা হুনছেন তা সত্য।

মজিদ দাড়িতে হাত বুলাতে শুরু করে। তারপর সভার দিকে দৃষ্টি রেখে বলে,

—তা এ বদ মতলব কেন হইল?

—বদ মতলব আর কী? দিনকাল আপনারা দেখবেন না? আইজকাইল ইংরাজি না পড়লে চলব ক্যামনে?



শুনে মজিদ হঠাৎ হাসে। হেসে এধার-ওধার তাকায়। দেখে আক্কাস ছাড়া সভার সকলে হেসে ওঠে। এমন বেকুফির কথা কেউ কী কখনো শুনেছে? শোন শোন, ছেলের কথা শোন একবার- এ রকম একটা ভাব নিয়ে ওরা হো-হো করে হাসে।

হাসির পর মজিদ গম্ভীর হয়ে ওঠে। তারপর বলে, আক্কাস মিঞা যে-দিনকালের কথা কইলো তা সত্য। দিনকাল বড়ই খারাপ। মাইনমের মতি-গতির ঠিক নাই, খোদার প্রতি মন নাই; তবু যাহোক আমি থাকনে লোকদের একটু চেতনা হইছে-। সকলে একবাক্যে সে-কথা স্বীকার করে। মানুষের আজ যথেষ্ট চেতনা হয়েছে বই কি। সাধারণ চাষাভূষা পর্যন্ত আজ কলমা জানে। তাছাড়া লোকেরা নামাজ পড়ে পাঁচওক্ত, রোজার দিনে রোজা রাখে। আগে শিলাবৃষ্টির ভয়ে শিরালিকে ডাকতো আর শিরালি যপতপ পড়ে নগ্ন হয়ে নাচতো; কিন্তু আজ তারা একত্র হয়ে খোদার কাছে দোয়া করে, -মাজারে শিরনি দেয়, মজিদকে দিয়ে খতম পড়ায়। আগে ধান ভানতে ভানতে মেয়েরা সুর করে গান গাইতো, বিয়ের আসরে সমস্ত গীত ধরতো- আজকাল তাদের মধ্যে নারীসুলভ লজ্জাশরম দেখা দিয়েছে। আগে ঘরে ঢোকা নিত্যকার ব্যাপার ছিলো, কিন্তু মজিদের একশ দোররার ভয়ে তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে মজিদ হাঁক ছাড়ে, -ভাইসকল! পোলা মাইনমের মাথায় একটা বদ খেয়াল ঢুকছে- তা নিয়া আর কী কম। দোয়া করি তার হেদায়ত হোক। কিন্তু একটা বড় জরুরি ব্যাপারে আপনাদের আমি আইজ ডাকছি। খোদার ফজলে বড় সমৃদ্ধশালী গেরাম আমাগো। বড় আফসোসের কথা, এমন গেরামে একটা পাকা মসজিদ নাই। খোদার মর্জি এইবার আমাগো ভালো ধান-চাইল হইছে, সকলের হাতেই দুইচারটা পয়সা হইছে। এমন শুভ কাম আর ফেলাইয়া রাখা ঠিক না।

সভার সকলে প্রথমে বিস্মিত হয়। আক্কাসের বিচার হবে, তার একটা শাস্তিবিধান হবে- এ আশা নিয়েই তো তারা এসেছে। কিন্তু তবু তারা মজিদের নোতুন কথায় মুহূর্তে চমৎকৃত হয়ে গেলো। ব্যাপারীর নেতৃত্বে কয়েকজন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলে, -বাহবা, বড় ঠিক কথা কইছেন!

মজিদ খুশিতে গদগদ। দাড়িতে হাত বুলায় পরম পুলকে। আর বলে, আমার খেয়াল, দশ গেরামের মধ্যে নাম হয় এমন একটা মসজিদ করা চাই। আর সে-মসজিদে নামাজ পইড়া মুসল্লিদের বুক যানি শীতল হয়।

শুনে সভার সকলে চোঁচিয়ে ওঠে, বড় ঠিক কথা কইছেন- আমাগো মনের কথাডাই কইছেন।

এক সময়ে আক্কাস ক্ষীণ গলায় বলে,

-তয় ইঙ্কুলের কথাডা?

শুনে সকলে এমন চমকে উঠে তার দিকে তাকায় যে, এ-কথা স্পষ্ট বোঝা যায় সভায় তার উপস্থিতি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। তার বাপ তো রেগে ওঠে। রাগলে লোকটি কেমন তোতলায়। ধমকে তো তো করে বলে,

-চুপ কর ছ্যামড়া, বেত্তমিজের মতো কথা কইস না। মনে মনে সে খুশি হয় এই ভেবে যে, মসজিদের প্রস্তাবের তলে তার অপরাধের কথাটা যাহোক ঢাকা পড়ে গেছে।

মসজিদের আকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে এমন সময়ে আক্কাস আন্তে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কেউ দেখে কেউ দেখে না, কিন্তু তার চলে যাওয়াটা কারো মনে প্রশ্ন জাগায় না। যে গুরুতর বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে তাতে আক্কাসের মতো খামখেয়ালী বুদ্ধিহীন যুবকের উপস্থিতি একান্ত নিষ্পয়োজনীয়।

মসজিদের কথা চলতে থাকে। এক সময়ে খরচের কথা ওঠে। মজিদ প্রস্তাব করে, গ্রামবাসী সকলেরই মসজিদটিতে কিছু যেন দান থাকে, প্রতিটি ইট বড়গা ছড়কায় কারো না কারো যেন যথকিঞ্চিৎ হাত থাকে। সেটা অবশ্য বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ একটা কানাকড়িও নেই এমন গ্রামবাসীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তারা অর্থ দিয়ে সাহায্য না করলেও গতর খাটিয়ে সাহায্য করতে পারে। তারা এ ভেবে তৃপ্তি পাবে যে, পয়সা দিয়ে না হলেও শ্রম দিয়ে খোদার ঘরটা নির্মাণ করেছে।

এমন সময় খালেক ব্যাপারী তার এক সকাতির আর্জি পেশ করে। বলে যে, সকলেরই কিছু না কিছু দান থাক মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে, কিন্তু খরচের বারো আনা তাকে যেন বহন করতে দেয়া হয়। তার জীবন আর ক-দিন। আর খায়েশখোয়াব বা আশা-ভরসা নাই, এবার দুনিয়ার পাট গুটাতে পারলেই হয়। যা সামান্য টাকা-পয়সা আছে তা ধর্মের কাজে ব্যয় করতে পারলে দিলে কিছু শান্তি আসবে।

দিলের শান্তির কথা কেমন যেন শোনায। আমেনা বিবির ঘটনাটা সেদিন মাত্র ঘটলো। কানামুঘায় কথাটা এখনো জীবন্ত হয়ে আছে। শুধু জীবন্ত হয়ে নেই, ডালপালা শাখা-প্রশাখায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই থেকে মানুষের মনে যেন একটা নতুন চেতনাও এসেছে। যাদের ঘরে বাজা মেয়ে তাদের আর শান্তি নেই। অবশ্য ধর্মের ঘরে গিয়ে কষ্টপাথরে ঘষলে জানা যায়



আসল কথা, কিন্তু সে তো সব সময়ে করা সম্ভব নয়। তাই একটা হিড়িক এসেছে, সংসার থেকে বাজা বউদের দূর করার, আর গণ্ডায় গণ্ডায় তারা চালান যাচ্ছে বাপের বাড়ি।

তবু যাহোক, মানুষের দিল বলে একটা বস্তু আছে। দীর্ঘ বসবাসের ফলে মানুষে মানুষে মায়া হয়। তাই পরমাত্মীর কোনো অন্যায়ের বুকে কঠিনতম আঘাত লাগে। ব্যাপারী আঘাত পেয়েছে। সে আঘাত এখনো শুকায়নি। তাই হয়তো দিলে শান্তি চায়।

মজিদ সভাকে প্রশ্ন করে,

—ভাই সকল, আপনাদের কী মত?

ব্যাপারীকে নিরাশ করবে— এমন কথা কেউ ভাবতে পারে না। কাজেই তার আবেদন মঞ্জুর হয়।

মজিদ সুবিচারক। অতএব স্থির হলো, এমনভাবে চাঁদা তোলা হবে যে, আখানা আর আস্তাই হোক— একজন লোক অন্তত একটা খরচ যেন বহন করে।

সভা ক্ষান্ত হবার আগে একবার আক্কাসের বদখেয়ালের কথা ওঠে। কিন্তু মোদায়েসের মিশ্রণ তখন জোশ এসে গেছে। রেগে উঠে সে বলে যে, ছেলে যদি এমন কথা ফের তোলে তবে সে নিজেই তাকে কেটে দু-টুকরো করে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে।

যতটা সুদৃশ্য করা হবে বলে কল্পনা করা হয়েছিলো ততটা সুদৃশ্য না হলেও একটা গম্বুজওয়ালা মসজিদ তৈরি হতে থাকে। শহর থেকে মিস্ত্রি-কারিগর এসেছে, আর গতর খাটাবার জন্য তৈরি গ্রামের যত দুস্থ লোক। মজিদ সকাল-বিকাল তদারক করে, আর দিন গোনে কবে শেষ হবে।

একদিন সকালে সে মসজিদের দিকে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ মাঠের ধারে ফাল্লুনের পাগলা হাওয়া ছোট্টে। এত আকস্মিক তার আবির্ভাব যে, বাকবাকে রোদভাসা আকাশের তলে সে-দমকা হাওয়া কেমন বিচিত্র ঠেকে। তাছাড়া শীতের হাওয়া শূন্য জমজমাট ভাবের পর আচমকা এই দমকা হাওয়া হঠাৎ মনের কোনো এক অতল অঞ্চলকে মথিত করে জাগিয়ে তোলে। ধুলো-ওড়ানো মাঠের দিকে তাকিয়ে মজিদের স্মরণ হয় তার জীবনের অতিক্রান্ত দিনগুলোর কথা। কত বছর ধরে সে বসবাস করছে এ-দেশে। দশ, বারো? ঠিক হিসাব নেই, কিন্তু এ-কথা স্পষ্ট মনে আছে যে, এক নিরাকপড়া শ্রাবণের দুপুরে সে এসে প্রবেশ করেছিলো এ মহব্বতনগর গ্রামে। সেদিন ছিলো ভাগ্যাবেশী দুস্থ মানুষ, কিন্তু আজ সে জোতজমি সম্মান-প্রতিপত্তির মালিক। বছরগুলো ভালোই কেটেছে, এবং হয়তো ভবিষ্যতেও এমনি কাটবে। এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়, সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ।

আজ দমকা হাওয়ার আকস্মিক আগমনে তার মনে ভবিষ্যতের কথাই জাগে এবং তাই সারাদিন মনটা কেমন কেমন করে। লোকদের সঙ্গে আলাপ করে ভাসা-ভাসা ভাবে, কইতে কইতে সে সহসা কেমন আনমনা হয়ে যায়।

সারাদিন হাওয়া ছোট্টে। সন্ধ্যার পরে সে-হাওয়া থামে। যেমনি আচমকা তার আবির্ভাব হয়েছিলো তেমনি আচমকা থেমে যায়। দোয়া-দরুদ পড়ছিলো মজিদ, এবার নিস্তব্ধতার মধ্যে গলাটা চড়া ও কেমন বিসদৃশ শোনাতে থাকে। একবার কেশে নিয়ে গলা নাবিয়ে এধার-ওধার দেখে অকারণে, তারপর মাছের পিঠের মতো মাজারটার দিকে তাকায়। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে চমকে ওঠে। রূপালি ঝালরওয়ালা সালু কাপড়টা এক কোণে উলটে আছে।

সত্যিই সে চমকে ওঠে। ভেতরটা কিসে ঠক্কর খেয়ে নড়ে ওঠে, স্রোতে ভাসমান নৌকায় চড়ে ধাক্কা খাওয়ার মতো ভীষণভাবে ঝাঁকুনি খায়। কারণ, ঘরের স্নান আলোয় কবরের সে অনাবৃত অংশটা মৃত মানুষের খোলা চোখের মতো দেখায়।

কার কবর এটা? যদিও মজিদের সমৃদ্ধির, যশমান ও আর্থিক সচ্ছলতার মূল কারণ এই কবরটা, কিন্তু সে জানে না কে চির শায়িত এর তলে। যে-কবরের পাশে আজ তার একযুগ ধরে বসবাস এবং যে-কবরের সভা সম্পর্কে সে প্রায় অচেতন হয়ে উঠেছিলো, সে-কবরই ভীত করে তোলে তার মনকে। কবরের কাপড় উলটানো নগ্ন অংশই হঠাৎ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মৃত লোকটিকে সে চেনে না। এবং চেনে না বলে আজ তার পাশে নিজেকে বিস্ময়করভাবে নিঃসঙ্গবোধ করে। এ-নিঃসঙ্গতা কালের মতো আদিঅন্তহীন— যার কাছে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ অর্থহীন অপলাপ মাত্র।

সে-রাতে রহীমা স্বামীর পা টিপতে টিপতে মজিদের দীর্ঘশ্বাস শোনে। চিরকালের স্বল্পভাষিণী রহীমা কোনো প্রশ্ন করে না। কিন্তু মনে-মনে ভাবে।

এক সময়ে মজিদই বলে,

—বিবি, আমাগো যদি পোলাপাইন থাকতো!



এমন কথা মজিদ কখনো বলে না। তাই সহসা রহীমা কথাটার উত্তর খুঁজে পায় না। তারপর পা টেপা ক্ষণকালের জন্য থামিয়ে ডান হাত দিয়ে ঘোমটাটা কানের ওপর চড়িয়ে সে আন্তে বলে, -আমার বড় সখ হাসুনিরে পুশি রাখি। কেমন মোটাতাজা পোলা।

প্রথমে মজিদ কিছুই বলে না। তারপর বলে,

-নিজের রক্তের না হইলে কী মন ভরে? কথাটা বলে আর মনে মনে অন্য একটা কথার মহড়া-দেয়। মহড়া-দেয়া কথাটা শেষে বলেই ফেলে। বলে, তাছাড়া তার মায়ের জনুর নাই ঠিক!

তারপর তারা অনেকক্ষণ নীরব হয়ে থাকে। মজিদের নীরবতা পাথরের মতো ভারি। যে-নিঃশব্দতা আজ তার মনে ঘন হয়ে উঠেছে সে-নিঃশব্দতা সত্যিকার, জীবনের মতো তা নিছক বাস্তব। এবং কথা হচ্ছে, পুশি ছেলে তো দূরের কথা, রহীমাও সে-নিঃশব্দতাকে দূর করতে পারে না। দূর হবে যদি নেশা ধরে। মজিদের নেশার প্রয়োজন।

ব্যথাবিদীর্ণ কণ্ঠে মজিদ আবার হাহাকার করে ওঠে,

-আহা, খোদা যদি আমাগো পোলাপাইন দিতো!

মজিদের মনে কিন্তু অন্য কথা ঘোরে। তখন মাজারের অনাবৃত কোণটা মৃত মানুষের চোখের মতো দেখাচ্ছিলো। তা দেখে হয়তো তার মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়েছিলো। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও স্মরণ হয়েছিলো যে, জীবনকে সে উপভোগ করেনি। জীবন উপভোগ না করতে পারলে কিসের ছাই মান-যশ-সম্পত্তি? কার জন্য শরীরের রক্ত পানি করা আয়েশ-আরাম থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা?

পরদিন সকালে মজিদ যখন কোরান শরিফ পড়ে তখন তার অশান্ত আত্মা সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে মিহি চিকন কণ্ঠের ঢালা সুরে। পড়তে পড়তে তার ঠোঁট পিচ্ছিল ও পাতলা হয়ে ওঠে, চোখে আসে এলোমেলো হাওয়ার মতো অস্থিরতা।

বেলা চড়লে তার কোরান-পাঠ খতম হয়। উঠানে সে যখন বেরিয়ে আসে তখনো কিন্তু তার ঠোঁট বিড়বিড় করে- তাতে যেন কোরান পাঠের রেশ লেগে আছে।

উঠানের কোণে আঙলাঘরের নিচু চালের ওপর রহীমা কদুর বিচি শুকাবার জন্য বিছিয়ে দিচ্ছিলো। সে পেছন ফিরে আছে বলে মজিদ আড়চোখে চেয়ে চেয়ে তাকে দেখে কতক্ষণ। যেন অপরিচিত কাউকে দেখে লুকিয়ে লুকিয়ে। কিন্তু চোখে আগুন জ্বলে না।

রাতে মজিদ রহীমাকে বলে,

-বিবি, একটা কথা।

শুনবার জন্যে রহীমা পা-টেপা বন্ধ করে। তারপর মুখটা তেরছাভাবে ঘুরিয়ে তাকায় স্বামীর পানে।

-বিবি, আমাগো বাড়িটা বড়ই নিরানন্দ। তোমার একটা সাথি আনুম? সাথি মানে সতীন। সে-কথা বুঝতে রহীমার এক মুহূর্ত দেরি হয় না। এবং পলকের মধ্যে কথাটা বোঝে বলেই সহসা কোনো উত্তর আসে না মুখে।

রহীমাকে নিরুত্তর দেখে মজিদ প্রশ্ন করে,

-কী কও?

-আপনে যেমুন বোঝেন।

তারপর আর কথা হয় না। রহীমা আবার পা টিপতে থাকে বটে কিন্তু থেকে-থেকে তার হাত থেমে যায়। সমস্ত জীবনের নিষ্ফলতা ও অন্তঃসারশূন্যতা এ মুহূর্তে তার কাছে হঠাৎ মস্তবড় হয়ে ওঠে। কিন্তু বলবার তার কিছু নেই।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অতিক্রান্ত- ফেলে আসা। অপলাপ- মিথ্যে কথা। অন্তর- পর। অন্তঃসারশূন্যতা- ভিতরটা শূন্য এমন ভাব। আঙলাঘর- বসার ঘর। আর্জি- নিবেদন, প্রার্থনা। আন্ত- পুরো। আদি অন্তহীন- যার শুরু নাই শেষও নাই, বিশাল, সীমাহীন। অনাবৃত- আটকা, খোলা। আফসোস- অনুতাপ। আড়ত- ব্যবসা-কেন্দ্র, কেনা-বেচার জায়গা। উচ্ছ্বসিত- বেশি আবেগপূর্ণ। উপভোগ- তৃপ্তির সঙ্গে যাপন। উপযুক্ততা- যোগ্যতা। ওস্ত- নামাজের সময়। কষ্টি পাথর- সোনা ইত্যাদি যাচাই করার বিশেষ পাথর। ক্ষান্ত- শেষ। ক্ষীণ- অল্প, মৃদু। কানাঘুসা- কানে কানে কথা চালাচালি। খামখেয়ালী- খেয়াল খুশি মতো যে চলে। খায়েশ-খোয়াব- ইচ্ছা ও স্বপ্ন। গদগদ- অতিরিক্ত খুশি। গতর- শরীর। গর্হিত- খারাপ। গাত্রাবরণ- গিলাফ। গম্বুজ- গম্বুজ, মসজিদ ইত্যাদির ওপরে গোল



চূড়া। চমৎকৃত- অবাক। চড়িয়ে- উপড়ে তুলে। চাকচিক্য- উজ্জ্বলতা। চাষাভূষা- চাষী জাতীয় সাধারণ লোক। চিরশায়িত- চিরকাল শুয়ে থাকা মৃত। ছাটা- কেটে ছোট করা। জমজমাট- সরগরম। জ্যোতজমি- সম্পত্তি। জোশ- উত্তেজনা। ঝকঝকে রোদভাসা- রোদে উজ্জ্বল। ঠক্কর- ধাক্কা, আঘাত। তদারক- দেখাশোনা। নিত্যকার- প্রতি দিনের। দমকা- হঠাৎ জোরে আসা। দররা- চাবুকের আঘাত। দরিয়া- নদী। দুস্থ- দীন, দুঃখী। নিষ্ফলতা- ব্যর্থতা। নিছক- খাঁটি। নিঃসঙ্গ- একাকী। নিরাকপড়া- একটুও হাওয়া নেই এমন। পরমাত্মীয়- অতি নিকটজন। পলক- নিমেষ। পরিদ্রাণ- উদ্ধার। প্রত্যাবর্তন- ফিরে আসা। পাগলা হাওয়া- এলোমেলো হাওয়া। পাত- লোহা বা তামার পাতলা করা অংশ। পাদদেশে- নিচে। প্রার্থী- ইচ্ছুক ব্যক্তি। পিচ্ছিল- পিছলা। পুষ্য- পোষ্য, দত্তক। বদ খেয়াল- দুঃস্থ ইচ্ছা। বদ মতলব- দুঃস্থ বুদ্ধি। বরঞ্চ- বরং। বড়গা- বরগা, ছাদের ভার, রক্ষার জন্য ব্যবহৃত কাঠ অথবা লোহা। ব্যথাবিদীর্ণ- ব্যথায় ছিড়ে গিয়েছে এমন। বাজা- বন্দ্য, যে নারীর সন্তান হয় না। বাঞ্ছনীয়- যে রকম ইচ্ছা করা হয়েছে, কাম্য। বিবর্ণ- রং ওঠা। বিসদৃশ- অন্য রকম। বৈঠক- সভা। বৃষ্টির পানি সিঁধিত- বৃষ্টির পানিতে ভেজা। ভারি- দুঃখিত। মক্তব- মুসলমান ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়। মথিত- আন্দোলিত। মহড়া- প্রস্তুতি। মর্জি- ইচ্ছা। মঞ্জুর- গৃহীত। মুরুবি- গুরুজন। মুসল্লি- যারা নামাজ পড়ে, নামাজী। যপতপ- মন্ত্রপাঠ। যথকিঞ্চিত- সামান্য। যশমান- সুনাম ও সম্মান। রকম-সকম- ভাবভঙ্গি। রুদ্ধ- বন্ধ। রেশ- অনুরণ। রোশনাই- আলোকিত। লাট-বেলাট- ক্ষমতাসালী। শান্তিবিধান- শান্তির ব্যবস্থা। শিকড়গাড়া- শিকড় মাটিতে অনেকটা ঢুকে যাওয়াতে গাছের শক্ত অবস্থান। শিলাবৃষ্টি- ঝড়ো বৃষ্টির সঙ্গে বরফ খণ্ড পড়া। শিরালি- শিলাবৃষ্টির ভয় কাটানোর জন্য যারা মন্ত্র পড়ে। শিরনি- পুণ্য লাভের জন্য মসজিদে বা পীরের বাড়িতে দেয়া পায়ের জাতীয় খাদ্য। সকাতির- কাতরতাসহ। সমস্বরে- এক সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে। সূত্র- সম্পর্ক। সুদৃশ্য- দেখতে সুন্দর। সম্মান-প্রতিপত্তি- মর্যাদা ও ক্ষমতা। সচ্ছলতা- প্রাচুর্য। সমৃদ্ধি- টাকা পয়সা ও সম্পত্তির উন্নতি। সৌখিনতা- সখ। স্বল্পভাষিনী- যে স্ত্রীলোক কম কথা বলে। হিড়িক- হুজুগ। হড়কা- দরজার খিল। হেদায়ত- সংশোধন।

বাক্যাংশের বিশিষ্ট অর্থ :

অন্যের মাথা গরম করা- অন্যকে রাগিয়ে দেয়া। অনেক প্রার্থী গজিয়ে ওঠে- অনেকেই কিনতে চায়। ইচ্ছুল বসানো- বিদ্যালয় তৈরি করা। উজ্জ্বলতার দীর্ঘ পাড়ের মধ্যে- সব উজ্জ্বলতার মধ্যে। ওঠে পড়ে লেগে গেলো- তৎপর হল। কথাটা ঢাকা পড়ে গেছে- কথাটি নিয়ে আর কেউ আলোচনা করছে না। কয়েকজন রূপালি চাকচিক্য- উচ্চ গিলাফে ঢাকা মাজার কালো করে রেখেছে কেমন- মনটা বিষাদে ভরে গেছে। কেমন একটা লাট-বেলাটের ভাব- কাউকে তোয়াক্কা করছে না এমন ভাব। খাড়া হয়ে উঠলো কপালের রং- রেগে বা উত্তেজিত হয়ে উঠল। গতর খাটিয়ে সাহায্য করতে পারে- শারীরিক পরিশ্রম দিয়ে সাহায্য করতে পারে। গা টিলা করে- স্বস্তি পায়। জীবন আর কদিন- জীবন শেষ হয়ে এসেছে। ডাল পালা শাখা প্রশাখায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে- কথাটা সব দিকে ছড়াচ্ছে। তসবি টিপতে পারবে- ধর্মকর্ম করতে পারবে। দুনিয়ার পাট গুটানো- পৃথিবীর কাজ কর্ম শেষ করে আনা। নিমগ্ন হয়ে থাকার অস্পষ্টতা- নিজের ভাবনায় ডুবে থাকার কারণে উদাসীন ভাব। বুকটা কেমন কেমন করে ওঠে- বুকের ভিতরে দুঃখ জাগে। বাড়াবাড়ির সীমা- অতিরিক্ত কিছু করার সীমা। মন অন্ধকার হওয়া- মনে দুঃখ আসা। মাথাটা একটু গরম ধরেছে- মাথা বিগড়ে গেছে। মুখ খুলেছে- কথা বলতে শুরু করেছে। যুক্তি তর্কের ধার ধারে না- যুক্তি মানে না। যে ঘুরতে লাগলো চরকির মতো- চারদিকে অনবরত যেতে লাগল। হাওয়ায় কদিন ধরে একটা কথা ভাসে- প্রধান আলোচ্য বিষয়।

আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্য :

আইজকাইল ইংরাজি না পড়েল চলব ক্যামনে- আজ কাল ইংরেজি না পড়েল চলবে কীভাবে। আপনি যা হনছেন- আপনি যা শুনেছেন। আপনে যেমন বোঝেন- আপনি যেমন বোঝেন। আমাগো ভালে ধান হইছে- আমাদের ভালো ধান হয়েছে। আমাগো মনের কথাডাই কইছেন- আমাদের মনের কথাটাই বলেছেন। আমাগো যদি পোলাপাইন থাকত- আমাদের যদি ছেলে-পিলে থাকত। আমি কত কই ছ্যামড়া দাড়ি রাখ তা হের কান দিয়া যায় না কথাটা- আমি কত বলি, ছেলে দাড়ি রাখ তা ওর কান দিয়ে যায় না কথাটা। কথাডা ঠিকই- কথাটা ঠিকই। কী কও- কি বল। গিরাম- গ্রাম। চুপ কর ছ্যামড়া- চুপ কর ছেলে। তোমার একটা সাথী আনুম- তোমার একটি সঙ্গী আনব। পোলা- ছেলে। পোলা মাইনমের- ছেলে মানুষের। বেগুমিজের মত কথা কইস না- অভদ্রের মতো কথা বলিস না। ফেলাইয়া রাখা ঠিক না- ফেলে রাখা ঠিক নয়।



সারসংক্ষেপ

রহীমা আমেনা বিবির কথা ভুলতে পারে না। খোদা দয়ালু হয়েও এত কঠিন কেন? রহীমার কথায় মজিদ চমকে ওঠে। এদিকে মোদাবের মিঞার ইংরেজি পড়া ছেলে আক্বাস গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদা তোলে ও সরকারের কাছে



আবেদন দেয়। গ্রামের মুরুব্বির এটা পছন্দ কওে না, মজিদ তো নয়ই। মজিদ আক্কাসকে কাবু করার পথ খুঁজতে লাগে। স্কুলের ব্যাপারে যে বৈঠক বসে তাতে মজিদ হঠাৎ আক্কাসকে জিজ্ঞেস করে বসল তার দাড়ি কই। আক্কাস স্কুল সম্পর্কে কথা বলতে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল, কিন্তু এ রকম উদ্ভট আক্রমণে সে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। মজিদের প্রভাবে মহব্বতনগরের সবাই দাড়ি রাখতে শুরু করেছে, শুধু ব্যতিক্রম আক্কাস। মজিদ সকলকে বুঝিয়ে দিল যে, স্কুল গড়ার চিন্তা আক্কাসের মনের একটি বদ খেয়াল মাত্র। এরপর মজিদ একটি নতুন প্রস্তাব দেয়, তা হলো মহব্বত নগর গ্রাম সমৃদ্ধিশালী হলেও এখানে পাকা মসজিদ নেই। পাকা মসজিদ করার প্রস্তাবে সবাই প্রবল উৎসাহ বোধ করে। খালেক ব্যাপারী খরচের বারো আনা বহন করার আগ্রহ দেখায়। তবে মসজিদ নির্মাণে গ্রামের সকলেরই কিছু না কিছু অংশ থাকতেই হবে। এটি মজিদের ইচ্ছা। এভাবে আক্কাসের স্কুল গড়ার প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। মোদাক্কের মিঞাই জানায় ছেলে যদি আর অগ্রসর হয় তাকে দু টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হবে। মজিদ একদিন দেখে মাজারের সালু কাপড়ের এক অংশ বাতাসে উল্টে আছে। কার কবর এটি? মজিদ জানে না। রাতে ঘুমাবার সময় মজিদ রহীমাকে বলে, যদি তাদের ছেলেপিলে থাকতো। পরদিন মজিদ রহীমাকে জানায়, সে রহীমার সাথে আনবে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৯. ‘চুপ কর ছ্যামড়া, বেঙমিজের মতো কথা কইস না।’- উক্তিটি কার?

ক. ধলা মিঞার

খ. খালেক ব্যাপারীর

গ. মোদাক্কের মিঞার

ঘ. তাহেরের পিতার

৩০. আক্কাস স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চায় কেন?

ক. মজিদকে গ্রাম ছাড়া করতে

খ. সমাজ সেবা করতে

গ. গোঁড়ামি দূর করতে

ঘ. এলাকাবাসিকে শিক্ষিত করতে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩১ ও ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

শ্রী সদানন্দ চক্রবর্তীকে গ্রামের অর্ধেক লোক ‘সাদা দাদা’, অর্ধেক লোক ‘সাদা পাগলা’ বলিয়া ডাকিত। তাহার পিতা গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। ইংরেজি স্লেচ্ছ ভাষা, ইংরেজি শিখিলে ধর্ম নষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি পুত্রকে লিখিতে-পড়িতে শিখান নাই।

৩১. উদ্দীপকের সদানন্দের পিতা ‘লালসালু’ উপন্যাসের কোন চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. মোদাক্কের মিঞা

খ. ধলা মিঞা

গ. খালেক ব্যাপারি

ঘ. আওয়ালপুরের পীর

৩২. এরূপ সাদৃশ্যের কারণ-

i. কুসংস্কারাচ্ছন্নতা

ii. ধর্মীয় গোঁড়ামি

iii. কুপমণ্ডকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৯



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

✚ মজিদের দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।

✚ বিদ্রোহী জমিলার চরিত্রের একটি দিক বর্ণনা করতে পারবেন।

✚ মাজারে জিকির অনুষ্ঠানের বিবরণ লিখতে পারবেন।



মূলপাঠ

জ্যেষ্ঠের কড়া রোদে মাঠ ফাটছে আর লোকদের দেহ দানা-দানা হয়ে গেছে ঘামাচিত্তে, এমন সময় মসজিদের কাজ শেষ হয়। এবং তার কিছু দিনের মধ্যেই মজিদের দ্বিতীয় বিয়েও সম্পন্ন হয় অনাড়ম্বর দ্রুততায়। ঢাকঢোল বাজে না, খানাপিনা মেহমান অতিথির হৈছলছুল হয় না, অত্যন্ত সহজে ব্যাপারটা চুকে যায়।

বউ হয়ে যে মেয়েটি ঘরে আসে সে যেন ঠিক বেড়ালছানা। বিয়ের আগে মজিদ ব্যাপারীকে সংগোপনে বলেছিলো যে, ঘরে এমন একটি বউ আনবে যে খোদাকে ভয় করবে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হয়, সে খোদাকে কেন সব কিছুকেই ভয় করবে, মানুষ হাসিমুখে আদর করতে গেলেও ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে।

নোতুন বউ-এর নাম জমিলা। জমিলাকে পেয়ে রহীমার মনে শাশুড়ির ভাব জাগে। স্নেহ-কোমল চোখে সারাক্ষণ তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে, আর যত দেখে তত ভালো লাগে তাকে। আদর-যত্ন করে খাওয়ায়-দাওয়ায় তাকে। ওদিকে মজিদ ঘনঘন দাড়িতে হাত বুলায়, আর তার আশ-পাশ আতরের গন্ধে ভুরভুর করে।

এক সময় গলায় পুলক জাগিয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

—হে নামাজ জানেনি?

রহীমা জমিলার সঙ্গে একবার গোপনে আলাপ করে নেয়। তারপর গলা চড়িয়ে বলে,

—জানে।

জানলে পড়ে না ক্যান?

জমিলার সঙ্গে আলাপ না করেই রহীমা সরাসরি উত্তর দেয়,

—পড়বো আর কি ধীরে-সুস্থে,

—তোমার হে মানসম্মান করেনি?

—করে না? খুব করে। একরত্তি মাইয়া, কিন্তু বড় ভালো। চোখ পর্যন্ত তোলে না।

তারা দু-জনেই কিন্তু ভুল করে। কারণ দিন কয়েকের মধ্যে জমিলার আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে। প্রথমে সে ঘোমটা খোলে, তারপর মুখ আড়াল করে হাসতে শুরু করে। অবশেষে ধীরে ধীরে তার মুখে কথা ফুটতে থাকে। এবং একবার যখন ফোটে তখন দেখা যায় যে, অনেক কথাই সে জানে ও বলতে পারে—এতদিন কেবল তা ঘোমটার তলে ঢেকে রেখেছিলো।

একদিন বাইরের ঘর থেকে মজিদ হঠাৎ শোনে সোনালি মিহি সুন্দর হাসির ঝঙ্কার। শুনে মজিদ চমকিত হয়। দীর্ঘ জীবনের মধ্যে এমন হাসি সে কখনো শোনে নি। রহীমা জোরে হাসে না। সালু আবৃত মাজারের আশে-পাশে যারা আসে তারাও কোনোদিন হাসে না। অনেক সময় কান্নার রোল ওঠে, কত জীবনের দুঃখবেদনা বরফ-গলা নদীর মতো হুহু করে ভেসে আসে আর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসের দমকা হাওয়া জাগে, কিন্তু এখানে হাসির ঝঙ্কার ওঠে না কখনো। এখানকার কথা ছেড়ে দিলেও, আগেই-বা কবে মজিদ এমন হাসি শুনেছে। জীর্ণ গোয়ালঘরের মতো মজবে খিটখিটে মেজাজের মৌলবির সামনে প্রাণভয়ে তারস্বরে আমসিপারা-পড়া হতে শুরু করে অনু-সংস্থানের জন্য তিক্ততম সংগ্রামের দিনগুলির মধ্যে কোথাও হাসির লেশমাত্র আভাস নাই। তাই কয়েক মুহূর্ত বিমুগ্ধ মানুষের মতো মজিদ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর সামনের লোকটির পানে তাকিয়ে হঠাৎ সে শক্ত হয়ে যায়। মুখের পেশি টান হয়ে ওঠে, আর কুঁচকে যায় ভুরু।

পরে ভেতরে এসে মজিদ বলে,

—কে হাসে অমন কইরা?

জমিলা আসার পর আজ প্রথম মজিদের কণ্ঠে রুষ্টিতা শোনা যায়। তাই যে-জমিলা মজিদকে ভেতরে আসতে দেখে ওধারে মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছিল লজ্জায়, সে আড়ষ্ট হয়ে যায় ভয়ে। কেউ উত্তর দেয় না।

মজিদ আবার বলে,

—মুসলমানের মাইয়ার হাসি কেউ কখনো হুনে না। তোমার হাসিও যানি কেউ হুনে না।

রহীমা এবার ফিসফিস করে বলে, হুনলানি? আওয়াজ কইরা হাসন নাই।

জমিলা আস্তে মাথা নাড়ে। সে শুনেছে।



একদিন দুপুরে জমিলাকে নিয়ে রহীমা পাটি বুনতে বসে। বাইরে আকাশে শঙ্খচিল ওড়ে, আর অদূরে বেড়ার ওপর বসে দুটো কাক ডাকাডাকি করে অবিশ্রান্তভাবে।

বুনতে-বুনতে জমিলা হঠাৎ হাসতে শুরু করে। মজিদ বাড়িতে নেই, পাশের গ্রামে গেছে এক মরণাপন্ন গৃহস্থকে ঝাড়তে। তবু সভয়ে চমকে ওঠে রহীমা বলে,

—জোরে হাইস না বইন, মাইনসে ছনবো।

ওর হাসি কিছু থামে না। বরঞ্চ হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। বিচিত্রভাবে জীবন্ত সে হাসি, বরনার অনাবিল গতির মতো ছন্দময় দীর্ঘ সমাপ্তিহীন ধারা আপনা থেকে হাসি যখন থামে তখন জমিলা বলে,

—একটা মজার কথা মনে পড়লো বইলাই হাসলাম বুঝ।

হাসি থেমেছে দেখে রহীমা নিশ্চিন্ত হয়। তাই এবার সহজ গলায় প্রশ্ন করে,

—কী কথা বইন?

—কমু? বলে চোখ তুলে তাকায় জমিলা। সে-চোখ কৌতুকে নাচে।

—কও না!

বলবার আগে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সে কী যেন ভাবে। তারপর বলে,

—তানি যখন আমারে বিয়া করবার যায় তখন খোদেজা বুঝ বেড়ার ফাঁক দিয়া তাঁনারে দেখাইছিল।

—কারে দেখাইছিল?

—আমারে। তয় দেইখা আমি কই, দ্যুত, তুমি আমার লগে মক্ষরা কর খোদেজা বুঝ। কারণ কী আমি ভাবলাম, তানি বুঝি দুলার বাপ। আর— হঠাৎ আবার হাসির একটা দমক আসে, তবু নিজেকে সংযত করে সে বলে— আর, এখানে তোমারে দেইখা ভাবলাম তুমি বুঝি শাশুড়ি।

কথা শেষ করেছে কী অমনি জমিলা আবার হাসিতে ফেটে পড়লো। কিন্তু সে হাসি থামতে দেরি হলো না। রহীমার হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে উঠা মুখের দিকে তাকিয়ে সে আচমকা থেমে গেলো।

সারা দুপুর পাটি বোনে, কেউ কোনো কথা কয় না। নীরবতার মধ্যে এক সময়ে জমিলার চোখ ছলছল করে ওঠে, কিসের একটা নিদারুণ অভিমান গলা পর্যন্ত উঠে ভারি হয়ে থাকে। রহীমার অলক্ষ্যে ছাপিয়ে ওঠা অশ্রুর সঙ্গে কতক্ষণ লড়াই করে জমিলা তার পর কেঁদে ফেলে।

হাসি শুনে রহীমা যেমন চমকে উঠেছিলো তেমনি চমকে উঠে তার কান্না শুনে। বিস্মিত হয়ে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকে জমিলার পানে। জমিলা কাঁদে আর পাটি বোনে, থেকে থেকে মাথা ঝুঁকি চোখ নাক মোছে।

রহীমা আস্তে বলে,

—কাঁদো ক্যান বইন?

জমিলা কিছুই বলে না। পশলাটি কেটে গেলে সে চোখ তুলে তাকায় রহীমার পানে, তারপর হাসে। হেসে সে একটি মিথ্যা কথা বলে।

বলে যে, বাড়ির জন্য তার প্রাণ জ্বলে। সেখানে একটা নুলা ভাইকে ফেলে এসেছে, তার জন্য মনটা কাঁদে। বলে না যে, রহীমাকে হঠাৎ গম্ভীর হতে দেখে বুকে অভিমান ঠেলে এসেছিলো এবং একবার অভিমান ঠেলে এলে কান্নাটা কী করে আসে সব সময়ে বোঝা যায় না। রহীমা উত্তরে হঠাৎ তাকে বুকে টেনে নেয়, কপালে আস্তে চুমা খায়।

জমিলাই কিন্তু দু-দিনের মধ্যে ভাবিয়ে তোলে মজিদকে। মেয়েটি যেন কেমন! তার মনের হৃদিশ পাওয়া যায় না। কখন তাতে মেঘ আসে কখন উজ্জ্বল আলোয় বলমল করে— পূর্বাহ্নে তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া দুষ্কর। তার মুখ খুলেছে বটে কিন্তু তা রহীমার কাছেই। মজিদের সঙ্গে এখনো সে দুটি কথা মুখ তুলে কয় না। কাজেই তাকে ভালোভাবে জানবারও উপায় নেই।

একদিন সকালে কোথেকে মাথায় শনের মতো চুলওয়ালা খ্যাংটা বুড়ি মাজারে এসে তীক্ষ্ণ আত্ননাদ শুরু করে দিলো। কী তার বিলাপ, কী ধারালো তার অভিযোগ। তার সাতকুলে কেউ নেই, এখন নাকি তার চোখের মণি একমাত্র ছেলে যাদুও মরেছে। তাই সে মাজারে এসেছে খোদার অন্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করতে।



তার তীক্ষ্ণ বিলাপে সকালটা যেন কাঁচের মতো ভেঙে খান-খান হয়ে গেলো। মজিদ তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে, কিন্তু ওর বিলাপ শেষ হয় না, গলার তীক্ষ্ণতা কিছুমাত্র কোমল হয় না। উত্তরে এবার সে কোমরে গাঁজা আনা পাঁচেক পয়সা বের করে মজিদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, –সব দিলাম আমি, সব দিলাম। পোলাটার এবার জান ফিরাইয়া দেন।

মজিদ আরো বোঝায় তাকে। –ছেলে মরেছে, তার জন্য শোক করা উচিত নয়। খোদার যে বেশি পেয়ারের হয় সে আরো জলদি দুনিয়া থেকে প্রস্থান করে। এবার তার উচিত মৃত ছেলের রুহ-এর জন্য দোয়া করা, সে যেন বেহেস্তে স্থান পায়, তার গুণাহ যেন মাফ হয়ে যায়– তার জন্য দোয়া করা।

কিন্তু এসব ভালো নছিহতে কান নেই বুড়ির; শোক আগুন হয়ে জড়িয়ে ধরেছে তাকে, তাতে দাউ-দাউ করে পুড়ে মরছে। মজিদ আর কী করে। পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসে। অন্দরে আসতে দেখে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে জমিলা, পাথরের মতো মুখ চোখ। মজিদ থমকে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ তার পানে চেয়ে থাকে, কিন্তু তার হুস নাই।

সেই থেকে মেয়েটির কী যেন হয়ে গেলো। দুপুরে আগে মজিদকে নিকটে কোনো একস্থানে যেতে হয়েছিলো, ফিরে এসে দেখে দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে গালে হাত চেপে জমিলা মূর্তির মতো বসে আছে, বুকে আসা চোখে আশপাশের দিশা নাই।

রহীমা বদনা করে পানি আনে, খড়ম জোড়া রাখে পায়ের কাছে। মুখ ধুতে-ধুতে সজোরে গলা সাফ করে মজিদ, তারপর আবার আড়চোখে চেয়ে দেখে জমিলাকে। জমিলার নড়চড় নেই। তার চোখ যেন পৃথিবীর দুঃখ বেদনার অর্থহীনতায় হারিয়ে গেছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মজিদ দরজার কাছাকাছি একটা পিঁড়িতে এসে বসে। রহীমার হাত থেকে হুঁকাটা নিয়ে প্রশ্ন করে, –ওইটার হইছে কী?

রহীমা একবার তাকায় জমিলার পানে। তারপর আঁচল দিয়ে গায়ের ঘাম মুছে আঁতে বলে, –মন খারাপ করছে।

ঘন ঘন বার কয়েক হুকায় টান দিয়ে মজিদ আবার প্রশ্ন করে, –কিন্তু ... ক্যান খারাপ করছে?

রহীমা সে-কথার জবাব দেয় না। হঠাৎ জমিলার দিকে তাকিয়ে ধমকে ওঠে, –ওঠ ছেমড়ি, চৌকাঠে ঐরকম কইরা বসে না।

মজিদ হুকা টানে আর নীলাভ ধোঁয়ায় হাল্কা পর্দা ভেদ করে তাকায় জমিলার পানে। জমিলা যখন নড়বার কোনো লক্ষণ দেখায় না তখন মজিদের মাথায় ধীরে ধীরে একটা চিনচিনে রাগ চড়তে থাকে। মন খারাপ হয়েছে? সে যদি হতো নানারকম দায়িত্ব ও জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে দিন কাটানো মস্ত সংসারের কর্ত্রী– তবে না হয় বুঝতো মন খারাপের অর্থ। কিন্তু বিবাহিতা একরত্তি মেয়ের আবার ওটা কী চণ্ড? তাছাড়া মানুষের মন খারাপ হয় এবং তাই নিয়ে ঘর-সংসারের কাজ করে, কথা কয়, হাঁটে-চলে। জমিলা যেন ঠাটাপড়া মানুষের মতো হয়ে গেছে।

হঠাৎ মজিদ গর্জন করে উঠে বলে, আমার দরজা থিকা উঠবার কও তারে। ও কী ঘরে বলা আনবার চায় নাকি? চায় নাকি আমার সংসার উচ্ছল্নে যাক, মড়ক লাগুক ঘরে?

গর্জন শুনে রহীমার বুক পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। জমিলাও এবার নড়ে। হঠাৎ কেমন অবসন্ন দৃষ্টিতে তাকায় এদিকে, তারপর হঠাৎ উঠে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গোয়াল ঘরের দিকে চলে যায়।

সে-রাতে দূরে ডোমপাড়ায় কিসের উৎসব। সেই সন্ধ্যা থেকে একটানা ভোতা উত্তেজনায় ঢোলক বেজে চলেছে। বিছানায় শুয়ে জমিলা এমন আলগোছে নিঃশব্দ হয়ে থাকে, যেন সে বিচিত্র ঢোলকের আওয়াজ শোনে কান পেতে। মজিদও অনেকক্ষণ নিঃশব্দ হয়ে পড়ে থাকে। একবার ভাবে, তাকে জিজ্ঞাসা করে কী হয়েছে তার, কিন্তু একটা কুল-কিনারহীন অথই প্রশ্নের মধ্যে নিমজ্জিত মনের আভাস পেয়ে মজিদের ভেতরটা এখনো খিটখিটে হয়ে আছে। প্রশ্ন করলে কী একটা অতলতার প্রমাণ পাবে– এ ভয় মনে। মাজারের সান্নিধ্যে বসবাস করার ফলে মজিদ এই দীর্ঘ এক যুগকাল সময়ের মধ্যে বহু ভগ্ন, নির্মমভাবে আঘাত-পাওয়া হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছে। তাই আজ সকালে ঐ সাতকুল খাওয়া শনের মতো চুল মাথায় বুড়িটার ছুরির মতো ধারালো তীক্ষ্ণ বিলাপ মজিদের মনকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। কিন্তু সে-বিলাপ শোনার পর থেকেই জমিলা যেন কেমন হয়ে গেছে। কেন?



মনে-মনে ক্রোধে বিড়বিড় করে মজিদ বলে, যেন তার ভাতার মরছে।

ডোমপাড়ায় অবিশ্রান্ত ঢোলক বেজে চলে; পৃথিবীর মাটিতে অন্ধকারের তলানি গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়। মজিদের ঘুম আসে না। ঘুমের আগে জমিলার গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে খানিক আদর করা প্রায় তার অভ্যাস হয়ে দাঁড়ালেও আজ তার দিকে তাকায় না পর্যন্ত। হয়তো এ মুহূর্তে দুনিয়ার নির্মমতার মধ্যে হঠাৎ নিঃসঙ্গ হয়ে-ওঠা জমিলার অন্তর একটু আদরের জন্য, একটু স্নেহ-কোমল সান্ত্বনার জন্য বা মিষ্টি-মধুর আশার কথার জন্য খাঁ-খাঁ করে, কিন্তু মজিদের আজ আদর শুকিয়ে আছে। তার সে শুষ্ক হৃদয় ঢোলকের একটানা আওয়াজের নিরন্তর খোঁচায় খিকি-খিকি করে জ্বলে, মনের অন্ধকারে স্ফুলিঙ্গের ছটা জাগে। সে ভাবে, নেশার লোভে কাকে সে ঘরে আনলো? যার কচি-কোমল লতার মতো হাল্কা দেহ দেখে আর এক ফালি চাঁদের মতো ছোট মুখ দেখে তার এত ভালো লেগেছিলো- তার এ কী পরিচয় পাচ্ছে ধীরে-ধীরে?

তারপর কখন মজিদ ঘুমিয়ে পড়েছিলো। মধ্যরাতে ঢোলকের আওয়াজ থামলে হঠাৎ নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা ভারি হয়ে এলো। তারই ভারিতে হয়তো চিন্তাক্রান্ত মজিদের অস্পষ্ট ঘুম ছুটে গেলো। ঘুম ভাঙলেই তার একবার আল্লাহ্ আকবর বলার অভ্যাস। তাই অভ্যাসবশত সে শব্দ দুটো উচ্চারণ করে পাশে ফিরে তাকিয়ে দেখে জমিলা নেই। কয়েক মুহূর্ত সে কিছু বুঝলো না, তারপর ধাঁ করে ওঠে বসলো। তারপর নিজেকে অপেক্ষাকৃত সংযত করে অকম্পিত হাতে দেশলাই জ্বালিয়ে কুপিটা ধরালো।

পাশের বারান্দার মতো ঘরটায় রহীমা শোয়। সেখানেই রহীমার প্রশস্ত বুক মুখ গুজে জমিলা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। কুপিটার লালচে আলো মুখে পড়তেই তার ঠোঁট একটু নড়ে উঠলো- যেন মাই খেতে-খেতে ভুলে থেমে গিয়েছিলো, আলো দেখে হঠাৎ স্মরণ হলো সে-কথা।

পরদিন জমিলার মুখের অন্ধকারটা কেটে যায়। কিন্তু মজিদের কাটে না। সে সারাদিন ভাবে। রাতে রহীমা যখন গোয়াল ঘরে গামলাতে হাত ডুবিয়ে নুন-পানি মেশানো ভূষি গোলায় তখন বাইরের ঘর থেকে ফিরবার মুখে মজিদ সেখানে এসে দাঁড়ায়। রহীমার মুখ ঘামে চকচক করে আর ভনভন করে মশায় কাটে তার সারা দেহ। পায়ের আওয়াজে চমকে উঠে রহীমা দেখে, মজিদ। তারপর আবার মুখ নিচু করে ভূষি গোলায়।

মজিদ একবার কাশে। তারপর বলে,

-জমিলা কই?

-ঘুমাইছে বোধ হয়।

জমিলার সন্ধ্যা হতে না হতেই ঘুমোবার অভ্যাস। মজিদ বলা-কওয়াতে সে নামাজ পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু প্রায়ই এশার নামাজ পড়া তার হয়ে ওঠে না, এ নিদারুণ ঘুমের জন্য। নামাজ তো দূরের কথা, খাওয়াই হয়ে ওঠে না। যে-রাতে অভুক্ত থাকে তার পরদিন অতি ভোরে উঠে ঢাকাঢোকা যা বাসি খাবার পায় তাই খায় গবগব করে।

মজিদ এবার চাপা গলায় গর্জে ওঠে,

-ঘুমাইছে? তুমি কাম করবা, হে লালবিবির মতো খাটে চইড়া ঘুমাইব বুঝি? ক্যান, এত ক্যান? থেমে আবার বলে, নামাজ পড়ছেন?

নামাজ সে আজ পড়েছে। মগরেবের নামাজের পরেই ঢুলতে শুরু করেছিলো, তবু টান হয়ে বসেছিলো আধ ঘণ্টার মতো। তারপর কোনো প্রকারে এশার নামাজ সেরেই সোজা বিছানায় গিয়ে ঘুম দিয়েছে। কিন্তু তখন রহীমা পেছনে ছাপড়া দেয়া ঘরটিতে বসে রান্না করছিলো বলে সে-কথা সে জানে না।

-কী জানি, বোধ হয় পড়েছে।

-বোধ হয় বুধ হয় জানি না। খোদার কামে ঐসব ফাইজলামি চলে না। যাও, গিয়া তারে ঘুম থিকা তোল, তারপর নামাজ পড়বার কও।

রহীমা নিরন্তরে ভূষি গোলায় শেষ করে। গাইটা নাসারক ডুবিয়ে সোঁ-সোঁ আওয়াজ করে। ভূষি খেতে শুরু করে, কুপির আলোয় চকচক করে তার মস্ত কালো চোখজোড়া। সে-চোখের পানে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে রহীমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, পেছনে-পেছনে যায় মজিদ।

হাত ধুয়ে এসে ঠাণ্ডা সে হাত দিয়ে জমিলার দেহ স্পর্শ করে রহীমা যখন ধীরে-ধীরে ডাকে তখনো মজিদ পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে, একটা অধীরতায় তার চোখ চকচক করে। কিন্তু সে অধীর হলে কী হবে, জমিলার ঘুম কাঠের মতো। সে-ঘুম ভাঙে না। রহীমার গলা চড়ে, ধাক্কানি জোরালো হয়, কিন্তু সে যেন মরে আছে। এ সময়ে এক কাণ্ড করে মজিদ। হঠাৎ এগিয়ে



এসে একহাত দিয়ে রহীমাকে সরিয়ে একটানে জমিলাকে উঠিয়ে বসিয়ে দেয়। তার শক্ত মুঠির পেষণে মেয়েটির কজার কচি হাড় হয়তো মড়মড় করে ওঠে।

আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠে ঘরে ডাকাত পড়েছে ভেবে জমিলার চোখ ভীত বিহ্বল হয়ে ওঠে প্রথমে। কিন্তু ক্রমশ শ্রবণশক্তি পরিষ্কার হতে থাকে এবং সঙ্গে-সঙ্গে মজিদের রুষ্ট কথাগুলোর অর্থও পরিষ্কার হতে থাকে। কেন তাকে উঠিয়েছে সে-কথা এখন বুঝলেও জমিলা বসেই থাকে, ওঠার নামটি করে না।

সে ল্যাট মেরে বসেই থাকে। হঠাৎ তার মনে বিদ্রোহ জেগেছে। সে উঠবেও না, কিছু বলবেও না। কোনো কথাই সে বলবে না। নামাজ যে পড়েছে, এ কথাও না।

ক্ষণকালের জন্য মজিদ বুঝতে পারে না কী করবে। মহবতনগরে তার দীর্ঘ রাজত্বকালে আপন হোক পর হোক কেউ তার হুকুম এমনভাবে অমান্য করেনি কোনো দিন। আজ তার ঘরের এক রত্তি বউ- যাকে সে সেদিনমাত্র ঘরে এনেছে একটু নেশার ঝাঁক জেগেছিলো বলে- সে কিনা তার কথায় কান না দিয়ে অমন নির্বিকারভাবে বসে আছে।

সত্যিই সে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। অন্তরে যে-ক্রোধ দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে সে-ক্রোধ ফেটে পড়বার পথ না পেয়ে অন্ধ সাপের মতো ঘুরতে থাকে, ফুঁসতে থাকে। তার চেহারা দেখে রহীমার বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে। দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে স্বামীকে সে অনেকবার রাগতে দেখেছে, কিন্তু তার এমন চেহারা সে কখনো দেখেনি। কারণ সচরাচর সে যখন রাগে তখন তার রাগাশ্বিত মুখে কেমন একটা সমবেদনার, সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের সদৃচ্ছার কোমল আভা ছড়িয়ে থাকে। আজ সেখানে নির্ভেজাল নিষ্ঠুর হিংস্রতা।

ভীতকণ্ঠে রহীমা বলে

-ওঠ বইন ওঠ, বহুত হইছে। নামাজ লইয়া কী রাগ করা যায়?

-রাগ? কিসের রাগ? মজিদ আবার গর্জে ওঠে। এ বাড়িতে অল্লাহদের জায়গা নেই। এ বাড়ি তার বাপের বাড়ি না।

তবু জমিলা ঠায় বসে থাকে। সে যেন মূর্তি।

অবশেষে আগ্নেয়গিরির মুখে ছিপি দিয়ে মজিদ সরে যায়। আসলে সে বুঝতে পারে না এর পর কী করবে। হঠাৎ এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝে উঠতে পারে না তাকে কীভাবে দমন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে, দীর্ঘকাল অন্দরে-বাইরে রাজত্ব করেও যে সতর্কতার গুণটা হারায়নি, সে সতর্কতাও সে অবলম্বন করে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত সে ভেবে দেখতে চায়।

যাবার সময় একটি কথা বলে মজিদ,

-ওর দিলে খোদার ভয় নেই। এটা বড়ই আফসোসের কথা।

অর্থাৎ তার মনে পর্বতপ্রমাণ খোদার ভীতি জাগাতে হবে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত ভেবে দেখবার সময় সে-লাইনেই মজিদ ভাববে।

পরদিন সকালে কোরান-পাঠ খতম করে মজিদ অন্দরে এসে দেখে, দরজার চৌকাঠের ওপর ক্ষুদ্র ঘোলাটে আয়নাটি বসিয়ে জমিলা অত্যন্ত মনোযোগসহকারে সিঁথি কাটছে। তেল জবজবে পাট করা মাথাটি বাইরের কড়া রোদের ঝলক লেগে জ্বলজ্বল করে। মজিদ যখন পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকে তখন জমিলা পিঠটা কেবল টান করে যাবার পথ করে দেয়, তাকায় না তার দিকে।

এ সময়ে মজিদ নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মেছোয়াক করে। মেছোয়াক করতে করতে ঘরময় ঘোরে, উঠানে পায়চারি করে, পেছনে গাছ-গাছলার দিকে চেয়ে কী দেখে। দীর্ঘ সময় নিয়ে সযত্নে মেছোয়াক করে- দাঁতের আশে-পাশে ওপরে-নিচে। ঘষতে ঘষতে ঠোঁটের পাশের ফেনার মতো থুথু জমে ওঠে। মেছোয়াকের পালা শেষ হলে গামছাটা নিয়ে পুকুরে গিয়ে দেহ রগড়ে গোসল করে আসে।

একটু পরে একটা নিমের ডাল দাঁতে কামড়ে ধরে জমিলার দেহ ঘেঁষে আবার বেরিয়ে আসে মজিদ। আড়চোখে একবার তাকায় বউ-এর পানে। মনে হয়, ঘোলাটে আয়নায় নিজেরই প্রতিচ্ছবি দেখে চকচক করে মেয়েটির চোখ। সে-চোখে বিন্দুমাত্র খোদার ভয় নেই- মানুষের ভয় তো দূরের কথা।

মেছোয়াক করতে করতে উঠানে চক্কর খায় মজিদ। এক সময়ে সশব্দে থুথু ফেলে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। দরজায় পাকা সিঁড়ি নেই। পুকুর ঘাটে যেমন থাক-থাক করে কাটা নারকেল গাছের গুঁড়ি থাকে, তেমনি একটা গুঁড়ি বসানো। তারই নিচের ধাপে পা রেখে মজিদ আবার থুথু ফেলে তারপর বলে,



—রূপ দিয়া কী হইব? মাইন্সের রূপ ক-দিনের? ক-দিনের বা জীবন তার?

ক্ষীপ্রগতিতে জমিলা স্বামীর পানে তাকায়। শত্রুর আভাস-পাওয়া হরিণের চোখের মতই সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ।

মজিদ বলে চলে,

—তোমার বাপ-মা দেখি বড় জাহেল কিছিমের মানুষ। তোমারে কিছু শিক্ষা দেয় নাই। অবশ্য তার জন্য হাশরের দিনে তারাই জবাবদিহি দিব। তোমার দোষ কী?

জমিলা শোনে, কিছু বলে না। মজিদ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলে, কাইল যে কামটি করছো, তা কী শক্ত গুণার কাম জানো নি, ক্যামনে করলা কামটা? খোদারে কী উরাও না, দোজখের আগরে উরাও না?

জমিলা পূর্ববৎ নীরব। কেবল ধীরে-ধীরে কাঠের মতো শক্ত হয়ে ওঠে তার মুখটা।

—তাছাড়া, এ কথা সর্বদা খেয়াল রাখিও যে, যার-তার ঘরে আস নাই তুমি। এ ঘর মাজারপাকের ছায়ায় শীতল, এখানে তাঁনার রুহ-এর দোয়া মানুষের শান্তি দেয়, সুখ দেয়। তাঁনার দিলে গোয়া আসে এমন কাম কোনো দিন করিও না।

তারপর আরেকবার সশব্দে থুথু ফেলে মজিদ পুকুর ঘাটের দিকে রওনা হয়।

জমিলা তেমনি বসে থাকে। ভঙ্গিটা তেমনি সতর্ক, কান খাড়া করে রাখা সশঙ্কিত হরিণের মত। তারপর হঠাৎ একটা কথা সে বোঝে। কাঁচা গোস্তে মুখ দিতে গিয়ে খট করে একটা আওয়াজ শুনে ইঁদুর যা বোঝে, হয়তো তেমনি কিছু একটা বোঝে সে। সে যেন খাঁচায় ধরা পড়েছে।

তারপর এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। দপ করে জমিলার চোখ জ্বলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁট কেঁপে ওঠে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়, দাউ-দাউ করা শিখার মতো সে দীর্ঘ হয়ে ওঠে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই শান্ত হয়ে অধিকতর মনোযোগ সহকারে জমিলা সিঁথি কাটতে থাকে।

সেদিন বাদ-মগরের শিরনি চড়ানো হবে। যে-দিন শিরনি চড়ানো হবে বলে মজিদ ঘোষণা করে সেদিন সকাল থেকে লোকেরা চাল-ডাল মশলা পাঠাতে শুরু করে। সে চাল-ডাল মজিদ ছুঁয়ে দিলে রহীমা তা দিয়ে খিচুড়ি রাঁধে। অন্দরের উঠানে সেদিন কাটা চুলায় ব্যাপারীর বড় বড় ডেকচিতে রান্না হতে থাকে। ওদিকে বাইরে জিকির হয়। জিকিরের পর খাওয়া-দাওয়া।

মজিদ পুকুরঘাট থেকে ফিরে এলে প্রথম চাল-ডাল মশলা এলো ব্যাপারীর বাড়ি থেকে। সেই শুরু। তারপর একসের আধসের করে নানা বাড়ি থেকে তেমনি চাল-ডাল-মশলা আসতে থাকে। অপরাহ্নের দিকে অন্দরে উঠানে চুলা কাটা হলো। শীঘ্র সে-চুলা গনগন করে উঠবে আগুনে।

মগরের পর লোকের এসে বাইরের ঘরে জমতে লাগলো। কে একজন মোমবাতি এনেছে ক-টা, তাছাড়া আগরবাতিও এনেছে এক গোছা। বিছানো সাদা চাদরের ওপর মজিদ বসলে তার দুপাশে রাখা হলো দুটো দীর্ঘ মোমবাতি, আর সামনে একগোছা আগরবাতির জ্বলন্ত কাঠি। কাঠিগুলো একভাণ্ড চালের মধ্যে বসানো।

মজিদ আজ লম্বা সাদা আলখেল্লা পরেছে। পিঠ টান করে হাঁটু গেড়ে বসে সেটা গুঁজে দিয়েছে পায়ের নিচে পর্যন্ত। আর মাথায় পরেছে আধা পাগড়ি, পেছন দিকটায় তার বিষণ্ণ খানেক লেজ।

যথেষ্ট দোয়া-দরুদ পাঠের পর জিকির শুরু হয়। প্রথমে অতি ধীরে-ধীরে প্রশান্ত সমুদ্রের বিলম্বিত ঢেউয়ের মতো। কারণ লোকেরা তখন পরস্পরের নিকট হতে দূরে-দূরে ছড়িয়ে আছে যোগশূন্য হয়ে। কিন্তু এ যোগশূন্যতার মধ্যে এ-কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই তারা ভাসতে শুরু করেছে, উঠতে নাবতে শুরু করেছে।

টিমেতেতালা ঢেউয়ের মতো ভাসতে-ভাসতে তারা ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে পরস্পরের সন্নিহিতে। এ-ধীর গতিশীল অগ্রসর হবার মধ্যে চাঞ্চল্য নেই এখনো, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বও নেই। খোদার অস্তিত্বের মতো তাদের লক্ষ্যের অবস্থান সম্পর্কে একটা নিরুদ্ভিগ্ন বিশ্বাস।

সন্ধ্যাটি হাওয়াশূন্য। মোমবাতির শিখা স্থির ও নিষ্কম্প। অদূরে সালাকপাড়ে আবৃত মাছের পিঠের মতো মাজারটি মহাসত্যের প্রতীকস্বরূপ অটুট জমাট পাথরে নীরব, নিশ্চল।

কিন্তু ধীরে-ধীরে এদের গলা চড়তে থাকে। ক্রমে-ক্রমে দুনে চলে জিকির। প্রত্যেকে পরস্পরের সন্নিহিতে আসতে থাকে, এবং যে-মহাঅগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হবে শীঘ্র তারই ছিটেফোঁটা স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে ঘনিষ্ঠতার সংঘর্ষে।



মজিদের চোখ ঝিমিয়ে আসে। সঙ্গে-সঙ্গে বারবার দেহ ঝুঁকে আসে। মুখের কথা আধা বুকে বিঁধে যায় আর তার অন্তরখনন গভীরতর হতে থাকে। ভেতর থেকে ক্রমশ বলকে-বলকে একটা অস্পষ্ট বিচিত্র আওয়াজ বেরোয় শুধু। আর কতক্ষণ? পরস্পরের দাহ্য-চেতনা এবার মিলিত হবে-হচ্ছে করছে। একবার হলে মুহূর্তে সমস্ত কিছু মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, দুনিয়ার মোহ আর ঘরবসতির মায়া-মমতা জ্বলে ছারখার হয়ে যাবে।

আওয়াজ বিচিত্রতর হতে থাকে। হু-হু-হু। আবার : হু হু হু। আবার—

অন্দরে উঠানে মজিদ নিজের হাতে যে-শিরনি চড়িয়ে এসেছে, তার তদারক করার ভার রহীমা-জমিলার ওপর। চাঁদহীন রাতে ঘন অন্ধকারের গায়ে বিরাট চুলা গনগন করে, আর কালো হাওয়া ভালো চালের মিহি-মিষ্টি গন্ধে ভুরভুর করে।

কাজের মধ্যে জমিলা উবু হয়ে বসে হাঁটুতে থুতনি রেখে বড় ডেকচিটাতে বলক-ওঠা চেয়ে চেয়ে দেখে। সাহায্য করতে পাড়ার মেয়েরা যারা এসেছে তারা অশরীরীর মতো নিঃশব্দে ঘুরে-ঘুরে কাজ করে। ধোয়া-পাকলা করে, লাকড়ি ফাড়ে, কিন্তু কথা কয় না কেউ।

বাইরে থেকে ঢেউ আসে জিকিরের। ডেকচিতে বলক-আসা দেখে জমিলা, আর সে-ঢেউয়ের গর্জন কান পেতে শোনে। সে-ঢেউ যখন ক্রমশ একটা অবজব্য উত্তাল ঝড়ে পরিণত হয় তখন এক সময়ে হঠাৎ কেমন বিচলিত হয়ে পড়ে জমিলা। সে-ঢেউ তাকে আচম্বিতে এবং অত্যন্ত রুঢ়ভাবে আঘাত করে। তারপর আঘাতের পর আঘাত আসতে থাকে। একটা সামলিয়ে উঠতে না উঠতে আরেকটা। সে আর কত সহ্য করবে। বালুতীরে যুগযুগ আঘাত পাওয়া শক্ত-কঠিন পাথর তো সে নয়। হঠাৎ দিশেহারা হয়ে সে পিঠ সোজা করে বসে, তারপর বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে এধার-ওধার চেয়ে শেষে রহীমার পানে তাকায়। গনগনে আগুনের পাশে কেমন চওড়া দেখায় তাকে কিন্তু কানের পাশে গাঁজা ঘোমটায় আবৃত মাথাটি নিশ্চল; চোখ তার বাষ্পের মতো ভাসে।

পানিতে ডুবতে থাকা মানুষের মতো মুখ তুলে আবার শরীর দীর্ঘ করে জমিলা থই পায় না কোথাও। শেষে সে রহীমাকে ডাকে,

—বুঝ!

রহীমা শোনে কী শোনে না। সে ফিরে তাকায়ও না, উত্তরও দেয় না। এদিকে ঢেউয়ের পর আরো ঢেউ আসে, উত্তাল উত্তুঙ্গ ঢেউ। হু হু হু। আবার : হু হু হু। দুনিয়া যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে আছে, আকাশে যেন তারা নেই।

তারপর একটু পরে চিৎকার ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়কর দ্রুততায় আসতে থাকা পর্বতপ্রমাণ অজস্র ঢেউ ভেঙে ছত্রখান হয়ে যায়। মুহূর্তে কী যেন লগ্ন-ভগ্ন হয়ে যায়, মারাত্মক বন্যাকে যেন অবশেষে কারা রুখতে পারেনা। এবার ভেসে জনমানব-ঘরবসতি, মানুষের আশা-ভরসা।

বিদুৎগতিতে জমিলা উঠে দাঁড়ায়। ক্ষীণদেহে রুদ্ধ বৃক্ষের মতো কঠিনভাবে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্ট কণ্ঠে আবার ডাকে,

—বুঝ!

এবার রহীমা মুখ তুলে তাকায়। তার চওড়া দেহটি শান্ত দিনের নদীর মতো বিস্তৃত আর নিস্তরঙ্গ। উজ্জ্বল চোখ ঝলমল করছে বটে কিন্তু তাও শান্ত, স্পষ্ট। সে-চোখের দিকে জমিলা তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত, কিন্তু অবশেষে কিছু বলে না। তারপর সে দ্রুতপায়ে হাঁটতে থাকে উঠান পেরিয়ে বাইরের দিকে।

জিকির করতে করতে মজিদ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। এ হয়েই থাকে। তবু লোকেরা তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ হাওয়া করে কেউ বুকফাটা আওয়াজে হা-হা করে আফসোস করে কেউ-বা এ হটগোলের সুযোগে মজিদের অবশ পদযুগল মত্ত চুম্বনে-চুম্বনে সিক্ত করে দেয়। কেবল ক্ষয়ে-আসা মোমবাতি দুটো তখনো নিষ্কম্প স্থিরতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

হঠাৎ একটা লোকের নজর বাইরের দিকে যায়। কেন যায় কে জানে, কিন্তু বাইরে গাছতলার দিকে তাকিয়ে সে মুহূর্তে স্থির হয়ে যায়। কে ওখানে? আলিঝালি দেখা যায়, পাতলা একটি মেয়ে, মাথায় ঘোমটা নেই। সে আর দৃষ্টি ফেরায় না। তারপর একে একে অনেকেই দেখে। তবু মেয়েটি নড়ে না। অস্পষ্ট অন্ধকারে ঘোমটাশূন্য তার মুখটা ঢাকা চাঁদের মতো রহস্যময় মনে হয়।

শীঘ্র মজিদের জ্ঞান হয়। ধীরে-ধীরে উঠে বসে তারপর চোখে অর্থহীন অবসাদ নিয়ে ঘুরে-ঘুরে সবার দিকে তাকায়। এক সময়ে সেও দেখে মেয়েটিকে। সে তাকায়, তারপর বিমূঢ় হয়ে যায়। বিমূঢ়তা কাটলে দপ করে জ্বলে ওঠে চোখ।

অবশেষে কী করে যেন মজিদ সরল কণ্ঠে হাসে। সকল দিকে চেয়ে বলে,



—পাগলি ঝাটা। একটু থেমে আবার বলে, নোতুন বিবির বাড়ির লোক, তার সঙ্গে আসছে।

তারপর হাততালি দিয়ে উঁচু গলায় মজিদ হাঁকে, এ বিটি ভাগ! ঠোঁটে তখনো হাসির রেখা, কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে চোখ তার দপদপ করে জ্বলে।

হয়তো তার চোখের আগুনের হক্কা লেগেই ঘোর ভাঙে জমিলার। হঠাৎ সে ভেতরের দিকে চলতে থাকে, তারপর শীঘ্র বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আবার জিকির শুরু হয়। কিন্তু কোথায় যেন ভাঙন ধরেছে, জিকির আর জমে না। লোকেরা মাথা দোলায় বটে কিন্তু থেকে থেকে তাদের দৃষ্টি বিদ্যুৎ-ক্ষীপ্রতায় নিষ্কিণ্ত হয় গাছতলার দিকে। কাঙালের মতো তাদের দৃষ্টি কী যেন হাতড়ায়। মহাসমুদ্রের ডাককে অবহেলা করে বালুতীরে কী যেন খোঁজে।

অবশেষে মজিদ মুখ তুলে তাকায়। জিকিরের ধ্বনিও সেই সঙ্গে থামে। ক্ষয়িষ্ণু মোমবাতি দুটো নিষ্কম্পভাবে জ্বলে, কিন্তু আগরবাতির কাঠিগুলো চালের মধ্যে কখন গুঁড়িয়ে ভস্ম হয়ে আছে।

কিছু বলার আগে মজিদ একবার কাশে। কেশে একে-একে সকলের পানে তাকায়। তারপর বলে,

—ভাই সকল, আমার মালুম হইতেছে কোনো কারণে আপনারা বেচইন আছেন। কী তার কারণ?

কেউ উত্তর দেয় না। কেবল উত্তর শোনার জন্য তারা পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করে। কতক্ষণ অপেক্ষা করে মজিদ তারপর বলে, —আইজ জিকির ক্ষান্ত হইল।

খাওয়া-দাওয়া শুরু হয়। অন্যান্য দিন জিকিরের পর লোকেরা প্রচণ্ড ক্ষিধে নিয়ে গোছাসে খিচুড়ি গেলে, আজ কিন্তু তেমন হাত চলে না তাদের। কিসের লজ্জায় সবাই মাথা নিচু করে রেখেছে, আর কেমন বিসদৃশভাবে চুপচাপ।

নিবন্ত চুলার পাশে রহীমা তখনো বসে আছে, পাশে নাবিয়ে রাখা খিচুড়ির ডেকচি। বুড়ো আওলাদ অন্দরে-বাইরে আসা-যাওয়া করে। এবার খালি বর্তন নিয়ে আসে ভেতরে।

একটু পরে মজিদও আসে। রহীমা আলগোছে ঘোমটা টেনে সিঁধা হয়ে বসে। ভাবে, রান্না ভালো হলো কী খারাপ হলো এবার মতামত জানাবে মজিদ। কাছে এসে মজিদ কিন্তু রান্না সম্পর্কে কোনো কথাই বলে না। কেমন চাপা কর্কশ গলায় প্রশ্ন করে,

—হে কই?

রহীমা চারধারে তাকায়। কোথাও জমিলা নেই। মনে পড়ে, তখন সে যে হঠাৎ উঠে চলে গেলো তারপর আর সে এদিকে আসেনি। আন্তে রহীমা বলে,

—বোধ হয় ঘুমাইছে।

দাঁত কিড়মিড় করে এবার মজিদ বলে,

—ও যে একদম বাইরে চইলা গেলো, দেখলা না তুমি?

মুহূর্তে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় রহীমা। জমিলা বাইরে গিয়েছিলো? কতক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে গালে হাত দিয়ে প্রশ্ন করে,

—হে বাইরে গেছিলো?

তখনো দাঁত কিড়মিড় করে মজিদের। উত্তরে শুধু বলে,

—হ!

তারপর হনহনিয়ে ভেতরে চলে যায়।

রহীমা অনেকক্ষণ চুপ হয়ে বসে থাকে। তার হাত-পা কেমন যেন অসাড় হয়ে আসে।

পরে সেদিনকার মতো জমিলাকে ডাকতে সাহস হয় না। নিবন্ত হুকাটা পাশে নামিয়ে রেখে সিঁড়ির কাছাকাছি গুম হয়ে বসে ছিলো মজিদ। তার দিকে চেয়ে ভয় হয় যে, ডাকার আওয়াজে সহসা সে জেগে উঠবে, চাপা ক্রোধ হঠাৎ ফেটে পড়বে, নিঃশ্বাসরুদ্ধ করা আশঙ্কার মধ্যে তবু যে-নীরবতা এখনো অক্ষুণ্ণ আছে তা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। তাই উঠানটা পেরুতে গিয়ে সতর্কভাবে হাঁটে রহীমা, নিঃশব্দে আর আলগোছে। কিন্তু এদিকে তার মাথা ঝিমঝিম করে। জমিলার বাইরে যাওয়ার কথা যখনই ভাবে তখনই তার মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। মনে-মনে কেমন ভীতিও বোধ করে। লতার মতো মেয়েটি



যেন এ-সংসারে ফাটল ধরিয়ে দিতে এসেছে। ঘরে সে যেন বলা ডেকে আনবে আর মাজারপাকের দোয়ায় যে-সংসার গড়ে উঠেছে সে-সংসার ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

ওদিক থেকে ফিরে রহীমা সিঁড়ির দিকে এলে মজিদ হঠাৎ ডাকে- বিবি, শোন। তোমার লগে কথা আছে।

সে নিরুত্তরে পাশে এসে দাঁড়ালে মজিদ মুখ তুলে তাকায় তার পানে। সংকীর্ণ দাওয়ার ওপর একটি কুপি বসানো। তার আবছা আলো কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রহীমার মুখকে অস্পষ্ট করে তোলে। সে দিকে তাকিয়ে মজিদের ঠোঁট যেন কেমন থর থর করে কেঁপে ওঠে।

-বিবি, কারে বিয়া করলাম? তুমি কী বদদোয়া দিচ্ছিলানি?

শেষোক্ত কথাটা তড়িৎবেগে আহত করে রহীমাকে। তৎক্ষণাৎ সে ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে উত্তর দেয়,

-তওবা-তওবা, কী যে কন। কিন্তু তারপর তার কথা গুলিয়ে যায়। মুখ তুলে তাকিয়েই থাকে মজিদ। অস্পষ্ট আলোর মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রহীমা। মুখের একপাশে গাঢ় ছায়া, চোখদুটো ভেজা মাটির মতো নরম। মুহূর্তের মধ্যে মজিদ উপলব্ধি করে যে, চওড়া ও রঙশূন্য নিস্পৃহ মানুষ রহীমা মনে নেশা না জাগালেও তারই ওপর সে নির্ভর করতে পারে। তার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়, তার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল। সে তার ঘরের খুঁটি।

হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো নিঃশ্বাস ফেলে জীবনে প্রথম হয়তো কোমল হয়ে এবং নিজের সত্তার কথা ভুলে গিয়ে সে রহীমাকে বলে,

-কও বিবি কী করলাম? আমার বুদ্ধিতে যানি কুলায় না। তোমারে জিগাই, তুমি কও।

রাতের ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও কখনো এমন সহজ সরল পরমাত্মীয়ের কথা মজিদ বলে না। তাই ঝট করে রহীমা তার অর্থ বোঝে না। অকারণে মাথায় ঘোমটা টানে, তারপর ঈষৎ চমকে উঠে তাকায় স্বামীর পানে। তাকিয়ে নোতুন এক মজিদকে দেখে। তার শীর্ণ মুখের একটি পেশিও এখন সচেতনভাবে টান হয়ে নেই। এতদিনের সহবাসের ফলেও যে-চোখের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেনি সে-চোখ এই মুহূর্তে কেমন অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে নির্ভেজাল হৃদয় নিয়ে যেন তাকিয়ে আছে। দেখে একটা অভূতপূর্ব ব্যথাবিদীর্ণ আনন্দভাব ছেয়ে আসে রহীমার মনে, তারপর পুলক শিহরণে পরিণত হয়ে ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে। সে-পুলক শিহরণের অজস্র ঢেউয়ের মধ্যে জমিলার মুখ তলিয়ে যায়, তারপর ডুবে যায় চোখের আড়ালে।

হঠাৎ ঝাপটা দিয়ে রহীমা বলে,

-কী কমু? মাইয়াডা যানি কেমন। পাগলি। তা আপনে এলেমদার মানুষ। দোয়াপানি দিলে ঠিক হইয়া যাইবনি সব।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অকল্পিত- স্থির। অক্ষুণ্ণ- যা এখন ক্ষুণ্ণ হয়নি বা ভাঙেনি। অঘোরে- বেহুঁশের মতো। অচম্বিতে- হঠাৎ। অজস্র- অনেক। অটুট- যা ভাঙে না, শক্ত। অতলতা- গভীরতা। উত্তাল- ভয়ঙ্কর। অথই- অতল, গভীর। অধীরতা- অস্থিরতা। অনড়- যা নড়ে না, শক্তি। অন্তর খনন- হৃদয়কে খোঁড়া। অন্দরে বাইরে- ঘরের ভিতরে ও বাইরে। অনাবিল- স্বচ্ছ, পরিষ্কার। অনাড়ম্বর- জাঁকজমকহীন। অন্ন-সংস্থান- খাবার জোটানো। অপরাহ্ন- বিকেল। অপেক্ষাকৃত- তুলনামূলকভাবে। অবজব্য- অব্যক্ত, অপ্রকাশিত। অবশ পদযুগল- অসাড় দুই পা। অবসাদ- ক্লান্তি। অবলম্বন- নির্ভর। অবসন্ন- শ্রান্ত, ক্লান্ত। অভুক্ত- উপোস। অলক্ষ্যে- গোপনে, কেউ দেখে না এমন। অশরীরী- ভূতপ্রেত। অস্তিত্ব- সত্তা। আগারবাতি- ধূপকাঠি। আগ্নেয়গিরি- যে পাহাড় থেকে আগুন ও গলিত পদার্থ বের হয়। আদ্যোপান্ত- আগাগোড়া। আধা পাগড়ি- ছোট করে বানানো পাগড়ি, মাথা সম্পর্ক ঢাকে না এতে। আভাস- পরিচয়, চিহ্ন। আর্তনাদ- কাতর চীৎকার। আনুগত্য- অধীনতা। আলগোছে- মৃদুভাবে। আলিবাণি- অস্পষ্ট, আবছা। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব- পাবে কি পাবে না এ নিয়ে মানসিক সংকট। আড়ষ্ট- জড়োসড়ো, অবিশ্রান্ত। ইঙ্গিত- আভাস। উত্তুঙ্গ- অতি উঁচু। একরঙি- এতটুকু। এলেমদার- জ্ঞানী, বিদ্বান। কবজা- ভয়ে দিশেহারা। কড়া- তীক্ষ্ণ। কর্কশ- কঠিন, অমিষ্ট। কাটা চুলা- ওঠোনে কিংবা খালি জায়গায় কেটে গর্ত করে যে চুলা তৈরি হয়; অস্থায়ী চুলা। কালো হাওয়া- অন্ধকারের হাওয়া। কাড়ে- চিড়ে। কিছিম- রকম। কিড়মিড়- উত্তেজনায় দাঁত কামড়ানোর ভাব। ক্ষণকাল- অল্পসময়। ক্ষয়িষ্ণু- ক্ষয়ে যাচ্ছে যা। ক্ষীপ্রগতিতে- অতি দ্রুত। খড়ম- কাঠের পাদুকা। খ্যাংটা- মেজাজ গরম, খিটখিটে। খান খান- টুকরো টুকরো। খানিক- অল্প। খুঁটি- বাঁশ বা কাঠের লম্বা থাম যার ওপর ঘর



দাঁড়িয়ে থাকে, অবলম্বন। গনগন- আগুন জ্বলার শব্দ। গর্জন- রাগ প্রকাশের উচ্চ চীৎকার। গুম- গম্ভীরভাবে চুপ। গুঁড়ি- গোছের দেহ, কাণ্ড। গোছা- রাগ। ঘোলাটে- ভালো দেখা যায় না এমন। চমকিত- বিস্মিত। চড়ানো- রান্নার জন্য ডেকচি চুলোর উপরে দেয়া। ছটা- আলো, আভা। ছত্রখান- টুকরো টুকরো, লন্ডভণ্ড ধংস। ছলছল- চোখের জল আসার ভাব। ছারখার- ধংস। ছাপড়া- বাঁশ ছন ইত্যাদি দিয়ে তৈরি চাল। ছিপি- যা দিয়ে বোতলের মুখ বন্ধ করা হয়। ছুঁয়ে দিলে- দোয়া পড়ে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে। জাহেল- মূর্খ, জ্ঞানহীন। জিকির- সমবেতভাবে উচ্চস্বরে বারবার আল্লাহর নাম নেওয়ার ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বলমল- উজ্জ্বলভাবে আলোকিত। ঝাড়তে- দোয়া পড়ে গা ফুঁ দিতে। ঝুরে আসা চোখ- কান্নায় কাতর চোখ। ঝৌক- প্রবণতা। টান- শক্ত। ডোম- হিন্দু সমাজের একটি সম্প্রদায়। ঠাটাপড়া- বাজপড়া, বজ্রাহত। ঠায়- নড়াচড়া না করে। টিলে তেতাল- আস্তে আস্তে। তলানি- বিস্তৃতি। তারস্বরে- উচ্চস্বরে। তিজতম- সবচাইতে দুঃখজনক। থাক- সিঁড়ির অংশ, ধাপ। দাওয়া- বারান্দা। দাহ্য-চেতনা- পুড়বার ভাব। দুনে- দ্বিগুণ হয়ে। দুলা- বর। দুষ্কর- কষ্টসাধ্য। ধারা- প্রবাহ, গতি। ধোয়া-পাকলা- ধোয়ার কাজ। নছিত- ধর্মীয় উপদেশ। নাসারঙ্গ- নাকের ছিদ্র। নিদারুণ- খুব বেশি। নিরবচ্ছিন্ন- একটানা, অবিরাম। নিরন্তর- একটানা। নিরন্তরে- উত্তর না দিয়ে। নির্বিকারভাবে- কিছুই হয়নি এমন ভাব দেখিয়ে। নির্মম- নির্ভর। নুলা- হাত বিকল হয়েছে এমন। পশলা- বর্ষণ, এখানে চোখের পানি পড়া। পর্বতপ্রমাণ- পাহাড়ের মতো উঁচু, বিরাট, বিশাল। প্রতিচ্ছবি- অনুরূপ ছবি। পাট করা- বিন্যস্ত। পিড়ি- কাঠের আসন। পূর্ববৎ- আগের মতো। পেঘনে- চাপে। ফালি- টুকরো। ফুঁসতে থাকে- ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। বর্তন- বড় থালা। বদদোয়া- অভিশাপ। বলক-ওঠা- উত্থান। বলকে বলকে- উথলে উথলে। বালা- বিপদ আপদ, রোগ। বিষং খানেক লেজ- পাগড়ির ছোট ঝোলানো অংশ। বিছানো... বসানো- মিলাদে, জিকির বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এটি একটি পরিচিত দৃশ্য। যিনি মিলাদ পড়াবেন কিংবা জিকির পরিচালনা করবেন তিনি বিশেষ জায়গায় বসেন। তাঁর দুপাশে কখনো কখনো মোমবাতি জ্বালানো হয়। সামনে থাকে চালভর্তি একটি পাত্র। তাতে গুঁজে দেয়া হয় অনেকগুলো ধূপকাঠি। ধূপকাঠিগুলো পুড়তে থাকে, তাতে একটি সুরভিত ধর্মীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বিস্ফারিত- বড় হওয়া, ফুলে ওঠা। বেচইন- অস্ত্রির, চিন্তাহ্রস্ত। ভাতার- স্বামী। ভারিত- ওজনদার, গভীর। ভুরভুর- ভরপুর, সবদিকে ভরে যাওয়া। ভোতা উত্তেজনা- তীব্র নয় এমন উত্তেজনা। মরণাপন্ন- মূর্খ। মড়ক- মহামারি। মাই- বুকের দুধ। মাজার পাক- পবিত্র কবর। মালুম- ধারণা, অনুমান। মিহিসুন্দর- অতি সূক্ষ্ম, চমৎকার। মেছোয়াক করে- মাজে। যোগশূন্য- আলাদা, বিচ্ছিন্ন। রগড়ে- ডলে। রুখতে- বাধা দিতে। রুহ- আত্মা। রোল- আওয়াজ, শব্দ। রুস্ত- রাগাঘিত। রুস্ততা- রাগের ভাব। লাকড়ি- জ্বালানী কাঠ। ল্যাট মেরে- হাত পা ছড়িয়ে। শিহরণ- কাঁপন। শীর্ণ- রোগা, শুকনো। সংযত- নিয়ন্ত্রিত। সন্তা- অস্তিত্ব। সন্নিকট- কাছে। সশঙ্কিত- ভীত। সহবাস- একসঙ্গে বসবাস। সিক্ত- ভেজা। সিধা- সোজা। স্কুলিঙ্গ- আগুনের কণা। হতবুদ্ধি- বুদ্ধিহীন। হদিশ- ঠিকানা। হনহনিয়ে- তাড়াতাড়ি, দ্রুত গমন। হস্কা- তাপ। হাশর- ইসলাম ধর্মমতে শেষ বিচারের দিন। হৈহুলছুল- হটগোল, চীৎকার, ব্যস্ততা। হুস- জ্ঞান।



সারসংক্ষেপ

জ্যৈষ্ঠ মাসে মসজিদের কাজ শেষ হওয়ার পরপরই মজিদ দ্বিতীয় বিয়ে সেরে ফেলে। নতুন বউ অল্পবয়সী, দেখতে অতি নিরীহ গোছের, নাম জমিলা। জমিলাকে খুব পছন্দ হয় রহীমার। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে জমিলা বেরিয়ে আসে ঘোমটা থেকে, কথা বলে অনবরত এবং হাসতে থাকে। মজিদ বিচলিত হয়। মাজারে কেউ কখনো হাসে না। একদিন হেসে হেসে জমিলা রহীমাকে বুঝিয়ে দেয় যে মজিদ তার শ্বশুরের মতো, আর রহীমা তার শাশুড়ির মতো। একদিন এক খিটখিটে বুড়ি মজিদের কাছে বিপুল আর্থনাদ করে তার মৃত ছেলেকে বাঁচিয়ে তোলার চীৎকার জুড়ে দেয়। সেটি দেখে জমিলা কেমন পাথরের মতো হয়ে যায়। মজিদ এসব একেবারে পছন্দ করে না। মজিদের চিন্তা, হালকা কচি দেহ জমিলা এতখানি অবাধ্য কেন। মজিদ জমিলাকে আদর করে না। মধ্যরাতে ঢোলের আওয়াজে মজিদের ঘুম ভেঙে গেলে মজিদ দেখে জমিলা বিছানায় নেই। জমিলা তখন পাশের ঘরে রহীমার বুক লেপ্টে শুয়ে আছে। জমিলার ওপর মজিদের রাগ বেড়ে ওঠে। সে ঠিকভাবে নামাজও পড়তে পারে না। এতে মজিদ আরো ক্রুদ্ধ হয়। ঘুমন্ত জমিলাকে সে হ্যাঁচকা টান মেরে ওঠায়। জমিলার অবাধ্যতা সে কল্পনা করতে পারে না। জমিলা মজিদকে তোয়াক্কা করে না। জমিলা বুঝতে পারে সে খাঁচায় ধরা পড়েছে। একদিন বাদ মাগরিব মাজারে জিকির হয়। এ উপলক্ষে খিচুড়ি রান্না হয়। মজিদ আজ বিশেষ সাজে সেজেছে। এক এক করে লোক আসতে থাকে। দোয়া দরুদ দিয়ে জিকির শুরু হয়, তারপর তা আস্তে আস্তে প্রচণ্ড



গতি লাভ করে। জিকির করতে করতে মজিদ অজ্ঞান হয়ে যায়। লোকজন তার সেবায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এদিকে গাছের তলায় জমিলাকে ঘোমটাশূন্য অবস্থায় দেখা যায়। জ্ঞান ফিরে এলে মজিদও তাই দেখে। সে লোকজনের কাছে জমিলাকে কাজের বেটি রূপে পরিচয় দেয়। মজিদ রহীমার কাছে দারুণ ক্ষোভ প্রকাশ করে। জমিলাকে বিয়ে করার জন্য মজিদ অনুতপ্ত হয়।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৩. মজিদের মতে কাদের হাসি কেউ কখনো শুনে না?

ক. মুসলমানদের মেয়ে	খ. মাজারে আগত মেয়ে
গ. গারো পাহাড়ের মেয়ে	ঘ. আওয়ালপুরের মেয়ে

৩৪. ‘আমার বুদ্ধিতে জানি কুলায় না’-উক্তিটিতে মজিদ চরিত্রের কোন দিক প্রকাশিত হয়েছে?

ক. অসহায়ত্ব	খ. ভীৰুতা
গ. ধর্মবোধ	ঘ. অস্তিত্বসংকট

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩৫ ও ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

মকবুলের তিন বউয়ের মধ্যে সবার ছোট টুনি। সংসার কাকে বলে তা সে জানে না। সমবয়সী কারও সঙ্গে দেখা হলে সবকিছু ভুলে গল্প জুড়ে দেয় আর হাসে। হাসতে হাসে মেঝেতে গড়াগড়ি দেয় টুনি।

৩৫. উদ্দীপকের টুনির সঙ্গে ‘লালসালু’ উপন্যাসের কোন চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. রহীমা	খ. জমিলা
গ. হাসুনির মা	ঘ. তানু বিবি

৩৬. উভয়ের সাদৃশ্যের যে কারণ-

- বয়স
- মানসিকতা
- বাল্যবিবাহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii	গ. iii	ঘ. i, ii ও iii



পাঠ-১০



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- জমিলার ওপর ত্রুদ্ব মজিদের নির্যাতনের ঘটনা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- মাজার ঘরে বন্দী দশায় রাত কাটানো জমিলার পরিণতি সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

পরদিন থেকে শিক্ষা শুরু হয় জমিলার। ঘুম থেকে উঠে বাসি খিচুড়ি গোছাসে গিলে খেয়ে সে উঠানে নেবেছে এমন সময় মজিদ ফিরে আসে বাইরে থেকে। এ-সময়ে সে বাইরেই থাকে। ফজরের নামাজ পড়েই সোজা ভেতরে চলে এসেছে।

মজিদের মুখ গম্ভীর। ততোধিক গম্ভীর কণ্ঠে জমিলাকে ডেকে বলে, কাইল তুমি আমার বে-ইজ্জত করছো। খালি তা না, তুমি তাঁনারে নারাজ করছো। আমার দিলে বড় ডর উপস্থিত হইছে। আমার ওপর তাঁনার এংবার না থাকলে আমার সর্বনাশ হইব। একটু থেমে মজিদ আবার বলে, -আমার দয়ার শরীল। অন্য কেউ হইলে তোমারে দুই লাখি দিয়ে বাপের বাড়িত পাঠাইয়া দিতো। আমি দেখলাম, তোমার শিক্ষা হয় নাই, তোমারে শিক্ষা দেওন দরকার। তুমি আমার বিবি হইলে কী হইব, তুমি নাজুক শিশু।

জমিলা আগাগোড়া মাথা নিচু করে শোনে। তার চোখের পাতাটি পর্যন্ত একবার নড়ে না। তার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে মজিদ একটু রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করে,

-হুনাছো নি কী কইলাম?

কোনো উত্তর আসে না জমিলার কাছ থেকে। তাঁর নির্বাক মুখের পানে কতক্ষণ চেয়ে থেকে মজিদের মাথায় সেই চিনচিনে রাগটা চড়তে থাকে। কণ্ঠস্বর আরো রুক্ষ করে সে বলে,

-দেখ বিবি, আমারে রাগাইও না। কাইল যে কামটা করছো তার পরেও আমি চুপচাপ আছি এ কারণে যে, আমার শরীলটা বড়ই দয়ার। কিন্তু বাড়াবাড়ি করিও না কইয়া দিলাম।

কোনো উত্তর পাবে না জেনেও আবার কতক্ষণ চুপ করে থাকে মজিদ। তারপর ক্রোধ সংযত করে বলে,

-তুমি আইজ রাইতে তারাবি নামাজ পড়বা। তারপর মাজারে গিয়া তাঁনার কাছে মাফ চাইবা। তাঁনার নাম মোদাচ্ছের। কাপড়ে ঢাকা মানুষেরে কোরানের ভাষায় কয় মোদাচ্ছের। সালুকাপড়ে ঢাকা মাজারের তলে কিন্তু তানি ঘুমাইয়া নাই। তিনি সব জানেন, সব দেখেন।

তারপর মজিদ একটা গল্প বলে। বলে যে, একবার রাতে এশার নামাজের পর সে গেছে মাজার-ঘরে। কখন তার অজু ভেঙে গিয়েছিলো খেয়াল করেনি। মাজার ঘরে পা দিতেই হঠাৎ কেমন একটি আওয়াজ কানে এলো তার, যেন দূর জঙ্গলে শত-সহস্র সিংহ একযোগে গর্জন করছে। বাইরে কী একটা আওয়াজ হচ্ছে ভেবে সে ঘর ছেড়ে বেরুতেই মুহূর্তে সে আওয়াজ থেমে গেলো। বড় বিস্মিত হলো সে, ব্যাপারটার আগামাথা না বুঝে কতক্ষণ হতভম্বের মতো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলো। একটু পরে সে যখন ফের প্রবেশ করলো মাজার ঘরে তখন শোনে আবার সেই শত-সহস্র সিংহের ভয়াবহ গর্জন। কী গর্জন, শুনে রক্ত তার পানি হয়ে গেলো ভয়ে। আবার বাইরে গেলো, আবার এলো ভেতরে। প্রত্যেকবারই একই ব্যাপার। শেষে কী করে খেয়াল হলো যে, অজু নেই তার, নাপাক শরীরে পাক মাজার ঘরে সে ঢুকেছে। ছুটে গিয়ে মজিদ তালাবে অজু বানিয়ে এলো। এবার যখন সে মাজার-ঘরে এলো তখন আর কোনো আওয়াজ নেই। সে-রাতে দরগার কোলে বসে অনেক অশ্রু বিসর্জন করলো মজিদ।

গল্পটা মিথ্যা। এবং সম্ভ্রানে ও সুস্থদেহে মিথ্যা কথা বলেছে বলে মনে-মনে তওবা কাটে মজিদ। যাহোক, জমিলার মুখের দিকে চেয়ে মজিদের মনের আফসোস ঘোচে। যে অত কথাতেও একবার মুখ তুলে তাকায়নি সে মাজারপাকের গল্পটা শুনে



চোখ তুলে তাকিয়ে আছে তার পানে। চোখে কেমন ভীতির ছায়া। বাইরে অটুট গাভীর বজায় রাখলেও মনে-মনে মজিদ কিছুটা খুশি না হয়ে পারে না। সে বোঝে, তার শ্রম সার্থক হবে, তার শিক্ষা ব্যর্থ হবে না।

—তয় তুমি আইজ রাইতে নামাজ পড়বা তারাবির, আর পরে তাঁনার কাছে মাফ চাইবা।

জমিলা ততক্ষণে চোখ নাবিয়ে ফেলেছে। কথার কোনো উত্তর দেয় না।

তারাবিই হোক আর যাই হোক, সে-রাতে দীর্ঘকাল সময় জমিলা জায়নামাজে ওঠাবসা করে। ঘরসংসারের কাজ শেষ করে রহীমা যখন ভেতরে আসে তখনো তার নামাজ শেষ হয়নি। দেখে মন তার খুশিতে ভরে ওঠে, ওঘরে মজিদ হুকায় দম দেয়। আওয়াজ শুনে মনে হয় তার ভেতরটাও কেমন তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে। রহীমা অজু বানিয়ে এসেছে, সেও এবার নামাজটা সেরে নেয়। তারপর পা টিপতে হবে কিনা এ-কথা জানার অজুহাতে মজিদের কাছে গিয়ে আভাসে-ইঙ্গিতে মনের খুশির কথা প্রকাশ করে। উত্তরে মজিদ ঘন-ঘন হুকায় টান মারে, আর চোখটা পিটপিট করে আত্মসচেতনতায়।

রহীমা কিছুক্ষণের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বামীর পা টেপে। হাড়সম্বল কালো কঠিন পা, মৃতের মতো শীতল শুষ্ক তার চামড়া। কিন্তু গভীর ভক্তির ভরে সে-পা টেপে রহীমা, ঘুনধরা হাড়ের মধ্যে যে-ব্যথার রস টনটন করে তার আরাম করে।

সুখভোগ নীরবেই করে মজিদ। হুকায় তেজ কমে এসেছে, তবু টেনে চলে। কানটা ওধারে। নীরবতার মধ্যে ওঘর হতে থেকে-থেকে কাঁচের চুড়ির মৃদু ঝঙ্কার ভেসে আসে। সে কান পেতে শোনে সে-ঝঙ্কার।

সময় কাটে। রাত গভীর হয়ে ওঠে বাঁশঝাড়ে, গাছের পাতায় আর মাঠে-ঘাটে। এক সময়ে রহীমা আশ্তে উঠে চলে যায়। মজিদের চোখেও একটু তন্দ্রার মতো ভাব নাবে। একটু পরে সহসা চমকে জেগে উঠে সে কান খাড়া করে। ওধারে পরিপূর্ণ নীরবতা : সে-নীরবতার গায়ে আর চুড়ির চিকন আওয়াজ নেই।

ধীর-ধীরে মজিদ ওঠে। ও ঘরে গিয়ে দেখে, জায়নামাজের ওপর জমিলা সেজদা দিয়ে আছে। এখুনি উঠবে— এই অপেক্ষায় কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ। জমিলা কিন্তু ওঠে না।

ব্যাপারটা বুঝতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না মজিদের। নামাজ পড়তে পড়তে সেজদায় গিয়ে হঠাৎ সে ঘুমিয়ে পড়েছে। দস্যুর মতো আচমকা এসেছে সে-ঘুম, এক পলকের মধ্যে কাবু করে ফেলেছে তাকে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ, বোঝে না কী করবে। তারপর সহসা আবার সে-চিনচিনে ক্রোধ তার মাথাকে উত্তপ্ত করতে থাকে। নামাজ পড়তে-পড়তে যার ঘুম এসেছে তার মনে ভয় নাই এ-কথা স্পষ্ট। মনে নিদারুণ ভয় থাকলে মানুষের ঘুম আসতে পারে না কখনো। এবং এত করেও যার মনে ভয় হয় নাই, তাকেই এবার ভয় হয় মজিদের।

হঠাৎ দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে সেদিনকার মতো এক হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বসিয়ে দেয় জমিলাকে। জমিলা চমকে উঠে তাকায় মজিদের পানে, প্রথমে চোখে জাগে ভীতি, তারপর সে-চোখ কালো হয়ে আসে।

মজিদ গৌঁ গৌঁ করে ক্রোধে। রাতের নীরবতা এত ভারি যে, গলা ছেড়ে চীৎকার করতে সাহস হয় না, কিন্তু একটা চাপা গর্জন নিঃসৃত হয় তার মুখ দিয়ে। যেন দূর আকাশে মেঘ গর্জন করে গড়ায়, গড়ায়।

—তোমার এত দুঃসাহস? তুমি জায়নামাজে ঘুমাছ? তোমার দিলে একটু ভয়ডর হইব না?

জমিলা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। ভয়ে নয় ক্রোধে। গোলমাল শুনে রহীমা পাশের বিছানা থেকে উঠে এসেছিলো, সে জমিলার কাঁপুনি দেখে ভাবলে দুরন্ত ভয় বুঝি পেয়েছে মেয়েটার। কিন্তু গর্জন করছে মজিদ, গর্জন করছে খোদা-তায়ালার ন্যায়বাণী, তাঁর নাখোশ দিল। মজিদের ক্রোধ তো তাঁরই বিদ্যুৎছটা, তাঁরই ক্রোধের ইঙ্গিত। কী আর বলবে রহীমা। নিদারুণ ভয়ে সেও অসাড়া হয়ে যায়। তবে জমিলার মতো কাঁপে না।

বাক্যবাণ নিষ্ফল দেখে আরেকটা হ্যাঁচকা টান দেয় মজিদ। শোয়া থেকে আচমকা একটা টানে যে উঠে বসেছিলো, তাকে তেমনি একটা টান দিয়ে দাঁড় করাতে বেগ পেতে হয় না। বরঞ্চ কিছু বুঝে উঠবার আগেই জমিলা দেখে যে, সে দাঁড়িয়ে আছে, যদিও খুব শক্তভাবে নয়। তারপর সে আপন শক্তিতে সুস্থির হয়ে দাঁড়ালো, এবং কাঁপতে থাকা ঠোঁটকে উপেক্ষা করে শান্ত দৃষ্টিতে একবার নিজের ডান হাতের কজির পানে তাকালো। হয়তো ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু ব্যথার স্থান শুধু দেখলো। তাতে হাত বুলালো না। বুলাবার ইচ্ছে থাকলেও অবসর পেলো না। কারণ আরেকটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে মজিদ তাকে নিয়ে চললো বাইরের দিকে।

উঠানটা তখনো পেরোয়নি, বিদ্রান্ত জমিলা হঠাৎ বুঝলে কোথায় সে যাচ্ছে। মজিদ তাকে মাজারে নিয়ে যাচ্ছে। তারাবির নামাজ পড়ে মাজারে গিয়ে মাফ চাইতে হবে সে-কথা মজিদ আগেই বলেছিলো, এবং সেই থেকে একটা ভয়ও উঠেছিলো



জমিলার মনে। মাজারের ত্রিসীমানায় আজ পর্যন্ত ঘেঁষেনি সে। সকালে আজ মজিদ যে-গল্পটা বলেছিলো, তারপর থেকে মাজারের প্রতি ভয়টা আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

মাঝ-উঠানে হঠাৎ বেঁকে বসলো জমিলা। মজিদের টানে শ্রোতে-ভাসা তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যাচ্ছিলো, এখন সে সমস্ত শক্তি সংযোগ করে মজিদের বজ্রমুষ্টি হতে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো। অনেক চেষ্টা করেও হাত যখন ছাড়াতে পারলো না তখন সে অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসলো। হঠাৎ সিধা হয়ে মজিদের বুকের কাছে এসে পিচ করে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করলো।

পেছনে-পেছনে রহীমা আসছিলো কম্পিত বুক নিয়ে। আবছা অন্ধকারে ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারলো না; এও বুঝলো না মজিদ অমন বজ্রাহত মানুষের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন। কিছু না বুঝে সে বুকের কাছে আঁচল শক্ত করে ধরে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

মজিদ যেন সত্যি বজ্রাহত হয়েছে। জমিলা এমন একটি কাজ করেছে যা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি কেউ করতে পারে। যার কথায় গ্রাম ওঠে-বসে, যার নির্দেশে খালেক ব্যাপারীর মতো প্রতিপত্তিশালী লোকও বউ তালুক দেয় দ্বিরুক্তি মাত্র না করে, যার পা খোদাভাবমত্ত লোকেরা চুম্বনে-চুম্বনে সিক্ত করে দেয়, তার প্রতি এমন চরম অশ্রদ্ধা কেউ দেখাতে পারে সে-কথা ভাবতে না পারাই স্বাভাবিক।

হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে মজিদ রহীমার পানে তাকালো, তাকিয়ে অদ্ভুত গলায় বললো,
-হে আমার মুখে থুথু দিলো!

একটু পরে অন্ধকার থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলো রহীমা,
-কী করলো বইন তুমি, কী করলো!

তার আর্তনাদে কী ছিলো কে জানে, কিন্তু ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে থাকা জমিলা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো মনে-প্রাণে। কী একটা গভীর অন্যায়ে তীব্রতায় খোদার আরশ পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠেছে।

মজিদ রহীমার চিৎকার শুনলো কী শুনলো না, কিন্তু ওধারে তাকালো না, কোনো কথাও বললো না। আরো কিছুক্ষণ সে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ হাত-কাটা ফতুয়ার নিম্নাংশ দিয়ে মুখটা মুছে ফেললো। ইতিমধ্যে তার ডান হাতের বজ্রকঠিন মৃঠার মধ্যে জমিলার হাতটি ঢিলা হয়ে গেছে; সে-হাত ছাড়িয়ে নেবার আর চেষ্টা নাই, বন্দি হয়ে আছে বলে প্রতিবাদ নাই। তার হাতের লইটো মাছের মতো হাড়গোড়হীন তুলতুলে নরম ভাব দেখে মজিদ অসতর্ক হবার কোনো কারণ দেখলো না; সে নিজের বজ্রমুষ্টিতে আরো কঠিনতর করে তুললো। তারপর হঠাৎ দু-পা এগিয়ে এসে এক নিমেষে তাকে পাজাকোল করে শূন্যে তুলে আবার দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগলো বাইরের দিকে। ভেবেছিলো, হাত-পা ছোড়াছুড়ি করবে জমিলা, কিন্তু তার ক্ষুদ্র অপরিণত দেহটা নেতিয়ে পড়ে থাকলো মজিদের অর্ধচক্রাকারে প্রসারিত দুই বাহুতে। এমন নরম তার দেহের ঘনিষ্ঠতা যে তারার ঝলকানির মতো এক মুহূর্তের জন্য মজিদের মনে ঝলকে ওঠে একটু আকুলতা; তা তাকে তার বুকের মধ্যে ফুলের মতো নিষ্পেষিত করে ফেলবার। কিন্তু সে-ক্ষুদ্র লতার মতো মেয়েটির প্রতিই ভয়টা দুর্দান্ত হয়ে উঠলো। এবারেও সে অসতর্ক হলো না। এখন গা-ঢেলে নিস্তেজ হয়ে থাকলে কী হবে বিষাক্ত সাপকে দিয়ে কিছু বিশ্বাস নেই।

জমিলাকে সোজা মাজার-ঘরে নিয়ে ধপাস করে তার পাদপ্রান্তে বসিয়ে দিলো মজিদ। ঘর অন্ধকার। বাইরে থেকে আকাশের যে অতি স্নান আলো আসে তা মাজার-ঘরের দরজাটিকেই কেবল রেখায়িত করে রাখে, এখানে সে আলো পৌঁছায় না। এখানে যেন মৃত্যুর আর ভিন্ন অপরিচিত দুনিয়ার অন্ধকার; সে-অন্ধকারে সূর্য নেই, চাঁদ-তারা নেই, মানুষের কুপি-লণ্ঠন বা চকমকির পাথর নেই। খুন হওয়া মানুষের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে অন্ধের চোখে দৃষ্টির জন্য যে-তীব্র ব্যাকুলতা জাগে তেমনি একটু ব্যাকুলতা জাগে অন্ধকারের গ্রাসে জ্যোতিহীন জমিলার চোখে। কিন্তু সে দেখে না কিছু। কেবল মনে হয় চোখের সামনে অন্ধকারই যেন অধিকতর গাঢ় হয়ে রয়েছে।

তারপর হঠাৎ যেন ঝড় ওঠে। অদ্ভুত ক্ষীপ্রতায় ও দূরন্ত বাতাসের মতো বিভিন্ন সুরে মজিদ দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করে। বাইরে আকাশ নীরব, কিন্তু ওর কণ্ঠে জেগে ওঠে দুনিয়ার যত অশান্তি আর মরণভীতি, সর্বনাশা ধ্বংস থেকে বাঁচবার তীব্র ব্যাকুলতা।

মজিদের কণ্ঠের ঝড় থামে না। জমিলা স্তব্ধ হয়ে বসে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে, মাছের পিঠের মতো একটা ঘনবর্ণ স্তূপ রেখায়িত হয়ে ওঠে সামনে। মাজারের অস্পষ্ট চেহারার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে জমিলার ভীত-চঞ্চল মনটা কিছু স্থির হয়ে



এসেছে এমনি সময়ে বুক ফাটা কণ্ঠে মজিদ হা-হা করে উঠলো। তার দুঃখের তীক্ষ্ণতার সে কী ধার। অন্ধকারকে যেন চিড়চিড় করে দু-ফাঁক করে দিলো। সভয়ে চমকে ওঠে জমিলা, তাকালো স্বামীর পানে। মজিদের কণ্ঠে তখন আবার দোয়া-দরুদেদের ঝড় জেগেছে, আর ঝড়ের মুখে পড়া ক্ষুদ্রপল্লবের মতো ঘূর্ণমান তার অশান্ত উদ্ভাস চোখ।

একটু পরে হঠাৎ জমিলা আত্ননাদ করে উঠলো। আওয়াজটা জোরালো নয়, কারণ একটা প্রচণ্ড ভীতি তার গলা দিয়ে যেন আস্ত হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারপর সে চুপ করে গেলো। কিন্তু ঝড়ের শেষ নেই। ওঠা-নাবা আছে, দিক পরিবর্তন আছে, শেষ নেই। এবং শেষ নেই বলে মানুষের আশ্বাসের ভরসা নেই।

ধাঁ করে জমিলা উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু মজিদও ক্ষীপ্রভাবে উঠে দাঁড়ালো। জমিলা দেখলো পথ বন্ধ। যে-ঝড়ের উদ্দামতার জন্য নিঃশ্বাস ফেলবার যো নাই, সে-ঝড়ের আঘাতেই ডালপালা ভেঙে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। একটু দূরে খোলা দরজা, তারপর অন্ধকার আর তারাময় আকাশের অসীমতা। এটুকুন পথ পেরোবার উপায় নাই।

জমিলাকে বসিয়ে কিছুক্ষণের জন্য দোয়া-দরুদ পড়া বন্ধ করে মজিদ। এ সময় সে বলে,

—দেখ আমি যেইভাবে বলি সেইভাবে কর। আমার হাত হইতে দুষ্ট আত্মা, ভূতপ্রেতও রক্ষা পায় নাই। এ দুনিয়ার মানুষরা যেমন আমারে ভয় করে শ্রদ্ধা করে, তেমনি ভয় করে, শ্রদ্ধা করে অন্য দুনিয়ার জিন-পরিরা। আমার মনে হইতেছে, তোমার ওপর কারো আছর আছে। না হইলে মাজারপাকের কোলে বইসাও তোমার চোখে এখনো পানি আইল না কেন, কেন তোমার দিলে একটু পাশোনির ভাব জাগলো না? কেনই-বা মাজারপাক তোমার কাছে আগুনের মতো অসহ্য লাগতাতছে?

এ বলে সে একটা দড়ি দিয়ে কাছাকাছি একটা খুঁটির সঙ্গে জমিলার কোমর বাঁধলো। মাঝখানের দড়িটা টিলা রাখলো, যাতে সে মাজারের পাশেই বসে থাকতে পারে। তারপর ভয়ে অসাড় হয়ে যাওয়া জমিলার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো,

—তোমার জন্য আমার মায়া হয়। তোমারে কষ্ট দিতেছি তার জন্য দিলে কষ্ট হইতেছে। কিন্তু মানুষের ফোঁড়া হইলে সে-ফোঁড়া ধারালো ছুরি দিয়া কাটতে হয়, জিনের আছর হইলে বেত দিয়া চাবকাইতে হয়, চোখে মরিচ দিতে হয়। কিন্তু তোমারে আমি এ সব করুণ না। কারণ মাজারপাকের কাছে রাতের এক পহর থাকলে যতই নাছোড়বান্দা দুষ্ট আত্মা হোক না কেন, বাপ-বাপ ডাক ছাড়ি পলাইব। কাইল তুমি দেখবা দিলে তোমার খোদার ভয় আইছে, স্বামীর প্রতি ভক্তি আইছে, মনে আর শয়তানি নাই।

মনে-মনে মজিদ আশঙ্কা করেছিলো, জমিলা হঠাৎ তারস্বরে কাঁদতে শুরু করবে। কিন্তু আশ্চর্য, জমিলা কাঁদলোও না, কিছু বললোও না, দরজার পানে তাকিয়ে মূর্তির মতো বসে রইলো। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে গলা উঁচিয়ে বললো,

—ঝাপটা দিয়া গেলাম। কিন্তু তুমি চুপ কইরা থাইক না। দোয়া-দরুদ পড়, খোদার কাছে আর তাঁনার কাছে মাফ চাও।

তারপর সে ঝাপ দিয়ে চলে গেলো।

ভেতরে বেড়ার কাছে তখনো দাঁড়িয়ে রহীমা। মজিদকে দেখে সে অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলে,

—হে কই?

—মাজারে। ওর ওপর আছর আছে। মাজারে কিছুক্ষণ থাকলে বাপ-বাপ ডাক ছাড়ি পলাইব সে-জিন।

—ও ভয় পাইব না?

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো মজিদ। বিস্মিত হয়ে বললে,

—কী যে কও তুমি বিবি? মাজারপাকের কাছে থাকলে কিসের ভয়? ভয় যদি কেউ পায় তা ঐ দুষ্ট জিনটাই পাইব, যে আমার মুখে পর্যন্ত থুখু দিছে।

কথাটা মনে হতেই দাঁত কড়মড় করে উঠলো মজিদের। দম খিচে ক্রোধ-সংবরণ করে সে আবার বললে,

—তুমি ঘরে গিয়া শোও বিবি।

রহীমা ঘরে চলে গেলো। গিয়ে ঘুমাল কী জেগে রইলো তার সন্ধান নেবার প্রয়োজন বোধ করলো না মজিদ। মধ্যরাতের স্তব্ধতার মধ্যে সে ভেতরের ঘরের দাওয়ার ওপর চুপচাপ বসে রইলো। যে-কোন মুহূর্তে বাইরে থেকে একটা তীক্ষ্ণ আত্ননাদ শোনা যাবে— এই আশায় সে নিজের শ্বসনকে নিঃশব্দ-প্রায় করে তুললো। কিন্তু ওধারে কোনো আওয়াজ নেই। থেকে-থেকে



দূরে প্যাঁচা ডেকে উঠছে, আরো দূরে কোথাও একটা দীর্ঘগাছের আশ্রয়ে শকুনের বাচ্চা নবজাত মানবশিশুর মতো অবিশ্রান্ত কেঁদে চলেছে, অন্ধকারের মধ্যে একটা বাদুড় থেকে-থেকে পাক খেয়ে যাচ্ছে। রাতটা গুমোট মেরে আছে, গাছের পাতার নড়চড় নেই। বাইরে বসেও মজিদের কপালে ঘাম জমছে বিন্দু বিন্দু।

সময় কাটে, ওধারে তবু কোনো আওয়াজ নেই। মুমূর্ষু রোগীর পাশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষায় অনাত্মীয় সুহৃদ লোক যেমন নিশ্চল হয়ে বসে থাকে, তেমনি বসে থাকে মজিদ, গাছের পাতার মতো তারও নড়চড় নাই।

আরো সময় কাটে। এক সময় মজিদ বয়সের দোষে বসে থেকেই একটু আলগোছে বিমিয়ে নেয়, তারপর দূর আকাশে মেঘগর্জন শুনে চমকে উঠে চোখ মেলে তাকায় দিগন্তের দিকে। যে-রাত সেখানে এখন অপেক্ষাকৃত তরল হয়ে আসার কথা সেখানে ঘনীভূত মেঘস্তুপ। থেকে থেকে বিজলি চমকায়, আর শীঘ্র বির-বিরে শীতল হাওয়া বয়ে আসতে থাকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে। দেহের আড়মোড়া ভেঙে সোজা হয়ে বসে মজিদ, মুখে পালকস্পর্শের মতো সে শিরশিরে শীতল হাওয়া বেশ লাগে, এবং সেই আরামে কয়েক মুহূর্ত চোখও বোজে সে। কিন্তু কান খাড়া হয়ে ওঠার সাথে-সাথে চোখটাও তার খুলে যায়। সে দেখে না কিছু, শোনেও না কিছু। মেঘ-দেখা সারা, এবার সে শুনতে চায়। কিন্তু ওধারে এখনো প্রগাঢ় নীরবতা।

আর কতক্ষণ! নড়েচড়ে ভাবে মজিদ, তারপর নিরলস দৃষ্টি দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসতে থাকা ঘনকালো মেঘের পানে তাকিয়ে থাকে। ইতোমধ্যে রহীমা একবার ছায়ার মতো এসে ঘুরে যায়। ওর দিকে মজিদ তাকায়ও না একবার, না ঘুমিয়ে অত রাতে সে কেন ঘুরছে-ফিরছে এ-কথা জিজ্ঞাসা করবারও কোনো তাগিদ বোধ করে না। তার মনে যেন কোনো প্রশ্ন নেই, নেই অস্থিরতা, অপেক্ষা থাকলেও এবং সে-অপেক্ষা যুগযুগব্যাপী দীর্ঘ হলেও কোনো উদ্বেগ আসবে না। কিছু দেখবার নেই বলেই যেন সে বসে-বসে মেঘ দেখে।

মেঘগর্জন নিকটতর হয়। এবার যখন বিদ্যুৎচমকায় তখন সারা দুনিয়া ঝলসে ওঠে সাদা হয়ে যায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত অত্যুজ্জ্বল আলোর মধ্যে নিজেকে উলঙ্গ বোধ হলেও মজিদ চিরে দু-ফাঁক হয়ে যাওয়া আকাশ দেখে এ-মাথা থেকে সে-মাথা, তারপর প্যাঁচার মতো মুখ গোমড়া করে তাকিয়ে থাকে অন্ধকারের পানে। সে অন্ধকারের তবু চোখ পিটপিট করে, আশায় আর আকাঙ্ক্ষায়। সে-আশা-আকাঙ্ক্ষা অবসর উপভোগীর অলস বিলাস মাত্র। চোখ তার পিটপিট করে আর পুনর্বীর বিদ্যুৎ চমকানোর অপেক্ষায় থাকে। খোদার কুদরত প্রকৃতির লীলা দেখবার জন্যই যেন সে বসে আছে ঘুম না গিয়ে, আরাম না করে। হয়তো-বা সে এবাদত করে। এবাদতের রকমের শেষ নেই। প্রকৃতির লীলা চেয়ে-চেয়ে দেখাও একরকম এবাদত।

আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় আকাশ অনেকক্ষণ থমথম করে। রাতও কাটি-কাটি করে কাটে না, পাড়াগাঁয়ের থিয়েটারের যবনিকার মতো সময় পেরিয়ে গেলেও রাত্রির যবনিকা ওঠে না। প্রকৃতি অবলোকনের এবাদতই যদি করে থাকে মজিদ তবে ঈশ্বর বিরক্তি ধরে যেন কারণ, ভূর কাছটা একটু কুঁচকে যায়।

তারপর হঠাৎ ঝড় আসে। দেখতে না দেখতে সারা আকাশ ছেয়ে যায় ঘনকালো মেঘে, তীব্র হাওয়ার ঝাপটায় গাছপালা গোঙায়, থরথর করে কাঁপে মানুষের বাড়িঘর। মজিদ ওঠে আসে ভেতরে। ভাবে, ঝড় থামুক। কারণ আর দেরি নয়, ওধারে মেঘের আড়ালে প্রভাত হয়েছে। সুবেহ্ সাদেক। নির্মল, অতি পবিত্র তার বিকাশ। যে-রাতে অসংখ্য দুষ্ট আত্মারা ঘুরে বেড়ায় সে-রাতের শেষ; নোতুন দিনের শুরু। মজিদের কণ্ঠে গানের মতো গুনগুনিয়ে ওঠে পাঁচ পদের ছুরা আল ফালাখ। সন্ধ্যার আকাশে অস্তগামী সূর্য দ্বারা ছড়ানো লাল আভাকে যে কুৎসিত ভয়াবহ অন্ধকার মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, সে অন্ধকারের শয়তানি থেকে আমি আশ্রয় চাই, চাই তোমারই কাছে হে খোদা, হে প্রভাতের মালিক। আমি বাঁচতে চাই যত অন্যায় থেকে, শয়তানের মায়াজাল থেকে আর যত দুর্বলতা থেকে, হে দিনাদির অধিকারী।

এদিকে প্রভাতের বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় না। ঝড়ের পরে আসে জোরালো বৃষ্টি। অসংখ্য তীরের ফলার মতো সে-বৃষ্টি বিদ্ধ করে মাটিকে। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে আসে শিলাবৃষ্টি। মজিদের ঢেউ-তোলা টিনের ছাদে যখন পথভ্রষ্ট উল্কার মতো প্রথম শিলাটি এসে পড়ে তখন হঠাৎ মজিদ সোজা হয়ে উঠে বসে, কান তার খাড়া হয়ে ওঠে বিপদ সঙ্কেত শুনে। শীঘ্র অজস্র শিলাবৃষ্টি পড়তে শুরু করে।

তড়িৎ বেগে মজিদ উঠে দাঁড়ায়। ভয়ে তার মুখটা কেমন কালো হয়ে গেছে। দু-পা এগিয়ে ওধারে তাকিয়ে সে বলে, বিবি, শিলাবৃষ্টি শুরু হইছে!

পরিস্কার প্রভাতের অপেক্ষায় রহীমা গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে ছিলো। সে কোনো উত্তর দেয় না। মজিদ আরেকটু এগিয়ে যায়, তারপর আবার উৎকণ্ঠিত গলায় বলে,



—বিবি, শিলাবৃষ্টি শুরু হইছে।

রহীমা এবারও উত্তর দেয় না। তার আবছা চোখের পানে চেয়ে মনে হয়, সে-চোখ যেন জমিলার সে-দিনকার চোখের মতো হয়ে উঠেছে— যেদিন সাতকুলখাওয়া খ্যাংটা বুড়ি এসে আত্ননাদ করেছিলো।

এদিকে আকাশ থেকে ঝরতে থাকে পাথরের মতো খণ্ডখণ্ড বরফের অজস্র টুকরো, হয় জমা বৃষ্টিপাত। দিনের বেলা হলে বাছুরগুলো দিশেহারা হয়ে ছুটতো, এক আধটা হয়তো আঘাত খেয়ে শুয়েও পড়তো, কাদের মিঞার পেটওয়ালা ছাগলটা ডাকতে ডাকতে হয়রান হতো। বউরা আসতো বেরিয়ে, ছেলেরা ছুটতো বাইরে, লুফে-লুফে খেতো খোদার ঢিল। কারণ শয়তানকে তাড়াবার জন্যই তো শিলা ছোঁড়ে খোদা।

ছেলে-ছোকরারা আনন্দ করলেও বয়স্ক মানুষের মুখ কালো হয়ে আসে— তা দিন-রাতের যখনই শিলাবৃষ্টি হোক না কেন। কারণ মাঠে-মাঠে নধর-কচি ধান ধ্বংস হয়ে যায়, শিলার আঘাতে তার শিষ ঝরে-ঝরে পড়ে মাটিতে। যারা দোয়া-দরুদ জানে তারা তখন ঝড়ের মুখে পড়া নৌকার যাত্রীদের মতো আকুলকণ্ঠে খোদাকে ডাকে, যারা জানে না তারা পাথর হয়ে বসে থাকে।

রহীমার কাছে উত্তর না পেয়ে এলেমদার মানুষ মজিদ খোদাকে ডাকতে শুরু করে। একবার ছুটে দরজার কাছে যায়, সর্বের মতো উঠানে ছেয়ে যাওয়া শিলা দেখে, তারপর আবার দোয়া-দরুদ পড়ে পায়চারি করে দ্রুতপদে। এক সময়ে রহীমার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বলে,

—কী হইল তোমার? দেখ না শিলাবৃষ্টি পড়ে।

একবার নড়বার ভঙ্গি করে রহীমা, কিন্তু তবু কিছু বলে না। পোষা জীবজন্তু একদিন আহার মুখে না দিলে যে-রহীমা অস্থির হয়ে ওঠে দুশ্চিন্তায়, দুটো ভাত অযথা নষ্ট হলে যে আফসোস করে বাঁচে না, সে-ই মাঠে মাঠে কচি-নধর ধান নষ্ট হচ্ছে জেনেও চুপ করে থাকে। এবং যে-রহীমার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল, যার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়, সে-ই যেন হঠাৎ মজিদের আড়ালে চলে যায়, তার কথা বোঝে না।

মজিদ আবার ওর সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বিস্মিত কণ্ঠে বলে,

—কী হইলো তোমার বিবি?

রহীমা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে। তারপর স্বামীর পানে তাকিয়ে পরিস্কার গলায় বলে,

—ধান দিয়া কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভিতরে।

কী একটা কথা বলতে গিয়েও মজিদ বলে না। তারপর শিলাবৃষ্টি থামলে সে বেরিয়ে যায়। গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে তখনো, আকাশ এ-মাথা থেকে সে-মাথা পর্যন্ত মেঘাবৃত। তবু তা ভেদ করে একটু ধূসর আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে।

ঝাপটা খুলে মজিদ দেখলো লাল কাপড়ে আবৃত কবরের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে জমিলা, চোখ বোজা, বুকে কাপড় নাই। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বলে সে-বুকেটা বালকের বুকের মতো সমান মনে হয়। আর মেহেদি দেয়া তার একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে। পায়ের দুঃসাহস দেখে মজিদ মোটেই ক্রুদ্ধ হয় না; এমনকী তার মুখের একটি পেশিও স্থানান্তরিত হয় না। সে নত হয়ে ধীরে-ধীরে দড়িটা খোলে, তারপর তাকে পঁজাকোল করে ভেতরে নিয়ে আসে। বিছানায় শুইয়ে দিতেই রহীমা স্পষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

—মরছে নাকি?

প্রশ্নটি এ রকম যে মজিদের ইচ্ছা হয় একটা হুঙ্কার ছাড়ে। কিন্তু কেন কে জানে সে কোনো উত্তর দিতে পারে না! শেষে কেবল সংক্ষিপ্তভাবে বলে,

—না। একটু থেমে আস্তে বলে, ওর ঘোর এখনো কাটে নাই। আছর ছাড়লে এই রকমটা হয়।

সে-কথায় কান না দিয়ে জমিলার কাছে দাঁড়িয়ে রহীমা তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখে। তারপর কী একটা প্রবল আবেগের বশে সে তার দেহে ঘন-ঘন হাত বুলাতে শুরু করে। মায়া যেন ছলছল করে জেগে ওঠে হঠাৎ বন্যার মতো দুর্বীর হয়ে ওঠে, তার কম্পমান আঙুলে সে-বন্যার উচ্ছ্বাস জাগে; তারই আবেগে বার-বার বুজে আসে চোখ।



মজিদ অদূরে বিমূঢ় হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে। মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরেও কী যেন একটা ওলট-পালট হয়ে যাবার উপক্রম করে, একটা বিচিত্র জীবন আদিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ পায় তার চোখের সামনে, আর একটা সত্যের সীমানায় পৌঁছে জন্মবেদনার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করে মনে-মনে। কিন্তু শেষপর্যন্ত টাল খেয়ে সে সামলে নেয় নিজেকে।

গলা কেশে মজিদ বলে,

—দুনিয়াটা বিবি বড় কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র। দয়া-মায়া সকলেরই আছে। কিন্তু তা যেন তোমারে আঁধা না করে।

তারপর সে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে মাঠের দিকে হাঁটতে শুরু করে। ইতোমধ্যে ক্ষেতের প্রান্তে লোক জমা হয়েছে অনেক। কারো মুখে কথা নেই। মজিদকে দেখে কে একজন হাহাকার করে উঠে বলে— সব তো গেলো। এবার নিজেই বা খামু কী, পোলাপানদেরই বা দিমু কী?

মজিদের বিন্দ্র মুখটা বৃষ্টির প্রভাতের স্নান আলোয় বিবর্ণ কাঠের মতো শক্ত দেখায়। সে কঠিনভাবে বলে,

—নাফরমানি করিও না। খোদার ওপর তোয়াক্কল রাখো।

এরপর আর কারো মুখে কথা জোগায় না। সামনে ক্ষেতে-ক্ষেতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে ঝরে-পড়া ধানের ধ্বংসস্তূপ। তাই দেখে চেয়ে-চেয়ে। চোখে ভাব নেই। বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে-চোখ।



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অবসর— সুযোগ, সময়। অপরিণত— যা পরিণত হয়নি। অর্ধচক্রাকারে— অর্ধ বৃত্তের মতো। আত্মসচেনতায়— নিজের উপলব্ধিতে। আছর— প্রভাব। আর্তনাদ— কাতর চিৎকার। আদিগন্ত— দিগন্ত পর্যন্ত। আভা— আলোর ছটা। আরশ— আল্লাহর আসন। আড়মোড়া ভেঙে— আলস্য ত্যাগ করে। উচ্ছ্বাস— ভাবাবেগ। উদ্দামতা— প্রবলতা। উদ্ভাসিত— আলোকিত। উদ্ভ্রান্ত— পাগলাটে, এলোমেলো। উদ্বেগ— চিন্তা। উপভোগী— যে ভোগ করে। উপক্রম— আয়োজন। উচ্ছা— হাউই। উৎকর্ষিত— চিত্তিত। এংবার— প্রসন্নতা, দয়া। কাটি-কাটি— শেষ হচ্ছে শেষ হচ্ছে এ রকম ভাব। কাবু— বশীভূত। কুদরত— মহিমা। ক্ষীপ্রতায়— দ্রুততায়। ক্ষুদ্র পল্লব— ছোট পাতা। খোদাভাবমত্ত— খোদার জন্য পাগল হয়েছে যে মানুষ। গর্জন— প্রবল চিৎকার। গুমোট— হাওয়া-বাতাসহীন অবস্থা, ভ্যাপসা গরম। গোছাসে— বড় বড় গ্রাসে। গৌগৌ— গর্জনের শব্দ। ঘনবর্ণ— কালো রঙের। ঘনীভূত— বেশি ঘন হওয়া, বেড়ে খাওয়া। ঘুনধরা হাড়— বুড়ো হাড়। ঘূর্ণমান— যা ঘুরছে। ঘোর— আচ্ছন্নতা। চকমকির পাথর— এক ধরনের পাথর যা ঘষলে আগুন বের হয়। চাবকাইতে (আঞ্চলিক শব্দ)— চাবুক দিয়ে মারতে। চিড়চিড়— কোনো বস্ত্র বা ঐ জাতীয় কিছু কেটে যাওয়ার ভাব। চিনচিনে— অল্প অল্প। জিন-পরী— কল্পিত অশরীরী প্রাণী। জিন— মুসলমানদের মতে আগুনে তৈরি অশরীরী জীব। ঝলসে ওঠা— প্রখর আলোসহ প্রকাশ পাওয়া। ঝলকানি— হঠাৎ প্রখর আলোর চমক। টনটন— ব্যথা বেদনার অনুভূতির ভাব। ঠায়— একই জায়গায়। তাগিদ— প্রেরণা। তোয়াক্কল— বিশ্বাস, নির্ভরতা। তৃণখণ্ড— খড়কুটো। থরথর— ভয়ে, ক্রোধে বা অন্য কারণে বেশি রকম কাঁপার। দুরন্ত অতিমাত্রায়। থিয়েটার— নাট্যশালা। দম খিচে— নিঃশ্বাস বন্ধ করে। দরবার— দরবেশ বা পীরের মাজার। দাওয়া— ঘরের মেঝের বাড়তি অংশ, বারান্দা। দুর্বার— যা বারণ করা কষ্টকর। দুরন্ত— প্রবল। দুর্দান্ত— প্রবল। ধাঁ— দ্রুত যাওয়া বা ওঠার ভাব। নধর-কচি— অতি কচি। নাখোশ— অসন্তুষ্ট। নাজুক— অপরিণত। নাফরমানি— অবাধ্যতা। নিঃশব্দপ্রায়— নীরব। নিঃসৃত— বের। নিশ্চল— স্থির। নিষ্পেষিত— পিষ্ট। নিরলস দৃষ্টি— সচেতন দৃষ্টি। নির্বাক— চুপ। নির্মল— পরিষ্কার। পথ ভ্রষ্ট— পথ হারিয়েছে যা। প্রকৃতি অবলোকন— প্রকৃতিকে দেখা। প্রান্তে— একদিকে। পোষা জীবজন্তু— গরু ছাগল ইত্যাদি। ফলা— তীরের তীক্ষ্ণ মুখ। বজ্রমুষ্টি— হাত দিয়ে ভীষণ শক্তভাবে ধরা। ব্যাকুলতা— আগ্রহ। ব্যাপ্ত— ছড়ানো। বিদ্যুৎছটা— বিদ্যুতের চমক। বিন্দ্র— ঘুমহীন। বিমূঢ়— হতবুদ্ধি। বেকঁ বসলো— অসম্মত হল। মরণভীতি— মৃত্যুর ভয়। মায়াজাল— ছলনা। মেঘস্তূপ— মেঘের পুঞ্জ। মুহূর্ত— ক্ষণ, সামান্য সময়। যবনিকা— পর্দা। যো— উপায়। রক্ত পানি হওয়া— অতিরিক্ত ভয় পাওয়া। রেখায়িত— চিহ্নিত। রুক্ষ— কর্কশ, কঠিন। লীলা— গৃহ কাজ। লুফে লুফে— ধরে নিয়ে। শ্বসন— নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। শিষ— ধান গাছের আগা। সন্ধানী— কৌতুহলী। সর্বনাশা— ধ্বংসকারী। শুদ্ধতা— নীরবতা। স্বতঃপ্রবৃত্ত— নিজেই উদ্যোগী। সিন্ত— ভেজা। সুবেহ সাদেক— সূর্য ওঠার আগে প্রভাতের রূপ, প্রথম ভোর। সুহৃদ— বন্ধু। হুকাই দম দেয়— হুকা টানে।



সারসংক্ষেপ

জমিলার শিক্ষা শুরু হয়। একবার বিনা অজুতে মাজারে গিয়ে তার কী হাল হয়েছিল এ-রকম একটা বানানো গল্পও সে জমিলাকে শোনায়। মজিদ জমিলাকে তারাবির নামাজ পড়তে ও পীরের কাছে মাফ চাইতে নির্দেশ দেয়। সে রাতে জমিলা জায়নামাজের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে। এতে ভয়ানক দ্রুত হয়ে মজিদ জমিলাকে হ্যাঁচকা টানে ঘুম থেকে তুলে মাজারে নিয়ে যেতে চায়। উপায়ন্তর না দেখে জমিলা মজিদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করে। মজিদ একেবারে থ মেরে যায়। তার মতো একজন শক্তিশালী মানুষের বিরুদ্ধে কেউ এমন প্রতিবাদ করতে পারে তা মজিদ কোনোদিন ভাবেনি। রহীমা আত্ননাদ করে। থুথু মুছে মজিদ জমিলাকে পঁজাকোলা করে মাজারে নিয়ে আসে। এবার জমিলা আর প্রতিবাদ করে না। মজিদের কঠোর হাল্হতাশে জমিলা ভয়ার্ত হয়ে ওঠে। সে একবার মাজার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু মজিদ পথ বন্ধ করে রাখে। সে জমিলাকে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। তাকে বলে এক রাত মাজারপাকের কাছে থাকলে দুষ্ট আত্মা বাপ বাপ করে পালাবে এবং এভাবে জমিলার মনে খোদাভীতি ও স্বামীভক্তি আসবে। জমিলাকে মাজার ঘরে আটকে রেখে মজিদ ঘরের ভেতরের দাওয়ায় বসে থাকে। আকাশে মেঘ জমে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায়, শীতল হাওয়া বয়ে যায়, ঝড় আসে তীব্র গতিতে। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে লগুভণ্ড অবস্থা। ঝড়ের পরে নামে শিলাবৃষ্টি। শিলাবৃষ্টি থামলে মজিদ মাজারের ঝাপটা খোলে। জমিলা হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে সাণুতে ঢাকা কবরের পাশে সংজ্ঞাহীন হয়ে আছে। দড়ি খুলে মজিদ তাকে ভেতরে নিয়ে আসে। রহীমা পরম আবেগে জমিলার গায়ে হাত বুলাতে থাকে। মজিদের মধ্যেও ভাবাবেগ জাগে। কিন্তু মজিদ নিজেকে সামলে নেয়। বলে, দুনিয়াটা একটা পরীক্ষা মাত্র। এরপর মজিদ মাঠের দিকে যায়। মাঠের সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। সে হাহাকাররত লোকজনদের নাফরমানি না করে খোদার ওপর বিশ্বাস রাখতে বলে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৭. মজিদ জমিলাকে কোথায় বেঁধে রেখেছিল?

ক. মাজারে	খ. মসজিদে
গ. কবরস্থানে	ঘ. মক্তবে

৩৮. মজিদ কীভাবে সমাজে তার প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে?

ক. মানুষের অন্ধবিশ্বাসে	খ. সমাজের সেবা করে
গ. অঢেল অর্থের জোরে	ঘ. অলৌকিক ক্ষমতাবলে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

অমৃতা বেড়ে উঠেছে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে। সমাজের কঠোর নিয়ম-নীতি তাকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু বিয়ের পর তাকে এর মূল্য দিতে হয়েছে। অমৃতার হাসি, কান্না আর গানে বাধা আসে। এক সময় সে প্রতিবাদী হয়ে উঠে।

৩৯. উদ্দীপকের অমৃতার সঙ্গে ‘লালসালু’ উপন্যাসের কোন চরিত্রটি সামঞ্জস্যপূর্ণ?

ক. রহীমা	খ. জমিলা
গ. আমেনা বিবি	ঘ. তানু বিবি

৪০. উদ্দীপক ও ‘লালসালু’ উপন্যাসের প্রতিবাদী চেতনা যে বিষয়ে-

i. কুসংস্কার	ii. ধর্মীয় গোঁড়ামি	iii. অন্ধবিশ্বাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. i, ii ও iii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৪১. বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস কোনটি?

ক. ঘরে-বাইরে	খ. আলালের ঘরের দুলাল
গ. দুর্গেশনন্দিনী	ঘ. কৃষ্ণকান্তের উইল



৪২. 'সালু' শব্দের অর্থ কী?

- ক. কালো রঙের কাপড়
গ. মাজারের আবরণ

- খ. লাল রঙের কাপড়
ঘ. কবরস্থানের আবরণ

৪৩. মোনাজাত শেষে মজিদ কোনদিকে পা ফেলেছিল?

- ক. উত্তর
গ. পশ্চিম

- খ. দক্ষিণ
ঘ. পূর্ব

৪৪. 'খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা'— উক্তিটি কার?

- ক. ধলা মিঞার
গ. মজিদের

- খ. খালেক ব্যাপারির
ঘ. তাহেরের

৪৫. জমিলাকে পেয়ে রহীমার মনে কোন ভাব জাগে?

- ক. বড় বোন
গ. ননদ

- খ. শাশুড়ি
ঘ. জা

৪৬. মজিদ মহব্বতনগর গ্রামের লোকদের কী বলে গালি দেয়?

- ক. নাস্তিক
গ. জাহেল

- খ. বেঈমান
ঘ. কাফের

৪৭. 'লালসালু' উপন্যাসে কোন পীর সূর্যের গতি খামিয়ে রাখতে পারে?

- ক. খালেক ব্যাপারির পীর
গ. আওয়ালপুরের পীর

- খ. গারো পাহাড়ের পীর
ঘ. তাহেরের পীর

৪৮. মজিদের মুখে থুথু ফেলেছিল কে?

- ক. হাসুনি
গ. জমিলা

- খ. রহীমা
ঘ. আমেনা

৪৯. 'লালসালু' উপন্যাসের শেষ বাক্য কোনটি?

- ক. নাফরমানি করিও না।
গ. ধান দিয়া কী হইবো, মানুষের জান যদি না থাকে?

- খ. বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ।
ঘ. কাজেই তার আবেদন মঞ্জুর হয়।

৫০. 'লালসালু' কী ধরনের উপন্যাস?

- ক. ধর্মীয় সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন
গ. রাজনৈতিক প্রচারধর্মী

- খ. সামাজিক সমস্যামূলক
ঘ. ইতিহাস আশ্রয়ী

৫১. 'তাই তারা ছোট, ছোট'—কেন?

- ক. মাছ ধরার জন্য
গ. জীবিকার সন্ধান

- খ. মাজার দেখতে
ঘ. পীরের মুরিদ হতে

৫২. 'শস্যহীন জনবহুল' কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—

i. আকাল

ii. দুর্ভিক্ষ

iii. প্লাবন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
গ. iii

- খ. ii
ঘ. i, ii ও iii

৫৩. মজিদ মহব্বতনগরে কিসের জাল বিস্তার করেছে?

- ক. ছলনা
গ. অজ্ঞতা

- খ. মায়া
ঘ. বিশ্বাস

৫৪. 'খেলোয়াড় চলে গেছে এখন খেলবে কার সাথে?'—বাক্যটিতে 'খেলোয়াড়' কে?

- ক. খালেক ব্যাপারি
গ. আওয়ালপুরের পীর

- খ. ধলা মিঞা
ঘ. তাহেরের বাপ



৫৫. মানুষের নির্বোধ বোকামি আর অকৃতজ্ঞতার জন্য মজিদের মনে জেগে উঠে—

- i. লোভ
- ii. ঘৃণা
- iii. ক্রোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. i ও ii
- ঘ. ii ও iii

৫৬. মজিদকে থুথু দেয়ার মধ্য দিয়ে জমিলা চরিত্রে ফুটে উঠে—

- i. বালিকাসুলভ আচরণ
- ii. প্রতিবাদী চেতনা
- iii. প্রথা অনুসারী

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. iii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫৭ ও ৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

বউ মারায় একটা পৈশাচিক আনন্দ পায় আবুল। মেরে মেরে এর আগে দুটো বউকে প্রাণে শেষ করে দিয়েছে সে।

৫৭. ‘লালসালু’ উপন্যাসের কোন চরিত্রের সঙ্গে আবুলের মিল রয়েছে?

- ক. মজিদ
- খ. তাহের
- গ. আক্বাস
- ঘ. ঢেঙা বুড়ো

৫৮. এই মিল যে বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে—

- i. ভালবাসায়
- ii. হিংস্রতায়
- iii. নারী নির্যাতনে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. iii
- ঘ. i ও ii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৫৯ ও ৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

বকুলপুরের পীর পর্দা রক্ষা করে চলেন। এজন্য মুরিদের বাড়ি গিয়ে তাকে নারীদের জন্য পর্দার আড়ালে ওয়াজ করতে হয়। একবার তিনি এভাবে ওয়াজ করতে গিয়ে রজবের সুন্দরী বউ করিমনকে বিয়ে করেন।

৫৯. উদ্দীপকের পীরের সঙ্গে ‘লালসালু’ উপন্যাসে যার সাদৃশ্য রয়েছে?

- ক. আওয়ালপুরের পীর
- খ. কাদেরের বাপ
- গ. মজিদ
- ঘ. ধলা মিঞা

৬০. এরূপ সাদৃশ্য যে বিষয়ে ফুটে উঠেছে—

- i. ক্ষমতা
- ii. নারীলোলুপতা
- iii. গ্রাম্য রাজনীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. iii
- ঘ. i ও ii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৬১ ও ৬২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

এনায়েত বারী শহর থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে গ্রামে ফেরেন। ব্যথিত হন গ্রামের মানুষের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দেখে। তিনি গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় স্থানীয় পীরের মুরিদচক্র।

৬১. উদ্দীপকের এনায়েত বারীর চেতনা ‘লালসালু’ উপন্যাসে কার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে?

- ক. আক্বাস
- খ. তাহের
- গ. কাদের
- ঘ. মতলুব খাঁ



৬২. উদ্দীপকের মুরিদ ও ‘লালসালু’ উপন্যাসের গ্রামবাসীর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে—

- i. গোঁড়ামি
- ii. অজ্ঞতা
- iii. কুসংস্কারাচ্ছন্নতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. iii
- ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

রসময় চকোভি ভবা পাগলার মন্দিরে পুরোহিত। স্থানীয় মানুষের ধারণা তিনি অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ। মন্দিরে পূজা ও ভগবানের নাম সংকীর্তন করে তাঁর সময় কাটে। লোকে বলে ভগবানের সঙ্গে তাঁর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। ফলে দশ গ্রামের মানুষ মন্দিরে আসে তাঁকে সেবা দিতে। শত মানুষের প্রার্থনা, আবদার, অনুযোগ আর দুঃখ, কষ্টে ভরে উঠে পাষণ প্রতিমার মন্দির। প্রতিমার দেবতাকে তুষ্ট করতে গিয়ে জনতার কড়িতে ভরে ওঠে মন্দিরের কড়িকাঠ। কালের চক্রে রসময়ের ধন বাড়ে, মান বাড়ে আর প্রতিমার প্রতি আপামর জনতার বাড়ে ভয় আর ভরসা।

ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কত সালে জনগ্রহণ করেন?

খ. ‘মজিদ ধরা- ছোঁয়ার বাইরে। যোগসূত্র হচ্ছে রহীমা।’—কেন?

গ. উদ্দীপকের রসময় চকোভি ‘লালসালু’ উপন্যাসে কাকে ইঙ্গিত করে?—আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘লালসালু’ উপন্যাসে ধর্ম ব্যবসায়ের একই চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।”—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :

এলাকায় শফি কবিরাজের বেশ নাম-ডাক। যে কোন অসুখ-বিসুখে গ্রামের লোকের তিনিই একমাত্র ভরসা। নিজের গরজে তিনি প্রায়ই স্থানীয় লোকজনের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। জনদরদী কবিরাজ বলে আশ-পাশের গ্রামের লোকজনও তাকে বেশ সমীহ করে। বিশেষ করে জ্বর, পেট ব্যথা, কলেরা, হাঁপানি ইত্যাদি রোগের চিকিৎসায় তার খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত। দেশীয় পদ্ধতিতে তিনি গাছের পাতা, ছাল, শেকড়-বাকড় থেকে ঔষুধ তৈরি করেন। সম্প্রতি তার একচেটিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় ফাটল ধরেছে। নদীর ওপারে যে নতুন এমবিবিএস পাশ করা ডাক্তার এসেছেন আজকাল লোকজন ওখানেই ছুটেছে। তাই সমাজে নিজের প্রভাব হারানোর ভয়ে শঙ্কিত শফি কবিরাজ। গোপনে তিনি কৌশল আঁটেন নতুন ডাক্তারকে তাড়াতে।

ক. মতলুব খাঁ কে?

খ. ‘তোমার দাড়ি কই মিয়া’—উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকের শফি কবিরাজের মধ্যে ‘লালসালু’ উপন্যাসের কার চেহারা ফুটে উঠেছে?—আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘লালসালু’ উপন্যাসে মানুষের অস্তিত্বের সংকট প্রকাশিত হয়েছে।”—স্বীকার করেন কি? আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩ :

বহিপীর : বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়াছি। বিবির সঙ্গে দেখা হইবার পূর্বেই তিনি পালাইয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইলাম। ভাগ্যের কী খেলা আর খোদার কী মর্জি, তাহাকে এই বজরাতেই পাইলাম। তাঁহার সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাও ঘটিল, বলিতে লজ্জা নাই, তাহাকে দেখার পর আমার এই ধারণা আরো বদ্ধমূল হইল যে, তাহাকে আমি ফেলিয়া যাইতে পারি না। যে করিয়াই হোক, তাঁহাকে আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। কিন্তু সমস্যা গুরুতর। তাহাকে টলাইতে পারি না। তিনি আমার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য পানিতে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিতে পর্যন্ত প্রস্তুত।

ক. মজিদের ঘর কিসের তৈরি?

খ. ‘যত সব শয়তানি বেদাতি কারবার’—কে, কোন প্রসঙ্গে কথাটি বলেছে?

গ. উদ্দীপকের বহিপীর ‘লালসালু’ উপন্যাসের কোন চরিত্রকে মনে করিয়ে দেয়?—আলোচনা করুন।



ঘ. “উদ্দীপক ও ‘লালসালু’ উপন্যাসে আংশিকভাবে হলেও নারীর স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে।”-যুক্তিসহ মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৪ :

আলিমের বাড়ি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে চরমোলাই ইউনিয়নে। সেখানে শিক্ষার আলো যথেষ্ট পরিমাণে পৌঁছেছে এমন কথা বলা যাবে না। যদিও স্থানীয়ভাবে কিছু বেসরকারি সংস্থা সেখানে শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করেছে। কিন্তু মৌলবাদীদের প্রভাবে সে প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এবারে আলিম এবং তার বন্ধু কয়েকজন যুবক মিলে সেখানে স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে। স্কুলের জন্য তারা জায়গাও নির্বাচন করে ফেলে। কিন্তু তাদের এ উদ্যোগের কথা জেনে স্কুল প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয় স্থানীয় মসজিদের ইমাম বজরা শাহি ও তার অনুগত কয়েকজন মুসল্লি। তাদের ভাষ্য হচ্ছে, “নির্ধারিত স্থানে মসজিদ না হলে মাদ্রাসা হবে, কিন্তু কোনোক্রমেই স্কুল নয়।”

ক. ‘বতোর’ কিসের উৎসব?

খ. ‘নিরাক পড়া শ্রাবণ’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকটিতে ‘লালসালু’ উপন্যাসের যে আবহ ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. “কুসংস্কার ও ধর্মাত্মতা অনেক সময় মানবিক সমাজ গড়ায় অন্তরায় হয়।”-উদ্দীপক ও ‘লালসালু’ উপন্যাসের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৫ :

মসজিদে কাল শিরনী আছিল,-অটেল গোস্তু রুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি
এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন
বলে, “বাবা আমি ভূখা ফাকাআছি আজ নিয়ে সাত দিন।”
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা-‘ভ্যালা হলো দেখি লেঠা,
ভূখা আছ মর গো-ভাগাড়ে গিয়ে! নামাজ পড়িস বেটা?
ভুখারি কহিল, ‘না বাবা!’ মোল্লা হাঁকিল-‘তা হলে শালা
সোজা পথ দেখ!’ গোস্তু- রুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা।

ক. খালেক ব্যাপারির শ্যালকের নাম কী?

খ. “অন্যের আত্মার শক্তিতে অবশ্য মজিদের খাঁটি বিশ্বাস নেই।”-কেন?

গ. উদ্দীপকে ‘লালসালু’ উপন্যাসের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা তুলে ধরুন।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘লালসালু’ উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও চরিত্রগত দিক থেকে উভয়ের অভিন্নতা রয়েছে।”-যুক্তিসহ মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

🔑 নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর :

ক.

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯২২ সালের ১৫ আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন।

খ.

‘মজিদ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যোগসূত্র হচ্ছে রহীমা।’- উক্তিটি দিয়ে মহব্বতনগর গ্রামে রহীমার গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। ‘লালসালু’ উপন্যাসে মজিদ পুরুষ চরিত্র। বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে সে সহজেই মহিলাদের সঙ্গে মিশতে পারেনা। প্রকৃতিগতভাবে নারীদের আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা প্রবল। কিন্তু মহব্বতনগর গ্রামের নারীদের মজিদের সঙ্গে কথা বলার সরাসরি কোন পথ নেই, মজিদের কাছে তারা সরাসরি পৌঁছাতে পারেনা। তাদের একটি উপায় অবলম্বন করতে হয়, আর সে উপায়টি হচ্ছে রহীমা। মজিদ আর মহব্বতনগর গ্রামের নারীদের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে দেয় রহীমা। অবশ্য মহব্বতনগর গ্রামে রহীমার কদরও কম নয়। মজিদের স্ত্রী হিসাবে সে গ্রামে যথেষ্ট গুরুত্ব ও সম্মান পায়।



গ.

উদ্দীপকের রসময় চকোন্টি ‘লালসালু’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদকে ইঙ্গিত করে।

আবহমানকালের বাংলার মানুষ সহজ ও সরল জীবন-যাপন করতে অভ্যস্ত। প্রকৃতিগতভাবে তারা ধর্মভীরু এবং পীর-পুরোহিতদের প্রতি তাদের অন্ধ ভক্তি রয়েছে। মানুষের এই ধর্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে এক শ্রেণির ধূর্ত লোক নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়। সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠে তাদের।

উদ্দীপকের রসময় চকোন্টি ভবা পাগলার মন্দিরের পুরোহিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের একজন ব্রাহ্মণ। তাই সে নিজেকে খুব সহজেই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী করে তোলে। আশপাশের দশ গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখ, আবদার-প্রার্থনা, অভিযোগ-অনুযোগে তার মন্দির সব সময় সরগরম থাকে। সাধারণ মানুষের কষ্টে ভারি হয় পাষণ দেবতার মন্দির। আর তাদের অর্থ সম্প্রদানে ভরে উঠে মন্দিরের গোলা। এতে রসময় চকোন্টির ধন বাড়়ে, মর্যাদা বাড়়ে আর জনমনে বাড়়ে ভয় ও ভরসা। অন্যদিকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘লালসালু’ উপন্যাসে দেখা যায় অজ্ঞাত পরিচয় এক মোদাচ্ছের পীরের কবরকে কেন্দ্র করে শুরু হয় মজিদের মাজার ব্যবসায়। ঝালরওয়ালা সালু কাপড় দ্বারা আবৃত মাছের পিঠের মতো সে কবর। মজিদের প্রচারণায় এ গ্রাম সে গ্রাম থেকে মানুষজন আসতে থাকে মাজারে। তাদের কান্না, হতাশা, আশার কথা, সবকিছুই সালুতে আবৃত মাছের পিঠের মত অজ্ঞাত ব্যক্তির সেই কবরের কোলে আছড়ে পড়ে দিনের পর দিন। অর্থ-কড়ি, রোগ-চিকিৎসায় বিভিন্ন দৈব-দুর্বিপাকে মুশকিল আসান করে সাধারণ মানুষের অর্থে মজিদের গোলা ভরে উঠে। এভাবে মহকুতনগর গ্রামে সে হয়ে উঠে বিশেষ ক্ষমতাবান ব্যক্তি। অতএব বলা যায়, উদ্দীপকের রসময় চকোন্টি ‘লালসালু’ উপন্যাসের মজিদ চরিত্রকে ইঙ্গিত করে।

ঘ.

উদ্দীপকে মন্দির ও পুরোহিতের দৌরাভ্য পরিলক্ষিত হয়, একই চিত্র দেখা যায় ‘লালসালু’ উপন্যাসে মজিদ ও তার মাজারকেন্দ্রিক ধর্ম ব্যবসায়ে। অর্থাৎ মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

ধর্ম সাধারণ মানুষের নিকট ভয়, ভক্তি ও বিশ্বাসের আশ্রয়। এটি মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়। আবার এই ধর্মকে পুঁজি করে অনেকে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করে। কখনোবা ধর্মকে অবলম্বন করে সমাজের উপরের উঁচুস্তরে উঠতে চায়। ধার্মিকতা যদি অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মব্যবসায়ীদের চেতনার উপর নির্ভর করে তবে তা অনেক সময় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকে রসময় চকোন্টির শক্তির কেন্দ্র ভবা পাগলার মন্দির। অভিজাত ব্রাহ্মণ রসময় পাষণ দেবতাকে জাহত করেছে কটকৌশলে। সে অজ্ঞ, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে আপন স্বার্থের গান গেয়েছে। দেবতাকে তুষ্ট করতে গ্রামের মানুষের শ্রমের ফসলে ভরে তুলেছে মিথ্যার মন্দির। এতে পুরোহিতের ধন বেড়েছে, মান বেড়েছে, আর মানুষের বেড়েছে ভয় ও ভরসা। পক্ষান্তরে ‘লালসালু’ উপন্যাসেও দেখা যায় কুসংস্কার ও অজ্ঞতার সুযোগ-সন্ধানী ধূর্ত চরিত্রের উপস্থিতি। মজিদ এ ধরণের চরিত্রের প্রতিভূ। সমাজের মানুষের সরলতার সুযোগ নেয় সে। খরা, ভয় ও ভরসার নাটক সাজিয়ে এরা ঈশ্বরের রাজত্ব কায়ম করতে চায়। মূলত শোষণ ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরা মানুষের দুর্বলতম স্থানে আঘাত করে। পরকালের আজাবের ভয় দেখানোও এদের অন্যতম কৌশল। উদ্দীপকের রসময় চকোন্টি এবং ‘লালসালু’ উপন্যাসের মজিদ একই শ্রেণির প্রতিনিধি। তারা উভয়েই ধর্মব্যবসায়ী। ধর্মের অসার আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে তারা মানুষকে নিপীড়ন করে ও ধোঁকা দেয়। মানুষকে ধর্মীয় আবেগে সম্মোহিত করে ও আত্মিক ক্ষমতার মায়াজালে আটকে রেখে তারা ধনে, মানে ও জানে বড় হয়ে উঠে। ‘লালসালু’ উপন্যাসের মজিদ ও উদ্দীপকের রসময় চকোন্টি চরিত্র তাই ভণ্ডামি ও ধোঁকাবাজির উজ্জ্বল উদাহরণ। অতএব, সার্বিক আলোচনায় বলা যায়, উদ্দীপক ও ‘লালসালু’ উপন্যাসে ধর্ম ব্যবসায়ের একই চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ এর নমুনা উত্তর :

ক.

মতলুব খাঁ স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট।

খ.

‘তোমার দাড়ি কই মিয়া?’ –মহকুতনগর গ্রামের মোদাচ্ছের পীরের মাজারের খাদেম মজিদ উক্তিটি করেছে।

আক্কাস শিক্ষিত ছেলে। সে শহর থেকে পড়াশোনা শেষ করে গ্রামে ফিরেছে। তার একটি স্বপ্ন রয়েছে নিজ গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠার। কেননা গ্রামের মানুষ লেখাপড়া শিখলে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে, সভ্যতার অগ্রগতি ঘটবে। কিন্তু



ধর্মব্যবসায়ী মজিদ নিজের স্বার্থহানির আশঙ্কায় এ প্রস্তাবে বৈরিতা সৃষ্টি করে। ধর্মের ফাঁদ পেতে সে আক্কাসকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। বিচার মজলিশে মজিদ আক্কাসকে কৌশলে ধর্মীয় অনুভূতির উক্ত কথাটি দ্বারা ঘায়েল করে। এতে আক্কাস বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। এমনকি সে তার পিতার বকুনি খায়। মজিদের তীব্র আক্রমণের মুখে তার মুখে কোন কথা যোগায় না।

গ.

উদ্দীপকের শফি কবিরাজের মধ্যে মজিদের চেহারা ফুটে উঠেছে।

মানুষ প্রকৃতিগতভাবে নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে চায়। সে ভীত হয়ে পড়ে কখনো অস্তিত্ব সংকটে পতিত হলে। নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য সে যে কোন কাজ করে ফেলতে পারে। অস্তিত্ব সংকটে পড়া একজন মানুষ ভণ্ড, স্বার্থপর, শঠ ও প্রতারক হতে পারে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘লালসালু’ উপন্যাসে মজিদ এক রহস্যময় চরিত্র। মহক্কাতনগরে বানোয়াট কাহিনি তৈরি করে সে নিজের ভাগ্যকে গড়ে নেয়। সাধারণ মানুষ তার নিকট থেকে ধর্ম-কর্ম সম্পর্কে একটু ধারণা পায়। শিরালির জন্য নাচানাচি করা যে ধর্মসম্মত নয়, একথা সে জানত তবুও ব্যক্তিস্বার্থে সে এর বিরোধিতা করেনি। মজিদ কায়েমি স্বার্থবাদী মানুষ হলেও সকলে তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করত। এভাবে সমাজে তার একটু প্রভাবও তৈরি হয়। কিন্তু কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি বা জানাশোনা লোকের সামনে পড়লে সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাকে তাড়ানোর কৌশল খুঁজে বেড়ায়। উদ্দীপকে শফি কবিরাজের ক্ষেত্রেও দেখা যায় সে অল্প শিক্ষিত কবিরাজ, চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে তেমন কিছু জানেনা। তবুও গ্রামের লোকজন তার নিকট ভরসা পায়। দেশিয় পদ্ধতিতে তার কলেরা, বসন্ত রোগের চিকিৎসা বেশ ভালই। কিন্তু নদীর ওপারে এমবিবিএস পাশ করা ডাক্তার এলে সে ভয়ে গুটিয়ে যায়। তখন তাকে তাড়ানোর জন্য শফি কবিরাজ ওঠে-পড়ে লাগে। আর এখানেই শফি কবিরাজের মধ্যে ‘লালসালু’ উপন্যাসের মজিদের চেহারা ফুটে উঠে।

ঘ.

‘উদ্দীপক ও ‘লালসালু’ উপন্যাসে মানুষের অস্তিত্বের সংকট প্রকাশিত হয়েছে।’-মন্তব্যটি স্বীকার্য।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ একজন অস্তিত্ববাদী কথাশিল্পী। অস্তিত্বের সংকট এবং তা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে অন্যকে সে সংকটে ফেলে দেয়ার যে ধারাবাহিক জৈব প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে কাজ করে তা তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর ‘লালসালু’ উপন্যাসে। ‘লালসালু’ উপন্যাসে মজিদের মধ্যে ফুটে উঠেছে অস্তিত্বের সংকট। আর উদ্দীপকের শফি কবিরাজের জানা নেই চিকিৎসাবিদ্যা, এমবিবিএস পাশ করা ডাক্তার দেখলে কিংবা নাম শুনলেই সে আতঙ্কে পাংশুটে হয়ে যায়।

উদ্দীপকের শফি কবিরাজ একজন হাতুড়ে ডাক্তার। চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে তার সম্যক ধারণা নেই। তবুও সে সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার পরামর্শ ও চিকিৎসায় মানুষ যে উপকার পায়নি এমন নয়। কিন্তু ধারেকাছে পাশ করা ডাক্তার কিংবা নামকরা কবিরাজ এলে নিজের আসন হারানোর ভয়ে সে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে ‘লালসালু’ উপন্যাসেও মজিদ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে খুব সামান্যই জ্ঞান রাখে। ইসলামের মহত্ত্ব ও আদর্শ তার মধ্যে একপ্রকার নেই বললেই চলে। কিন্তু অপকৌশলে সে মহক্কাতনগরের অজ্ঞ সমাজে নিজের আধিপত্য বজায় রাখে। তার আশেপাশে যখন কোন জ্ঞানী আলেমের আগমন ঘটে তখন সবকিছু হারানোর ভয়ে সে কাঁপতে থাকে। আওয়ালপুরের পীর যখন ধর্মীয় সফরে মজিদের পাশের গ্রামে আসেন তখন এ চিত্রটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। পীর সাহেব এলে হয়তো মজিদের ফাঁকি ধরা পড়ে সত্য উন্মোচিত হয়ে যাবে। তাই নিজের অস্তিত্বের তাড়নায় সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

‘লালসালু’ উপন্যাসে মজিদ এবং উদ্দীপকে শফি কবিরাজ দুজনেই ধূর্ত এবং সমাজের দৃষ্টিতে চতুর। মজিদ ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ হয়েও ধর্ম নিয়েই তার ব্যবসা। অন্যদিকে শফি কবিরাজ চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধে অল্প ধারণা নিয়েও পশার জমিয়েছে। তারা উভয়েই প্রভাবশালী। কিন্তু নিজেদের ফাঁকি ধরা পড়ার ভয়ে উৎকর্ষিত হয়েছে। তাই প্রকৃত জ্ঞানী লোক কেউ এলে মজিদ ও শফি কবিরাজ দুজনেই তাকে তাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ উপন্যাস ও উদ্দীপক দুইয়েরই চরিত্রগুলো অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপক ও ‘লালসালু’ উপন্যাসে মানুষের অস্তিত্বের সংকট প্রকাশিত হয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩ এর নমুনা উত্তর :

ক.

মজিদের ঘরটি ইটের তৈরি।



খ.

আওয়ালপুরের পীরের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তার কাজকে ভগামি আখ্যা দিয়ে মজিদ উক্তিটি করেছে। মহব্বতনগরের পাশের গ্রাম আওয়ালপুর। সে গ্রামে হঠাৎ একজন পীরের আগমন ঘটে। অন্য অনেকের মত মজিদও কৌতুহলবশত সে গ্রামে পীরকে দেখতে যায়। সেখানে সে নবাগত পীরের জনপ্রিয়তা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। আওয়ালপুরে মজিদ খুব একটা পাত্তা পায় না। এমনকি যারা তাকে চিনে ও ভক্তি করে তারাও সেদিন তাকে খুব একটা সমীহ করেনি। আওয়ালপুরে মজিদ পীরের নানা কেরামতির কথা শুনতে পায়। একবার সে দেখতে পায় পীর সাহেব অসময়ে নামাজ পড়তে হুকুম দিয়েছেন। আর সে এ সুযোগটিই কাজে লাগায়। অবশেষে মজিদ পীরের কেরামতির অসারতা প্রমাণের জন্য আলোচ্য উক্তিটি করে।

গ.

উদ্দীপকের বৃদ্ধ চরিত্রের মানসিকতা ‘লালসালু’ উপন্যাসের মজিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত রয়েছে। অনেক সময় এখানে নারীদেরকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এদেশের নারীদেরকে সেবাদাস হিসাবে মনে করে। তাদের চাওয়া-পাওয়া, পছন্দ-অপছন্দ খুব একটা গুরুত্ব পায় না। উদ্দীপকের বহিপীর মজিদ চরিত্রেরই প্রতিরূপ। বহিপীর বৃদ্ধ বয়সে একজন নারীকে বিয়ে করে। কিন্তু এই বিয়েতে সে নারীর মত ছিলনা। তাই দেখা যায় বিয়ের পরে নারী চরিত্রটি স্বামী বহিপীরের সঙ্গে দেখা হবার পূর্বেই ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। বহিপীরও জেদ ধরেছে যেভাবেই হোক সে তার স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। কিন্তু বহিপীরের স্ত্রী শেষ পর্যন্ত অনমনীয় মনোভাব দেখিয়েছে, আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে চেয়েছে। বস্তুত বহিপীরের চরিত্রে নারীর প্রতি হীনমন্যতা এবং নারীকে ভোগ করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। এমনটি দেখা যায় ‘লালসালু’ উপন্যাসের মজিদ চরিত্রে। মজিদ ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধ বয়সে অল্পবয়সী নারী জমিলাকে বিয়ে করে। তার এই আচরণে জৈবিক চাহিদা পূরণ ও স্বার্থপরতার দিকটিই প্রকাশিত হয়েছে। এখানে ধর্মীয় অনুশাসনের বিষয়টি অবান্তর ছিল।

ঘ.

‘উদ্দীপক এবং ‘লালসালু’ উপন্যাসে আংশিকভাবে হলেও নারীর স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে।’ –উদ্দীপকের নারী চরিত্র এবং উপন্যাসের জমিলার ক্ষেত্রে মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে। আবহমানকাল থেকে বাংলার সমাজ হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক। আর এদেশের পরিবারগুলো পুরুষ প্রধান। এখানে নারীরা কেবল ঘরের বউ। তারা ঘরের কাজ করে আর বাচ্চা-কাচ্চা সামলায়। এ সমাজের পরিবার প্রথায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাধারণত নারীদের অংশগ্রহণ থাকে না। তবুও এর মধ্যেই কোনো কোনো নারী ভিন্নভাবে চিন্তা করে, প্রতিবাদী হয়ে উঠে। সে তার স্বাধীন ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। উদ্দীপকের নারী চরিত্রটি পিতা-মাতার অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের শিকার। তাকে বিয়ে দেয়া হয় নারীলোলুপ এক বৃদ্ধ পীরের সঙ্গে। এখানে তার মতের কোনো মূল্যায়ন করা হয় না। কিন্তু নারী চরিত্রটি তার নিয়তিকে মেনে নেয়নি। সে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। বহিপীরের দৃঢ়চেতা দৃষ্টিভঙ্গির সামনেও সে নত হয়নি। নিজের অনমনীয় মনোভাব দেখিয়েছে। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ বহিপীর তাকে টলাতে পারেনি। অন্যদিকে ‘লালসালু’ উপন্যাসে মজিদও বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করে অল্প বয়সী নারী জমিলাকে। জমিলাকে বিয়ে করার পর থেকে মজিদ খুব কম সময়ই স্বস্তিতে থাকতে পেরেছে। জমিলা চপলা, চঞ্চলা আর ধর্মে তার অন্ধবিশ্বাস নেই। সে যখন-তখন ঘুমিয়ে পড়ে, আবার কৌতুহলের কারণে জিকির দেখার জন্য উঠানে নেমে আসে। বস্তুত জমিলার স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে মজিদের শাসন আলগা হয়ে পড়ে। উদ্দীপকের নারী চরিত্র আর ‘লালসালু’ উপন্যাসের জমিলা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বৈষম্যের শিকার। কিন্তু তারা কেউই প্রচলিত সমাজকে নির্বিরোধ মেনে নেয়নি। জমিলা মাজারের গায়ে পা তুলে দিয়ে বিদ্রোহ করেছে। আর নারী চরিত্রটিকে বহিপীর কোনো অবস্থাতেই টলাতে পারেনি। তারা বৈষম্যমূলক সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তারা প্রতিবাদী হয়েছে। নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছে। জমিলা এবং উদ্দীপকের নারী চরিত্রটি সমাজকে বদলে ফেলতে পারেনি, কিন্তু এর শেকড়কে মুচড়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপক ও ‘লালসালু’ উপন্যাসে আংশিকভাবে হলেও নারীর ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন-৬ :

আর কিছু নয়, গফরগাঁ থাইকা পীর সাহেবেরে নিয়া আস তোমরা। অনেক ভেবেচিন্তে বললেন রহিম সর্দার। তাই করেন হুজুর তাই করেন। এক বাক্যে সায় দিল চাষিরা। গফরগাঁ থেকে জবরদস্ত পীর মনোয়ার হাজিকেই নিয়ে আসবে ওরা। দেশজোড়া নাম মনোয়ার হাজির। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি তিনি। মুমূর্ষু রোগীকেও এক ফুঁয়ে ভালো করে দিয়েছেন, এমন দৃষ্টান্তও আছে।

ক. কোন মাসে মজিদ দ্বিতীয় বউ ঘরে তোলে?

খ. “খেলোয়াড় চলে গেছে, খেলবে কার সাথে।” –কথাটি বলা হয়েছে কেন?

গ. উদ্দীপকের মনোয়ার হাজির সঙ্গে ‘লালসালু’ উপন্যাসের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? তুলে ধরুন।

ঘ. “লালসালু’ উপন্যাসে ফুটে ওঠা সমাজচিত্র উদ্দীপককেও স্পর্শ করেছে।” –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৭ :

মৌলবী সাহেব বলিয়া যাইতে লাগিলেন; “... দীনের চেরাগ আলেম-ফাযেলরা দুনিয়ার চিন্তা হতে ফারোগ হতে না পারিলে তাহারা এছলামের রওনক বৃদ্ধি করিবেন কেমন করিয়া? মুসলমানদের যে আজ তঙ্গদস্তি দূর হচ্ছে না, তার কারণ ইহারা আলেম সমাজের হক আদায় করিতেছে না। আলেম সমাজকে যদি পেটের চিন্তা করিতে হয়, তবে আর ইসলামের চেরাগ জ্বলাইয়া রাখিবে কাহারো? এই জন্য হাদিস শরিফে আসিয়াছে নায়েবে রসুলদের ভরণপোষণের দায়িত্ব সমাজের।”... মৌলভী সাহেবকে অর্থ সাহায্য করিয়া এই দায়িত্ব পালন করিবার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করিলেন।

ক. আমেনা বিবির সতীনের নাম কী?

খ. “শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।” –বাক্যটি দ্বারা লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের মৌলবির সঙ্গে ‘লালসালু’ উপন্যাসের মজিদের ভিন্নতা তুলে ধরুন।

ঘ. “উদ্দীপক এবং ‘লালসালু’ উপন্যাসে আলোকিত জীবন নয় বরং ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ধর্মকে অবলম্বন করা হয়েছে।” –মন্তব্যটি বিচার করুন।



উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

০১. গ	০২. খ	০৩. খ	০৪. ক	০৫. ক	০৬. খ	০৭. গ	০৮. খ	০৯. ক	১০. গ	১১. ক	১২. ঘ
১৩. ক	১৪. ঘ	১৫. খ	১৬. গ	১৭. খ	১৮. ক	১৯. ক	২০. ঘ	২১. খ	২২. ক	২৩. ক	২৪. ঘ
২৫. ক	২৬. খ	২৭. ঘ	২৮. ঘ	২৯. গ	৩০. ঘ	৩১. ক	৩২. ঘ	৩৩. ক	৩৪. ক	৩৫. খ	৩৬. ঘ
৩৭. ক	৩৮. ক	৩৯. খ	৪০. ঘ	৪১. খ	৪২. খ	৪৩. ক	৪৪. গ	৪৫. খ	৪৬. গ	৪৭. গ	৪৮. গ
৪৯. খ	৫০. খ	৫১. গ	৫২. ক	৫৩. ক	৫৪. ঘ	৫৫. ঘ	৫৬. খ	৫৭. ঘ	৫৮. গ	৫৯. গ	৬০. গ
৬১. ক	৬২. ঘ										



নাটক



সিরাজউদ্দৌলা

সিকান্দার আবু জাফর





সিরাজউদ্দৌলা

সিকান্দার আবু জাফর



নাট্যকার-পরিচিতি

সিকান্দার আবু জাফর ১৯১৯ সালের ৩১ মার্চ সাতক্ষীরা জেলার তেঁতুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ মঈনুদ্দীন হাশেমী, আর মাতা জোবেদা খানম। কবির প্রকৃত নাম ছিল সৈয়দ সিকান্দার আবু জাফর হাশেমী বখত। স্থানীয় তালা বিডি ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯৩৬ সনে তিনি মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। প্রথমে তিনি কলকাতার একটি সরকারী সংস্থায় চাকরি করেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত দৈনিক নবযুগ পত্রিকার সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পৃক্ত হন। চাকরি এবং সাংবাদিকতার পাশাপাশি স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতিও তিনি একসময় মনোযোগী হয়ে ওঠেন। ভারত বিভক্তির পর তিনি কলকাতার জীবন ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় এসে একদিকে সাহিত্যচর্চা, অন্যদিকে ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন তিনি। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রে স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করেন। সিকান্দার আবু জাফরের জীবনের একটা বৃহত্তর অংশ জুড়ে আছে তাঁর সাংবাদিক কর্মধারা। কলকাতা থেকে ঢাকায় আসার পরে তিনি দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় সম্পাদনীয় বিভাগে কিছুদিন কাজ করেন। দৈনিক সংবাদের প্রথম সম্পাদকীয় তাঁরই লেখা। সংবাদের পর তিনি ইত্তেফাক এবং মিল্লাত পত্রিকায়ও সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। ১৯৫৭ সালে সিকান্দার আবু জাফরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বিখ্যাত সমকাল পত্রিকা। বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে সমকাল পত্রিকার অবদান অসামান্য। নতুন লেখক সৃষ্টিতে সমকাল-এর সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক পালন করেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। ১৯৭১ সালে মুজিবনগর থেকে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় অভিযান পত্রিকা। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অভিযান পত্রিকার প্রকাশ একটি দুঃসাহসী এবং ঐতিহাসিক ঘটনা। সিকান্দার আবু জাফরের সাহিত্যজীবনও গৌরবোজ্জ্বল কীর্তিতে ভাস্বর। স্কুল জীবন থেকেই তিনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। কর্মজীবনের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হতে থাকে তাঁর সাহিত্যসাধনা। একে একে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর কাব্য, উপন্যাস, নাটক, ছড়া ও অনুবাদগ্রন্থসমূহ। গীতিকার ও সুরকার হিসেবেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি এবং প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গেও সিকান্দার আবু জাফরের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাঁর ‘আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবে’ গানটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিপুল প্রেরণার উৎস হয়ে কাজ করেছে। বাংলাদেশের সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর সংগ্রাম ছিল নিরলস ও অকুণ্ঠ। নাটকে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৬৬ সালে তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৫ সালের ৫ আগস্ট তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

সিকান্দার আবু জাফরের প্রধান সাহিত্যকর্ম:

- কবিতা : প্রসন্ন প্রহর (১৯৬৫), বৈরীবৃষ্টিতে (১৯৬৫), তিমিরান্তিক (১৯৬৫), কবিতা ১৩৭২ (১৯৬৮), কবিতা- ১৩৭৪ (১৯৬৮), বৃশ্চিক লগ্ন (১৯৭১), বাঙলা ছাড়ো (১৯৭২)।
- গানের বই : মালব কৌশিক (১৯৬৬)
- উপন্যাস : মাটি আর অশ্রু (১৯৪২), জয়ের পথে (১৯৪৩), পূরবী (১৯৪৪), নতুন সকাল (১৯৪৫)
- নাটক : শকুন্ত উপাখ্যান (১৯৫৮), সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৫), মহাকবি আলাউল (১৯৬৬);
- অনুবাদ : যাদুর কলস (১৯৫৯), সেন্ট লুইয়ের সেতু (১৯৬১), পশ্চিমের পারাবাত (১৯৬২), রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম (১৯৬৬), সিংয়ের নাটক (১৯৭১)।



ভূমিকা

সাহিত্যের অন্যতম শাখা নাটক সম্পর্কে আমরা সকলেই কম-বেশি অবহিত আছি। নাটক তুলনামূলকভাবে আধুনিক সাহিত্য শাখা। বাংলা নাটকের বয়স মোটামুটি দুশো বছর। মাধ্যমিক পর্যায়ে আপনারা নাটক পড়েছেন, উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের বাংলা পাঠ্যসূচিতেও নাটক অন্তর্ভুক্ত আছে। এ পর্যায়ে আপনাদের পাঠ করতে হবে সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৫) বিরচিত ‘সিরাজউদ্দৌলা’ (রচনাকাল : ১৯৫১, প্রকাশকাল : ১৯৬৫) নাটক। মূল নাটকে অনুপ্রবেশের পূর্বে নাটকের সংজ্ঞার্থ ও শিল্পরূপ, নাটকের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য, বাংলা নাটকের ইতিহাস, সিকান্দার আবু জাফরের জীবন ও সাহিত্যসাধনা, সিরাজউদ্দৌলা নাটক সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা আবশ্যিক। বর্তমান ইউনিটে আমরা উপরের বিষয়সমূহ অনুধাবনে সচেষ্ট হবো।



সাধারণ উদ্দেশ্য

- নাটকের উপাদান, আঙ্গিক ও গঠনকৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নাটকের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা করতে পারবেন;
- নাটকের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন;
- ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের প্রাসঙ্গিক পরিচয় লিখতে পারবেন;
- ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের সম্পূর্ণ কাহিনিটি লিখতে পারবেন;
- ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঠ-১



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- নাটকের সংজ্ঞার্থ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- নাটকের গঠনকৌশল আলোচনা করতে পারবেন;
- নাটকের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন;
- নাটকের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- বাংলা নাটকের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন;
- সিকান্দার আবু জাফরের জীবন ও সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের প্রাসঙ্গিক পরিচয় লিখতে পারবেন।



মূলপাঠ

নাটকের সংজ্ঞার্থ

সাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা হচ্ছে নাটক। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ, নাটক-সাহিত্যের এসব বিচিত্র শাখার মধ্যে নাটক এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম। দেখা ও শোনার যুগপৎ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে একটি প্রকৃত নাটক। অর্থাৎ নাটক একই সঙ্গে দেখা ও শোনার বিষয়। এই দুটি মৌল বিষয় নাটকের প্রধান শিল্প-বৈশিষ্ট্য হলেও, আমরা নাট্যগ্রন্থ পাঠ করেও সাহিত্য রস আন্বাদন করতে পারি।



সহজ কথায় আমরা নিম্নোক্তভাবে নাটককে সংজ্ঞায়িত করতে পারি- মঞ্চ অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাহায্যে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা যখন সংলাপের আশ্রয়ে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করা হয়, তখন তা হয় নাটক। ইংরেজিতে বলা হয় "Drama is the creation and representation of life in terms of theater"

নট, নাট্য, নাটক- এ তিনটি শব্দেরই মূল হলো নট। আর নট এর অর্থ হলো নড়াচড়া করা, অঙ্গচালনা করা ইত্যাদি। নাটকের মধ্যে আমরা অভিনেতা অভিনেত্রীদের কথাবার্তা এবং হাত-পা-মুখ-চোখ নড়াচড়ার মাধ্যমে জীবনের বিশেষ কোনো দিক বা ঘটনার অভিনয় দেখতে পাই। অভিনীত হবার উদ্দেশ্য নিয়ে নাটকের সৃষ্টি হলেও, কেবল পাঠ করেও আমরা নাটকের রস আনন্দন করতে পারি। তবে মঞ্চ অভিনয়ের মাধ্যমেই নাটকের মৌল উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কাজেই নাট্যগ্রন্থ পাঠ করে যে আনন্দ লাভ, নাটকের শিল্পরূপ বিচারে তা মুখ্য নয়, গৌণ বিষয় মাত্র।

নাটকের শিল্পরীতি

যদিও বলা হয়, মানবজীবনের বিশেষ কোনো ঘটনার সংলাপময় শিল্পরূপই নাটক। কিন্তু নাটক হয়ে উঠতে হলে নাট্যকারকে কয়েকটি জরুরি বিষয় মেনে চলতে হয়। এই জরুরি বিষয়গুলোকে নাটকের শিল্পরীতি বলে। বস্তুত, এইসব শিল্পরীতি মেনে চলাই একটি সার্থক নাট্যকর্মের মৌল ভিত্তি। শিল্পরীতির এই বিষয়গুলো হলো- কর্ম বা ক্রিয়ার গতিবেগ (action), সংঘাত (conflict), আকস্মিকতা (unexpectedness), উৎকণ্ঠা (Suspense), নাট্যশ্রেষ (dramatic irony) ইত্যাদি।

নাটক জীবনের অনুকরণে নির্মিত হয়, তবে সেই জীবনকেই অনুকরণ করা হয় যে-জীবন কর্মময়, গতিশীল, প্রকৃষ্ট এবং পরিবর্তনমান। দর্শক শ্রোতার কৌতূহল এবং আগ্রহ ধরে রাখাই হচ্ছে গতিবেগ বা অ্যাকশনের মূল কথা। বস্তুত ক্রিয়া বা কর্মের গতিবেগই জীবনের আনন্দকে ধারণ করে। নাটকের অ্যাকশনে কেবল নড়াচড়া বা অগ্র-পশ্চাৎ গতি থাকলেই চলে না, তাতে অবস্থান্তর এবং পরিবর্তনশীলতাও থাকতে হবে।

নাটকের গতি প্রথমত অভিনেতা অভিনেত্রীদের মঞ্চে আসা-যাওয়া এবং অঙ্গ-সঞ্চালনের মাধ্যমে ঘটে থাকে। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বিখ্যাত নাট্যসমালোচক অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন- “অভিনেতা একভাবে দাঁড়িয়ে বা বসে কথা বললে তা প্রায়ই একঘেঁয়ে ও ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। সেজন্য তাকে আসতে হয়, যেতে হয়, মঞ্চের মধ্যে নড়াচড়া করতে হয়, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বিশেষভাবে হাত, মুখ, চোখ ও ক্রয়গল সঞ্চালন করতে হয়। শুধু আঙ্গিক গতি নয়, বাচিক গতিও নাটকের জন্য প্রয়োজন। এজন্য অভিনেতার কণ্ঠস্বর কখনো উচ্চে এবং কখনো বা নিম্নে দ্রুত ও আকস্মিকভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। এভাবে দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে নাটকের action আমাদের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে আমাদের চিত্তকে কৌতূহলী ও উত্তেজিত করে রাখে।”

বস্তুত, গতির আসল উৎস হলো দর্শকের মনোজগৎ। ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নাটকে ভিন্ন ভিন্ন গতিবেগ ফুটিয়ে তুলতে হয়। এ কারণে ঐতিহাসিক নাটকে যে ধরনের অ্যাকশন বা গতি ফুটিয়ে তোলা হয়, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নাটকে তা কার্যকর হতে পারে না।

গতিবেগ বা অ্যাকশন সৃষ্টির জন্য নাট্যকার প্রথমেই যে কৌশল অবলম্বন করেন, তার নাম conflict বা সংঘাত। সংঘাত নাটকের প্রাণ। নাটকে যদি সংঘাত সৃষ্টি করা না যায়, তাহলে শিল্প হিসেবে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নাটকে সংঘাত নানাভাবে দেখা দেয়। গ্রিক নাটকে আমরা দেখি দৈবশক্তি বা নিয়তির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব বা সংঘাত বেধেছে। কখনো কখনো নাটকে সংঘাত দেখা দেয় দু'গুচ্ছ মানুষের মধ্যে। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই বিরোধ বা সংঘাতই নাটকের প্রধান উপজীব্য। দুই বিপরীতধর্মী চরিত্রের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই নাটকে সংঘাত সৃষ্টি হয়। বিপরীতধর্মী দুই গুচ্ছমানুষের এক গুচ্ছ ভালোর প্রতীক, অন্য গুচ্ছ মন্দের প্রতীক। নাটকে সংঘাত যত তীব্র হয়, নাটক হিসেবে তার ততই সার্থকতা।

সমাজশক্তির সঙ্গে ব্যক্তিশক্তির দ্বন্দ্বের ফলেও নাটকে সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে। অধিকাংশ নাটকেই আমরা এ ধরনের সংঘাতের সাক্ষাৎ পাই। সমাজনীতি ও যৌনচেতনার বিরোধ, সামাজিক ভেদের কারণে মতান্তর ও মনান্তর, বিবাহ ও ব্যক্তি অধিকারের সংঘাত, যন্ত্র ও জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মালিক ও শ্রমিকের বিরোধ, সমাজবাদ ও ধনবাদের সংগ্রাম ইত্যাদি নানা কারণে আধুনিক নাটকে সংঘাত সৃষ্টি হয়।

নাটকে অন্য এক ধরনের সংঘাত দেখা যায়। কোন বহিঃ কারণে নয়, বরং চরিত্র অভ্যন্তরেই এই সংঘাতের বীজ উগ্ঠ হয়। বস্তুত, এই দ্বন্দ্বই আধুনিক নাটকের প্রধান দ্বন্দ্ব। প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির, সমাজ-চেতনার সঙ্গে ব্যক্তি-চেতনার, হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে কর্তব্যবোধের, বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের, স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে ব্যক্তি-অনুরাগের দ্বন্দ্ব চরিত্রের



অভ্যন্তরে নিয়ত চলতে থাকে। চরিত্রের এই অন্তর্দ্বন্দ্বই নাটকের মূল সংঘাত। যে-কোনো ধরনের নাটকে এই সংঘাত সৃষ্টি করতে হয়।

নাটকে অ্যাকশন বা গতিবেগ সৃষ্টির অপর কৌশল হচ্ছে ঘটনা ও চরিত্র সন্নিবেশে আকস্মিকতার আমদানি করা। রঙ্গ-মঞ্চের অপ্রকাশ্য তিন দিক থেকে চরিত্রের আগমন-নির্গমন বিষয়ে দর্শকের কোনো ধারণা থাকে না বলে নাট্যকার এখানে আকস্মিকতা সৃষ্টির সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন।

আকস্মিকতার মতো Suspense বা উৎকর্ষাও নাটকের জন্য অপরিহার্য বিষয়। এই উৎকর্ষার জন্যই দর্শক পুরো সময় ধরে গভীর বিস্ময় ও উত্তেজনা নিয়ে নাট্যাভিনয় উপভোগ করে থাকেন। নাটকে একটি উৎকর্ষা তৈরির কিছুক্ষণ পর তার উত্তেজনা শেষ হয়ে যায়। অতঃপর পুনরায় নতুন পরিস্থিতির মাধ্যমে নতুন উৎকর্ষা সৃষ্টি করা হয়। এভাবে সাসপেন্স বা উৎকর্ষা নাটকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। উৎকর্ষা আছে বলেই নাটকের সঙ্গে দর্শক শ্রোতার এক অদৃশ্য সেতুবন্ধ তৈরি হয়।

নাটকীয় অ্যাকশন বা গতিবেগ সৃষ্টির একটি বিশেষ উপায় হলো dramatic irony বা নাট্যশ্লেষ নির্মাণ। ‘শ্লেষ’ অলঙ্কারে যেমন একটি শব্দের দ্বিবিধ অর্থ থাকে, নাট্যশ্লেষেও তেমনি ঘটনা ও সংলাপের মধ্যে নাট্যকার সুকৌশলে দ্ব্যর্থতার সৃষ্টি করেন। নাট্যশ্লেষ দর্শকদের মনে কৌতুক, ব্যঙ্গ ও বেদনা- এসব অনুভূতির উদ্রেক করতে পারে। তাই ট্রাজেডি, কমেডি বা যে-কোনো ধরনের নাটকেই আমরা নাট্যশ্লেষ লক্ষ্য করি।

নাটকের আঙ্গিক ও উপাদান

নাটকের সঙ্গে দর্শক ও শ্রোতার সম্পর্ক সরাসরি ও প্রত্যক্ষ। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা মানুষ একাকী যখন ও যেভাবে ইচ্ছা উপভোগ করতে পারে, কিন্তু নাটক উপভোগ করতে হয় নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে এবং সম্মিলিতভাবে। এ জন্যে অন্যান্য সাহিত্য শাখা থেকে নাটকের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল সম্পূর্ণ আলাদা এবং বিশেষ নিয়ম-নীতি দ্বারা সুনির্দিষ্ট।

প্রতিটি নাটকের মধ্যে চারটি প্রধান উপাদান থাকে। এগুলো হচ্ছে—

১. কাহিনি বা বিষয়
২. চরিত্র
৩. সংলাপ
৪. পরিবেশ।

একজন নাট্যকারকে নাটক রচনার সময় এ-চারটি উপাদানের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হয়। প্রতিটি নাটকে একটি নির্দিষ্ট কাহিনি থাকে। মানবজীবন মূল অবলম্বন হলেও মানুষের সম্পূর্ণ জীবন নাটকে উপস্থাপিত হয় না। জীবনের বিশেষ কোনো ঘটনা বা বিষয়কে অবলম্বন করে নাট্যকার নাটক রচনা করেন। নাট্যকারকে সব সময় মনে রাখতে হয় যে, নাটক নির্দিষ্ট একটি মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রী দ্বারা অভিনীত হবে। তাই কাহিনির মধ্যে এমন কিছু আনা যাবে না, যা মঞ্চের উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। এছাড়া নাটকের অভিনয় সাধারণত ৬০ থেকে ৯০ মিনিট, কিংবা সর্বোচ্চ ১২০ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে থাকে। তাই কাহিনি এতোটা বড় করা যায় না, যা অভিনীত হতে এর চেয়ে বেশি সময় প্রয়োজন হয়।

কাহিনিকে সাজাতে হলে চরিত্রের প্রয়োজন। কারণ বিশেষ বিশেষ চরিত্র ছাড়া নাটকের কাহিনি দাঁড়াতে কীভাবে? তাই নাট্যকারকে প্রথমেই কতিপয় চরিত্র নির্বাচন করতে হয়। নাটকে একটি, কখনো বা দুটি প্রধান চরিত্র থাকে। প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করেই নাট্যঘটনা বিকশিত হয়। কিন্তু প্রধান চরিত্র তো একা একা কথা বলতে পারে না। তাই তার সঙ্গে সঙ্গে আসে আরও কিছু চরিত্র। এরা সবাই মিলে নাটকের কাহিনিকে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। পৃথিবীর যে-কোনো সমস্যায় কমপক্ষে দুটি পক্ষ থাকে। একপক্ষ বিশেষ একটি কাজকে সমর্থন করে, অন্যপক্ষ করে তার বিরোধিতা। এ দু’পক্ষের দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মধ্য দিয়েই নাট্যকাহিনিতে চরিত্র বিকশিত হয়। ট্রাজেডির চরিত্র কেমন হবে সে সম্পর্কে এ্যারিস্টটল যা বলেছেন, তা মূলত সকল নাটকের চরিত্র সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তাঁর মতে, চরিত্রের থাকতে হবে নিম্নোক্ত গুণাবলি—

- ক. নাটকের চরিত্রের মাঝে ভাল ও মন্দের সমাবেশ থাকবে;
- খ. নাটকের চরিত্রকে হতে হবে যথাযথ;
- গ. নাটকের চরিত্রকে হতে হবে বাস্তব;
- ঘ. নাটকের চরিত্রকে হতে হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।



নাটকের মধ্যে অনেক চরিত্র থাকতে পারে, কিন্তু নাটকের গতি প্রধানত একটি কি দুটি প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়। প্রধান চরিত্রের উপরই নাটকের সার্থকতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। তাই প্রধান চরিত্র রূপায়ণে নাট্যকারকে দক্ষতার পরিচয় দিতে হয়।

কাহিনি আর চরিত্র তো পাওয়া গেল, এখনো কিন্তু নাটক হলো না। কারণ চরিত্রগুলো এখনো কথা বলতে পারছে না। কথা বলার জন্য চাই সংলাপ। সংলাপ কাহিনি ও চরিত্রকে সুস্পষ্ট করে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। এক চরিত্রের সঙ্গে অন্য চরিত্রের সংলাপ বিনিময়ের মধ্য দিয়েই নাট্যকাহিনি বিকশিত হয়। বহুত সংলাপের মাধ্যমে তিনটি বিশেষ প্রয়োজন সাধিত হয়। এগুলো হচ্ছে—

ক. নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশ ও প্রমাণ করার জন্য সংলাপ;

খ. চরিত্রসমূহের প্রকাশ ও বিকাশের জন্য সংলাপ;

গ. নাটকের দ্বন্দ্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সংলাপ।

সংলাপ নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সংলাপের মাধ্যমেই নাট্য পরিস্থিতি নির্মিত হয়। সংলাপ ব্যর্থ হলে, নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। গল্প বা উপন্যাসে বর্ণনার অবকাশ আছে, সেখানে গল্পকার বা উপন্যাসিকও কথা বলতে পারেন। কিন্তু নাটকে সে সুযোগ থাকে না। নাট্যকারকে এখানে সংলাপের মাধ্যমেই সব কাজ করতে হয়। সংলাপের মাধ্যমেই যেহেতু নাট্যকাহিনি বিকশিত হয়, তাই সংলাপের ভাষা কেবল চরিত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী হলেই চলে না। ভাষার মধ্য দিয়ে আবেগ, দ্বন্দ্ব, উৎকর্ষা প্রভৃতিও ফুটিয়ে তুলতে হয়। সেজন্য সংলাপের শব্দপ্রয়োগ, বাক্যবিন্যাস, বিভিন্ন বাক্যের পারিবারিক সংযোগ ইত্যাদিতেও নাট্যকারকে সতর্ক ও যত্নবান হতে হয়। সংলাপের ভাষা অবিকল বাস্তব হলে চলে না। সংলাপের ভাষা হলো শিল্পের ভাষা। তাই সংলাপের ভাষাকে একটু সাজিয়ে, বর্ণ ও সুরের সমাবেশে ফুটিয়ে তুলতে হয়।

নাটকের সংলাপ কখনো গদ্যরীতি, কখনও বা পদ্যরীতি অবলম্বন করে রচিত। নাটকের বিষয়বস্তু এবং নাট্যরসের দাবি অনুযায়ী যে-কোনো একটি রীতি সংলাপে ব্যবহৃত হয়। গ্রিক নাটকের ভাষায় পদ্যরীতি ব্যবহৃত হয়েছে, শেক্সপিয়রের নাটকেও পদ্যরীতির ব্যবহার ঘটেছে। কিন্তু আধুনিককালে আমরা নাটকের সংলাপে সাধারণত গদ্যভাষার ব্যবহারই লক্ষ্য করি। তবে একালেও বিষয়ের প্রয়োজনে অনেক নাটকের সংলাপে পদ্যরীতির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

নাটকের কাহিনি, চরিত্র ও সংলাপকে অর্থবহ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য নাট্যকার পরিবেশ তৈরি করেন। নাচ, গান, শব্দ সংযোজন, আলোকবিন্যাস, কাহিনি অনুযায়ী দৃশ্য ও মঞ্চসজ্জা এবং মঞ্চনির্মাণ কৌশলের মাধ্যমে নাটকের পরিবেশ নির্মাণ করা হয়। পরিবেশ যথাযথ না হলে নাটকের শিল্পগুণ ক্ষুণ্ণ হয়। তাই পরিবেশ নির্মাণের প্রতি নাট্যকারকে খুবই সতর্ক থাকতে হয়। নাট্যকারের এমন কোন পরিবেশ নির্মাণ করা উচিত নয়, যা মঞ্চ উপস্থাপন করা অসম্ভব। এই চারটি উপাদান মিলেই গড়ে ওঠে একটি নাটক। গ্রিক নাটকে কাহিনির প্রাধান্য বেশি, পক্ষান্তরে শেক্সপিয়রের নাটকে দেখি চরিত্রের প্রাধান্য।

নাটকের গঠনকৌশল

নাটকের গঠনকৌশল নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন গ্রিক মনীষী এ্যারিস্টটল। প্রাচীন গ্রিক নাটকগুলো পরীক্ষা করে নাটকের সংগঠন এবং শৈলী সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর মতে, তিনটি বিষয়ের ঐক্যই একটি নাটকের গঠনকৌশলের প্রধান ভিত্তি। এই ঐক্যত্রয় নিম্নরূপ—

১. কালের ঐক্য;

২. স্থানের ঐক্য;

৩. ঘটনার ঐক্য।

কালের ঐক্য বলতে আমরা বুঝি, নাটক যত সময় মঞ্চে অভিনীত হবে, সে সময়ের মধ্যে যা কিছু ঘটা সম্ভব, নাটকে কেবল তা-ই ঘটানো যাবে। অর্থাৎ ঘটনার বিশুদ্ধতা এবং মঞ্চ-যোগ্যতা নাট্যকারকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়। এ্যারিস্টটল বলেছেন, ২৪ ঘন্টার মধ্যে নাট্যকাহিনিকে সীমাবদ্ধ হতে হবে। তবে এ তত্ত্ব আধুনিক কালের নাটকে সর্বাংশে প্রযোজ্য নয়।



স্থানের ঐক্য হলো, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাট্যচরিত্রসমূহ যতটা স্থান পরিবর্তন করতে পারে, নাটকে ততটাই দেখানো যাবে। এর চেয়ে বেশি স্থানান্তর নাটকের জন্য অপ্রয়োজনীয়। নাটকে এমন কোনো স্থানের উল্লেখ থাকতে পারবে না, যেখানে নাট্য নিদেশিত সময়ের মধ্যে চরিত্রসমূহ যাতায়াত করতে পারে না।

ঘটনার ঐক্য হলো, নাটকে এমন কোনো ঘটনা দেখানো যাবে না, যা মূল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। এয়ারিস্টটলের মতে, অপ্রয়োজনীয় ঘটনার সমাবেশ নাটকের শিল্পগুণ নষ্ট করে। ঘটনার ঐক্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাশ লিখেছেন “নাটকে এমন কোনো দৃশ্য বা চরিত্র সমাবেশ থাকিবে না, যাহাতে মূল সুর ব্যাহত হইতে পারে। সমস্ত চরিত্র ও দৃশ্যই নাটকের মূল বিষয় ও সুরের পরিপোষক রূপে প্রদর্শিত হওয়া চাই।”

ওপরের তিন ধরনের ঐক্যের মধ্যে এয়ারিস্টটল তাঁর On the Art of Poetry গ্রন্থে ঘটনার ঐক্যের ওপরেই সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, ঘটনার ঐক্যের প্রতি নাট্যকারকে খুবই মনোযোগী থাকতে হয়। আধুনিক কালে এই ত্রিমাত্রিক ঐক্যের সঙ্গে নতুন এক প্রকার ঐক্য আমরা কোনো কোনো নাটকে লক্ষ্য করি। একে বলা হয় চরিত্রের একত্ব। একটি মাত্র চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নাটকেই আমরা এই ঐক্য দেখতে পাই। এ ধরনের নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বিনি পয়সার ভোজ’, নুরুল মোমেনের ‘নেমেসিস’, আব্দুল্লাহ আল মামুনের ‘কোকিলারা’, ইউজিন ও নীল-এর ‘দি ব্রেক ফাস্ট’, জাঁ ককতুর ‘দি হিউম্যান ভয়েস’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মূল নাট্যকাহিনিকে এয়ারিস্টটল আদি, মধ্য এবং অন্ত্য- এই তিন পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। একই সঙ্গে ঐ তিনটি পর্যায়ের মধ্যে তিনি অখণ্ড সমন্বয়ের কথাও বলেছেন। নাট্যকাহিনি বিকাশের ক্রমকে অনুসরণ করেই আদি, মধ্য ও অন্ত্য পর্ব বিবেচনা করা হয়। খুব সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি— নাট্যসমস্যার উপস্থাপনা, চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচন এবং মূল সমস্যায় অনুপ্রবেশের পূর্বাবস্থা হলো আদি পর্যায়। মধ্য পর্যায়ে নাট্যদ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়ে ওঠে এবং মূল সঙ্কটের একটি চূড়ান্ত নাট্যমুহূর্ত নির্মিত হয়। অন্ত্যপর্বে অতি দ্রুত কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটে। এয়ারিস্টটলের মতে, নাট্যকাহিনির এই তিন পর্বের মধ্যে গভীর ঐক্য ও সমন্বয় থাকা প্রয়োজন।

এখানে একটি কথা আপনার মনে রাখা প্রয়োজন, উপরের তিনটি ঐক্যের মধ্যে স্থান ও কালের ঐক্য মেনে নিয়ে নাটক রচনা রীতিমতো দুরূহ কাজ। স্থান ও কালের ঐক্য মেনে চললে নাটকের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। তাই আধুনিক কালের নাটকে আপনি ঐ দু’ধরনের ঐক্য তেমন লক্ষ্য করবেন না। এমনকি উইলিয়ম শেক্সপিয়রও তাঁর নাটকে স্থান ও কালের ঐক্য সর্বদা মেনে চলেননি। তবে ঘটনার ঐক্য নাটকের জন্য অনিবার্য শর্ত। ঘটনার ঐক্য বিনষ্ট হলে নাটক কিছুতেই সার্থক হবে না। মোটকথা, বিষয়ের প্রয়োজনেই নাট্যকারেরা নির্বাচন করে নেন তাঁরা কতটুকু ও কোন মাত্রায় ত্রয়ী ঐক্যনীতি অনুসরণ করবেন। এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কথা হলো, তাঁরা ঐক্যনীতি যেভাবে এবং যতটুকুই মেনে চলেন না কেন, দেখতে হবে মূল নাট্যরস যেন কিছুতেই বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

একটি নাটকের গঠনকে প্রধানত পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। এই পর্বগুলো নিম্নরূপ—

১. কাহিনির আরম্ভ- Exposition [মুখ]
২. কাহিনির ক্রমব্যাপ্তি- Rising action [প্রতিমুখ]
৩. উৎকর্ষ বা চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব- climax [গর্ভ]
৪. গ্রস্থিমোচন- Falling action [বিমর্ষ]
৫. যবনিকাপাত- Conclusion [উপসংহার]

উপর্যুক্ত পাঁচটি পর্যায়কে অবলম্বন করেই রচিত হয় পঞ্চাঙ্গ নাটক। এক-একটি পর্যায় নিয়ে লেখা হয় এক-একটি অঙ্ক। এয়ারিস্টটলের মতে, পঞ্চাঙ্গ নাটকই হচ্ছে আদর্শ নাটক। নাটকের প্রথম অঙ্কে আখ্যানভাগের সূচনা এবং নাট্যিক দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিত বর্ণিত হয়। দ্বিতীয় অঙ্কে আখ্যানের জটিলতা এবং নাট্যদ্বন্দ্ব বিস্তার লাভ করে। তৃতীয় অঙ্কে বর্ণিত হয় ঘটনার ঘনীভূত অবস্থা এবং চরম নাট্যোৎকর্ষ। এখানেই নাট্যদ্বন্দ্বের চূড়ান্ত রূপ বর্ণিত হয়। চতুর্থ অঙ্কে আস্তে আস্তে নাট্য-জটিলতার জট খুলতে থাকে। পঞ্চম অঙ্কে বর্ণিত হয় নাট্যকাহিনির সমাপ্তি বা উপসংহার। একটি পঞ্চাঙ্গ নাটকের কাহিনিধারা অনুসরণ করলে উপর্যুক্ত পঞ্চাঙ্গ নাটকের বিভাজন অনুধাবন করা আপনার কাছে সহজ হতে পারে। এ উদ্দেশ্যে আমরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত নাটক ‘সাজাহান’-এর কাহিনিক্রম বিশ্লেষণ করতে পারি। ‘সাজাহান’ নাটকের অঙ্ক-বিভাজন নিম্নরূপ—



প্রথম অঙ্ক : দিল্লীর সিংহাসন লাভের জন্য সাজাহানের পুত্রদের মাঝে বিদ্রোহ। বিদ্রোহ দমন করে বিজয়ী ঔরঙ্গজেব আত্মায় প্রবেশ করে বৃদ্ধ পিতা সাজাহানকে বন্দী করেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক : ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মোরাদকে বন্দি করেন। পরাজিত দারা রাজপুতানার মরুভূমিতে সপরিবারে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকেন। ঔরঙ্গজেব কর্তৃক সুজার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ।

তৃতীয় অঙ্ক : গুজরাটের সুবেদার সাহাবাজের দারার পক্ষ অবলম্বন। ঔরঙ্গজেব যশোবন্ত সিংহকে গুজরের সুবেদারির লোভ দেখিয়ে দারার পক্ষ থেকে সরিয়ে আনা।

চতুর্থ অঙ্ক : পরাজিত ও ধৃত দারাকে ঔরঙ্গজেব কারাদণ্ড প্রদান করেন। জিহন খাঁ দারার ছিন্নমুণ্ড এনে ঔরঙ্গজেবকে উপহার প্রদান করেন।

পঞ্চম অঙ্ক : দারার পুত্র সোলেমান বন্দি হলেন। সুজা আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দারার মৃত্যুতে সাজাহানের উন্মাদ অবস্থা। অনুতাপদগ্ধ ঔরঙ্গজেব পিতা সাজাহানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বৃদ্ধ পিতা মাতৃহীন পুত্রকে ক্ষমা করলেন এবং এভাবে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

এয়ারিস্টটল পঞ্চাঙ্ক নাটকের কথা বললেও, আধুনিক কালে উপর্যুক্ত পাঁচটি পর্যায় পাঁচের চেয়ে কম অঙ্কে ধারণ করেও নাটক রচিত হচ্ছে। আধুনিক নাট্যকারেরা তিন অঙ্কে নাটক রচনা করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কখনো বা এক অঙ্কের পরিসরেই পাঁচটি পর্যায়কে ধারণ করে উৎকৃষ্ট নাটক লেখা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রক্তকরবী’ এবং নুরুল মোমেনের ‘নেমেসিস’ নাটকের কথা বলতে পারি। এক অঙ্ক এবং এক দৃশ্যে রচিত হলেও উপর্যুক্ত নাট্যদ্বয়ে অদৃশ্য পঞ্চাঙ্গ (পাঁচটি পর্যায়) সহজেই নির্দেশ করা যায়।

নাটকের মূল লক্ষ্য হলো নাট্যকাহিনির বিকাশ ও চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাত নির্মাণ। এদিকে লক্ষ রেখেই নাট্যকার তাঁর নাটকের সংগঠন নির্মাণ করেন। অঙ্ক ভাগের গাণিতিক হিসেব দিয়ে জীবনের হিসেব সর্বদা মেলে না। তাই সৃজনশীল নাট্যকার প্রায়শই নতুন নতুন গঠনশৈলী নির্মাণ করে নাট্যসাহিত্যের বিকাশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখেন।

নাটকের শ্রেণিবিভাগ

আপনি নিশ্চয়ই অনেক নাটক দেখেছেন; কখনো রেডিওতে নাটক শুনেছেন, কখনো টেলিভিশনে নাটক উপভোগ করেছেন, কখনো-বা বিশেষ কোনো নাট্যগ্রন্থ পাঠ করেছেন। আপনার দেখা শোনা বা পাঠ করা সবগুলো নাটকই কি একই ধরনের? নিশ্চয়ই নয়। কোনো নাটক দেখে আপনি হেসেছেন, কখনো কেঁদেছেন, কখনো পেয়েছেন আনন্দ, কখনো বা বেদনায় হয়েছেন বিমর্ষ। কোনো কোনো নাটকে আপনি সমাজের বিশেষ কোনো ঘটনা বা চিত্র দেখেছেন; কোথাও বা দেখেছেন ঐতিহাসিক কোনো চরিত্রের বিজয়কাহিনি কিংবা তার পতন ও পরাভবের ইতিহাস। এসব কারণে নাটককে আমরা কতগুলো ভাগে বিভক্ত বা শ্রেণিবদ্ধ করতে পারি; আবার রসের বিচারে নাটককে ট্র্যাজেডি, কমেডি, ফার্স (প্রহসন) ইত্যাদি ভাগে বিন্যস্ত করতে পারি। বিভিন্ন ধরনের মাপকাঠির আলোকে নাটককে যে সব শ্রেণিতে বিভক্ত করা সম্ভব, তার একটা ছক নিচে দেওয়া হলো—

মাপকাঠি	নাটকের শ্রেণিবিভাগ				
ভাব অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	ক্ল্যাসিকাল	রোমান্টিক	বাস্তববাদী	-	-
বিষয় অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	পৌরাণিক	ঐতিহাসিক	সামাজিক	চরিত্রমূলক	-
রস অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	ট্র্যাজেডি	কমেডি	মেলোড্রামা	ট্র্যাজিকমেডি	প্রহসন
উদ্দেশ্য অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	সমস্যামূলক	রূপকনাট্য	সাম্প্রতিক	অভিব্যক্তিবাদী	অ্যাবসার্ড
রূপ অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	লোকনাট্য	গীতিনাট্য	নৃত্যনাট্য	মহাকাব্যিক	পথনাটক
আয়তন অনুসারে শ্রেণিবিভাগ	পাঁচ অঙ্কের নাটক	চার অঙ্কের নাটক	তিন অঙ্কের নাটক	দুই অঙ্কের নাটক	এক অঙ্কের নাটক

আপনি ইচ্ছা করলে আরো কিছু মাপকাঠি প্রয়োগ করে নাটককে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন। যেমন, প্রচারমাধ্যম বা অভিনয় স্থল অনুসারে আপনি নাটককে তিন ভাগে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেন— বেতার নাটক, টেলিভিশন নাটক, মঞ্চ নাটক ইত্যাদি।



উপরের শ্রেণিবিভাগের মধ্যে ট্র্যাজেডি নাটক সম্পর্কে এখানে বিস্তৃতভাবে আপনার জানা প্রয়োজন। কেননা, আপনার পাঠ্যসূচিভুক্ত ‘সিরাজউদ্দৌলা একটি ট্র্যাজেডি নাটক। ট্র্যাজেডি হিসেবে ‘সিরাজউদ্দৌলা’ কতটুকু সার্থক, তা বিবেচনা করতে হলে ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে।

অন্তর্দর্শ এবং বহির্দর্শে পরাভূত মানবজীবনের করুণ কাহিনিকে সাধারণত ট্র্যাজেডি বলা হয়। এ জাতীয় নাটকে নায়কের বিশেষ কোনো মানস প্রবণতা কিংবা ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা সামান্য ভুল-ভ্রান্তির জন্য জীবনে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় দেখা দেয়; কখনো-বা দৈব এবং অদৃষ্ট পীড়িত হয়ে তাকে মেনে নিতে হয় করুণ পরিণতি। ট্র্যাজেডি নাটকের নায়ক অন্তর্দর্শ এবং বহির্দর্শে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হন এবং অবশেষে তার জীবনে নেমে আসে ভয়াবহ করুণ পরিণতি। গ্রিক মনীষী এ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে লিখেছেন—

Tragedy, then, is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of action, not of narrative; through pity and fear effecting the proper purgation of these emotions.

এ্যারিস্টটলের এই সংজ্ঞার্থ থেকে ট্র্যাজেডি নাটকের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমরা শনাক্ত করতে পারি—

১. ট্র্যাজেডি কোনো গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিজাত কর্মের অনুকরণ। এ ধরনের নাটকের ঘটনা হবে সুগভীর ও পূর্ণাবয়ব।
২. ট্র্যাজেডিতে কোনো সাক্ষরক জীবন ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্তর্দর্শ বহির্দর্শের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়।
৩. ভাবগৌরবে, শব্দচয়নে এবং সঙ্গীত-সংযোগে ট্র্যাজেডির বহির্দর্শ প্রসাধিত হয়।
৪. নাটকীয়, বিচিত্র ঘটনাধারা হবে একক পরিণামমুখী (unity of action)।
৫. ট্র্যাজেডি ঘটনাত্মক, বর্ণনাত্মক কাহিনি নয়।
৬. ট্র্যাজেডি দর্শনে দর্শকচিত্তে করুণা ও ভীতি সঞ্চারিত হয় এবং অন্তিমে এর নিরসন (Purgation) ঘটে।

ট্র্যাজেডি মানবজীবনের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত আলোড়িত করে দর্শকচিত্তে করুণা ও ভীতিতে পূর্ণ করে দেয়। এখানে মানবজীবনের নিদারুণ ব্যর্থতা ও অসহায়তার কথা ফুটে ওঠে সন্দেহ নেই, কিন্তু কোনো শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিই জীবনের প্রতি বিদ্রোহ সৃষ্টি করে না। ট্র্যাজেডি দর্শনে মানুষ তার সম্ভাবনার কথা জানতে পারে। তাই ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা থাকলেও, ট্র্যাজেডি দেখে মানুষ আনন্দ পায়।

নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ

খ্রিষ্টপূর্ব কাল থেকেই গ্রিস দেশে নাট্যচর্চার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা জানা যায়। পেরিক্লিসের গ্রিসে এবং পরবর্তীকালে এলিজাবেথের ইংল্যান্ডে নাট্যচর্চায় ব্যাপক সমৃদ্ধি এসেছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষেও সংস্কৃত নাটক খুব সমৃদ্ধ ছিল। বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই নাট্যচর্চা আছে। আদিকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীর বিখ্যাত নাটক ও তাঁর রচয়িতাদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো—

নাট্যকার	সময়কাল	দেশ	প্রধান নাটকের নাম
ইসকাইলাস	খ্রি.পূ. ৫২৫-খ্রি.পূ. ৪৫৬	গ্রিস	প্রমিথিউস বাউন্ড
সফোক্লিস	খ্রি.পূ. ৪৯৬-খ্রি.পূ. ৪০৬	গ্রিস	দি কিং ইডিপাস
ইউরিপিডিস	খ্রি.পূ. ৪৮৪-খ্রি.পূ. ৪০৬	গ্রিস	ইলেকট্রা
এ্যারিস্টোফেনিস	খ্রি.পূ. ৪৪৮-খ্রি.পূ. ৩৪৮	গ্রিস	দি ফ্লেগস্
সেনেকা	খ্রি.পূ. ৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দ	ইতালি	ফিয়েড্রা
ভবভূতি	খ্রিস্টীয় ২য় শতক	ভারত	স্বপ্ন-বাসবদত্তা
কালিদাস	খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতক	ভারত	অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্
শেক্সপিয়ার	১৫৬৪-১৬১৬	ইংল্যান্ড	হ্যামলেট, ম্যাকবেথ
মলিয়ার	১৬২২-১৬৭৩	ফ্রান্স	লে বুর্জোয়া



নাট্যকার	সময়কাল	দেশ	প্রধান নাটকের নাম
রাসিন	১৬৩৯-১৬৯৯	ফ্রান্স	এ্যাড্রোমেকি
গ্যেটে	১৭৪৯-১৮৩২	জার্মানি	ফাউস্ট
ইবসেন	১৮২৮-১৯০৬	নরওয়ে	দি ডলস্ হাউস
স্ট্রিন্দবার্গ	১৮৪৯-১৯১২	সুইডেন	দি ড্রিম প্লে
অস্কার ওয়াইল্ড	১৮৫৬-১৯০০	ইংল্যান্ড	সালোমি
বার্নার্ড শ	১৮৫৬-১৯৫০	ইংল্যান্ড	ম্যান এ্যান্ড সুপারম্যান
চেখভ	১৮৬০-১৯০৪	রাশিয়া	দি চেরি অরচার্ড
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৬১-১৯৪১	ভারতবর্ষ	বিসর্জন, রক্তকরবী
ইউজিন ও'নিল	১৮৮৮-১৯৩৫	আমেরিকা	দি এম্পেরার জোনস্
লোরকা	১৮৯৮-১৯৩৬	স্পেন	ব্লাড ওয়েডিং
বুদ্ধদেব বসু	১৯০৮-১৯৭৪	ভারতবর্ষ	তপস্বী ও তরঙ্গিনী
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	১৯২২-১৯৭১	বাংলাদেশ	তরঙ্গ-ভঙ্গ

ওপরের তালিকা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান নাট্যকার সম্পর্কে আপনি ধারণা লাভ করতে পারবেন।

বাংলা নাটকের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের। তবে আধুনিক অর্থে যাকে আমরা নাটক বলি, বাংলা ভাষায় তা প্রথম পাই আজ থেকে দুশো বছর আগে। ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর কলকাতার বেঙ্গলি থিয়েটার-এ মঞ্চস্থ হয় প্রথম বাংলা নাটক 'কাল্পনিক সংবদল'। এটি কোনো মৌলিক নাটক নয়, অনুবাদ নাটক। রুশদেশীয় যুবক গেরাসিম স্তেপানভিচ্ লেবেদেফ ইংরেজি নাটক 'দ্য ডিসগাইজ' বাংলায় রূপান্তর করে লেখেন 'কাল্পনিক সংবদল'। এ সময় লেবেদেফ 'লাভ ইজ দ্য বেস্ট ডক্টর' নামে আরও একটি কৌতুক নাটক অনুবাদ করেন। এ নাটকটিও কলকাতার বেঙ্গলি থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। নাটকদ্বয় বাংলায় রূপান্তর করতে গিয়ে লেবেদেফ পণ্ডিত গোলকনাথ দাসের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। ১৭৯৫ সালে রুশীয় যুবক লেবেদেফের এই সাহসী উদ্যোগের পর ধীরে ধীরে বাংলা নাটক বিকশিত হতে শুরু করে।

১৭৯৫ সালে প্রথম বাংলা নাটকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির নানা শাখায় বিপুল পরিমাণ নাট্য উপাদান বহু পূর্ব থেকেই বিরাজমান ছিল। মঙ্গলকাব্য, লোকসঙ্গীত, পালাগান, গাজীর গান, কবিগান, গম্ভীরা গান, ময়মনসিংহ গীতিকা প্রভৃতির মধ্যে বাংলা নাটকের নানা উপাদান পাওয়া যায়। লোকনাটকের অন্যতম উপাদান নৃত্য এবং গীতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যের এসব নিদর্শনে। কালক্রমে এসব উপাদান থেকেই আধুনিক যুগের বাংলা নাটকের উদ্ভব ঘটেছে।

১৮৫২ সালে রচিত তারাচাঁদ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'কেই বাংলাভাষার প্রথম মৌলিক নাটক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এরপর দীর্ঘ দেড়শত বছরে বাংলা নাটক নানাভাবে বিচিত্র মাত্রায় বিকশিত হয়েছে, রচিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য বহু নাটক। বাংলা নাটকের এই বিকাশধারাকে আমরা নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করতে পারি—

- ক. সামাজিক নাটক
- খ. ঐতিহাসিক নাটক
- গ. পৌরাণিক নাটক
- ঘ. রূপক-সাম্প্রতিক নাটক
- ঙ. প্রহসন ও কৌতুক নাটক
- চ. গণনাট্যধারা
- ছ. কাব্যনাটক।

সামাজিক নাটকের ধারায় উল্লেখযোগ্য নাট্যকার এবং তাঁদের প্রধান দু'একটি নাটকের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো—



নাট্যকার	নাটক
রামনারায়ণ তর্করত্ন দীনবন্ধু মিত্র মীর মশাররফ হোসেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অমৃতলাল বসু গিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	কুলীনকুল সর্বস্ব নাটক নীলদর্পণ, সধবার একাদশী জমীদার দর্পণ অলীক বাবু ব্যাপিকা বিদায় প্রফুল্ল পুনর্জন্ম

উপর্যুক্ত তালিকা ছাড়াও আরও অনেক নাট্যকারের সাধনায় বিকশিত হয়েছে বাংলা সামাজিক নাটকের ধারা। কিন্তু আমরা সকলের নাম উল্লেখ করিনি। বলাই বাহুল্য উপরের তালিকাটি একটি নমুনা মাত্র।

বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের ধারায় প্রধান নাট্যকারদের নাম তাঁদের প্রধান রচনার নামসহ নিচে উল্লেখ করা হলো—

নাট্যকার	নাটক
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	কৃষ্ণকুমারী নাটক
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	সিরাজদ্দৌলা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	প্রায়শ্চিত্ত
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, নূরজাহান
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	সিরাজদ্দৌলা, গৈরিক পতাকা
মহেন্দ্র গুপ্ত	টিপু সুলতান, মহারাজা নন্দকুমার

পৌরাণিক নাটক রচনায় যঁারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁরা হচ্ছেন— গিরিশচন্দ্র ঘোষ (‘বিল্বমঙ্গল’, ‘জনা’), অমৃতলাল বসু (‘হরিশচন্দ্র’), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (‘সীতা’), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (‘নর-নারায়ণ’), মনুথ রায় (‘কারাগার’) প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একক সাধনায় গড়ে উঠেছে বাংলা রূপক-সাম্প্রতিক নাটকের ধারা। এই পর্যায়ে তাঁর ‘অচলায়তন’, ‘মুক্তধারা’, ‘ডাকঘর’, ‘রক্তকরবী’ প্রভৃতি নাটকের নাম উল্লেখ করা যায়। বাংলা প্রহসন ও কৌতুক নাটক রচনায় যঁারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, গ্রন্থনামসহ তাঁদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো—

নাট্যকার	নাটক
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	একেই কি বলে সভ্যতা, বুড় সালিকের ঘাড়ে রৌঁ
দীনবন্ধু মিত্র	কমলে কামিনী
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	কিঞ্চিৎ জলযোগ
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	কঙ্কি-অবতার, বিরহ
অমৃতলাল বসু	তাজ্জব ব্যাপার
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	আলিবাবা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	চিরকুমার সভা, বৈকুণ্ঠের খাতা

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলা গণনাট্যধারার সূত্রপাত। সাধারণ মানুষকে প্রগতিশীল চেতনায় উদ্বুদ্ধ করাই ছিল এই ধরনের নাটক লেখার মৌল উদ্দেশ্য। এই নাট্যকারের ধারার মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য (‘নবান্ন’),



‘আগুন’, জবানবন্দী), বিনয় ঘোষ (‘ল্যাবরেটরি’), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (‘হোমিওপ্যাথি’), সুনীল চট্টোপাধ্যায় (‘কেরানী’), বিধায়ক ভট্টাচার্য (‘আঁঠার পথে’), তুলসী লাহিড়ী (‘ছেঁড়াতার’) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ধারায় কাব্যনাটকের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। কাব্যনাটক রচনায় যাঁরা পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তাঁদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

নাট্যকার	কাব্যনাটক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, কর্ণকুন্তীসংবাদ, মুক্তধারা, রক্তকরবী, ডাকঘর, রথের রশি
আলোক সরকার	মায়াকাননের ফুল, সিঁড়ি
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	উত্তরমেঘ, শেষ গ্রহর
বুদ্ধদেব বসু	তপস্বী ও তরঙ্গিনী, কালসন্ধ্যা, প্রথম পার্থ, সংক্রান্তি

উপরের আলোচনার সূত্র ধরে বাংলা সাহিত্যের প্রধান নাট্যকার ও তাঁদের প্রধান প্রধান রচনার নাম প্রকাশকালসহ একটি ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারি। বলাই বাহুল্য, এ-ছক একটা নমুনা মাত্র। তবে এ ছকের সাহায্যে বাংলা নাটক সম্পর্কে আপনি একটা ধারণা লাভ করতে পারবেন—

নাট্যকার	নাটকের নাম	প্রকাশকাল
তারাচাঁদ শিকদার	ভদ্রার্জুন	১৮৫২
যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত	কীর্তিবিলাস নাটক	১৮৫২
হরচন্দ্র ঘোষ	ভানুমতি চিত্ত বিলাস	১৮৫৩
রামনারায়ণ তর্করত্ন	কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক	১৮৫৪
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	কৃষ্ণকুমারী	১৮৬০
	একেই কি বলে সভ্যতা	১৮৬০
দীনবন্ধু মিত্র	নীলদর্পণ	১৮৬০
	সধবার একাদশী	১৮৬০
মনোমোহন বসু	সতী	১৮৭৩
মীর মশাররফ হোসেন	বসন্তকুমারী নাটক	১৮৭৩
	জমিদার-দর্পণ	১৮৭৩
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	পুরুবিক্রম	১৮৭৪
অমৃতলাল বসু	তাজব ব্যাপার	১৮৯৪
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	প্রফুল্ল	১৮৮৯
	জনা	১৮৯৪
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	নূরজাহান	১৯০৮
	সাজাহান	১৯০৯
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	প্রতাপাদিত্য	১৯০৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিসর্জন	১৮৯০
	ডাকঘর	১৯১১
	মুক্তধারা	১৯২১
	রক্তকরবী	১৯২৬



নাট্যকার	নাটকের নাম	প্রকাশকাল
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	সিরাজউদ্দৌলা	১৯৩৮
বিজন ভট্টাচার্য	নবান্ন	১৯৪৪
তুলসী লাহিড়ী	ছেঁড়া তার	১৯৫১
উৎপল দত্ত	কল্লোল	১৯৬৮
বাদল সরকার	এবং ইন্দ্রজিৎ	১৯৬৫

বাংলাদেশের নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ওপরের আলোচনা থেকে আপনি বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান নাট্যকার ও তাঁদের উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম জানতে পেরেছেন। লক্ষ করেছেন উপরের আলোচনায় বাংলাদেশের নাট্যকারদের নাম নেই। বাংলাদেশের নাট্যকারদের অবদান স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার উদ্দেশ্যেই আমরা উপরের আলোচনায় তাঁদের নাম উল্লেখ করিনি। এবার আমরা বাংলাদেশের নাট্যকার ও তাঁদের প্রধান প্রধান নাটকের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে তুলে ধরবো।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পূর্বে বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা। ফলে আমাদের এ অঞ্চলে নাটক তেমন বিকশিত হয়নি। দেশবিভাগের পর থেকেই পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে নাটক রচনায় একটা ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর নাটক রচনা ও নাট্যচর্চায় ব্যাপক রূপান্তর সাধিত হয়। এ সময় গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের কারণে বাংলাদেশের নাটকে লাগে পালা বদলের হাওয়া। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের মৌসুমী নাট্যচর্চার পরিবর্তে নাট্যকর্মীরা নিয়মিত নাটক মঞ্চায়নে উদ্যোগী হলেন, নাট্যকর্মীরা নাটককে গ্রহণ করলেন সমাজবদলের হাতিয়ার হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে নাটক হয়ে উঠলো একটি নিয়মিত শিল্পমাধ্যম। স্বাধীনতার মূলচেতনাকে অর্থবহ করার আন্তর গরজে নাট্যকর্মী ও নাট্যকাররা এগিয়ে এলেন নতুন উদ্যমে এবং এভাবেই বাংলাদেশের নাটক অর্জন করলো নতুন মাত্রা। দেশ কালের দাবিতেই রচিত হলো নতুন নাটক, আবির্ভূত হলেন নতুন নাট্যকার। বাংলাদেশের নাটকের প্রধান বিষয় হয়ে উঠলো মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজমানস। সমাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো বিষয় নাটকে আর স্থান পেল না।

১৯৪৭ সালের পূর্বে বাংলাদেশে প্রধানত ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছে। এই পর্বে বাংলাদেশের প্রধান নাট্যকার ও তাঁদের নাটকের নাম নিম্নে উপস্থাপিত হলো—

নাট্যকার	নাটকের নাম	প্রকাশকাল
আকবরউদ্দিন	সিঙ্গু-বিজয়	১৯৩০
	সুলতান মাহমুদ	১৯৩০
	নাদির শাহ	১৯৫৩
শাহাদাৎ হোসেন	সরফরাজ খাঁ	১৯২১
	আনারকলি	১৯৪৫
	মসনদের মোহ	১৯৪৬
ইব্রাহিম খাঁ	কামালপাশা	১৯২৮
	আনোয়ার পাশা	১৯৩২
ইব্রাহিম খলিল	স্পেন বিজয়ী মুসা	১৯৪৯
শওকত ওসমান	তক্ষর ও লক্ষর	১৯৪৫
	কাঁকরমণি	১৯৪৯

১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশের নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক নাটকের পাশাপাশি সামাজিক নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন।

১৯৪৭ থেকে প্রাক-মুক্তিযুদ্ধ কালখন্ডে যাঁরা নাটক লিখেছেন, তাঁদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো—



নাট্যকার	নাটকের নাম	প্রকাশকাল
নুরুল মোমেন	নেমেসিস	১৯৪৮
মুনীর চৌধুরী	রক্তাক্ত প্রান্তর	১৯৬২
	কবর	১৯৬৬
	চিঠি	১৯৬৬
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	বহির্পীর	১৯৬০
	তরঙ্গভঙ্গ	১৯৬৫
সিকান্দার আবু জাফর	সিরাজউদ্দৌলা	১৯৬৫
	মহাকবি আলাউল	১৯৬৬
সাজ্জিদ আহমদ	কালবেলা	১৯৭৬
	মাইলপোস্ট	১৯৭৬
	তৃষ্ণায়	১৯৭৬
আসকার ইবনে শাইখ	বিদ্রোহী পদ্মা	১৯৫২
	অগ্নিগিরি	১৯৫৯
জিয়া হায়দার	গুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ	১৯৭০

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে বাংলাদেশের নাটকে যে নবতরঙ্গের সূত্রপাত ঘটে, সে কথা পূর্বেই আপনি জেনেছেন। এই সময়ে প্রকাশিত বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যকে প্রধান পাঁচটি শাখায় বিন্যস্ত করা যায়। নাট্যকার ও তাঁদের প্রধান প্রধান নাটকের নাম আমরা পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করছি—

মুক্তিযুদ্ধের নাটক : মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে যারা নাটক লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন— মমতাজউদদীন আহমদ— ‘স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা’ (১৯৭৬), ‘বকুলপুরের স্বাধীনতা’ (১৯৮৬), ‘বিবাহ ও কী চাহ শঙ্খচিল’ (১৯৮৫); সৈয়দ শামসুল হক— ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’; জিয়া হায়দার— ‘সাদা গোলাপে আগুন’ (১৯৮২), ‘পঙ্কজ বিভাস’ (১৯৮২); আলাউদ্দিন আল আজাদ— ‘নিঃশব্দ যাত্রা’ (১৯৭২), ‘নরকে লাল গোলাপ’ (১৯৭৪); মোহাম্মদ এহসানুল্লাহ— ‘কিৎশুক যে মরুতে’ (১৯৭৪); নীলিমা ইব্রাহিম— ‘হে জনতা আরেক বার’ (১৯৭৪) প্রমুখ। উপর্যুক্ত নাটকসমূহে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের নানা খণ্ডচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে— কখনো আবেগী ভাষে, কখনো বা শিল্পিত পরিচর্যায়।

প্রতিবাদের নাটক, প্রতিরোধের নাটক : প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ চেতনাই বাংলাদেশের নাটকের প্রধান প্রবণতা। এ ধারায় উল্লেখযোগ্য নাটকসমূহ হচ্ছে— মামুনুর রশীদে ‘ওরা কদম আলী’ (১৯৭৮), ‘ইবলিস’ (১৯৮২), ‘এখানে নোঙর’ (১৯৮৪), ‘গিনিপিগ’ (১৯৮৬); আবদুল্লাহ আল মামুনের ‘শপথ’ (১৯৭৮), ‘সেনাপতি’ (১৯৮০), ‘এখনও ত্রীতদাস’ (১৯৮৪); মমতাজউদদীন আহমদের ‘সাতঘাটের কানাকড়ি’ (১৯৯১); সেলিম আল দীনের ‘করিম বাওয়ালীর শত্রু বা মূল মুখ দেখা’ (১৯৭৩), ‘কিন্তনখোলা’ (১৯৮৬); রাজীব হুমায়ূনের ‘নীলপানিয়া’ (১৯৯২); আবদুল মতিন খানের ‘মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব’ (১৯৮০); এস.এম সোলায়মানের ‘ইঙ্গিত’ (১৯৮৫) ‘এই দেশে এই বেশে’ (১৯৮৮) ইত্যাদি।

ইতিহাস-ঐতিহ্য পুরাণ, পুনর্মূল্যায়নধর্মী নাটক : মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর কালে ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরাণের অনুষঙ্গে নাটক রচনায় সঞ্চারিত হয় নতুন মাত্রা। এ ধারায় উল্লেখযোগ্য নাটকসমূহ হচ্ছে— সৈয়দ শামসুল হকের ‘নূরলদীনের সারাজীবন’ (১৯৮২); সাজ্জিদ আহমদের ‘শেষ নবাব’ (১৯৮৯); মমতাজউদদীন আহমদের ‘স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা’ (১৯৭৬); সেলিম আল দীনের ‘অনিকেত অন্বেষণ’, ‘শকুন্তলা’ (১৯৮৬) ইত্যাদি।



সামাজিক নাটক : স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের অন্যতম প্রবণতা বিদেশি নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তরকরণ। ১৯৭১ পরবর্তীকালে শেক্সপিয়র, মলিয়ের, মোলনার, বেকট, ইয়োসেনেকো, ব্রেখট, সার্ত, কাম্যু, এ্যালবি প্রমুখ নাট্যকারের নাটক অনূদিত কিংবা রূপান্তরিত হয়েছে। অনুবাদ ও রূপান্তরকরণে যারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন কবীর চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, মমতাজউদ্দীন আহমদ, আলী যাকের, জিয়া হায়দার, খায়রুল আলম সবুজ, আসাদুজ্জামান নূর, আবদুস সেলিম প্রমুখ।

নির্বাচিত নাটক প্রসঙ্গ

সিকান্দার আবু জাফরের ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটক প্রথম প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ১৯৬৫ সালে (পৌষ ১৩৭২)। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও পতনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে আলোচ্য নাটক। ইতিহাসের ধূসর আবর্ত থেকে কাহিনির মৌল উপাদান গৃহীত হলেও, সিকান্দার আবু জাফর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আলোচ্য নাটকে বর্তমান কালের জীবন-জিজ্ঞাসাকে ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে প্রতিস্থাপন করেছেন। তাঁর হাতে পলাশির ইতিহাস পুনর্জীবন লাভ করেছে। বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আর সংগ্রামশীল সত্তা প্রকাশের আগ্রহ থেকেই নাট্যকারের সিরাজউদ্দৌলা স্মরণ। ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের ভূমিকায় সিকান্দার আবু জাফরের অভিমত এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়—

“জাতীয় জাগরণের প্রয়োজনে উদ্দীপনার প্রেরণা হিসেবে সিরাজউদ্দৌলা জাতীয় বীরের আসন লাভ করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক নায়ক রূপে সিরাজউদ্দৌলা আজ সর্বজনপ্রিয় চরিত্র। এই সাফল্যের পথ প্রসারিত হয়েছে জাতীয় নাট্যন্দোলনের মাধ্যমে।

জাতীয় চেতনা নতুন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। কাজেই নতুন মূল্যবোধের তাগিদে ইতিহাসের বিভ্রান্তি এড়িয়ে জাতীয় প্রেরণার উৎস হিসেবে সিরাজউদ্দৌলাকে আমি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি। একান্তভাবে প্রকৃতই ইতিহাসের কাছাকাছি থেকে এবং প্রতি পদক্ষেপে ইতিহাসকে অনুসরণ করে আমি সিরাজউদ্দৌলার জীবননাট্য পুনর্নির্মাণ করেছি। ধর্ম এবং নৈতিক আদর্শে সিরাজউদ্দৌলার যে অকৃত্রিম বিশ্বাস, তাঁর চরিত্রের যে দৃঢ়তা এবং মানবীয় সদগুণগুলিকে চাপা দেবার জন্য ঔপনিবেশিক চক্রান্তকারীরা ও তাদের স্বার্থান্ধ স্তাবকেরা অসত্যের পাহাড় জমিয়ে তুলেছিল, এই নাটকে প্রধানত সেই আদর্শ এবং মানবীয় গুণগুলিকেই আমি তুলে ধরতে চেয়েছি।”

নাট্যকারের উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকেই আপনি অনুধাবন করতে পারবেন কেন তিনি সিরাজউদ্দৌলার ইতিহাসখ্যাত কাহিনি নিয়ে আলোচ্য নাটকটি লিখেছেন। সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরা যেসব কলঙ্ক লেপন করতে চেয়েছিল, সিকান্দার আবু জাফর সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের কথা বলতে গিয়ে সে কলঙ্ককে মোচনের চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসকে অবলম্বন করে তিনি নতুন করে ইতিহাস লেখেননি, বরং নির্মাণ করেছেন কালজয়ী সাহিত্য। ১৯৬৫ সালে আইয়ুবী শাসনের যাতাকলে পূর্ববাংলার মানুষ যখন দিশেহারা, তখন সিকান্দার আবু জাফরের এই নাটক রচনা ভিন্নতর মাত্রা নির্দেশকও বটে। তিনি চেয়েছেন সিরাজউদ্দৌলার শক্তি আর সাহস আর দেশপ্রেমকে পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে, যাতে তারা সজ্জবদ্ধভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারে। এই সূত্রে আলোচ্য নাটক রচনা ও প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি সাহসী কর্ম।

সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও পতনকে নিয়ে সিকান্দার আবু জাফরের পূর্বে এবং পরে একাধিক নাট্যকার নাটক রচনা করেছেন। বর্তমান আলোচনায় সে সব নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানও এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে আপনার জানা প্রয়োজন।

সিরাজউদ্দৌলার ট্র্যাজিক ইতিহাস নিয়ে প্রথম নাটক রচনা করেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁর নাটক প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ই (১৯০৫) তিনি এই নাটক রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই নাটকেও গিরিশচন্দ্র সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রে আরোপিত কলঙ্কমোচনের চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় তাঁর অভিমত— ‘বিদেশি ইতিহাসে সিরাজ চরিত্র বিকৃত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সুধিগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশি ইতিহাস খণ্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপ চিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন।’ এভাবে সিরাজ-চরিত্র গিরিশচন্দ্র ঘোষের হাতে নতুন মহিমা ও মর্যাদা নিয়ে আবির্ভূত হলো।

সিরাজউদ্দৌলার ট্র্যাজিক পরিণতি নিয়ে সবচেয়ে মধুসফল ও বহুল পঠিত নাটক রচনা করেছেন শচীন সেনগুপ্ত। বস্তুত, শচীন সেনগুপ্তের ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকই বাংলার রঙ্গমঞ্চে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাটক। শচীন সেনগুপ্তের নাটক প্রথম প্রকাশিত



হয় ১৯৩৮ সালে। নাটকে ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে নাট্যকার নিপুণতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন কল্পনার সত্যকে। এখানে নাট্যকার সিরাজ চরিত্রকে বাঙালি জাতির নায়করূপে নির্মাণ করেছেন।

সিকান্দার আবু জাফরের পরে সিরাজউদ্দৌলা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য নাটক লিখেছেন সাঈদ আহমদ। সাঈদ আহমদের ‘শেষ নবাব’ প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালে। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন- ‘সিরাজউদ্দৌলাকে আমি নবরূপে উপস্থাপন করতে চেয়েছি। নতুন কিছু বলবারও চেষ্টা করেছি।’ আলোচ্য নাটকে সাঈদ আহমদ ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে নিহত সিরাজউদ্দৌলার পতনের মৌল কারণ তুলে ধরেছেন। ফলে ইতিহাসের অনেক তথ্য তিনি বাদ দিয়েছেন, ইতিহাস সন্ধান করে পরিবেশন করেছেন প্রকৃত সত্য। সাঈদ আহমদের ‘শেষ নবাব’ নাটক প্রসঙ্গে কবি শামসুর রাহমানের মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন-

“আরেকটি কথা। ‘শেষ নবাবের’ পাণ্ডুলিপি পড়তে পড়তে বারবার আমার মনে পড়েছে সমকালীন বাংলাদেশের কথা। আর সবকিছু ছাপিয়ে সিরাজউদ্দৌলার অন্তরালে এক অতিকায় ছায়ার মতো জেগে রয়েছেন সেই মহানায়ক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাঁর নাম। সৎ সাহিত্যের একটি গুণ এই যে, তা কোনো বিশেষ কালে সীমাবদ্ধ থাকে না।”

ওপরের আলোচনায় আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন সকল নাট্যকারেরই মৌল উদ্দেশ্য সিরাজ চরিত্রে আরোপিত কলঙ্কমোচন এবং তাঁর অতুল দেশপ্রেমের শিল্পরূপ নির্মাণ। এভাবে, বাঙালি নাট্যকারদের হাতে সিরাজউদ্দৌলা নতুন মহিমায় হলেন অভিষিক্ত।



সারসংক্ষেপ

গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ, নাটক- সাহিত্যের এসব বিচিত্র শাখার মধ্যে নাটক এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম। নাটক একই সঙ্গে দেখা ও শোনার বিষয়। মঞ্চ অভিনেতা অভিনেত্রীদের সাহায্যে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা যখন সংলাপের আশ্রয়ে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করা হয়, তখন তা হয় নাটক। নাটক হয়ে উঠতে হলে নাট্যকারকে কয়েকটি জরুরি বিষয় মেনে চলতে হয়। এই জরুরি বিষয়গুলোকে নাটকের শিল্পরীতি বলে। শিল্পরীতির এই বিষয়গুলো হলো- কর্ম বা ক্রিয়ার গতিবেগ (action), সংঘাত (conflict), আকস্মিকতা (unexpectedness), উৎকর্ষ (Suspense), নাট্যশ্রেণি (dramatic irony) ইত্যাদি। এছাড়া, প্রতিটি নাটকের মধ্যে চারটি প্রধান উপাদান থাকে। এগুলো হচ্ছে- কাহিনি বা বিষয়, চরিত্র, সংলাপ এবং পরিবেশ।

মনীষী এয়ারিস্টটলের মতে, তিনটি বিষয়ের ঐক্যই একটি নাটকের গঠনকৌশলের প্রধান ভিত্তি। এই ঐক্যত্রয় হলো- কালের ঐক্য, স্থানের ঐক্য ও ঘটনার ঐক্য। আবার একটি নাটকের গঠনকে প্রধানত পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। এই পর্বগুলো হলো- কাহিনির আরম্ভ- Exposition [মুখ], কাহিনির ক্রমব্যাপ্তি- Rising action [প্রতিমুখ], উৎকর্ষ বা চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব- climax [গর্ভ], গ্রহণমোচন- Falling action [বিমর্ষ], যবনিকাপাত- Conclusion বা Catastrophe/ [উপসংহার]। এই পাঁচটি পর্যায়কে অবলম্বন করেই রচিত হয় পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাটককে আমরা কতগুলো ভাগে বিভক্ত বা শ্রেণিবদ্ধ করতে পারি; আবার রসের বিচারে নাটককে ট্রাজেডি, কমেডি, ফার্স (প্রহসন) ইত্যাদি ভাগে বিন্যস্ত করতে পারি। বিভিন্ন ধরনের মাপকাঠির আলোকে নাটককে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা সম্ভব।

খ্রিষ্টপূর্ব কাল থেকেই গ্রিস দেশে নাট্যচর্চার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা জানা যায়। পেরিক্লিসের গ্রিসে এবং পরবর্তীকালে এলিজাবেথের ইংল্যান্ডে নাট্যচর্চায় ব্যাপক সমৃদ্ধি এসেছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষেও সংস্কৃত নাটক খুব সমৃদ্ধ ছিল। বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই নাট্যচর্চা আছে। বাংলা নাটকের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের। তবে আধুনিক অর্থে যাকে আমরা নাটক বলি, বাংলা ভাষায় তা প্রথম পাই আজ থেকে দুশো বছর আগে। ১৮৫২ সালে রচিত তারাচাঁদ শিকদারের ‘ভদ্রাজ্জুন’কেই বাংলাভাষার প্রথম মৌলিক নাটক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এরপর দীর্ঘ দেড়শত বছরে বাংলা নাটক নানাভাবে বিচিত্র মাত্রায় বিকশিত হয়েছে, রচিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য বহু নাটক। বাংলা নাটকের এই বিকাশধারাকে আমরা বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে পারি। যেমন- সামাজিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, পৌরাণিক নাটক, রূপক-সাম্প্রতিক নাটক, প্রহসন ও কৌতুক নাটক, গণনাট্যধারা, কাব্যনাটক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একক সাধনায় গড়ে উঠেছে বাংলা রূপক-সাম্প্রতিক নাটকের ধারা। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলা গণনাট্যধারার সূত্রপাত। সাধারণ মানুষকে প্রগতিশীল চেতনায় উদ্বুদ্ধ করাই ছিল এই ধরনের নাটক লেখার মৌল উদ্দেশ্য। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারায় কাব্যনাটকের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে



হয়। দেশবিভাগের পরে বাংলাদেশে নাটক রচনায় একটা ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর নাটক রচনা ও নাট্যচর্চায় ব্যাপক রূপান্তর সাধিত হয়। এ সময় গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের কারণে বাংলাদেশের নাটকে লাগে পালা বদলের হাওয়া।

সিকান্দার আবু জাফরের ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটক প্রথম প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ১৯৬৫ সালে (পৌষ ১৩৭২)। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও পতনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে আলোচ্য নাটক। ইতিহাসের ধূসর আবর্ত থেকে কাহিনির মৌল উপাদান গৃহীত হলেও, সিকান্দার আবু জাফর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আলোচ্য নাটকে বর্তমান কালের জীবন-জিজ্ঞাসাকে ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে প্রতিস্থাপন করেছেন। বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আর সংগ্রামশীল সত্তা প্রকাশের আগ্রহ থেকেই নাট্যকারের সিরাজউদ্দৌলা স্মরণ।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘ড্রামা’ শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

ক. ইংরেজি	খ. ল্যাটিন
গ. গ্রিক	ঘ. ফরাসি

২. ট্র্যাজেডি দর্শকের চিন্তে—

- করণা সঞ্চর করে
- ভয় সৃষ্টি করে
- প্রশান্তি আনয়ন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. ii
- গ. iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

ইতিহাসের প্রতি সাহিত্যিকের আনুগত্য প্রদর্শন অপ্রয়োজনীয়। মূল কথা এই যে, ইতিহাসের মূল সত্যের প্রতি আস্থা রেখেই সাহিত্যিক ইতিহাস— অবলম্বী সাহিত্য রচনা করবেন; তবে ইতিহাসকে যান্ত্রিকভাবে অনুসরণের কোনো দায় লেখকের থাকবে না।

৩. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু যে রচনার উপজীব্য—

ক. লালসালু	খ. সিরাজউদ্দৌলা
গ. অপরিচিতা	ঘ. রেইনকোট

৪. উদ্দীপক ও নাটকের প্লট বিবেচনায় ‘সিরাজউদ্দৌলা’ একটি—

ক. ঐতিহাসিক নাটক	খ. সামাজিক নাটক
গ. ডিটেক্টিভ নাটক	ঘ. রূপক নাটক



সিরাজউদ্দৌলা

সিকান্দার আবু জাফর

পাঠ-২



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের প্রাসঙ্গিক পরিচয় লিখতে পারবেন।
- সিরাজউদ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের কথা লিখতে পারবেন।
- সিরাজের পতনের জন্যে ইংরেজদের সঙ্গে এ-দেশের যে সব ব্যক্তি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, তাদের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সিরাজের চরিত্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।



মূলপাঠ

প্রথম অঙ্ক

যবনিকা উত্তোলনের অব্যবহিত পূর্বে আবহ সংগীতের পটভূমিতে নেপথ্যে ঘোষণা :

ঘোষণা : এক স্বাধীন বাংলা থেকে আর এক স্বাধীন বাংলায় আসতে বহু দুর্যোগের পথ আমরা পাড়ি দিয়েছি; বহু লাঞ্ছনা বহু পীড়নের গ্লানি আমরা সহ্য করেছি। দুই স্বাধীন বাংলার ভেতরে আমাদের সম্পর্ক তাই অত্যন্ত গভীর। আজ এই নতুন দিনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিস্মৃত অতীতের পানে দৃষ্টি ফেরালে বাংলার শেষ সূর্যালোকিত দিনের সীমান্ত রেখায় আমরা দেখতে পাই নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে।

নবাব সিরাজের দুর্বল জীবনের মর্মস্কন্দ কাহিনি আমরা স্মরণ করি গভীর বেদনায়, গভীর সহানুভূতিতে। সে কাহিনি আমাদের ঐতিহ্য। আজ তাই অতীতের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য আমরা বিস্মৃতির যবনিকা উত্তোলন করছি।

১৭৫৬ সাল : ১৯ জুন।

প্রথম দৃশ্য

সময় : ১৭৫৬ সাল, ১৯ জুন। স্থান : ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ।

[চরিত্রবৃন্দ : মঞ্চ প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- ক্যাপ্টেন ক্লেটন, ওয়ালি খান, জর্জ হলওয়ে, উমিচাঁদ, মিরমর্দান, মানিক চাঁদ, সিরাজ, রায়দুর্লভ, ওয়াটস।]

(নবাব সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করেছে। দুর্গের ভেতরে ইংরেজদের অবস্থা শোচনীয়। তবু যুদ্ধ না করে উপায় নেই। তাই ক্যাপ্টেন ক্লেটন দুর্গ প্রাচীরের এক অংশ থেকে মুষ্টিমেয় গোলন্দাজ নিয়ে কামান চালাচ্ছেন। ইংরেজ সৈন্যের মনে কোনো উৎসাহ নেই, তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।)

ক্লেটন : প্রাণপণে যুদ্ধ করো সাহসী ব্রিটিশ সৈনিক। যুদ্ধে জয়লাভ অথবা মৃত্যুবরণ, এই আমাদের প্রতিজ্ঞা Victory or death- Victory or death.

(গোলাগুলির শব্দ প্রবল হয়ে উঠল। ক্যাপ্টেন ক্লেটন একজন বাঙালি গোলন্দাজের দিকে এগিয়ে গেলেন)।



ক্লেটন : তোমরা, তোমরাও প্রাণপণে যুদ্ধ করো বাঙালি বীর। বিপদ আসন্ন দেখে কাপুরুষের মতো হাল ছেড়ে দিও না। যুদ্ধ করো, প্রাণপণে যুদ্ধ করো।

(একজন প্রহরীর প্রবেশ)

ওয়ালি খান : যুদ্ধ বন্ধ করবার আদেশ দিন ক্যাপ্টেন ক্লেটন। নবাব সৈন্য দুর্গের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

ক্লেটন : না, না।

ওয়ালি : এখুনি যুদ্ধ বন্ধ করুন। নবাব সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে দুর্গের একটি প্রাণিকেও তারা রেহাই দেবে না।

ক্লেটন : চুপ বেঙ্গমান। কাপুরুষ বাঙালির কথায় যুদ্ধ বন্ধ হবে না।

ওয়ালি : ও সব কথা বলবেন না সাহেব। ইংরেজের হয়ে যুদ্ধ করছি কোম্পানির টাকার জন্যে। তা বলে বাঙালি কাপুরুষ নয়। যুদ্ধ বন্ধ না করলে নবাব সৈন্য এখুনি তার প্রমাণ দেবে।

ক্লেটন : What? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?

(ওয়ালি খানকে চড় মারার জন্যে এগিয়ে গেল। অপর একজন রক্ষীর দ্রুত প্রবেশ)

জর্জ : ক্যাপ্টেন ক্লেটন, অধিনায়ক এনসাইন পিকার্ডের পতন হয়েছে। পেরিস পয়েন্টের সমস্ত ছাউনি হারখার করে দিয়ে ভারী ভারী কামান নিয়ে নবাব সৈন্য দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছে।

ক্লেটন : কী করে তারা এখানে আসবার রাস্তা খুঁজে পেলো?

জর্জ : উমিচাঁদের গুপ্তচর নবাব ছাউনিতে খবর পাঠিয়েছে। নবাবের পদাতিক বাহিনী দমদমের সরু রাস্তা দিয়ে চলে এসেছে, আর গোলন্দাজ বাহিনী শিয়ালদহের মারাঠা খাল পেরিয়ে বন্যাস্রোতের মতো ছুটে আসছে।

ক্লেটন : বাধা দেবার কেউ নেই। (ক্ষিপ্তস্বরে) ক্যাপ্টেন মিনচিন দমদমের রাস্তাটা উড়িয়ে দিতে পারেননি?

জর্জ : ক্যাপ্টেন মিনচিন, কাউন্সিলার ফ্রাঙ্কল্যান্ড আর ম্যানিংহাম নৌকায় করে দুর্গ থেকে পালিয়ে গেছেন।

ক্লেটন : কাপুরুষ, বেঙ্গমান। জ্বলন্ত আগুনের মুখে বন্ধুদের ফেলে পালিয়ে যায়। চালাও, গুলি চালাও। নবাব সৈন্যদের দেখিয়ে দাও যে, বিপদের মুখে ইংল্যান্ডের বীর সন্তান কতখানি দুর্জয় হয়ে ওঠে।

(জন হলওয়েলের প্রবেশ এবং জর্জের প্রস্থান)

হলওয়েল : এখন গুলি চালিয়ে বিশেষ ফল হবে কি, ক্যাপ্টেন ক্লেটন?

ক্লেটন : যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেওয়া ছাড়া আর উপায় কী সার্জন হলওয়েল?

হলওয়েল : আমার মনে হয় গভর্নর রজার ড্রেকের সঙ্গে একবার পরামর্শ করে নবাবের কাছে আত্মসমর্পণ করাই এখন যুক্তিসঙ্গত।

ক্লেটন : তাকে কি নবাবের অত্যাচারের হাত থেকে আমরা রেহাই পাবো ভেবেছেন?

হলওয়েল : তবু কিছুটা আশা থাকবে। কিন্তু যুদ্ধ করে টিকে থাকবার কোনো আশা নেই। গোলাগুলি যা আছে তা দিয়ে আজ সন্ধ্যা পর্যন্তও যুদ্ধ করা যাবে না। ডাচদের কাছে, ফরাসিদের কাছে, সবার কাছে আমরা সাহায্য চেয়েছিলাম। কিন্তু সৈন্য তো দূরের কথা এক ছটাক বারুদ পাঠিয়েও কেউ আমাদের সাহায্য করল না।

(বাইরে গোলাবাজি আওয়াজ প্রবলতর হয়ে উঠল)

ক্লেটন : তা হলে আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি গভর্নর ড্রেকের সঙ্গে একবার আলাপ করে আসি। (ক্লেটনের প্রস্থান। বাইরে থেকে যথারীতি গোলাগুলির আওয়াজ আসছে। হলওয়েল চিন্তিতভাবে এদিক-ওদিক পায়চারি করছে।)

হলওয়েল : (পায়চারি থামিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে) এই, কে আছ?

(রক্ষীর প্রবেশ)

জর্জ : Yes sir.

হলওয়েল : উমিচাঁদকে বন্দি করে কোথায় রাখা হয়েছে?

জর্জ : পাশেই একটা ঘরে।

হলওয়েল : তাকে এখানে নিয়ে এসো।

জর্জ : Right sir

(জর্জ দ্রুত বেরিয়ে চলে যায় এবং প্রায় পর মুহূর্তে উমিচাঁদকে নিয়ে প্রবেশ করে।)



- উমিচাঁদ : (প্রবেশ করতে করতে) সুপ্রভাত সার্জন হলওয়েল।
- হলওয়েল : সুপ্রভাত। তাই না উমিচাঁদ? (গোলাগুলির আওয়াজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। হলওয়েল বিস্মিতভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলেন) নবাব সৈন্যের গোলাগুলি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন বলুন তো?
- উমিচাঁদ : (কান পেতে শুনল) বোধ হয় দুপুরের আহারের জন্যে সাময়িক বিরতি দেওয়া হয়েছে।
- হলওয়েল : এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে উমিচাঁদ। আপনি নবাবের সেন্যধ্যক্ষ রাজা মানিকচাঁদের কাছে একখানা পত্র লিখে পাঠান। তাঁকে অনুরোধ করুন নবাব সৈন্য যেন আর যুদ্ধ না করে।
- উমিচাঁদ : বন্দির কাছে এ প্রার্থনা কেন সার্জন হলওয়েল? (কঠিন স্বরে) আমি গভর্নর ড্রেকের ধ্বংস দেখতে চাই।
(জর্জের প্রবেশ)
- জর্জ : সার্জন হলওয়েল, গভর্নর রজার ড্রেক আর ক্যাপ্টেন ক্লেটন নৌকা করে পালিয়ে গেছেন।
- হলওয়েল : দুর্গ থেকে পালিয়ে গেছেন।
- জর্জ : গভর্নরকে পালাতে দেখে একজন রক্ষী তাঁর দিকে গুলি ছুঁড়েছিল কিন্তু তিনি আহত হননি।
- উমিচাঁদ : দুর্ভাগ্য, পরম দুর্ভাগ্য।
- হলওয়েল : যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেবেন বলে আশ্বস্তি আগেও প্রতিজ্ঞা করছিলেন ক্যাপ্টেন ক্লেটন। শেষে তিনিও পালিয়ে গেলেন।
- উমিচাঁদ : বৃটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন এ বড় লজ্জার কথা।
- হলওয়েল : উমিচাঁদ, এখন উপায়?
- উমিচাঁদ : আবার কী? ক্যাপ্টেন কর্নেলরা সব পালিয়ে গেছেন, এখন ফাঁকা ময়দানে গাইস হাসপাতালের হাতুড়ে সার্জন জন জেফানিয়া হলওয়েল সর্বাধিনায়ক। আপনিই এখন কম্যান্ডার ইন-চিফ।
(আবার প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ আওয়াজ ভেসে এল)
- হলওয়েল : (হতাশার স্বরে) উমিচাঁদ।
- উমিচাঁদ : আচ্ছা, আমি রাজা মানিকচাঁদের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছি। আপনি দুর্গ প্রাকারে সাদা নিশান উড়িয়ে দিন।
(উমিচাঁদের প্রস্থান। হঠাৎ বাইরে গোলমালের শব্দ শোনা গেল। বেগে জর্জের প্রবেশ।)
- জর্জ : সর্বনাশ হয়েছে। একদল ডাচ সৈন্য গঙ্গার দিক্কার ফটক ভেঙ্গে পালিয়ে গেছে। সেই পথ দিয়ে নবাবের সশস্ত্র পদাতিক বাহিনী হুড় হুড় করে কেল্লার ভেতরে ঢুকে পড়েছে।
- হলওয়েল : সাদা নিশান ওড়াও। দুর্গ তোরণে সাদা নিশান উড়িয়ে দাও।
(জর্জ ছুটে বেরিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নবাব সৈন্যের অধিনায়ক রাজা মানিকচাঁদ ও মিরমর্দানের প্রবেশ।)
- মিরমর্দান : এই যে দুশমনরা এখান থেকেই গুলি চালাচ্ছে।
- হলওয়েল : আমরা সন্ধির সাদা নিশান উড়িয়ে দিয়েছি। যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে।
- মিরমর্দান : সন্ধি না আত্মসমর্পণ?
- মানিকচাঁদ : সবাই অস্ত্র ত্যাগ করো।
- মিরমর্দান : মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও।
- মানিকচাঁদ : তুমি হলওয়েল, তুমিও মাথার ওপর দু'হাত তুলে দাঁড়াও। কেউ একচুল নড়লে প্রাণ যাবে।
(দ্রুতগতিতে নবাব সিরাজের প্রবেশ। পেছনে সসৈন্য সেনাপতি রায়দুর্লভ। বন্দিরা কুর্ণিশ করে এক পাশে সরে দাঁড়াল। সিরাজ চারদিকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে হলওয়েলের দিকে এগিয়ে গেলেন।)
- সিরাজ : কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার রাতারাতি সেন্যধ্যক্ষ হয়ে বসেছেন। তোমার কৃতকার্যের উপযুক্ত প্রতিফল নেবার জন্যে তৈরি হও হলওয়েল।
- হলওয়েল : আশা করি নবাব আমাদের ওপরে অন্যায় জুলুম করবেন না।
- সিরাজ : জুলুম? এ পর্যন্ত তোমরা যে আচরণ করে এসেছো তাতে তোমাদের ওপরে সত্যিকার জুলুম করতে পারলে আমি খুশি হতুম। গভর্নর ড্রেক কোথায়?
- হলওয়েল : তিনি কলকাতার বাইরে গেছেন।



- সিরাজ : কলকাতার বাইরে গেছেন, না প্রাণ নিয়ে পালিয়েছেন? আমি সব খবর রাখি হলওয়েল। নবাব সৈন্য কলকাতা আক্রমণ করবার সঙ্গে সঙ্গে রজার ড্রেক প্রাণভয়ে কুকুরের মতো ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু কৈফিয়ৎ তবু কাউকে দিতেই হবে। বাংলার বুকো দাঁড়িয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবার স্পর্ধা ইংরেজ পেলো কোথা থেকে আমি তার কৈফিয়ৎ চাই।
- হলওয়েল : আমরা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইনি। শুধু আত্মরক্ষার জন্যে—
- সিরাজ : শুধু আত্মরক্ষার জন্যেই কাশিমবাজার কুঠিতে তোমরা গোপনে অস্ত্র আমদানি করছিলে তাই না? খবর পেয়ে আমার হুকুমে কাশিমবাজার কুঠি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বন্দি করা হয়েছে ওয়াটস আর কলেটকে। রায়দুর্লভ।
- রায়দুর্লভ : জাঁহাপনা।
- সিরাজ : বন্দি ওয়াটসকে এখানে হাজির করুন।

(ওয়াটসসহ রায়দুর্লভের প্রবেশ)

ওয়াটস!

- ওয়াটস : Your Excellency.
- সিরাজ : আমি জানতে চাই তোমাদের অশিষ্ট আচরণের জবাবদিহি কে করবে? কাশিমবাজারে তোমরা গোলাগুলি আমদানি করছ, কলকাতার আশে পাশে গ্রামের পর গ্রাম তোমরা নিজেদের দখলে আনছ, দুর্গ সংস্কার করে তোমরা সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছ, আমার নিষেধ অগ্রাহ্য করে কৃষ্ণবল্লভকে তোমরা আশ্রয় দিয়েছ, বাংলার মসনদে বসবার পর আমাকে তোমরা নজরানা পর্যন্ত পাঠাওনি। তোমরা কি ভেবেছ এই সব অনাচার আমি সহ্য করব?
- ওয়াটস : আমরা আপনার অভিযোগের কথা কাউন্সিলের কাছে পেশ করব।
- সিরাজ : তোমাদের ধৃষ্টতার জবাবদিহি না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে তোমাদের বাণিজ্য করবার অধিকার আমি প্রত্যাহার করছি।
- ওয়াটস : কিন্তু বাংলাদেশে বাণিজ্য করবার অনুমতি দিল্লির বাদশাহ আমাদের দিয়েছেন।
- সিরাজ : বাদশাহকে তোমরা ঘুষের টাকায় বশীভূত করেছো। তিনি তোমাদের অনাচার দেখতে আসেন না।
- হলওয়েল : Your Excellency. নবাব আলিবর্দি আমাদের বাণিজ্য করবার অনুমতি দিয়েছেন।
- সিরাজ : আর আমাদের তিনি যে অনুমতি করে গেছেন তা তোমাদের অজানা থাকবার কথা নয়। সে খবর এ্যাডমিরাল ওয়াটসন, কিলপ্যাট্রিক, ক্লাইভ সকলেরই জানা আছে। মাদ্রাজে বসে ক্লাইভ লন্ডনের Secret Committee-র সঙ্গে যে পত্রালাপ করে তা আমার জানা নেই ভেবেছো? আমি সব জানি। তবু তোমাদের অবাধ বাণিজ্যে এ পর্যন্ত কোনো বিঘ্ন ঘটাইনি। কিন্তু সদ্যবহার তো দূরের কথা তোমাদের জন্যে করুণা প্রকাশ করাও অন্যায।
- ওয়াটস : Your Excellency, আমাদের সম্বন্ধে ভুল খবর শুনেছেন। আমরা এ দেশে বাণিজ্য করতে এসেছি। We have come to earn money and not to get into politics. রাজনীতি আমরা কেন করব?
- সিরাজ : তোমরা বাণিজ্য করো? তোমরা করো লুট। আর তাতে বাধা দিতে গেলেই তোমরা শাসন ব্যবস্থায় ওলটপালট আনতে চাও। কর্ণাটকে, দাক্ষিণাত্যে তোমরা কী করেছো? শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করে অবাধ লুণ্ঠতরাজের পথ পরিষ্কার করে নিয়েছো। বাংলাতেও তোমরা সেই ব্যবস্থাই করতে চাও। তা না হলে আমার নিষেধ সত্ত্বেও কলকাতার দুর্গ-সংস্কার তোমরা বন্ধ করনি। কেন?
- হলওয়েল : ফরাসি ডাকাতদের হাত থেকে আমরা আত্মরক্ষা করতে চাই।
- সিরাজ : ফরাসিরা ডাকাত আর ইংরেজরা অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি কেমন?
- ওয়াটস : আমরা অশান্তি চাই না Your Excellency।
- সিরাজ : চাও কি না চাও সে বিচার পরে হবে। রায়দুর্লভ।
- রায়দুর্লভ : জাঁহাপনা।



- সিরাজ : গভর্নর ড্রেকের বাড়িটা কামানের গোলায় উড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিন। গোটা ফিরিঙ্গি পাড়ায় আগুন ধরিয়ে ঘোষণা করে দিন সমস্ত ইংরেজ যেন অবিলম্বে কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। আশে-পাশের গ্রামবাসীদের জানিয়ে দিন তারা যেন কোনো ইংরেজের কাছে কোনো প্রকারের সওদা না বেঁচে। এই নিষেধ কেউ অগ্রাহ্য করলে তাকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে হবে।
- রায়দুর্লভ : হুকুম জাঁহাপনা।
- সিরাজ : আজ থেকে কলকাতার নাম হলো আলিনগর। রাজা মানিকচাঁদ, আপনাকে আলিনগরের দেওয়ান নিযুক্ত করলাম।
- মানিকচাঁদ : জাঁহাপনার অনুগ্রহ।
- সিরাজ : আপনি অবিলম্বে কোম্পানির যাবতীয় সম্পত্তি আর প্রত্যেকটি ইংরেজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নবাব তহবিলে বাজেয়াপ্ত করুন। কলকাতা অভিযানের সমস্ত খরচ বহন করবে কোম্পানির প্রতিনিধি আর কোম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এখানকার প্রত্যেকটি ইংরেজ।
- মানিকচাঁদ : হুকুম জাঁহাপনা।
- সিরাজ : নাসারার দুর্গ এই ফোর্ট উইলিয়ামের ভেতরে একটি মসজিদ তৈরি হবে। আয়োজন করুন সেনাপতি মিরমর্দান।
- সেনাপতি নত হয়ে আদেশ গ্রহণের ভঙ্গী করলেন)
- সিরাজ : (উমিচাঁদের কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে) আপনাকে মুক্তি দেওয়া হলো, উমিচাঁদ।
(উমিচাঁদ কৃতজ্ঞতায় নতশিরি)
আর (মিরমর্দানকে) হ্যাঁ, রাজা রাজবল্লভের সঙ্গে আমার একটা মিটমাট হয়ে গেছে। কাজেই কৃষ্ণবল্লভকেও মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করুন।
- মিরমর্দান : হুকুম, জাঁহাপনা।
- সিরাজ : হলওয়েল।
- হলওয়েল : Your Excellency.
- সিরাজ : তোমার সৈন্যদের মুক্তি দিচ্ছি, কিন্তু তুমি আমার বন্দি। (রায়দুর্লভকে) কয়েদি হলওয়েল, ওয়াটস আর কলেটকে আমার সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে আমি তাদের বিচার করব।
- রায়দুর্লভ : জাঁহাপনা।
(সিরাজ বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সবাই মাথা নুইয়ে তাঁকে কুর্নিশ করল।)
- [দৃশ্যান্তর]

প্রথম অংক: দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৬ সাল, ৩ জুলাই। স্থান : কলকাতার ভাগীরথী নদীতে ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ

(চরিত্রবৃন্দ : মঞ্চের প্রবেশের পর্যায় অনুসারে— ড্রেক, হ্যারি, মার্টিন, কিলপ্যাট্রিক, ইংরেজ মহিলা, সৈনিক, হলওয়েল, ওয়াটস, আদালি)

(কলকাতা থেকে তাড়া খেয়ে ড্রেক, কিলপ্যাট্রিক এবং তাদের দলবল এই জাহাজে আশ্রয় নিয়েছে। সকলের চরম দুরবস্থা। আহাৰ্য দ্রব্য প্রায়ই পাওয়া যায় না। অত্যন্ত গোপনে যৎ-সামান্য চোরাচালান আসে। পরিধেয়-বস্ত্র প্রায় নেই বললেই চলে। সকলেই এক কাপড় সম্বল। এর ভেতরেও নিয়মিত পরামর্শ চলছে কী করে উদ্ধার পাওয়া যায়। জাহাজ থেকে নদীর একদিক দেখা যাবে ঘন জঙ্গলে আকীর্ণ। জাহাজের ডেকে পরামর্শরত ড্রেক, কিলপ্যাট্রিক এবং আরও দুজন তরুণ ইংরেজ।)

- ড্রেক : এই তো কিলপ্যাট্রিক ফিরে এসেছেন মাদ্রাজ থেকে। ওঁর কাছেই শোনো, প্রয়োজনীয় সাহায্য—
- হ্যারি : এসে পড়ল বলে, এই তো বলতে চাইছেন? কিন্তু সে সাহায্য এসে পৌঁছোবার আগেই আমাদের দফা শেষ হবে মি. ড্রেক।



- মার্টিন : কিলপ্যাট্রিক সাহেবের সুখবর নিয়ে আসাটা আপাতত আমাদের কাছে মোটেই সুখবর নয়। তিনি মাত্র শ-আড়াই সৈন্য নিয়ে হাজির হয়েছেন। এই ভরসায় একটা দাঙ্গাও করা যাবে না। যুদ্ধ করে কলকাতা জয় তো দূরের কথা।
- ড্রেক : তবু তো লোকবল কিছুটা বাড়ল।
- হারি : লোকবল বাড়ুক আর না বাড়ুক আহাযের অংশীদার বাড়ল তা অবশ্য ঠিক।
- ড্রেক : আহায কোনো রকমের জোগাড় হবেই।
- মার্টিন : কী করে হবে তাই বলুন মি. ড্রেক। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎটাই তো জানতে চাইছি। এ পর্যন্ত দুবেলা আহাযের বন্দোবস্ত হয়েছে? ধারে কাছে হাটবাজার নেই। নবাবের হুকুমে প্রকাশ্যে কেউ কোনো জিনিস আমাদের কাছে বেঁচেও না। চারগুণ দাম দিয়ে গোপনে সওদাপাতি কিনতে হয়। এই অবস্থা কতদিন চলবে সেটা আমাদের জানা দরকার।
- কিলপ্যাট্রিক : এত অল্পে অধৈর্য হলে চলবে কেন?
- হারি : ধৈর্য ধরব আমরা কিসের আশায় সেটাও তো জানতে হবে।
- ড্রেক : যা হয়েছে তা নিয়ে বিবাদ করে কোনো লাভ নেই। দোষ কারো একার নয়।
- মার্টিন : যাঁরা এ পর্যন্ত হুকুম দেবার মালিক তাঁদের দোষেই আজ আমরা কলকাতা থেকে বিতাড়িত। বিশেষ করে আপনার হঠকারিতার জন্যেই আজ আমাদের এই দুর্ভোগ।
- ড্রেক : আমার হঠকারিতা?
- মার্টিন : তা নয়ত কী? এমন উদ্ধত ভাষায় নবাবকে চিঠি দেবার কী প্রয়োজন ছিল? তা ছাড়া নবাবের আদেশ অমান্য করে কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দেবারই বা কী কারণ?
- ড্রেক : সব ব্যাপারে সকলের মাথা গলানো সাজে না।
- হারি : তা তো বটেই। কৃষ্ণবল্লভের কাছ থেকে কী পরিমাণ টাকা উৎকোচ নেবেন মি. ড্রেক, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাবো কেন? কিন্তু এটা বলতে আমাদের কোনো বাধা নেই যে, ঘুষের অঙ্ক বড় বেশি মোটা হবার ফলেই নবাবের ধমকানি সত্ত্বেও কৃষ্ণবল্লভকে ত্যাগ করতে পারেননি মি. ড্রেক।
- ড্রেক : আমার রিপোর্ট আমি কাউন্সিলের কাছে দাখিল করেছি।
- মার্টিন : রিপোর্টের কথা রেখে দিন। তাতে আর যাই থাক সত্যি কথা বলা হয়নি। (টেবিলের ওপর এক বাড়িল কাগজ দেখিয়ে) ওই তো রিপোর্ট তৈরি করেছেন কলকাতা যে ডুবিয়ে দিয়ে এসেছেন তার। ওর ভেতরে একটি বর্ণ সত্যি কথা খুঁজে পাওয়া যাবে?
- ড্রেক : (টেবিলে ঘুসি মেরে) That's none to your business.
- মার্টিন : Of course it is.
- কিলপ্যাট্রিক : তোমরাই বা হঠাৎ এমন সাধুত্বের দাবিদার হলে কিসে?
- ড্রেক : তোমাদের দুজনের Bank balance বিশ হাজারের কম নয় কারণই। অথচ তোমরা কোম্পানির সত্তর টাকা বেতনের কর্মচারী।
- হারি : ব্যক্তিগত উপার্জনের ছাড়পত্র কোম্পানি সকলকেই দিয়েছে। সবাই উপার্জন করছে, আমরাও করছি। কিন্তু আমরা ঘুষ খাইনি।
- ড্রেক : আমিও ঘুষ খাইনে।
- মার্টিন : অর্থাৎ ঘুষ খেয়ে খেয়ে ঘুষ কথাটার অর্থই বদলে গেছে আপনার কাছে।
- ড্রেক : তোমরা বেশি বাড়াবাড়ি করছ। ভুলে যেও না এখনও ফোর্ট উইলিয়ামের কর্তৃত্ব আমার হাতে।
- হারি : ফোর্ট উইলিয়াম?
- ড্রেক : ইংরেজের আধিপত্য অত সহজেই মুছে যাবে নাকি? এই জাহাজটাই এখন আমাদের কলকাতার দুর্গ। আর দুর্গ শাসনের ক্ষমতা এখনও আমার অধিকারে। বিপদের সময়ে সকলে একযোগে কাজ করার জন্যেই মন্ত্রণা সভায় তোমাদের ডেকেছিলাম। কিন্তু দেখছি তোমরা এই মর্যাদার উপযুক্ত নও।
- মার্টিন : বড়াই করে কোনো লাভ হবে না মি. ড্রেক। আমরা আপনার কর্তৃত্ব মানব না।



- ড্রেক : এতবড় স্পর্ধা? Withdraw. Why you have said, মাফ চাও দ্বিতীয় কথা না বলে। Nothing sort of an unconditional apology will save you. মাফ চাও তা না হলে এই মুহূর্তে তোমাদের কয়েদ করবার হুকুম দিয়ে দেব।
(জনৈক ইংরেজ মহিলা দড়ির ওপর একটা ছেঁড়া গাউন মেলতে আসছিলেন। তিনি হঠাৎ ড্রেকের কথায় রুখে উঠলেন। ছুটে গেলেন বচসারত পুরুষদের কাছে।)
- রমণী : তবু যদি মেয়েদের নৌকায় করে কলকাতা থেকে না পালাতেন তা হলেও না হয় এই দম্ভ সহ্য করা যেত।
- ড্রেক : We are in the council Session, madam. এখানে মহিলাদের কোনো কাজ নেই।
- রমণী : Damn your Council, প্রাণ বাঁচবে কী করে তার ব্যবস্থা নেই, কর্তৃত্ব ফলাচ্ছেন সব।
- ড্রেক : সেই ব্যবস্থাই তো হচ্ছে।
- রমণী : ছাই হচ্ছে। রোজই শুনছি কিছু একটা হচ্ছে। যা হচ্ছে সে তো নিজেদের ভেতরে ঝগড়া। এ-দিকে দিনের পর দিন একবেলা খেয়ে, প্রায়ই না খেয়ে অহোরাত্র এক কাপড় পরে মানুষের মনুষ্যত্ব ঘুচে যাবার জোগাড়।
- ড্রেক : But you see—
- রমণী : I do not see alone, you can also see every night. এক প্রস্থ জামা কাপড় সম্বল। ছেলে-বুড়ো সকলকেই তা খুলে রেখে রাত্রে ঘুমুতে হয়। কোনো আড়াল নেই, আব্রু নেই। এর চেয়ে বেশি আর কী দেখাতে চান?
(হাতের ভিজা গাউনটা ড্রেকের মুখে ছুঁড়ে দিতে যাচ্ছিলেন মহিলাটি, এমন সময় জনৈক গোরা সৈনিকের দ্রুত প্রবেশ।)
- সৈনিক : মি. হলওয়েল আর মি. ওয়াটস।
(প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হলওয়েল আর ওয়াটস ঢুকলো)
- কিলপ্যাট্রিক : God gracious.
- হলওয়েল : (সকলের উদ্দেশ্যে) Good morning to you.
(সকলের সঙ্গে করমর্দন। ওয়াটস কোনো কথা না বলে সকলের সঙ্গে করমর্দন করল। মহিলাটি একটু ইতস্তত করে অন্যদিকে চলে গেলেন।)
- ড্রেক : বলো, খবর বলো হলওয়েল। উৎকণ্ঠায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো যে।
- হলওয়েল : মুর্শিদাবাদে ফিরেই নবাব আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। অবশ্য নানা রকম ওয়াদা করতে হয়েছে, নাকে-কানে খৎ দিতে হয়েছে এই যা।
- ড্রেক : কলকাতায় ফেরা যাবে?
- হলওয়েল : না।
- ওয়াটস : আপাতত নয়, কিন্তু ধীরে ধীরে হয়ত একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।
- কিলপ্যাট্রিক : কী রকম ব্যবস্থা?
- ওয়াটস : অর্থাৎ মেজাজ বুঝে যথাসময়ে কিছু উপটোকনসহ হাজির হয়ে আবার একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে।
- ড্রেক : তার জন্যে কতকাল অপেক্ষা করতে হবে কে জানে।
- হলওয়েল : একটা ব্যাপার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, নবাব ইংরেজদের ব্যবসা সমুলে উচ্ছেদ করতে চান না। তা চাইলে এভাবে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারতেন না।
- ড্রেক : তা হলে নবাবের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থাটা করে ফেলতে হয়।
- হলওয়েল : কিছুটা করেই এসেছি। তা ছাড়া উমিচাঁদ নিজের থেকেই আমাদের সাহায্য করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে।
- ড্রেক : Hurray!
- ওয়াটস : মিরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ ঐরাও আস্তে আস্তে নবাবের কানে কথাটা তুলবেন।
- ড্রেক : (হ্যারি ও মার্টিনকে) আশা করি তোমাদের মেজাজ এখন কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে। আমাদের মিলেমিশে থাকতে হবে, একযোগে কাজ করতে হবে।
- হ্যারি : আমরা তো ঝগড়া করতে চাইনে। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জানতে চাই।
- মার্টিন : যেমন হোক একটা নিশ্চিত ফল দেখতে চাই।



(উভয়ের প্রশ্নান)

- ড্রেক : (উচ্চ কণ্ঠে) Patience is the key-word youngmen.
- হলওয়েল : (পায়ে চাপড় মেরে) উঃ, কী মশা।
- ড্রেক : যা বলেছো। ম্যালেরিয়া আর আমাশয়ে ভুগে কয়েকজন এর ভেতরে মারাও গেছে।
- ওয়াটস : বড় ভয়ানক জায়গায় আস্তানা গেড়েছেন আপনারা।
- ড্রেক : But it is important from military point of view. সমুদ্র কাছেই। কলকাতাও চল্লিশ মাইলের ভেতরে। প্রয়োজন হলে যে কোনো দিকে ধাওয়া করা যাবে।
- কিলপ্যাট্রিক : Thats true. কলকাতায় ফেরার আশায় বসে থাকতে হলে এই জায়গাটাই সবচেয়ে নিরাপদ। নদীর দুপাশে ঘন জঙ্গল। সেদিক দিয়ে বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই, বিপদ যদি আসেই তা হলে তা আসবে কলকাতার দিক দিয়ে গঙ্গার স্রোতে ভেসে। কাজেই সতর্ক হবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।
- হলওয়েল : কলকাতার দিক থেকে আপাতত কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। উমিচাঁদ কলকাতার দেওয়ান মানিকচাঁদকে হাত করেছে। তার অনুমতি পেলেই জঙ্গল কেটে আমরা এখানে হাট-বাজার বসিয়ে দেবো।
- ড্রেক : নেটিভরা আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চায়। কিন্তু ফৌজদারে ভয়েই তা পারছে না।
(প্রহরী সৈনিকের প্রবেশ। সে ড্রেকের হাতে এক টুকরা কাগজ দিল। ড্রেক কাগজ পড়ে চোঁচিয়ে উঠল)
উমিচাঁদের লোক এই চিঠি এনেছে।
- সকলে : (What)? এত তাড়াতাড়ি।
- ড্রেক : (মাঝে মাঝে উচ্চৈঃস্বরে পত্র পড়তে লাগল) ‘আমি চিরকালই ইংরেজের বন্ধু। মৃত্যু পর্যন্ত এই বন্ধুত্ব আমি বজায় রাখিব। মানিকচাঁদকে অনেক কষ্টে রাজি করানো হইয়াছে। সে কলকাতায় ইংরেজদের ব্যবসা করিবার অনুমতি দিয়াছে। এর জন্য তাহাকে বারো হাজার টাকা নজর দিতে হইয়াছে। টাকাটা নিজের তহবিল হইতে দিয়া দেওয়ানের স্বাক্ষরিত হুকুমনামা হাতে হাতে সংগ্রহ করিয়া পত্রবাহক মারফত পাঠাইলাম। এই টাকা এবং আমার পারিশ্রমিক ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ যাহা ন্যায়্য বিবেচিত হয় তাহা পত্রবাহকের হাতে পাঠাইলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। বলা বাহুল্য, পারিশ্রমিক বাবদ আমি পাঁচ হাজার টাকা পাইবার আশা করি। সুদূর লাহোর হইতে আমি বাংলাদেশে আসিয়াছি অর্থ উপার্জনের জন্য, যেমন আসিয়াছেন কোম্পানির লোকেরা। কাজেই উদ্দেশ্যের দিক দিয়া বিচার করলে আমি আপনাদেরই সমগোত্রীয়। (চিঠি ভাঁজ করতে করতে) A Perfect scoundrel is this Omichand.
- হলওয়েল : কিন্তু উমিচাঁদের সাহায্য তো হাতছাড়া করা যাচ্ছে না।
- ওয়াটস : Even when it is too costly.
- ড্রেক : সেই তো মুশ্কিল। ওর লোভের অন্ত নেই। মানিকচাঁদের হুকুমনামার জন্যে সতের হাজার টাকা দাবি করেছে। আমি হলপ করে বলতে পারি দুহাজারের বেশি মানিকচাঁদের পকেটে যাবে না। বাকিটা যাবে উমিচাঁদের তহবিলে।
- হলওয়েল : কিন্তু কিছুই করবার নেই। উপযুক্ত অবস্থার সুযোগ পেয়ে সে ছাড়বে কেন?
- ড্রেক : দেখি, টাকাটা দিয়ে ওর লোকটাকে বিদায় করি।
(বেরিয়ে গেল)
- ওয়াটস : শুধু উমিচাঁদের দোষ দিয়ে কী লাভ? মিরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, মানিকচাঁদ কে হাত পেতে নেই?
- কিলপ্যাট্রিক : দশদিকের দশটি খালি হাত ভর্তি করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ইংরেজ, ডাচ আর ফরাসিরা।
- হলওয়েল : কিছু না, কিছু না। হাজার হাতে হাজার হাজার হাত থেকে নিয়ে দশ হাত বোঝাই করতে আর কতটুকু সময় লাগে? বিপদ সেখানে নয়। বিপদ হল বখরা নিয়ে মতান্তর ঘটলে। (ড্রেকের প্রবেশ)
- ড্রেক : (উমিচাঁদের চিঠি বার করে) আর একটা জরুরি খবর আছে উমিচাঁদের চিঠিতে। শওকতজঙ্গের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার লেগে গেল বলে। এই সুযোগ নেবে মিরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠের দল। তারা শওকতজঙ্গকে সমর্থন করবে।
- ওয়াটস : খুব স্বাভাবিক। শওকতজঙ্গ নবাব হলে সকলের উদ্দেশ্যই হাসিল হবে। ভাং খেয়ে নাচওয়ালিদের নিয়ে সারাক্ষণ সে পড়ে থাকবে আর উজির ফৌজদাররা যার যা খুশি তাই করতে পারবে।



ড্রেক : আগে ভাগেই তার কাছে আমাদের ভেট পাঠানো উচিত বলে আমার মনে হয় ।।

কিলপ্যাট্রিক : I send you.

ওয়াটস : তা পাঠান। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেল যে। এখানে একটা বাতি দেবে না?

ড্রেক : (আরদালি) বাতি লে আও।

হলওয়েল : নবাবের কয়েদখানায় থেকে এ দুদিনে শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছি। আপনাদের অবস্থা কি ততটাই খারাপ?

ড্রেক : Not so bad I hope.

(আরদালি একটা বাতি রাখলো)

ড্রেক : পেগ লাগাও।

(দূরে থেকে কণ্ঠস্বর)

নেপথ্যে : জাহাজ-জাহাজ আসছে।

চারজনে

সমস্বরে : কোথায়? From which side?

নেপথ্যে : সমুদ্রের দিক থেকে জাহাজ আসছে। দুখানা, তিন খানা, চার খানা, পাঁচখানা। পাঁচখানা জাহাজ। কোম্পানির জাহাজ!

(আরদালি বোতল আর গ্লাস রাখল টেবিলে)

ড্রেক : কোম্পানির জাহাজ? Must be from Madras. Let us celebrate. Hip Hip Hurray.

সমস্বরে : Hurray

(সবাই গ্লাসে মদ ঢেলে নিল)

[দৃশ্যান্তর]

প্রথম অংক: তৃতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৬ সাল ১০ অক্টোবর। স্থান : ঘসেটি বেগমের বাড়ি।

[চরিত্রবৃন্দ : মঞ্চ প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- ঘসেটি বেগম, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রাইসুল জুহালা, রায় দুর্লভ, প্রহরী, সিরাজ, মোহনলাল, নর্তকী, বাদকগণ।]

(প্রৌঢ়া ঘসেটি বেগম জাঁকজমকপূর্ণ জলসার সাজে সজ্জিতা। আসরে উপস্থিত রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, বাদক এবং নর্তকী। সুসজ্জিত খানসামা তাম্বুল এবং তাম্বুকূট পরিবেশন করছে। একজন বিচিত্রবেশী অতিথি রাইসুল জুহালার সঙ্গে আসরে প্রবেশ করল উমিচাঁদ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক পর্যায়ের নাচ শেষ হল। সকলের হাততালি।)

ঘসেটি : বসুন উমিচাঁদজি। সঙ্গের মেহমানটি আমাদের অচেনা বলেই মনে হচ্ছে।

উমিচাঁদ : (যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে) মাফ করবেন বেগম সাহেবা, ইনি একজন জবরদস্ত শিল্পী। আমার সঙ্গে অল্পদিনের পরিচয় কিন্তু তাতেই আমি এঁর কেরামতিতে একেবারে মুগ্ধ। আজকের জলসা সরগরম করে তুলতে পারবেন আশা করে এঁকে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

রাজবল্লভ : তাহলেও এখানে একজন অপরিচিত মেহমান-

উমিচাঁদ : না না সে সব কিছু ভাবতে হবে না। দরিদ্র শিল্পী, পেটের ধান্দায় আসরে জলসায় কেরামতি দেখিয়ে বেড়ান।

জগৎশেঠ : তাহলে আরম্ভ করুন গুস্তাদজি। দেখি নাচওয়ালিদের ঘুঙুর এবং ঘাগরা বাদ দিয়ে আপনার কাজের তারিফ করা যায় কিনা।

(ঘসেটি ও রাজবল্লভের দৃষ্টি বিনিময়। আগন্তুক আসরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল)

রাজবল্লভ : গুস্তাদজির নামটা-

আগন্তুক : রাইসুল জুহালা। (সকলের উচ্চহাসি)

রায়দুর্লভ : জাহেলদের রইস। এই নামের গৌরবেই আপনি উমিচাঁদজিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন নাকি?

(আবার সকলের হাসি)



- উমিচাঁদ : (ইষৎ রুষ্ট) আমি তো বেশক জাহেল। তা না হলে আপনারা সরসুন্ধ দুধ খেয়েও গৌফ শুকনো রাখেন, আর আমি দুধের হাঁড়ির কাছে যেতে না যেতেই হাঁড়ির কালি মেখে গুলবাঘা বনে যাই।
- ঘসেটি : আপনারা বড় বেশি কথা কাটাকাটি করেন। শুরু করুন ওস্তাদজি।
- রাইসুল জুহালা : ব্যায়াসা হুকুম। আমি নানা রকমের জন্তু জানোয়ারের আদব কায়দা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল। আপতত আমি আপনাদের একটা নাচ দেখাবো। পক্ষীকূলের একটি বিশেষ শ্রেণি, ধার্মিক হিসেবে যার জবরদস্ত নাম, সেই পাখির নৃত্যকলা আপনারা দেখবেন। দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে এই বিশেষ নৃত্যটি আমি জনপ্রিয় করতে চাই। (তবলচিকে) একটু ঠেকা দিয়ে দিন। (তাল বলে দিল। নৃত্য শুরু করল। নৃত্য চলাকালে ঘসেটি এবং রাজবল্লভ নিচুস্বরে পরামর্শ করলেন। পরে উমিচাঁদ এবং রাজবল্লভ কিছু আলোচনা করলেন। নাচ শেষ হলে সকলের হর্ষ প্রকাশ।)
- রাজবল্লভ : ওস্তাদজি জবরদস্ত লোক মনে হচ্ছে। ওঁকে আরও কিছু কেরামতি দেখাবার দায়িত্ব দিলে কেমন হয়?
(উমিচাঁদ রাইসুল জুহালাকে একপাশে ডেকে নিয়ে কিছু বলল। তারপর নিজের আসনে ফিরে এলো)
- উমিচাঁদ : উনি রাজি আছেন। উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে কলাকৌশল দেখাবার ফাঁকে ফাঁকে দুচারখানা চিঠিপত্রের আদান প্রদান করতে ওঁর আপত্তি নেই।
- রাজবল্লভ : তাহলে এখন ওঁকে বিদায় দিন। পরে দরকার মতো কাজে লাগানো হবে।
- রাইসুল জুহালা : বহোত আচ্ছা হুজুর।
(সবাইকে সালাম করে কালোয়াতি করতে করতে বেরিয়ে গেল)
- ঘসেটি : তাহলে আবার নাচ শুরু হোক?
- রাজবল্লভ : আমার মনে হয় নাচওয়ালিদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিয়ে কাজের কথা সেরে নেওয়াই ভালো।
- ঘসেটি : তাই হোক
(ইঙ্গিত করতেই দলবলসহ নাচওয়ালিদের প্রস্থান)
- রায়দুর্লভ : বেগম সাহেবাই আরম্ভ করুন।
- ঘসেটি : আপনারা তো সব জানেন। এখন খোলাখুলিভাবে যার যা বলার আছে বলুন।
- জগৎশেঠ : সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে শওকতজঙ্গকে আমরা পরোক্ষ সমর্থন দিয়েই দিয়েছি। কিন্তু শওকতজঙ্গ নবাব হলে আমি কী পাবো তা আমাকে পরিস্কার করে বলুন।
- ঘসেটি : শওকতজঙ্গ আপনাদেরই ছেলে। সে নবাবি পেলে প্রকারান্তরে আপনারাই তো দেশের মালিক হয়ে বসবেন।
- রায়দুর্লভ : এটা কোনো কথা হলো না। যিনি নবাব হবেন—
- জগৎশেঠ : আমার কথা আগে শেষ হোক দুর্লভরাম।
- রায়দুর্লভ : বেশ আপনার কথাই শেষ করুন। কিন্তু মনে রাখবেন কথা শেষ হবার পর আর কোনো কথা উঠবে না।
- জগৎশেঠ : সে আবার কী কথা?
- রাজবল্লভ : আপনারা তর্কের ভিতরে যাচ্ছেন আলোচনা শুরু করার আগেই। খুব সংক্ষেপে কথা শেষ করা দরকার। বর্তমান অবস্থায় এই ধরনের আলোচনা দীর্ঘ করা বিপজ্জনক।
- জগৎশেঠ : কথা ঠিক। কিন্তু নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে যাওয়াটাও তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মাফ করবেন বেগম সাহেবা, আমি খোলাখুলিই বলছি। অস্বীকার করে লাভ নেই যে শওকতজঙ্গ নিতান্তই অকর্মণ্য। ভাংয়ের গেলাস এবং নাচওয়ালি ছাড়া সে আর কিছুই জানে না। কাজেই শওকতজঙ্গ নবাব হবে নামমাত্র। আসল কর্তৃত্ব থাকবে বেগম সাহেবার এবং পরোক্ষে তাঁর নামে দেশ শাসন করবেন।
- রায়দুর্লভ : ঠিক এই ধরনের একটা সম্ভাবনার উল্লেখ করার ফলেই হোসেনকুলি খাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে।
- জগৎশেঠ : আমি তা বলছি। তাছাড়া এখানে সে কথা অবান্তর। আমি বলতে চাইছি যে, শওকতজঙ্গ নবাবি পেলে বেগম সাহেবা এবং রাজা রাজবল্লভের স্বার্থ যেমন নির্বিঘ্ন হবে আমাদের তেমন আশা নেই। কাজেই আমাদের পক্ষে নগদ কারবারই ভালো।
- ঘসেটি : ধনকুবের জগৎশেঠকে নগদ অর্থ দিতে হলে শওকতজঙ্গের যুদ্ধের খরচ চলবে কী করে?
- জগৎশেঠ : না না আমি নগদ টাকা চাইছি নে। যুদ্ধের খরচ বাবদ টাকা আমি দেবো অবশ্য আমার যা সাধ্য। কিন্তু আসল এবং লাভ মিলিয়ে আমাকে একটা কর্জনামা সই করে দিলেই আমি নিশ্চিত হতে পারি।



- রায়দুর্লভ : আমাকেও পদাধিকারের একটা একরারনামা সই করে দিতে হবে।
(প্রহরীর প্রবেশ। ঘসেটি বেগমের হাতে পত্র দান)
- ঘসেটি : (চিঠি খুলতে খুলতে) সিপাহসালার মিরজাফরের পত্র পড়তে পড়তে) তিনি শওকতজঙ্গকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন এবং অবিলম্বে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পরামর্শ দিয়েছেন।
- রাজবল্লভ : বহোত খুব।
- উমিচাঁদ : আমার তো কোনো বিষয়ে কোনো দাবি দাওয়া নেই, আমি সকলের খাদেম। খুশি হয়ে যে যা দেয় তাই নিই। কাজেই এতক্ষণ আমি চুপ করেই আছি।
- ঘসেটি : আপনারও যদি কিছু বলার থাকে এখনি বলে ফেলুন।
- উমিচাঁদ : নিজের সম্বন্ধে কিছু নয়। তবে সিপাহসালারের প্রস্তুতি আমার পছন্দ হয়েছে তাই বলছি। ইংরেজরা আবার সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছে। সিরাজউদ্দৌলার পতনই তাদের কাম্য। শওকতজঙ্গ এখনি যদি আঘাত হানতে পারেন, তিনি ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পাবেন। ফলে জয় তাঁর অবধারিত।
- ঘসেটি : সিরাজের পতন কে না চায়?
- উমিচাঁদ : অন্তত আমরা চাই। কারণ সিরাজউদ্দৌলার নবাবিতে নির্বিঘ্ন হতে পারলে আমাদের সকলের স্বার্থই রাহুগুস্ত হবে।
- ঘসেটি : সিরাজ সম্বন্ধে উমিচাঁদের বড় বেশি আশঙ্কা।
- উমিচাঁদ : কিছুমাত্র নয় বেগম সাহেবা। দণ্ডলং আমার কাছে ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়। আমি দণ্ডলতের পূজারী। তা না হলে সিরাজউদ্দৌলাকে বাতিল করে শওকতজঙ্গকে চাইব কেন? আমি কাজ কতদূর এগিয়ে এসেছি এই দেখুন তার প্রমাণ।
(পকেট থেকে চিঠি বার করে ঘসেটি বেগমের হাতে দিল)
- ঘসেটি : (চিঠির নিচে স্বাক্ষর দেখে উল্লসিত হয়ে) এ যে ড্রেক সাহেবের চিঠি।
- উমিচাঁদ : আমার প্রস্তাব অনুমোদন করে তিনি জবাব দিয়েছেন।
- ঘসেটি : (পত্র পড়তে পড়তে) লিখেছেন শওকতজঙ্গ যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সিরাজের সেনাবাহিনীতে যেন বিদ্রোহ ঘটানো হয়। আমাদের মিত্র সেনাপতিদের অধীনস্থ ফৌজ যেন রাজধানী আক্রমণ করে। তাহলে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।
- রাজবল্লভ : আমাদের বন্ধু সিপাহসালার মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খান ইচ্ছে করলেই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন।
(হঠাৎ বাইরে তুমুল কোলাহল। সকলেই সচকিত। ঘসেটি বেগম কোলাহলের কারণ জানবার জন্যে বাইরে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বাহির থেকে নবাব শব্দটি কানে যেতেই রাজবল্লভ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নাচওয়ালিদের ডেকে পাঠালেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তারা সদলবলে কামরায় এলো।)
- রাজবল্লভ : আরম্ভ করো জলদি। (ঘুঙুরের আওয়াজ উঠবার পর পরই সবেগে কামরায় ঢুকলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। পেছনে মোহনলাল। সবাই তড়িৎ বেগে উঠে দাঁড়ালো। নাচওয়ালিদের নাচ থেমে গেলো।)
- ঘসেটি : (ভীতিরুদ্ধ কণ্ঠে) নবাব!
- সিরাজ : কী ব্যাপার খালাআম্মা, বড়ো ভারী জলসা বসিয়েছেন?
- ঘসেটি : (আত্মস্থ হয়ে) এ রকম জলসা এই নতুন নয়।
- সিরাজ : তা নয়, তবে বাংলাদেশের সেরা লোকেরাই শুধু शामिल হয়েছেন বলে জলসার রোশনাই আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।
- ঘসেটি : নবাব কি নাচগানের মজলিস মানা করে দিয়েছেন?
- সিরাজ : নাচগানের মহফিলের জন্যে দেউড়িতে কড়া পাহারা বসিয়ে রেখেছেন খালাআম্মা। তারা তো আমার ওপরে গুলিই চালিয়ে দিয়েছিল প্রায়। দেহরক্ষী ফৌজ সঙ্গে না থাকলে এই জলসায় এতক্ষণে মর্সিয়া শুরু করতে হতো।
(হঠাৎ কণ্ঠস্বরে অবচল তীব্রতা ঢেলে)



রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, আপনারা এখন যেতে পারেন। মতিঝিলের জলসা আমি চিরকালের মতো ভেঙে দিলাম। (ঘসেটি বেগমকে) তৈরি হয়ে নিন খালাআম্মা। আপনাকে আমি প্রাসাদে নিয়ে যেতে এসেছি। আমার চারিদিকে যড়যন্ত্রের জাল। এ সময়ে নবাবের খালাআম্মার পক্ষে প্রাসাদের বাইরে থাকা নিরাপদ নয়।

- ঘসেটি : (রোষে চিৎকার করে) তুমি আমাকে বন্দি করে নিয়ে যেতে এসেছো? তোমার এতখানি স্পর্ধা?
- সিরাজ : এতে ত্রুদ্ব হবার কী আছে? আম্মা আছেন, আপনিও তাঁর সঙ্গেই প্রাসাদে থাকবেন।
- ঘসেটি : মতিঝিল ছেড়ে আমি এক পা নড়ব না। তোমার প্রাসাদে যাবো? তোমার প্রাসাদ বাজ পড়ে খান খান হয়ে যাবে। (সহসা কাঁদতে আরম্ভ করলেন)
- সিরাজ : (অবিচলিত) তৈরি হয়ে নিন খালাআম্মা। আপনাকে আমি নিয়ে যাবো।
- ঘসেটি : (মাতম করতে করতে) রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, বিধবার ওপরে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপনারা কিছুই করতে পারছেন না?
- রাজবল্লভ : (একটু ইতস্তত করে) জাঁহাপনা কি সত্যিই—
- সিরাজ : (উত্তপ্ত) আপনারদের চলে যেতে বলেছি রাজা রাজবল্লভ। নবাবের হুকুম অমান্য করা রাজদ্রোহিতার শামিল। আশা করি অগ্রিয় ঘটনার ভেতর দিয়ে তা আপনারদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। (রাজবল্লভ প্রভৃতি প্রস্থানোদ্যত) হ্যাঁ, শুনুন রায়দুর্লভ, শওকতজঙ্গকে আমি বিদ্রোহী ঘোষণা করেছি। তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যে মোহনলালের অধীনে সেনাবাহিনী পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। আপনি তৈরি থাকবেন। প্রয়োজন হলে আপনাকেও মোহনলালের অনুগামী হতে হবে।
- রায়দুর্লভ : হুকুম জাঁহাপনা। (তারা নিষ্ক্রান্ত হলো। ঘসেটি বেগম হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন)
- সিরাজ : মোহনলাল আপনাকে নিয়ে আসবে, খালাআম্মা। আপনার কোনো রকম অমর্যাদা হবে না।

(বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন)

- ঘসেটি : তোমার ক্ষমতা ধ্বংস হবে, সিরাজ। নবাবি? নবাবি করতে হবে না বেশিদিন। কেয়ামত নাজেল হবে। আমি তা দেখব-দেখব।

[দৃশ্যান্তর]



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অকর্মণ্য— যে কোনো কাজ করে না। কর্মক্ষম নয় এমন, অপটু। **অহোরাত্র**— দিবারাত্রি, সর্বক্ষণ। **আকীর্ণ**— পরিপূর্ণ। **আরদালি**— চাপরাশি, পিওন। **আব্র**— আবরণ, পর্দা। **ইতস্তত**— দ্বিধা, সঙ্কোচ। **একরারনামা**— স্বীকারনামা বা কবুলনামা। **ওয়াকিফহাল**— বিশেষ অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত বা অভিজ্ঞ। **করমর্দন**— হাতে হাতে প্রীতিমূলক বিশেষ মিলন বা স্পর্শ। **কয়েদখানা**— কারাগার, বন্দিশালা। **কালোয়াতী**— উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে নৈপুণ্য, রাগ সঙ্গীতে পারদর্শিতা। **কেরামতি**— ক্ষমতা, শক্তি, প্রতাপ। **কেয়ামত**— ইসলাম ধর্মমতে প্রলয়ের দিন, প্রলয়, ধ্বংস। **কোম্পানি**— ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সংক্ষিপ্ত নাম। **গোলন্দাজ**— যে সৈনিক কামান দাগিয়ে গোলা নিক্ষেপ করে। **জবরদস্ত**— শক্তিশালী, জোরালো। **জুলুম**— অত্যাচার। **ডাচদের**— ওলন্দাজ বা হল্যান্ডের কর্মচারীদের। **ড্রেক**— ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর রজার ড্রেক। **তহবিল**— সঞ্চয়িত নগদ টাকা কড়ি। **তারিফ**— প্রশংসা। **তাম্রকুট**— তামাক। **তামুল**— পান। **দত্তলৎ**— দৌলত, ধন-সম্পদ। **দুরবস্থা**— খারাপ অবস্থা। **দেউড়ি**— উঠান। **ধনকুবের**— ধনবান, বিত্তশালী। **ধান্দা**— ধাঁধা, ধোঁকা, প্রতারণা, এখানে জীবিকার প্রচেষ্টা। **নাজেল**— অবতরণ, আবির্ভাব। **ফৌজদার**— সেনানায়ক, আঞ্চলিক শাসক। **ভাঙ**— এক ধরনের মাদক। **মনুষ্যত্ব**— মানবিক গুণাবলী। **রাজদ্রোহিতা**— রাজা বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। **রোশনাই**— জ্যোতি, আলো। **সরগরম**— জমজমাট, পরিপূর্ণ। **সিপাহসালার**— সেনাপতি। **সর্বাধিনায়ক**— যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি। **হাতুড়ে**— আনাড়ি চিকিৎসক। **Celebrate**— উদ্‌যাপন করা। **Gracious**— করুণাময়, সদয়, দয়ালু। **Scoundrel**— নীচমনা, ইতর, নীতিবর্জিত মানুষ। **Secret Committee**— গোপন সংস্থা, গোপন পরিষদ।

আলিবর্দি— প্রকৃত নাম মির্জা মুহম্মদ আলিবর্দি খাঁ। বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার মাতামহ। তিনি ছিলেন সুদক্ষ শাসক। তিনিই মৃত্যুর সময় সিরাজকে ভবিষ্যৎ নবাব হওয়ার কথা বলে যান।



ওয়াটস- উইলিয়াম ওয়াটস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাশিমবাজার কুঠির পরিচালক। নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

উমিচাঁদ- লাহোরের অধিবাসী উমিচাঁদ ধর্ম বিশ্বাসে ছিলেন শিখ। ইংরেজদের সঙ্গে দালালী করে উমিচাঁদ সিরাজের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেন।

জগৎশেঠ- জগৎশেঠ কোন নাম নয়, উপাধি। ১৭২৩ সালে দিল্লীর সম্রাট মানিক চাঁদের ভ্রাতৃপুত্র ফতেহ চাঁদকে জগৎশেঠ উপাধিতে ভূষিত করেন। পলাশির যুদ্ধের সময় জগৎশেঠ সিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করেন।

মানিকচাঁদ- নবাবের অন্যতম সেনাপতি। আলিবর্দির কৃপায় মুর্শিদাবাদের সেরেস্তাদারির পদে নিযুক্ত হন। মানিক চাঁদ পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করে।

মানিকচাঁদ- সিরাজউদ্দৌলার অন্যতম সেনাপতি। ১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্দৌলা তাকে কলকাতার গভর্নর নিযুক্ত করেন। মানিকচাঁদ ছিলেন চরম বিশ্বাসঘাতক।

মিরমর্দান- নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিশ্বাসী এবং দেশপ্রেমিক সেনাপতি। পলাশির যুদ্ধে তিনি অকুতোভয়ে যুদ্ধ করে সিরাজের প্রতি তার আনুগত্য প্রদর্শন করেন। যুদ্ধরত অবস্থাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মিরজাফর- প্রকৃত নাম মিরজাফর আলী খান। সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় পারস্য থেকে ভারতবর্ষে আসেন মিরজাফর। নবাব আলিবর্দি বৈমাত্র ভগ্নী শাহ খানমের সঙ্গে মিরজাফরের বিয়ে দিয়ে তাকে সরকারি উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। যুদ্ধের সময় তিনি সর্বদা নবাবের সঙ্গে থাকবেন এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও নবাবের সঙ্গে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। ক্লাইভের গাধা বলে পরিচিত এবং চিরকালের বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত মিরজাফর ১৭৫৭ সালে ২৯ জুন বিকেলবেলা কর্নেল ক্লাইভের হাত ধরে বাংলার মসনদে বসেন। কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে ১৭৬৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি মারা যান।

রাইসুল জুহালা- ইতিহাস সিদ্ধ নারান সিংহ (নারায়ণ সিংহ) চরিত্র সিকান্দার আবু জাফরের হাতে পড়ে হয়ে উঠেছে কৌতুক-চরিত্র রাইসুল জুহালা। রাইসুল জুহালা সাহসী, বুদ্ধিমান এবং কৌশলী, সর্বোপরি তিনি দেশপ্রেমিক। নারান সিংহ ছদ্মবেশ ধারণ করে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের খবর নবাবকে জানাতেন।

রাজবল্লভ- বিশ্বাসঘাতক এবং অর্থলোলুপ মন্ত্রী। রাজবল্লভ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অধিবাসী। ঢাকায় নৌবাহিনীতে কেরানীর চাকরি করতেন। পরবর্তীকালে ‘রাজা’ উপাধি পান। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করতে রাজবল্লভ ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে ইংরেজ শক্তিকে প্রতিষ্ঠার জন্য রাজবল্লভের বিশ্বাস ঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল।

রায়দুর্লভ (দুর্লভ রাম)- রাজা জানকীরামের পুত্র রায়দুর্লভ। নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে রায়দুর্লভও গভীর ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত হয়। পলাশির যুদ্ধের পর মিরন তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এনে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। অবশেষে ইংরেজদের হস্তক্ষেপে তিনি কলকাতা পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বেঁচে যান।

সিরাজউদ্দৌলা- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। আলিবর্দি খাঁর প্রিয় দৌহিত্র। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে তিনি পরাজিত হন। তাঁর অধিকাংশ পারিষদই ষড়যন্ত্র করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে। সিরাজ ছিলেন একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং সাহসী সৈনিক। নানা ষড়যন্ত্রের জালে আটকা পড়লেও তিনি কখনো দিশাহারা হননি কিংবা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি। তিনি ছিলেন যথার্থ অর্থেই একজন প্রজাবৎসল নবাব।

হলওয়েল- প্রকৃত নাম জন জেফানায়া হলওয়েল। চরম মিথ্যাবাদী। কোনো ঘটনাকে বেশি করে বলা ছিল তার অভ্যাস। পেশায় তিনি ছিলেন চিকিৎসক। সিরাজের চরিত্র কলঙ্কিত করার জন্য তিনিই অন্ধকূপ হত্যা ঘটনাটি কল্পনা করে প্রচার করেন।



সারসংক্ষেপ

সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজপক্ষ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে বসে ষড়যন্ত্র করছে। ক্লেটন, জর্জ, হলওয়েল, উমিচাঁদ, মানিকচাঁদ-এরা সম্মিলিতভাবে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে বসে তারা যখন সিরাজের পতনের কথা আলোচনা করছেন তখন অকস্মাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। তিনি ওয়াটস হলওয়েল প্রমুখকে ষড়যন্ত্রের পথ পরিত্যাগ করতে বললেন। নবাবের সৈন্যবাহিনীর তাড়া খেয়ে কোম্পানির সৈন্যরা কলকাতা ছেড়ে চলে



যায়। ড্রেক, কিলপ্যাট্রিক প্রমুখ সেনাপতি দলবলসহ ভাগীরথী নদীতে ভাসমান জাহাজে আশ্রয় নেয়। চরম দুরবস্থার মধ্যে তাদের দিন কাটতে থাকে। এর মাঝেও সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রের কোনো শেষ নেই। এক্ষেত্রে এ-দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের কর্মকাণ্ড তাদের আশান্বিত করেছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনচ্যুত করার জন্যে ঘসেটি বেগম গভীর ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত। নিজের বাড়িতে সহচরদের ডেকে তিনি ষড়যন্ত্র করছিলেন। ঘসেটি বেগমের বাড়িতে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে রাজবল্লভ, জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ প্রমুখ। সেখানেও উপস্থিত হলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। সিরাজ ঘসেটি বেগমের বাড়ির জলসা ভেঙে দিলেন। ঘসেটি বেগমকে তিনি নিজ প্রাসাদে নিয়ে যাবার হুকুম দিলেন। তার এই প্রস্তাবে ঘসেটি বেগম ক্রোধান্বিত হলেন ও সিরাজকে অভিশাপ দিতে থাকলেন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. কোন শাসকের মর্মস্বাদ কাহিনি আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য?

ক. নবাব সিরাজের	খ. নবাব আলিবর্দির
গ. নবাব মিরজাফরের	ঘ. লর্ড ক্লাইভের

৬. শওকত জঙ্গের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

- শাসনকার্যে নিতান্ত অকর্মণ্য
- শুধু ভাঙের গেল্লাস ধরে
- কেবল নাচনেওয়ালী বোঝে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

পৈতৃক সম্পত্তির অংশীদারিত্ব নিয়ে দুই ভাই শ্যামল ও কাজলের মধ্যে কলহ বাঁধে। পরবর্তী সময়ে এলাকার বিশিষ্ট মুরব্বিরগণ তাদের বিবাদ মিটমাট করে দেন। পবিত্র গ্রন্থ গীতা হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা হয়। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই উভয়ের প্রতিজ্ঞা ভুলুপ্তি হয়। আবার তারা কলহে মেতে উঠে।

৭. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের সাদৃশ্য রয়েছে—

- নবাবের আদেশ না মানায়
- মিরজাফরের পবিত্র কালাম ছুঁয়ে শপথ করায়
- প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. ii ও iii

৮. উদ্দীপক ও ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে প্রকাশিত হয়েছে—

- ক্ষমতা ভোগ
- প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ
- কূপমণ্ডুক মানসিকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. i ও ii

পাঠ-৩



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- প্রজাদের প্রতি নবাব সিরাজউদ্দৌলার গভীর ভালোবাসার কথা বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রজাদের উপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধিদের নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের বিবরণ প্রদান করতে পারবেন;
- সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে পারবেন;
- সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে তাঁর সভাসদ এবং কোম্পানির প্রতিনিধি মি. ওয়াটসের মনোভাব লিপিবদ্ধ করতে পারবেন;
- সিরাজউদ্দৌলার সভাসদদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।



মূলপাঠ

দ্বিতীয় অংক: প্রথম দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ১০ মার্চ। স্থান : নবাবের দরবার।

[চরিত্রবৃন্দ : মঞ্চ প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- নকিব, সিরাজ, রাজবল্লভ, মিরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উৎপীড়িত ব্যক্তি, গ্রহরী ওয়াটস, মোহনলাল।]

(দরবারে উপস্থিত- মিরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ এবং ইংরেজ কোম্পানির প্রতিনিধি ওয়াটস। মোহনলাল, মিরমর্দান, সাঁফ্রে অস্ত্রসজ্জিত বেশে দণ্ডায়মান। নকিবের কণ্ঠে দরবারে নবাবের আগমন ঘোষিত হলো)।

- নকিব : নবাব মনসুর-উল-মলুক সিরাজউদ্দৌলা শাহকুলি খাঁ মির্জা মুহম্মদ হায়বতজঙ্গ বাহাদুর। বা-আদাব আগাহ বাশেদ।
- (সবাই আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। দৃঢ় পদক্ষেপে নবাব ঢুকলেন। সবাই নতশিরে শ্রদ্ধা জানালো।)
- সিরাজ : (সিংহাসনে আসীন হয়ে) আজকের এই দরবারে আপনাদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হয়েছে কয়েকটি জরুরি বিষয়ের মীমাংসার জন্যে।
- রাজবল্লভ : বে-আদবি মাফ করবেন জাঁহাপনা। দরবারে এ পর্যন্ত তেমন কোনো জরুরি বিষয়ের মীমাংসা হয়নি। তাই আমরা তেমন-
- সিরাজ : গুরুতর কোনো বিষয়ের মীমাংসা হয়নি এই জন্যে যে, গুরুতর কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে এমন আশঙ্কা আমার ছিল না। আমার বিশ্বাস ছিল যে, সিপাহসালার মিরজাফর, রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকবেন। আমার পথ বিঘ্নসঙ্কুল হয়ে উঠবে না। অন্তত নবাব আলিবর্দির অনুরাগজনদের কাছ থেকে আমি তাই আশা করেছিলাম।
- মিরজাফর : জাঁহাপনা কি আমাদের আচরণে সন্দেহ প্রকাশ করছেন?
- সিরাজ : আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবার কোনো বাসনা আমার নেই। আমার নালিশ আজ আমার নিজের বিরুদ্ধে। বিচারক আপনারা। বাংলার প্রজা সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে পারিনি বলে আমি তাদের কাছে অপরাধী। আজ সেই অপরাধের জন্যে আপনাদের কাছে আমি বিচারপ্রার্থী।
- জগৎশেঠ : আপনার অপরাধ।
- সিরাজ : পরিহাস বলে মনে হচ্ছে শেঠজি? চেয়ে দেখুন এই লোকটার দিকে (ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহরী একজন হতশ্রী ব্যক্তিকে দরবারে হাজির করল। সে ডুকরে কেঁদে উঠল।)
- রায়দুর্লভ : একি! এর এই অবস্থা কে করলে? (তরবারি নিক্ষেপন)
- সিরাজ : তরবারি কোষবদ্ধ করুন রায়দুর্লভ! এর এই অবস্থার জন্যে দায়ী সিরাজের দুর্বলশাসন।



- উৎপীড়িত : আমাকে শেষ করে দিয়েছে হুজুর।
- মিরজাফর : আমরা যে কিছুই বুঝতে পারছি নে জাঁহাপনা।
- উৎপীড়িত : লবণ বিক্রি করিনি বলে কুঠির সাহেবদের লোকজন আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। (ক্রন্দন)
- সিরাজ : (সিংহাসনের হাতলে ঘুমি মেরে) কেঁদনা। শুকনো খটখটে গলায় বলো আর কী হয়েছে। আমি দেখতে চাই, আমার রাজত্বে হৃদয়হীন জালিমের বিরুদ্ধে অসহায় মজলুম কঠিনতর জালিম হয়ে উঠছে।
- উৎপীড়িত : লবণ বিক্রি করিনি বলে কুঠির সাহেবদের লোকজন আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। ষণ্ডা ষণ্ডা পাঁচজনে মিলে আমার পোয়াতি বউটাকে— ওহ হো হো (কান্না)— আমি দেখতে চাইনি। কিন্তু চোখ বুজলেই ওদের আর একজন আমার নখের ভেতরে খেজুর কাঁটা ফুটিয়েছে। আমার বউকে ওরা খুন করে ফেলেছে হুজুর। (কান্নায় ভেঙে পড়ল)
- সিরাজ : (হঠাৎ আসন ত্যাগ করে ওয়াটসের কাছে গিয়ে প্রবল কণ্ঠে) ওয়াটস!
- ওয়াটস : (ভয়ে বিবর্ণ) Your Excellency.
- সিরাজ : আমার নিরীহ প্রজাতির এই দুরবস্থার জন্যে কে দায়ী?
- ওয়াটস : How can I know that your Excellency?
- সিরাজ : তুমি কী করে জানবে? তোমাদের অপকীর্তির কোনো খবর আমার কাছে পৌঁছায় না ভেবেছো? কুঠিয়াল ইংরেজরা এমনি করে দৈনিক কতগুলো নিরীহ প্রজার ওপর অত্যাচার করে তার হিসেব দাও।
- ওয়াটস : আপনি আমায় অপমান করছেন Your Excellency. দেশের কোথায় কী হচ্ছে সে কৈফিয়ত আমি দেবো কী করে? আমি তো আপনার দরবারে কোম্পানির প্রতিনিধি।
- সিরাজ : তুমি প্রতিনিধি? ড্রেক এবং তোমার পরিচয় আমি জানিনি ভেবেছো? দুশ্চরিত্রতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে দেশ থেকে নির্বাসিত না করে ভারতে বাণিজ্যের জন্যে তোমাদের পাঠানো হয়েছে। তাই এ দেশে বাণিজ্য করতে এসে দুর্নীতি এবং অনাচারের পথ তোমরা ত্যাগ করতে পারনি। কৈফিয়ৎ দাও, আমার নিরীহ প্রজাদের ওপর এই জুলুম কেন?
- ওয়াটস : আপনার প্রজাদের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক। আমরা ট্যাক্স দিয়ে শান্তিতে বাণিজ্য করি।
- সিরাজ : ট্যাক্স দিয়ে বাণিজ্য করো বলে আমার নিরীহ প্রজার ওপরে অত্যাচার করবার অধিকার তোমরা পাওনি। (সমবেত সকলকে উদ্দেশ্য করে)
- এই লোকটি লবণ প্রস্তুতকারক। লবণের ইজারাদার কুঠিয়াল ইংরেজ। স্থানীয় লোকদের তৈরি যাবতীয় লবণ তারা তিন চার আনা মণ দরে পাইকারি হিসেবে কিনে নেয়। তারপর এখানে বসেই এখানকার লোকের কাছে সেই লবণ বিক্রি করে দুটাকা আড়াই টাকা মণ দরে।
- মিরজাফর : এ তো ডাকাতি।
- সিরাজ : আপনাদের পরামর্শেই আমি কোম্পানিকে লবণের ইজারাদারি দিয়েছি। আপনারা আমাকে বুঝিয়েছিলেন রাজস্বের পরিমাণ বাড়লে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড মজবুত হয়ে উঠবে। কিন্তু এই কি তার প্রমাণ? এই লোকটি কুঠিয়াল ইংরেজদের কাছে পাইকারি দরে লবণ বিক্রি করতে চায়নি বলে তার এই অবস্থা। বলুন শেঠজি, বলুন রাজবল্লভ, ব্যক্তিগত অর্থলালসায় বিচারবুদ্ধি হারিয়ে আমি এই কুঠিয়ালদের প্রশ্রয় দিয়েছি কিনা? বলুন সিপাহসালার, বলুন রায়দুর্লভ, আমি এই অনাচারীদের বিরুদ্ধে শাসন-শক্তি প্রয়োগ করবার সদিচ্ছা দেখিয়েছি কিনা? বিচার করুন। আপনাদের কাছে আজ আমি আমার অপরাধের বিচারপ্রার্থী। (প্রহরী উৎপীড়িত লোকটিকে বাইরে নিয়ে গেল)
- রাজবল্লভ : জাঁহাপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না। কিন্তু প্রকাশ্য দরবারে এমন সুচিন্তিত পরিকল্পনায় আমাদের অপমান না করলেও চলত।
- জগৎশেঠ : নবাবের কাছে আমাদের পদমর্যাদার কোনো মূল্যই নেই। তাই—
- সিরাজ : আপনারাও সবাই মিলে নবাবের মর্যাদা যে কোনো মূল্যে বিক্রি করে দিতে চান এই তো?
- মিরজাফর : এ-কথা বলে নবাব আমাদের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রের অভিযোগ আনতে চাইছেন। এই অযথা দুর্ব্যবহার আমরা হুঁষ্ট মনে গ্রহণ করতে পারব কি না সন্দেহ।



সিরাজ : বাংলার নবাবকে ভয় দেখাচ্ছেন সিপাহসালার? দরবারে বসে নবাবের সঙ্গে কী রকম আচরণ করা বিধেয় তাও আপনার স্মরণ নেই? এই মুহূর্তে আপনাকে বরখাস্ত করে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব আমি নিজে গ্রহণ করতে পারি। জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ সবাইকে কয়েদখানায় আটক রাখতে পারি। হ্যাঁ কোনো দুর্বলতা নয়। শত্রুর কবল থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে আমাকে তাই করতে হবে। মোহনলাল।

(মোহনলাল তরবারি নিষ্কাশন করল)

সিরাজ : (হাতের ইঙ্গিতে মোহনলালকে নিরস্ত করে শান্তভাবে) না, আমি তা করব না। ধৈর্য ধরে থাকব। অসংখ্য ভুল বোঝাবুঝি, অসংখ্য ছলনা এবং শাঠ্যের ওপর আমাদের মৌলিক সম্প্রীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজ সন্দেহেরও কোনো অবকাশ রাখব না।

মিরজাফর : আমাদের প্রতি নবাবের সন্ধি মনোভাবের পরিবর্তন না হলে দেশের কল্যাণের কথা ভেবে আমরা উৎকর্ষিত হয়ে উঠব।

সিরাজ : ওই একটি পথ সিপাহসালার— দেশের কল্যাণ, দেশবাসীর কল্যাণ। শুধু ওই একটি পথেই আবার আমরা উভয়ে উভয়ের কাছাকাছি আসতে পারি। আমি জানতে চাই, সেই পথে আপনারা আমার সহযাত্রী হবেন কি না?

রাজবল্লভ : জাঁহাপনার উদ্দেশ্য স্পষ্ট জানা দরকার।

সিরাজ : আমার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট নয়। কলকাতায় ওয়াটস এবং ক্লাইভ আলিনগরের সন্ধি খেলাপ করে, আমার আদেশের বিরুদ্ধে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ করেছে। তাদের ঔদ্ধত্য বিদ্রোহের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এখনি এর প্রতিবিধান করতে না পারলে ওরা একদিন আমাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় হস্তক্ষেপ করবে।

মিরজাফর : জাঁহাপনা আমাদের হুকুম করুন।

সিরাজ : আমি অন্তহীন সন্দেহ-বিদ্বেষের উর্ধ্বে ভরসা নিয়েই আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। তবু বলছি আপনারা ইচ্ছে করলে আমাকে ত্যাগ করতে পারেন। বোঝা যতই দুর্বল হোক আমি একাই তা বইবার চেষ্টা করব। শুধু আপনাদের কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ যে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে আপনারা আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না।

মিরজাফর : দেশের স্বার্থের জন্যে নিজেদের স্বার্থ তুচ্ছ করে আমরা নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।

সিরাজ : আমি জানতাম দেশের প্রয়োজনকে আপনারা কখনও তুচ্ছ জ্ঞান করবেন না।

(সিরাজের ইঙ্গিতে প্রহরী তাঁর হাতে কোরান শরীফ দিল। সিরাজ দুহাতে সেটা নিয়ে চুমু খেয়ে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর মিরজাফরের দিকে এগিয়ে দিলেন। মিরজাফর নতজানু হয়ে দুহাতে পবিত্র কোরান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন।)

মিরজাফর : আমি আল্লাহর পাক কালাম ছুঁয়ে ওয়াদা করছি, আজীবন নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।

(সিরাজ প্রহরীর হাতে কোরান শরীফ সমর্পণ করলেন এবং অপর প্রহরীর হাত থেকে তামা, তুলসী, গঙ্গাজলের পাত্র গ্রহণ করলেন। তাঁর ইঙ্গিত পেয়ে একে একে রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ নিজের নিজের প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করে গেলেন।)

রাজবল্লভ : আমি রাজবল্লভ, তামাতুলসী গঙ্গাজল ছুঁয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, আমার জীবন নবাবের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত।

রায়দুর্লভ : ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, সর্বশক্তি নিয়ে চিরকালের জন্যে আমি নবাবের অনুগামী।

উমিচাঁদ : রামজিকি কসম, ম্যায় কোরবান হুঁ নওয়াবকে লিয়ে।

(প্রহরী গঙ্গাজলের পাত্র নিয়ে চলে গেল।)

সিরাজ : (ওয়াটসকে) ওয়াসটস।

ওয়াটস : Your Excellency.

সিরাজ : আলিনগরের সন্ধির শর্ত অনুসারে কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে দরবারে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। সেই সম্মানের অপব্যবহার করে এখানে বসে তুমি গুপ্তচরের কাজ করছো। তোমাকে সাজা না দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছি। বেরিয়ে যাও দরবার থেকে। ক্লাইভ আর ওয়াটসকে গিয়ে সংবাদ দাও যে, তাদের আমি উপযুক্ত



শিক্ষা দেব। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বেইমান নন্দকুমারকে ঘুষ খাইয়ে তারা চন্দননগর ধ্বংস করেছে। এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি তাদের যথাযোগ্যভাবেই দেওয়া হবে।

ওয়াটস : Your Excellency.

(কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল)

[দৃশ্যান্তর]

দ্বিতীয় অংক: দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ১৯ মে। স্থান : মিরজাফরের আবাস।

[চরিত্রবৃন্দ : মঞ্চ প্রবেশের পর্যায় অনুসারে— জগৎশেঠ, মিরজাফর, রাজবল্লভ, রাইসুল জুহালা, প্রহরী]

(মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত— মিরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ)

জগৎশেঠ : সিপাহসালার বড় বেশি হতাশ হয়েছেন।

মিরজাফর : না শেঠজি, হতাশ হবার প্রশ্ন নয়। আমি নিস্তক হয়েছি। অগ্নিগিরির মতো প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছি। বুকের ভেতর আকাঙ্ক্ষা আর অধিকারের লাভা টগবগ করে ফুটে উঠছে ঘৃণা আর বিদ্বেষের অসহ্য উত্তাপে। এবার আমি আঘাত হানবোই।

রাজবল্লভ : প্রকাশ্য দরবারে এতবড় অপমানের কথা আমি কল্পনাও করিনি।

মিরজাফর : শুধু অপমান! প্রাণের আশঙ্কায় সে আমাদের আতঙ্কিত করে তোলেনি? পদস্থ কেউ হলে মানীর মর্যাদা বুঝত। কিন্তু মোহনলালের মতো সামান্য একটা সিপাই যখন তলোয়ার খুলে সামনে দাঁড়াল তখন আমার চোখে কেয়ামতের ছবি ভেসে উঠেছিল।

রায়দুর্লভ : সিপাহসালারের অপমানটাই আমার বেশি বেজেছে।

মিরজাফর : এখন আপনারা সবাই আশা করি বুঝতে পারছেন যে, সিরাজ আমাদের স্বস্তি দেবে না।

জগৎশেঠ : তা দেবে না। চতুর্দিকে বিপদ, তা সত্ত্বেও সে আমাদের বন্দি করতে চায়। এরপর সিংহাসনে স্থির হতে পারলে তো কথাই নেই।

রাজবল্লভ : আমাদের অস্তিত্বই সে লোপ করে দেবে। আমাদের সম্বন্ধে যতটুকু সন্দেহ নবাবের বাইরের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে, প্রকাশ পায়নি তার চেয়ে বহু গুণ বেশি। শওকতজঙ্গের ব্যাপারে নবাব আমাদের কিছুই জিজ্ঞাসা করেনি। শুধু মোহনলালের অধীনে সৈন্য পাঠিয়ে তাকে বিনাশ করেছে। এতে আমাদের নিশ্চিত হবার কিছুই নেই।

জগৎশেঠ : তার প্রমাণ তো রয়েছে হাতের কাছে। আমাদের গ্রোফতার করতে গিয়েও করেনি। কিন্তু রাজা মানিকচাঁদকে তো ছাড়ল না। তাকে তো কয়েদখানায় যেতে হল। শেষ পর্যন্ত দশ লক্ষ টাকা খেসারত দিয়ে তবে তার মুক্তি। আমি দেখতে পাচ্ছি নন্দকুমারের অদৃষ্টেও বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।

মিরজাফর : আমাদের কারও অদৃষ্ট মেঘমুক্ত থাকবে না শেঠজি।

রাজবল্লভ : আমি ভাবছি তেমন দুঃসময় যদি আসে, আর মূল্য দিয়ে মুক্তি কিনবার পথটাও যদি খোলা থাকে, তা হলেও সে মূল্যের পরিমাণ এত বিপুল হবে যে আমরা তা বইতে পারব কিনা সন্দেহ। মানিকচাঁদের মুক্তিমূল্য যদি দশ লক্ষ টাকা হয়ে থাকে তা হলে জগৎশেঠের মুক্তিমূল্য পঞ্চাশ কোটি টাকার কম হবে না।

জগৎশেঠ : ওরে বাবা! তার চেয়ে গলায় পা দিয়ে বুকের ভেতর থেকে কলজেটাই টেনে বার করে আনুক। পঞ্চাশ কোটি? আমার যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রি করেও এক কোটি টাকা হবে না। ধরতে গেলে মাসের খরচটাইতো ওঠে না। নবাবের হাত থেকে ধন সম্পদ রক্ষার জন্যে মাসে অজস্র টাকা খরচ করে সেনাপতি ইয়ার লুৎফ খাঁয়ের অধীনে দুহাজার অশ্বরোহী পুষতে হচ্ছে।

মিরজাফর : কাজেই আর কালক্ষেপ নয়।

রাজবল্লভ : আমরা প্রস্তুত। কর্মপন্থা আপনিই নির্দেশ করুন। আমরা একবাক্যে আপনাকেই নেতৃত্ব দিলাম।

মিরজাফর : আমার ওপরে আপনাদের আন্তরিক ভরসা আছে তা আমি জানি। তবু আজ একটা বিষয় খোলসা করে নেওয়া উচিত। আজ আমরা সবাই সন্দেহ-দোলায় দুলছি। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি নে। তাই আমাদের সিদ্ধান্ত কাগজে কলমে পাকাপাকি করে নেওয়াই আমার প্রস্তাব।



জগৎশেঠ : আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।

রায়দুর্লভ : এতে আপত্তির কী থাকতে পারে?

(নেপথ্যে কণ্ঠস্বর)

নেপথ্যে : ওরে বাবা কতবার করে দেখাতে হবে? দেউড়ি থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত মোট একুশ বার দেখিয়েছি। এই দেখো বাবা, আর একটিবার দেখো। হলো তো?

(রাইসুল জুহালা কামরায় ঢুকলেন)

কী গেরোরে বাবা।

মিরজাফর : কী হয়েছে?

রাইস : সালাম হুজুর। ওই পাহারাওয়ালা হুজুর। সবাই হাত বাড়িয়ে আঙুল নাচিয়ে বলে, দেখলাও। দেরি করলে তলোয়ারে হাত দেয়। আমি বলি আছে বাবা, আছে। খোদ নবাবের পাঞ্জা—

মিরজাফর : (সন্ত্রস্ত) নবাবের পাঞ্জা?

রাইস : আলবৎ হুজুর। কেন নয়? (আবার কুণ্ঠিত করে) হুজুরের নবাব হতে আর বাকি কী?

মিরজাফর : (প্রসন্ন হাসি হেসে) সে যাক। খবর কী তাই বলো।

রাইস : প্রায় শেষ খবর নিয়ে এসেছিলাম হুজুর। তলোয়ারের খাড়া এক কোপ। একেবারে গর্দান সমেত—

রাজবল্লভ : (বিরক্ত) আবোল তাবোল বকে বড় বেশি সময় নষ্ট করছো রাইস মিয়া।

রাইস : (ক্ষুব্ধ) আবোল তাবোল কী হুজুর, বলছি তো তলোয়ারের খাড়া এক কোপ। লাফিয়ে সরে দাঁড়িয়ে তাই রক্ষে। তবে এই দেখুন। (পকেট থেকে দ্বিখন্ডিত মূলার নিম্নাংশ বার করল) একটু নুন জোগাড় হলোই কাঁচা খাবো বলে মূলোটা হাতে নিয়েই ঘুরছিলাম। ক্লাইভ সাহেবের তলোয়ারের কোপে সেটাই দুখণ্ড।

জগৎশেঠ : এ যে দেখি ব্যাপারটা ক্রমশ ঘোরালো করে তুলছে। ক্লাইভ সাহেব তোমাকে তলোয়ারের কোপ মারতে গেল কেন?

রাইস : গেরো হুজুর। কপালের গেরো। উমিচাঁদজির চিঠি নিয়ে তার কাছে গেলাম। তিনি চিঠি না পড়ে কটমট করে আমার দিকে চাইতে লাগলেন। তারপর ওঁর কামানের মতো গলা দিয়ে একতাল কথার গোলা ছুটে বার হলো: আর ইউ এ স্পাই? এবং সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রশ্নই বাংলায়— তুমি গুপ্তচর? এমন এক অদ্ভুত উচ্চারণ করলেন, আমি শুনলাম তুমি ঘুফুৎচোর? চোর এ কথাটা শুনেই মাথা গরম হয়ে উঠল। তা ছাড়া ঘুফুৎচোর? হিঁচকে চোর থেকে আরম্ভ করে হাড়ি চোর, শাড়ি চোর, গামছা চোর, বদনা চোর, জুতো চোর, গরু চোর, সিঁকেল চোর, কাফন চোর। আমাদের আপনাদের ভেতরে হুজুর কত রকমারি চোরের নাম যে শুনেছি আর তাদের চেহারা চিনেছি তার আর হিসেব নেই। কিন্তু ঘুফুৎচোর? আর আমি স্বয়ং। হিতাহিত বিচার না করে হুজুর মুখের ওপরেই বলে ফেললাম, (মৃদুহাসি) একটু ইংরেজিও তো জানি, ইংরেজিতেই বললাম, ইউ শাট আপ। সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারের এক কোপ। (হেসে উঠে) অহঙ্কার করব না হুজুর, লাফটা যা দিয়েছিলাম একবারে মাপা। তাই আমার গর্দানের বদলে ক্লাইভ সাহেবের ভাগ্যে জুটেছে মূলোর মাথাটা।

মিরজাফর : কথা থামাবে রাইস মিয়া।

রাইস : হুজুর।

মিরজাফর : এখন তুমি কার কাছ থেকে আসছ?

রাইস : উমিচাঁদজির কাছ থেকে। এই যে চিঠি। (পত্র দিল)

মিরজাফর : (পত্র পড়ে রাজবল্লভের দিকে এগিয়ে দিলেন) ক্লাইভ সাহেবের ওখানে কাকে দেখলে?

রাইস : অনেকগুলো সাহেব মেমসাহেব হুজুর। ভূত ভূত চেহারা সব।

মিরজাফর : কারো নাম জানো না?

রাইস : সব তো বিদেশি নাম। এদেশি হলে পুরুষগুলোকে বলা যেত— বেম্বোদতি, জটাধারী, মামদো, পেঁচো, চোয়ালে পেঁচো, গলায় দড়ে, এক ঠেংগে, কন্দকাটা ইত্যাদি। মেয়েগুলোকে বলতে পারতাম শাঁকচুল্লী, উলকামুখী, আঁষটেপেতি, কানি পিশাচী এইসব আর কী।

জগৎশেঠ : রাইস মিয়ার মুখে কথার খই ফুটছে।

রাইস : রাত-বেরাতে চলাফেরা করি, ভূত-পেত্রির সঙ্গেও যোগ রাখতে হয় হুজুর।



(চিঠিখানা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ এবং রায়দুর্লভের হাত ঘুরে আবার মিরজাফরের হাতে এলো।)

- মিরজাফর : একে তাহলে বিদায় দেওয়া যাক?
- রাজবল্লভ : চিঠির জবাব দেবেন না?
- মিরজাফর : চিঠিপত্র যত কম দেওয়া যায় ততই ভালো। কে জানে কোথায় সিরাজের গুপ্তচর ওৎ পেতে বসে আছে।
- জগৎশেঠ : তাছাড়া আমাদের গুপ্তচরদেরই বা বিশ্বাস কী? তারা মূল চিঠি হয়ত আসল জায়গায় পৌঁছচ্ছে; কিন্তু একখানা করে তার নকল যথাসময়ে নবাবের লোকের হাতে পাচার করে দিচ্ছে।
- রাইস : সন্দেহ করাটা অবশ্য বুদ্ধিমানের কাজ; কিন্তু বেশি সন্দেহে বুদ্ধি ঘুলিয়ে যেতে পারে। একটা কথা মনে রাখবেন হুজুর, গুপ্তচররাও যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে। তাদের বিপদের ঝুঁকিও কম নয়।
- জগৎশেঠ : কিছু মনে কোনো না। তোমার সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করিনি।
- মিরজাফর : তুমি তাহলে এখন এসো। উমিচাঁদজিকে আমার এই সাংকেতিক মোহরটা দিও। তাহলেই তিনি তোমার কথা বিশ্বাস করবেন। তাঁকে বোলো, দুশ্বর জায়গায় আগামী মাসের ৮ তারিখে সব কিছু লেখাপড়া হবে।
- রাইস : হুজুর! (সাংকেতিক মোহরটা নিয়ে বেরিয়ে গেল)
- মিরজাফর : কত কিছুই হতে পারে শেঠজি। আমরাই কি দিনকে রাত করে তুলছি? নবাবের মির মুন্সি আসল চিঠি গায়েব করে নকল চিঠি পাঠাচ্ছে কোম্পানির কাছে তাতেই তো ওদের এত সহজে ক্ষেপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বুদ্ধিটা অবশ্য রাজবল্লভের; কিন্তু ভাবুন তো কতখানি দায়িত্ব এবং বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে নবাবের বিশ্বাসী মির মুন্সি।
- জগৎশেঠ : তা তো বটেই। গুপ্তচরের সহায়তা ছাড়া আমরা এক পা-ও এগোতে পারতাম না।
- মিরজাফর : প্রস্তুতি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন আমি ভাবছি ইংরেজদের ওপরে পুরোপুরি নির্ভর করা যাবে কি না?
- রাজবল্লভ : তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওরা বেনিয়ার জাত। পয়সা ছাড়া কিছু বোঝে না। ওরা জানে সিরাজউদ্দৌলার কাছ থেকে কোনো রকম সুবিধার আশা নেই। কাজেই সিপাহসালারকে সিংহাসনে বসবার জন্যে ওরা সব রকমের সাহায্য দেবে।
- জগৎশেঠ : অবশ্য টাকা ছাড়া। কারণ সিরাজকে গদিচ্যুত করা ওদের প্রয়োজন হলেও সিপাহসালারকে ওরা সাহায্য দেবে নগদ মূল্যের বিনিময়ে।
- রাজবল্লভ : সেটাও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে কিনা তা তো বুঝতে পারছি। আমি যতদূর শুনেছি ওদের দাবি দুকোটি টাকার ওপরে যাবে। কিন্তু এত টাকা সিরাজউদ্দৌলার তহবিল থেকে কোনো ক্রমেই পাওয়া যাবে না।
- মিরজাফর : আমরা অনেকদূর এগিয়ে এসেছি রাজা রাজবল্লভ। ওকথা আর এখন ভাবলে চলবে না। সকলের স্বার্থের খাতিরে ক্লাইভের দাবি মেটাবার যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। (বিভোর কণ্ঠে) সফল করতে হবে আমার স্বপ্ন। বাংলার মসনদ-নবাব আলিবর্দির আমলে, উদ্ধত সিরাজের আমলে মসনদের পাশে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আমি এই কথাই শুধু ভেবেছি, একটা দিন মাত্র একটা দিনও যদি ওই মসনদে মাথা উঁচু করে আমি বসতে পারতাম।

[দৃশ্যান্তর]

দ্বিতীয় অংক: তৃতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ৯ জুন। স্থান : মিরনের আবাস।

[চরিত্রবৃন্দ : মঞ্চের প্রবেশের পর্যায় অনুসারে— নর্তকীগণ, বাদকগণ, মিরন, পরিচারিকা, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, মিরজাফর, ওয়াটস, ক্লাইভ, রক্ষী, মোহনলাল।]

(ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত মিরন। পার্শ্বে উপবিষ্টা নর্তকীর হাতে ডান হাত সমর্পিত। অপর নর্তকী নৃত্যরতা। নৃত্যের মাঝে মাঝে সুরামত্ত মিরনের উল্লাসধ্বনি।)

মিরন : সাবাস। বহোত খুব। তোমরা আছ বলেই বেঁচে থাকতে ভালো লাগে।

(নর্তকী নাচের ফাঁকে এক টুকরো হাসি ছুঁড়ে দিল মিরনের দিকে। পরিচারিকা কামরায় এসে চিঠি দিলো মিরনের হাতে। সেটা পড়ে বিরক্ত হলো মিরন। তবু পরিচারিকাকে সম্মতি সূচক ইঙ্গিত করতেই সে বেরিয়ে গেল।)



পার্শ্বে উপবিষ্টা নর্তকী মিরনের ইঙ্গিতে কামরার অন্যদিকে চলে গেল। অল্প পরেই ছদ্মবেশধারী এক ব্যক্তিকে কামরায় পৌঁছিয়ে দিয়ে পরিচারিকা চলে গেল।)

- মিরন : সেনাপতি রায়দুর্লভ এ সময়ে এখানে আসবেন তা ভাবিনি। (নর্তকীদের চলে যেতে ইঙ্গিত করল)
- রায়দুর্লভ : আমাকে আপনি নৃত্যগীতের সুধারসে একেবারে নিরাসক্ত বলেই ধরে নিয়েছেন।
- মিরন : তা নয়, তবে আপনি যখন ছদ্মবেশে হঠাৎ এখানে উপস্থিত হয়েছেন তখন বুঝেছি প্রয়োজন জরুরি। তাই সময় নষ্ট করতে চাইলুম না।
- রায়দুর্লভ : দুদণ্ড সময় নষ্ট করে একটু আমোদ-প্রমোদই না হয় হতো। অহরহ অশান্তি আর অব্যবস্থার মধ্যে থেকে জীবন বিস্বাদ হয়ে উঠেছে। কিন্তু (একজনকে দেখিয়ে) এ নর্তকীকে আপনি পেলেন কোথায়? একে যেন এর আগে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। সে যাক। হঠাৎ আপনার এখানে বৈঠকের আয়োজন? তা-ও খবর পেলাম কিছুক্ষণ আগে।
- মিরন : আমার এখানে না করে উপায় কী? মোহনলালের গুপ্তচর জীবন অসম্ভব করে তুলেছে। আমার বাসগৃহ অনেকটা নিরাপদ। কারণ মোহনলাল জানে যে, আমি নাচ-গানে মশগুল থাকতেই ভালবাসি।
- রায়দুর্লভ : কে কে আসছেন এখানে।
- মিরন : প্রয়োজনীয় সবাই। তা ছাড়া বাইরে থেকে বিশেষ অতিথি হিসেবে আসবেন কোম্পানির প্রতিনিধি কেউ একজন।
- রায়দুর্লভ : কোম্পানির প্রতিনিধি কলকাতা থেকে এখানে আসছেন?
- মিরন : তিনি আসবেন কাশিম বাজার থেকে।
- রায়দুর্লভ : সে যা হোক আলোচনায় আমি থাকতে পারব না। কারণ আমার পক্ষে বেশিক্ষণ বাইরে থাকা নিরাপদ নয়। কখন কী কাজে তলব করে বসবেন তার ঠিক নেই। তলবের সঙ্গে সঙ্গে হাজির না পেলে তখন সন্দেহ জমে উঠবে। আপনার কাছে তাই আগেভাগে এলাম শুধু আমার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা হলো জানবার জন্যে।
- মিরন : আপনার ব্যবস্থা তো পাকা। সিরাজের পতন হলে আব্বা হবেন মসনদের মালিক। কাজেই সিপাহসালার-এর পদ আপনার জন্যে একবারে নির্দিষ্ট।
- রায়দুর্লভ : আমার দাবিও তাই। তবে আর একটা কথা। চারদিককার অবস্থা দেখে যদি বুঝি যে, আপনাদের সাফল্যের কোনো আশা নেই, তা হলে কিন্তু আমার সহায়তা আপনারা আশা করবেন না?
- মিরন : (ঈর্ষা বিস্মিত) কী ব্যাপার? আপনাকে যেন কিছুটা আতঙ্কিত মনে হচ্ছে।
- রায়দুর্লভ : আতঙ্কিত নই। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। চারদিকে শুধু অবিশ্বাস আর ষড়যন্ত্র। এর ভেতরে কর্তব্য স্থির করাই দায় হয়ে উঠেছে।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

- পরিচারিকা : মেহমান।
- রায়দুর্লভ : আমি সরে পড়ি।
- মিরন : বসেই যান না। মেহমানরা এসে পড়েছেন। কিছুক্ষণের ভেতরেই বৈঠক শুরু হয়ে যাবে।
- রায়দুর্লভ : না আমার কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। আমি পালাই। কিন্তু আমার সঙ্গে যে ওয়াদা তার যেন খেলাপ না হয়। (প্রস্থান)

(পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করে মিরন কিছুটা প্রস্তুত হয়ে বসল। কামরায় ঢুকলেন রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মিরজাফর। মিরন সমাদর করে তাদের বসালো।)

- মিরন : একটু আগে রায়দুর্লভ এসেছিলেন। ব্যক্তিগত কারণে তিনি আলোচনায় থাকতে পারবেন না বললেন। কিন্তু তাঁর দাবির কথাটা আমার কাছে তিনি খোলাখুলিই জানিয়ে গেছেন।
- জগৎশেঠ : তাঁকে প্রধান সেনাপতি পদ দিতে হবে এই তো?
- রাজবল্লভ : সবাই উচ্চাভিলাষী। সবাই সুযোগ খুঁজছে। তা না হলে রায়দুর্লভ মাসে মাসে আমার কাছ থেকে যে বেতন পাচ্ছে তাতেই তার স্বর্গ হাতে পাবার কথা।



মিরজাফর : ও সব কথা থাক রাজা। সবাই একজোটে কাজ করতে হবে। সকলের দাবিই মানতে হবে। রায়দুর্লভ ক্ষুদ্র শক্তিধর। তার সাহায্যেই আমরা জিতব এমন কথা নয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নবাবের সঙ্গে তার বিশ্বাসঘাতকতার গুরুত্ব আছে বৈ কি!

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা : জানানো সওয়ারি।

(সবাই একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। মিরজাফর হঠাৎ পকেট থেকে কয়েক টুকরো কাগজ বের করে তাতে মন দিলেন। মিরন লজ্জিত। হঠাৎ আত্মসংবরণ করে ধমকে উঠল)

মিরন : ভাগো হিঁয়াসে, কমবখৎ।

(পরিচারিকার দ্রুত প্রস্থান)

রাজবল্লভ : (ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে) চট করে দেখে এসো। আত্মীয়রাই কেউ হবেন হয়ত।

(সুযোগটুকু পেয়ে মিরন তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল। অভাবিত পরিবেশ এড়াবার জন্যে জগৎশেঠ নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন)

জগৎশেঠ : আজকের আলোচনায় উমিচাঁদ অনুপস্থিত। কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে তো আর কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব নয়।

মিরজাফর : (হঠাৎ যেন পরিবেশের খেই ধরতে পেয়েছেন) আরে বাপরে, একবারে কাল কেউটে। তার দাবিই তো সকলের আগে। তা না হলে দণ্ড না পেরোতেই সমস্ত খবর পৌঁছে যাবে নবাবের দরবারে। মনে হয় কলকাতায় বসেই সে চুক্তিতে স্বাক্ষর দেবে। (দুজন মহিলাসহ উল্লসিত মিরন কামরায় ঢুকলো)

মিরন : ঐরাই জানানো সওয়ারি।

(রমনীর ছদ্মবেশ ত্যাগ করলেন ওয়াটস এবং ক্লাইভ মিরন বেরিয়ে গেল)

ওয়াটস : Sorry to disappoint you gentlemen. ইনি রবার্ট ক্লাইভ।

মিরজাফর : (সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে) কর্নেল ক্লাইভ?

ক্লাইভ : Are you surprised? অবাক হলেন।

মিরজাফর : অবাক হবারই কথা। এ সময়ে এভাবে এখানে আসা খুবই বিপজ্জনক।

ক্লাইভ : বিপদ? কার বিপদ জাফর আলি খান? আপনার না আমার?

মিরজাফর : দুজনেরই। তবে আপনার কিছুটা বেশি।

ক্লাইভ : আমার কোনো বিপদ নেই। তা ছাড়া বিপদ ঘটাবে কে?

জগৎশেঠ : নবাবের গুণ্ডচরের হাতে তো পড়েনি?

ক্লাইভ : নবাবকে আমার কোনো ভয় নেই। কারণ সে আমাদের কিছুই করতে পারবে না।

রাজবল্লভ : কেন পারবে না? গাল ফুলিয়ে বড় বড় কথা বললেই সব হয়ে গেল নাকি! তুমি এখানে একা এসেছো। তোমাকে বস্তাবন্দি হলো বেড়ালের মতো পানাপুকুরে দুচারটে চুবুনি দিতে বাদশাহের ফরমান জোগাড় করতে হবে নাকি?

ক্লাইভ : I do not understand your Hulo business. But am sure Nabab can cause no harm to us.

জগৎশেঠ : ভগবানের দিব্যি কর্নেল সাহেব, তোমরা বড় বেহায়া। এই সেদিন কলকাতায় যা মার খেয়েছো এখনো তার ব্যথা ভোলার কথা নয়। এরি ভেতরে—

ক্লাইভ : দেখো শেঠজি, এক আধবার অমন হয়েই থাকে। তাছাড়া রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে এখনো যুদ্ধ হয়নি। যখন হবে তখন তোমরাই তার ফলাফল দেখবে।

রাজবল্লভ : সেটা দেখবার আগেই গলাবাজি করছ কেন?

ক্লাইভ : এই জন্যে যে নবাবের কোনো ক্ষমতা নেই। যার প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক, যার খাজাঞ্চি, দেওয়ান, আমির, ওমরাহ সবাই প্রতারক তার কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের ক্ষতি করতে পারেন।



- রাজবল্লভ : আমরা?
- ক্লাইভ : Why not? আপনারা সব পারেন। আজ নবাবকে ডোবাচ্ছেন, কাল আমাদের পথে বসাবেন না তা কি বিশ্বাস করা যায়? আমি বরং নবাবকে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু-
- মিরজাফর : এই সব কথার জন্যেই আমরা এখানে হাজির হয়েছি নাকি?
- ক্লাইভ : Sorry, Mr. Jafar Ali Khan. হ্যাঁ একটা জরুরি কথা আগেই সেরে নেওয়া যাক। উমিচাঁদ এ যুগের সেরা বিশ্বাসঘাতক। আমাদের প্লানের কথা সে নবাবকে জানিয়ে দিয়েছে। কলকাতা attack এর সময়ে তার যা ক্ষতি হয়েছিল নবাব তা compensate করতে চেয়েছেন। Scoundrel টা আবার এক নতুন offer নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে।
- মিরজাফর : আমি শুনেছি সে আরও ত্রিশ লক্ষ টাকা চায়।
- ক্লাইভ : এবং তাকে অত টাকা দেবার মতো পজিশান আমাদের নয়। থাকলেও আমরা তা দেব না। কেন দেব? Why? Thirty lacs of rupees is no joke.
- রাজবল্লভ : কিন্তু উমিচাঁদ যে রকম ধড়িবাজ তাতে সে হয়ত অন্যরকম কিছু ষড়যন্ত্র করতে পারে। আমাদের যাবতীয় গুপ্ত খবর তার জানা।
- ক্লাইভ : Don't worry Raja। উমিচাঁদ অনেক বুদ্ধি রাখে। But Clive is no less আমি উমিচাঁদকে ঠকাবার ব্যবস্থা করেছি।
- মিরজাফর : কী রকম?
- ক্লাইভ : দুটো দলিল হবে। আসল দলিলে উমিচাঁদের কোনো reference থাকবে না। নকল দলিলে লেখা থাকবে যে, নবাব হেরে গেলে কোম্পানি উমিচাঁদকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দেবে।
- রাজবল্লভ : কিন্তু সে যদি কোনো রকমে এ কথা জানতে পারে?
- ক্লাইভ : আপনারা না জানালে জানবে না। আর জানলে কারও বুঝতে বাকি থাকবে না যে আপনারাই তা জানিয়েছেন।
- জগৎশেঠ : আমাদের সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন।
- মিরজাফর : দলিল সই করবে কে?
- ক্লাইভ : কমিটির সকলেই করেছেন। এখানে আপনি সই করবেন এবং রাজা রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ থাকবেন উইটনেস। নকল দলিলটায় এ্যাডমিরাল ওয়াটসন সই করতে রাজি হননি।
- মিরজাফর : উমিচাঁদ মানবে কেন তা হলে?
- ক্লাইভ : সে ব্যবস্থা হয়েছে। ওয়াটসনের সই জাল করে দিয়েছে লুসিংটন।
- জগৎশেঠ : তা হলে আর দেরি কেন? আমাদের আবার এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়।
- ক্লাইভ : Of course দলিল দুটোই তৈরি আছে। শুধু সই হয়ে গেলেই কাজ মিটে যায়।
(দলিলের কপি মিরজাফরের দিকে এগিয়ে দিল)
- মিরজাফর : একটু পড়ে দেখব না?
- ক্লাইভ : ড্রাফটতো আগেই পড়েছেন।
- রাজবল্লভ : তা হলেও একবার পড়ে দেখা দরকার।
- ক্লাইভ : If you want go ahead পড়ে দেখুন উমিচাঁদের মতো আপনাদেরও ঠকানো হয়েছে কি না।
- মিরজাফর : (দলিলটা রাজবল্লভের দিকে এগিয়ে দিয়ে) নিন রাজা আপনিই পড়ুন।
- রাজবল্লভ : (পড়তে পড়তে) যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতন হলে কোম্পানি পাবেন এক কোটি টাকা, কলকাতার বাসিন্দারা ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবেন সত্তর লক্ষ টাকা, ক্লাইভ সাহেব পাবেন দশ লক্ষ টাকা, এ্যাডমিরাল ওয়াটসন পাবে-
- মিরজাফর : ওগুলো দেখে আর লাভ কী?
- রাজবল্লভ : এখন আর কিছু লাভ নেই, কিন্তু ভাবছি নবাবের তহবিল দুবার করে লুট করলেও তিন কোটি টাকা পাওয়া যাবে কিনা।
- মিরজাফর : বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। আসুন দস্তখত দিয়ে কাজ শেষ করে ফেলি।



- রাজবল্লভ : এ সন্ধি অনুসারে সিপাহসালার শুধু মসনদে বসবেন। কিন্তু রাজ্য চালাবেন কোম্পানি।
- ক্লাইভ : (বিরক্ত) You are thinking like a fool.
আমরা কেন রাজ্য চালাবো। আমরা শুধু ব্যবসা বাণিজ্য করবার Privilege secure করে নিচ্ছি। তা আমাদের করতেই হবে।
- জগৎশেঠ : আপনাদের স্বার্থ রক্ষা করুন। কিন্তু দেশের শাসন ক্ষমতায় আপনারা হাত দেবেন এ তো ভালো কথা নয়।
- ক্লাইভ : (রীতিমত ক্রুদ্ধ) Then what you are going to do about it? দলিল দুটো তা হলে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। আপনাদের শর্তাদি জানিয়ে দেবেন। সেইভাবে আবার একটা খসড়া তৈরি করা যাবে।
- মিরজাফর : না না সেকি কথা? এমনিতেই বাজারে নানা রকম গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। কোন্‌দিন সিরাজউদ্দৌলা সবাইকে গারদে পুরে দেবে তার ঠিক নেই। দিন আমি দলিল সই করে দিই। শুভকাজে অযথা বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

(রাজবল্লভের হাত থেকে দলিল নিয়ে সই করতে বসল। কিন্তু একটু ইতস্তত করে-)

- মিরজাফর : বুকের ভেতের হঠাৎ যেন কেঁপে উঠল। বাইরে কোথাও মরাকান্না শুনতে পাচ্ছেন শেঠজি?
- জগৎশেঠ : না না, মরাকান্না আবার কোথায়?
- মিরজাফর : আমি যেন শুনলাম।
- ক্লাইভ : (উচ্চহাসি) বিদ্রোহী সেনাপতি অথচ Women থেকেও coward।
- রাজবল্লভ : নানা প্রকারের দুশ্চিন্তায় আপনার শরীর মন দুর্বল হয়ে পড়েছে। ও কিছু নয়।
- মিরজাফর : তাই হয়ত।

(কলম নিয়ে স্বাক্ষর দিতে গিয়ে আবার ইতস্তত করল)

- মিরজাফর : কিন্তু রাজবল্লভ যেমন বল্লেন, সবাই মিলে সত্যিই আমরা বাংলাকে বিক্রি করে দিচ্ছি না তো?
- ক্লাইভ : Oh, what nonsense আমি জানতাম coward দের ওপর কোনো কাজের জন্যেই ভরসা করা যায় না। তাই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দলিল সই করতে নিজেই এসেছি। একা ওয়াটসকে পাঠিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারিনি। এখন দেখছি আমার অনুমান অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। (মিরজাফরকে) আরে বাংলা আপনাদেরই থাকবে। রাজা হয়ে আমরা কী করব। আমরা চাই টাকা। আপনাদের কোনো ভয় নেই। you are sacrificing the Nabab and not the country. দেশের জন্যে দেশের নবাবকে আপনারা সরিয়ে দিচ্ছেন। কারণ, সে অত্যাচারী। সে থাকলে দেশের কল্যাণ হবে না।
- মিরজাফর : আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা নবাবকে সরিয়ে দিচ্ছি। সে আমাদের সম্মান দেয় না।
(দলিলে সই করল। নেপথ্যে করুণ সংগীত চলতে থাকবে। জগৎশেঠ এবং রাজবল্লভও সই করল)
- ক্লাইভ : That's all right (দলিল ভাঁজ করতে করতে) আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে। we have done a great thing- a great thing. (ক্লাইভ এবং ওয়াটস আবার রমণীর ছদ্মবেশ নিল, তারপর সবাই বেরিয়ে গেলো। অন্যদিক দিয়ে মিরনের প্রবেশ।)
- মিরন : হা হা হা। আর দেরি নেই।

(হাত তালি দিতেই পরিচারিকার প্রবেশ)

আগামীকাল যুদ্ধ। জানিস আগামী পরশু কী হবে? আগামী পরশু আমি শাহজাদা মিরন। শাহজাদা হা হা হা। তারপর একদিন বাংলার নবাব।

(দ্রুত জনৈক রক্ষীর প্রবেশ)

- রক্ষী : হুজুর, সেনাপতি মোহনলাল।
- মিরন : (আতঙ্কিত) মোহনলাল।

(ফরাসে বসে পড়ল। মোহনলালের প্রবেশ)

- মোহনলাল : শুনলাম আজ এখানে ভারী জলসা হচ্ছে। বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত আছেন। তাই খোঁজ নিতে এলাম।
- মিরন : সেনাপতি মোহনলাল, আপনার দুঃসাহসের সীমা নেই। আমার প্রাসাদে কার অনুমতিতে আপনি প্রবেশ করেছেন?



মোহনলাল : প্রয়োজন মতো যে কোনো জায়গায় যাবার অনুমতি আমার আছে। সত্য বলুন এখানে গুপ্ত ষড়যন্ত্র হচ্ছিল কি না?

মিরন : মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন সেনাপতি। জানেন এর ফল কী ভয়ানক হতে পারে? নবাবের সঙ্গে আবার সমস্ত গোলমাল সেদিন প্রকাশ্যে মিটমাট হয়ে গেল। নবাব তাকে বিশ্বাস করে সৈন্য পরিচালনার ভার দিয়েছেন। আর আপনি এসেছেন আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপবাদ নিয়ে। আমি এখনি আবারকে নিয়ে নবাবের প্রাসাদে যাবে। (উঠে দাঁড়ালো)
এই অপমানের বিচার হওয়া দরকার।

মোহনলাল : প্রতারণার চেষ্টা করবেন না। (তরবারি কোষমুক্ত করল) আমার গুপ্তচর ভুল সংবাদ দেয় না। সত্য বলুন, কী হচ্ছিল এখানে? কে কে ছিল মন্ত্রণা সভায়?

মিরন : মন্ত্রণা সভা হচ্ছিল কিনা, এবং হলে কোথায় হচ্ছিল আমি তার কিছুই জানিনে। এসব বাজে জিনিসে সময় কাটানো আমার স্বভাব নয়।

(পরিচারককে ডেকে মিরন কিছু ইঙ্গিত করল)

যখন নাছোড় হয়েছেন তখন বে-আদবি না করে আর উপায় কী?

(নর্তকীর প্রবেশ)

এখানে কী হচ্ছিল আশা করি সেনাপতি বুঝতে পেরেছেন? (একটি মালা নিয়ে নাচের ভঙ্গিতে দুলতে দুলতে নর্তকী মোহনলালের দিকে এগিয়ে গেলো। মোহনলাল তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে মালাটি গ্রহণ করে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে তরবারির দ্বিতীয় আঘাতে শূন্যেই তা দ্বিখন্ডিত করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।)

মিরন : মূর্তিমান বেরসিক হা হা হা-

[দৃশ্যান্তর]



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অনাচার- বিশৃঙ্খলা, ন্যায়-নীতিহীনতা, যথেষ্টাচার। অবনত- নিচু। অগ্নিগিরি- আগুনের পর্বত। অশ্বারোহী- ঘোড়ার পিঠে চরে যুদ্ধ করে যে সৈনিক। আলবৎ- অবশ্য, নিশ্চয়। আজ্ঞাবহ- যে আজ্ঞা বা আদেশ পালন করে। ইজারাদার- কর বা খাজনা আছে এমন জমির ইজারা নেয় যে। উৎকর্ষিত- চিত্তিত। কন্দকাটা- গলা কাটা। কর্মপন্থা- কাজ করার প্রক্রিয়া ও পথ। কৈফিয়ত- জবাবদিহি, নিজ দোষের কারণ প্রদর্শন। কুর্নিশ- সালাম, অভিবাদন। খেলাপ- অমান্য। খোলাসা করা- পরিষ্কার করা, সব কিছু খুলে বলা। গর্দান- স্কন্ধ, ঘাড়, গলা। গুপ্তচর- গোয়েন্দা, গোপনে যে ব্যক্তি সংবাদ সংগ্রহ করে। জালিম- অত্যাচারী, শোষক। ঠিয়ালদের- কোম্পানীর প্রতিনিধি, যারা কুঠিতে বাস করেন। ডুকরে- ফুঁপিয়ে কাঁদা। তহবিল- সিংহাসন। তারিফ- প্রশংসা। দেউড়ী- বাড়ির প্রধান প্রবেশদ্বার, সদর দরজা। নকীব- তুর্কবাদক, ঘোষক। নতজানু- আত্মসমর্পণ। পোয়াতি- সন্তানসম্ভবা। প্রশ্রয়- আশকারা, লাই, আদর। বরখাস্ত-অপসারণ। কয়েদখানা- বন্দিশালা, কারাগার। বিনাশ- ধ্বংস। বিদ্বেষ- হিংসা। বেনিয়ার জাত- ব্যবসায়ী জাত, ব্যবসা করাই যাদের জাতিগত পরিচয়। সিপাহসালার- সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ। সম্প্রীতি- সুসম্পর্ক, ভালো সম্পর্ক।



সারসংক্ষেপ

মুর্শিদাবাদে নবাবের শাহী দরবারে সভাসদদের নিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলা বসে আছেন। তিনি অত্যাচারী এবং ষড়যন্ত্রীদের শাস্তি দিতে চান। সভাসদ এবং কোম্পানির প্রতিনিধিকে সভায় ডেকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য সকলেই নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। নবাব সকলকে সবকিছু ভুলে গিয়ে দেশের স্বার্থে কাজ করার কথা বলেন। কোরান শরিফ ছুঁয়ে প্রধান সেনাপতি মিরজাফর বলেন- ‘আমি আল্লাহর পাক কালাম ছুঁয়ে ওয়াদা করছি, আজীবন নবাবের আজ্ঞাবহ হয়েই থাকব।’ রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ তামা, তুলসী, গঙ্গাজল ছুঁয়ে একই শপথ নিলেন। এই শপথের পরেই মিরজাফরের বাড়িতে এরাই গোপন মন্ত্রণাসভায় বসেছে। সকলের চিন্তা একই- এই মুহূর্তেই সিরাজকে গদিচ্যুত করতে হবে। নবাবকে গদিচ্যুত করার জন্যে মিরজাফর ইংরেজদের সহযোগিতাও প্রার্থনা করলেন। মিরনের বাসগৃহে আয়োজন করা হয়েছে নবাব-বিরোধী এক গোপন বৈঠকের। উচ্চাভিলাষী রায়দুর্লভের একান্ত



অভিলাষ- নবাবের পতনের পর তিনি হবেন নতুন নবাবের প্রধান সেনাপতি। মিরন এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন তাকে। একে একে মিরনের কামরায় প্রবেশ করেন রাজবল্লভ, জগৎশেঠ ও মিরজাফর। নবাব-বিরোধী এই ষড়যন্ত্রবৈঠকে ক্লাইভ প্রথমেই উত্থাপন করেন চতুর বিশ্বাসঘাতক উমিচাঁদের প্রসঙ্গ। আসন্ন যুদ্ধে সহায়তার বিনিময়ে তার দাবি নগদ ত্রিশ লক্ষ টাকা। ধূর্ত ক্লাইভ এ দাবি পূরণে অসম্মত। তিনি নতুন ফন্দি এঁটেছেন উমিচাঁদকে ঠকাবার। ক্লাইভের প্রস্তুতকৃত সমঝোতা দলিল অনুসারে নবাবের পতনের পর সিপাহসালার শুধু মসনদে বসবেন মাত্র, রাজ্য পরিচালনা করবে কোম্পানি। দস্তখত করার মুহূর্তে তার বুকে কেঁপে ওঠে, শুনতে পান মরাকান্নার ধ্বনি। মিরজাফরের মনে হয় তারা সবাই মিলে বাংলাকে বিক্রয় করে দিচ্ছেন না তো? পরিশেষে স্বাক্ষর দান করেন মিরজাফর। ক্লাইভ সন্তোষ চেপে রাখতে পারেন না; ‘আমরা এমন কিছু করলাম যা ইতিহাস হবে’, -বলে মন্তব্য করেন তিনি। বৈঠক সমাপ্তির পর মিরনের উল্লাসমুহূর্তে আকস্মিকভাবেই তার আবাসগৃহে প্রবেশ করেন নবাব সিরাজের বিশ্বস্ত সেনাপতি মোহনলাল। জেরার মুখে মিরন অস্বীকার করে বৈঠকের প্রসঙ্গ। অভিনয় পটু মিরন নৃত্যগীতের উপকরণ দেখিয়ে বিভ্রান্ত করতে চায় মোহনলালকে। শেষে প্রলুব্ধ করার জন্য এক পরিচারিকাকে সামনে ঠেলে দেয় মিরন। কর্তব্যপরায়ণ মোহনলাল পরিচারিকাটিকে উপেক্ষা করে দ্রুত বেরিয়ে যান মিরনের গৃহ থেকে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯. সিরাজের দরবারে কোম্পানির প্রতিনিধি কে?

ক. ওয়াটস্

খ. হলওয়েল

গ. ক্লাইভ

ঘ. ক্রেটন

১০. মোহনলাল মূর্তিমান বেরসিক কেন?

ক. নাচ-গানে আসক্তি নেই

খ. প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে যোগ দেননি

গ. সিরাজের পক্ষাবলম্বন করেছেন

ঘ. দলিলে সই করেননি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

মোহাম্মদ আলি কটক শহরের একজন নামকরা এ্যাডভোকেট। অর্থ তার নিকট মধুর চেয়ে মিষ্ট। কোর্টে মোকদ্দমা শুরু করার পূর্বেই তিনি তার ফিস পুরোটা আদায় করে নেন। আত্মীয়-স্বজনরাও তার এই প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়েন না। টাকা তার নিকট ভগবানের দাদামশায়ের চেয়েও বড়।

১১. উদ্দীপকের সঙ্গে ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে কার সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. উমিচাঁদ

খ. মোহনলাল

গ. মির জাফর

ঘ. রবার্ট ক্লাইভ

১২. উদ্দীপকের সঙ্গে নাটকের এরূপ সাদৃশ্য যে বিষয়ে-

i. অমাত্যদের অর্থলিপ্সায়

ii. মিরজাফরের কুটিলতায়

iii. সিরাজের বর্বরতায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. ii ও iii

পাঠ-৪



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-



সিরাজউদ্দৌলার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অবহিত হবেন।



সিরাজের নবাবের দ্রুত পতনের কাহিনি জানতে পারবেন।



মূলপাঠ

তৃতীয় অংক : প্রথম দৃশ্য

স্থান : লুৎফুল্লিসার কক্ষ

সময় : ১৭৫৭ সাল, ১০ থেকে ২১ জুনের মধ্যে যে কোনো একদিন।

[চরিত্রবৃন্দ : মঞ্চ প্রবেশের পর্যায় অনুসারে— ঘসেটি, লুৎফা, আমিনা, সিরাজ, পরিচারিকা]

(নবাব-জননী আমিনা বেগম ও লুৎফুল্লিসা উপবিষ্ট। ঘসেটি বেগমের প্রবেশ)

ঘসেটি : বড় সুখে আছো রাজমাতা আমিনা বেগম।

লুৎফা : আসুন খালাম্মা।

(সালাম করল)

ঘসেটি : বেঁচে থাকো। সুখী এবং সৌভাগ্যবতী হও এমন দোয়া করলে সেটা আমার পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। তাই সে দোয়া করতে পারলুম না।

আমিনা : ছিঃ বড় আপা। এসো কাছে এসে বসো।

ঘসেটি : বসতে আসিনি। দেখতে এলাম কত সুখে আছো তুমি। পুত্র নবাব, পুত্রবধু নবাব বেগম, পৌত্রী শাহজাদি—

আমিনা : সিরাজ তোমারও তো পুত্র। তুমিও তো কোলে পিঠে করে তাকে মানুষ করেছো।

ঘসেটি : অদৃষ্টের পরিহাস— তাই ভুল করেছিলাম। যদি জানতাম বড় হয়ে সে একদিন আমার সৌভাগ্যের অন্তরায় হবে, যদি জানতাম অহরহ সে আমার দুশ্চিন্তার একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়াবে, জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি সে গ্রাস করবে রাহুর মতো, তা হলে দুধের শিশু সিরাজকে প্রাসাদ চত্বরে আছড়ে মেরে ফেলতে কিছুমাত্র দ্বিধা করতাম না।

লুৎফা : আপনাকে আমরা মায়ের মতো ভালোবাসি। মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করি।

ঘসেটি : থাক! যে সত্যিকার মা তার মহলেই তো চাঁদের হাট বসিয়েছ। আমাকে আবার পরিহাস করা কেন? দরিদ্রা রমণী আমি। নিজের সামান্য বিত্তের অধিকারিণী হয়ে এক কোণে পড়ে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মহাপরাক্রমশালী নবাব সে অধিকারটুকুও আমাকে দিলেন না।

আমিনা : কী হয়েছে তোমার? পুত্রবধূর সামনে এ রকম রুঢ় ব্যবহার করছ কেন?

ঘসেটি : কে পুত্র আর কে পুত্রবধূ? সিরাজ আমার কেউ নয়। সিরাজ বাংলার নবাব আমি তার প্রজা। ক্ষমতার অহঙ্কারে উন্মত্ত না হলে আমার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে সে সাহস করত না। মতিঝিল থেকে আমাকে সে তড়িয়ে দিতে পারত না।

লুৎফা : শুনেছি আপনার কাছ থেকে কিছু টাকা তিনি ধার নিয়েছেন। কলকাতা অভিযানের সময়ে টাকার প্রয়োজন হয়েছিল তাই। কিন্তু গোলমাল মিটে গেলে সে টাকা তো আবার আপনি ফেরৎ পাবেন।

ঘসেটি : নবাব টাকা ফেরৎ দেবেন!

লুৎফা : কেন দেবেন না? তা ছাড়া সে টাকা তো তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করেননি। দেশের জন্যে—

ঘসেটি : থামো, লম্বা লম্বা বক্তৃতা করো না। সিরাজের বক্তৃতা তবু সহ্য হয়। তাকে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি। কিন্তু তোমার মুখে বড় বড় বুলি শুনলে গায়ে যেন জ্বালা ধরে যায়।

আমিনা : সিরাজ তোমার কোনো ক্ষতি করেনি বড় আপা।

ঘসেটি : তার নবাব হওয়াটাই তো আমার মস্ত ক্ষতি।

আমিনা : নবাবি সে কারো কাছ থেকে কেড়ে নেয়নি। ভূতপূর্ব নবাবই তাকে সিংহাসন দিয়ে গেছেন।

ঘসেটি : বুদ্ধ নবাবকে ছলনায় ভুলিয়ে তোমরা সিংহাসন দখল করেছো।

আমিনা : আমরা।

ঘসেটি : ভাবছো যে বিস্মিত হবার ভঙ্গি করলেই আমি তোমাকে বিশ্বাস করব কেমন? তোমাকে আমি চিনি। তুমি কম সাপিনী নও।

আমিনা : তুমি অনর্থক বিষ উদগার করছো বড় আপা। তোমার এই ব্যবহারের অর্থ কিছুই বুঝতে পারছি নে।



- ঘসেটি : বুঝবে। সেদিন আসছে। আর বেশিদিন এমন সুখে তোমার ছেলেকে নবাবি করতে হবে না।
(সিরাজের প্রবেশ)
- সিরাজ : সিরাজউদ্দৌলা একটি দিনের জন্যেও সুখে নবাবি করেনি খালাআম্মা।
- ঘসেটি : এসেছো শয়তান। ধাওয়া করেছে আমার পিছু।
- সিরাজ : আপনার সঙ্গে প্রয়োজন আছে।
- ঘসেটি : কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।
- সিরাজ : আমার প্রয়োজন আপনার সম্মতির অপেক্ষা রাখছে না খালাআম্মা।
- ঘসেটি : তাই বুঝি সেনাপতি পাঠিয়ে আমাকে সংবাদ দিয়েছে যে তোমার আরও কিছু টাকার দরকার।
- সিরাজ : খবর আপনার অজানা থাকার কথা না।
- ঘসেটি : অর্থাৎ?
- সিরাজ : অর্থাৎ আমি জানি যে, বাংলার ভাগ্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনার সমস্ত খবরই আপনি রাখেন। আরও স্পষ্ট করে শুনতে চান? আমি জানি যে, সিরাজের বিরুদ্ধে আপনার আক্রোশের কারণ আপনার সম্পত্তিতে সে হস্তক্ষেপ করেছে বলে নয়, রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের আশায় আপনি উন্মাদ। আমি অনুরোধ করছি আপনার সঙ্গে যেন কোনো প্রকারের দুর্ব্যবহার করতে বাধ্য করা না হয়।
- ঘসেটি : তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?
- সিরাজ : আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি।
- ঘসেটি : তোমার এই চোখ রাঙাবার স্পর্ধা বেশিদিন থাকবে না। নবাব। আমিও তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।
- সিরাজ : আমার ভবিষ্যৎ ভেবে আপনি উৎকণ্ঠিত হবেন না খালাআম্মা। আপনার নিজের সম্বন্ধেই আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। নবাবের মাতৃস্থানীয় হয়ে তাঁর শত্রুদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। অন্তত আমি আপনাকে সে দুর্নামের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই।
- ঘসেটি : তোমার মতলব বুঝতে পারছি না।
- সিরাজ : রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময়ে কোনো ক্ষমতাভিলাষী, স্বার্থপরায়ণ রমণীর পক্ষে রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দেশের পক্ষে অকল্যাণকর। আমি তাই আপনার গতিবিধির ওপরে লক্ষ রাখবার ব্যবস্থা করেছি। আমার প্রাসাদে আপনার স্বাধীনতা হস্তক্ষেপ করা হবে না। তবে লক্ষ রাখা হবে যাতে দেশের বর্তমান অশান্তি দূর হবার আগে বাইরের কারো সঙ্গে আপনি কোনো যোগাযোগ রাখতে না পারেন।
- ঘসেটি : (ক্ষিপ্ত) ওর অর্থ আমি বুঝি মহামান্য নবাব। (দ্রুত আমিনার দিকে এগিয়ে এসে) শুনলে তো রাজমাতা আমাকে বন্দিনী করে রাখা হল। এইবার বল তো আমি তার মা, সে আমার পুত্র- তাই না? হা হা হা।
(অসহায় ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেলেন)
- আমিনা : এসব লক্ষণ ভালো নয়। (উঠে দরজার দিকে এগোতে এগোতে) বড় আপা শুনেন যাও, বড় আপা-
(বেরিয়ে গেলেন)
- লুৎফা : খালাআম্মা বড় বেশি অপমানিত বোধ করেছেন। ওঁর সঙ্গে অমন ব্যবহার করাটা হয়ত উচিত হয়নি।
- সিরাজ : আমার ব্যবহারে সবাই অপমান বোধ করছেন লুৎফা। শুধু অপমান নেই আমার।
- লুৎফা : এ কথা কেন বলছেন জাঁহাপনা।
- সিরাজ : তুমিও অন্ধ হলে আর কার কাছে আমি আশ্রয় পাবো বল তো লুৎফা। দেখতে পাচ্ছে না, শুধু অপমান নয় আমাকে ধ্বংস করবার আয়োজনে সবাই কী রকম মেতে উঠেছে।
- লুৎফা : কিন্তু খালাআম্মা-
- সিরাজ : আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারলে খালাআম্মা খুশি হবেন সবচেয়ে বেশি।
- লুৎফা : অতটা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে ওঁর মন আপনার ওপরে যথেষ্ট বিষিয়ে উঠেছে তা ঠিক। কিন্তু-
- সিরাজ : থামলে কেন? বলো।
- লুৎফা : বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না।
- সিরাজ : বলো।
- লুৎফা : বিধবা মেয়েমানুষ, ওঁর সম্পত্তিতে বারবার এমন হস্তক্ষেপ করতে থাকলে ভরসা নষ্ট হবারই কথা।



- সিরাজ : লুৎফা, তুমিও আমার বিচার করতে বসলে। করো, আমি আপত্তি করব না। নানা মরবার পর থেকে এই ক-
মাসের ভেতরে আমি এত বদলে গেছি যে, আমার নিকটতম তুমিও তা বুঝতে পারবে না।
- লুৎফা : জাঁহাপনা।
- সিরাজ : মনে পড়ে লুৎফা, নানার মৃত্যুশয্যায় আমি কসম খেয়েছিলাম শরাব স্পর্শ করব না। আমি তা করিনি।
তুমিও জানো লুৎফা আমি তা করিনি।
- লুৎফা : আমি ওসব কোনো কথাই তুলছি নে জাঁহাপনা।
- সিরাজ : আমি জানি। সেই জন্যেই বলছি সব কিছু খুঁটিয়ে বিচার কর।
- লুৎফা : আমি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবার জন্যে কোনো কথা বলিনি জাঁহাপনা। খালাআম্মা রাগে প্রায়
কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন তাই—
- সিরাজ : তাই তোমার মনে হলো, গুঁর টাকা পয়সায় হাত দিয়েছি বলেই উনি আমার ওপর অতখানি বিরক্ত হয়েছেন।
কিন্তু তুমি জানো না, কতখানি উৎসাহ নিয়ে উনি অজস্র অর্থ ব্যয় করেছেন শওকতজঙ্গের কামিয়াবির
জন্যে। শুধু শওকতজঙ্গ কেন, আমার শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধির জন্যেও গুঁর দান কম নয়।
- লুৎফা : আমি মাপ চাইছি জাঁহাপনা, আমার অন্যায় হয়েছে?
- সিরাজ : লুৎফা এত দেয়াল কেন বল তো?
- লুৎফা : দেয়াল? কোথায় দেয়াল জাঁহাপনা?
- সিরাজ : আমার চারপাশে লুৎফা। আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কেবল যেন দেয়ালের ভিড়। উজির, অমাত্য,
সেনাপতিদের এবং আমার মাঝখানে দেয়াল, দেশের নিশ্চিত শাসন ব্যবস্থা এবং আমার মাঝখানে দেয়াল,
খালাআম্মা আর আমার মাঝখানে, আমার চিন্তা আর কাজের মাঝখানে, আমার স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝখানে,
আমার অদৃষ্ট আর কল্যাণের মাঝখানে শুধু দেয়াল আর দেয়াল।
- লুৎফা : জাঁহাপনা।
- সিরাজ : আমি এর কোনোটি ডিঙিয়ে যাচ্ছি, কোনোটি ভেঙে ফেলছি, কিন্তু তবু তো দেয়ালের শেষ হচ্ছে না লুৎফা।
- লুৎফা : আপনি ক্লান্ত হয়েছেন জাঁহাপনা।
- সিরাজ : মসনদে বসবার পর থেকে প্রতিটি মুহূর্তে যেন দুপায়ের দশ আঙুলের ওপর ভার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ক্লান্তি
আসটা কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। সমস্ত প্রাণশক্তি যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে লুৎফা।
- লুৎফা : সমস্ত দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে আমার কাছে দুএকদিন বিশ্রাম করুন।
- সিরাজ : কবে যে দুদণ্ড বিশ্রাম পাবো তার ঠিক নেই। আবার তো যুদ্ধে যেতে হচ্ছে।
- লুৎফা : সে কী!
- সিরাজ : আমার বিরুদ্ধে কোম্পানির ইংরেজদের আয়োজন সম্পন্ন। আমি এগিয়ে বাধা না দিলে তারা সরাসরি
রাজধানী আক্রমণ করবে।
- লুৎফা : ইংরেজদের সঙ্গে তো আপনার মিটমাট হয়ে গেল।
- সিরাজ : হ্যাঁ, আলিনগরের সন্ধি। কিন্তু সে সন্ধির মর্যাদা একমাস না যেতেই তারা ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে।
- লুৎফা : কজন বিদেশি বেনিয়ার এত স্পর্ধা কী করে সম্ভব?
- সিরাজ : ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব লুৎফা। শুধু একটা জিনিস বুঝে উঠতে
পারিনে, ধর্মের নামে ওয়াদা করে মানুষ তা খেলাপ করে কী করে? নিজের স্বার্থ কি এতই বড়?
- লুৎফা : কোনো প্রতিকার করতে পারেননি জাঁহাপনা?
- সিরাজ : পারিনি। চেয়েছি, চেষ্টাও করেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভরসা পাইনি। রাজবল্লভ, জগৎশেঠকে কয়েদ করে,
মিরজাফরকে ফাঁসি দিলে হয়ত প্রতিকার হত, কিন্তু সেনাবাহিনী তা বরদাস্ত করত কি না কে জানে?
- লুৎফা : থাক ওসব কথা। আজ আপনি বিশ্রাম করুন।
- সিরাজ : আর কাল সকালেই দেশের পথে ঘাটে লোকের মুখে ছড়িয়ে পড়বে, যুদ্ধের আয়োজন ফেলে রেখে হারেমের
কয়েকশ বেগমের সঙ্গে নবাবের উদ্দাম রসলীলার কাহিনি।
- লুৎফা : মহলে বেগমের তো সত্যিই কোনো অভাব নেই।



- সিরাজ : ঠাট্টা করছ লুৎফা? তুমি তো জানোই মরহুম শওকতজঙ্গের বিশাল হারেম বাধ্য হয়েই আমাকে প্রতিপালন করতে হচ্ছে।
- লুৎফা : সে যাক। আজ আপনার বিশ্রাম। শুধু আমার কাছে থাকবেন আপনি। শুধু আমরা দুজন।
- সিরাজ : অনেক সময়ে সত্যিই তা ভেবেছি লুৎফা। তোমার খুব কাছাকাছি বহুদিন আসতে পারিনি। আমাদের মাঝখানে একটি রাজত্বের দেয়াল। মাঝে মাঝে ভেবেছি, এই বাধা যদি দূর হয়ে যেত। নিশ্চিত সাধারণ গৃহস্থের ছোট সাজানো সংসার আমরা পেতাম।
- (পরিচারিকার প্রবেশ)
- পরিচারিকা : বেগম সাহেবা।
- লুৎফা : (তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে) জাঁহাপনা এখন বিশ্রাম করছেন যাও।
- পরিচারিকা : সেনাপতি মোহনলালের কাছ থেকে খবর এসেছে।
- (পেছোতে লাগল)
- লুৎফা : না।
- (পরিচারিকার প্রস্থান)
- সিরাজ : (এগিয়ে আসতে) মোহনলালের জরুরি খবরটা শুনতেই দাও লুৎফা।
- (লুৎফা সিরাজের গতিরোধ করল)
- লুৎফা : (আবেগজড়িত কণ্ঠে) না।
- (সিরাজ থামল ক্ষণকালের জন্যে। লুৎফার দিকে মেলে রাখা নীরব দৃষ্টি ধীরে ধীরে ল্লেহসিক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু পর মুহূর্তেই লুৎফার প্রসারিত বাহু ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে বের হয়ে গেল। লুৎফা চেয়ে রইল সিরাজের চলে যাওয়া পথের দিকে— দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ওর দুগাল বেয়ে)
- [দৃশ্যান্তর]



তৃতীয় অংক : দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ২২ জুন। স্থান : পলাশিতে সিরাজের শিবির।

[চরিত্রবৃন্দ : মঞ্চ প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- সিরাজ, মোহনলাল, মিরমর্দান, প্রহরী, বন্দি কমর]

(গভীর রাত্রি। শিবিরের ভেতরে নবাব চিন্তিতভাবে পায়চারি করছেন। দূর থেকে শৃগালের প্রহর ঘোষণার শব্দ ভেসে আসবে।)

সিরাজ : দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হলো। শুধু ঘুম নেই শেয়াল আর সিরাজউদ্দৌলার চোখে। (আবার নীরব পায়চারি) ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই-

(মোহনলালের প্রবেশ। কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই)

সিরাজ : সত্যি অবাক হয়ে যাই মোহনলাল, ইংরেজ সভ্য জাতি বলেই শুনেছি। তারা শৃঙ্খলা জানে, শাসন মেনে চলে। কিন্তু এখানে ইংরেজরা যা করছে সে তো স্পষ্ট রাজদ্রোহ। একটি দেশের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা অস্ত্র ধরছে। আশ্চর্য!

মোহনলাল : জাঁহাপনা।

সিরাজ : হ্যাঁ, বলো মোহনলাল, কী খবর।

মোহনলাল : ইংরেজের পক্ষে মোট সৈন্য তিন হাজারের বেশি হবে না। অবশ্য তারা অস্ত্র চালনায় সুশিক্ষিত। নবাবের পক্ষে সৈন্য সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশি। ছোট বড় মিলিয়ে ওদের কামান হবে গোটা দশেক। আমাদের কামান পঞ্চাশটার বেশি।

সিরাজ : এখন প্রশ্ন হলো আমাদের সব সিপাই লড়বে কিনা এবং সব কামান থেকে গোলা ছুটবে কিনা।

মোহনলাল : জাঁহাপনা।

সিরাজ : এমন আশঙ্কা কেন করছি তাই জানতে চাইছ তো? মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ নিজের নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে, ওরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বে।

মোহনলাল : সিপাহসালারের আরও একখানা গোপন চিঠি ধরা পড়েছে। (নবাবের হাতে পত্র দান। নবাব সেটা পড়ে হাতের মুঠোয় মুচড়ে ফেললেন।)

সিরাজ : বেইমান।

মোহনলাল : ক্লাইভের আরও তিনখানা চিঠি ধরা পড়েছে। সে সিপাহসালারের জবাবের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে মনে হয়।

সিরাজ : সাংঘাতিক লোক এই ক্লাইভ। মতলব হাসিল করার জন্যে যে কোনো অবস্থার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওর কাছে সব কিছুই যেন একটা বড় রকমের জুয়ো খেলা।

(মিরমর্দানের প্রবেশ। যথারীতি কুর্নিশ করে একদিকে দাঁড়াল।)

সিরাজ : বলো মিরমর্দান।

মিরমর্দান : ইংরেজ সৈন্য লক্ষবাগে আশ্রয় নিয়েছে। ক্লাইভ এবং তার সেনাপতিরা উঠেছে গঙ্গাতীরের ছোটো বাড়িটায়। এখান থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে।

সিরাজ : তোমাদের ফৌজ সাজাবার আয়োজন শেষ হয়েছে তো?

মিরমর্দান : (একটা প্রকাণ্ড নকশা নবাবের সামনে মেলে ধরে) আমরা সব গুছিয়ে ফেলেছি। (নকশা দেখাতে দেখাতে) আপনার ছাউনির সামনে গড়বন্দি হয়েছে। ছাউনির সামনে মোহনলাল, সাঁফে আর আমি। আরও ডানদিকে গঙ্গার ধারে এই টিপিটার উপরে একদল পদাতিক আমার জামাই বদ্রি আলি খাঁর অধীনে যুদ্ধ করবে। তাদের ডান পাশে গঙ্গার দিকে একটু এগিয়ে নৌবে সিং হাজারির বাহিনী। বা দিক দিয়ে লক্ষবাগ পর্যন্ত অর্ধ চন্দ্রাকারে সেনাবাহিনী সাজিয়েছেন সিপাহসালার, রায়দুর্লভরাম আর ইয়ার লুৎফ খাঁ।

সিরাজ : (নকশার কাছ থেকে সরে এসে একটু পায়চারি করলেন) কত বড় শক্তি তবু কত তুচ্ছ মিরমর্দান।

মিরমর্দান : জাঁহাপনা।

সিরাজ : আমি কী দেখছি জানো? কেমন যেন অন্ধের হিসেবে ওদের সুবিধার পাল্লা ভারী হয়ে উঠেছে।

মিরমর্দান : ইংরেজদের ঘায়েল করতে সেনাপতি মোহনলাল, সাঁফে আর আমার বাহিনীই যথেষ্ট।



- সিরাজ : ঠিক তা নয় মিরমর্দান। আমি জানি তোমাদের বাহিনীতে পাঁচ হাজার ঘোড়া সওয়ার আর আট হাজার পদাতিক সেনা রয়েছে। তারা জান দিয়ে লড়বে। কিন্তু সমস্ত অবস্থাটা কী দাঁড়াচ্ছে, এসো তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করি।
- মোহনলাল : জাঁহাপনা।
- সিরাজ : মিরজাফরের বাহিনী সাজিয়েছে দূরে লক্ষবাগের অর্ধেকটা ঘিরে। যুদ্ধে তোমরা হারতে থাকলে ওরা দুকদম এগিয়ে ক্লাইভের সঙ্গে মিলবে বিনা বাধায়। যেন নিশ্চিন্তে আত্মীয় বাড়ি যাচ্ছে।
- মিরমর্দান : কিন্তু আমরা হারব কেন?
- সিরাজ : না হারলে ওরা যে তোমাদের ওপরেই গুলি চালাবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যাক, শিবিরের কাছে ওদের ফৌজ রাখবার কথা আমরাও ভাবিনা। কারণ, সামনে তোমরা যুদ্ধ করতে থাকবে, ওরা পেছনে নবাবের শিবির দখল করতে এক মুহূর্ত দেরি করবে না।
- মোহনলাল : ওদের সেনা বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে না আনলেই বোধ হয়—
- সিরাজ : এনেছি চোখে চোখে রাখার জন্যে। পেছনে রেখে এলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী দখল করতো।
- মিরমর্দান : এত চিন্তিত হবার কারণ নেই জাঁহাপনা। আমাদের প্রাণ থাকতে নবাবের কোনো ক্ষতি হবে না।
- সিরাজ : আমি জানি, তাই আরও বেশি করে ভরসা হারিয়ে ফেলছি। তোমাদের প্রাণ বিপন্ন হবে অথচ স্বাধীনতা রক্ষা হবে না, এই চিন্তাটাই আজ বেশি করে পীড়া দিচ্ছে।
- মোহনলাল : আমরা জয়ী হবো জাঁহাপনা।
- সিরাজ : পরাজিত হবে, আমিই কি তা ভাবছি। আমি শুধু অশুভ সম্ভাবনাগুলো শেষবারের মতো খুটিয়ে বিচার করে দেখছি। আগামীকাল তোমরা যুদ্ধ করবে কিন্তু হুকুম দেবে মিরজাফর। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এড়াবার জন্যে যুদ্ধের সর্বময় কর্তৃত্ব সিপাহসালারকে দিতেই হবে। কী হবে কে জানে। আমি কর্তব্য স্থির করতে পারছি, কিন্তু কেন যে পারছি আশা করি তোমরা বুঝছো।
- মিরমর্দান : জাঁহাপনা।
- সিরাজ : আজ আমার ভরসা আমার সেনাবাহিনীর শক্তিতে নয় মোহনলাল। আমার একমাত্র ভরসা, আগামীকাল যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার স্বাধীনতা মুছে যাবার সূচনা দেখে মিরজাফর, দুর্লভরাম, ইয়ার লুৎফদের মনে যদি দেশপ্রীতি জেগে ওঠে সেই সম্ভাবনাটুকু। (কিছুটা কোলাহল শোনা গেল বাইরে। দুজন প্রহরী এক ব্যক্তিকে নিয়ে হাজির হলো)
- প্রহরী : হুজুর, এই লোকটা নবাবের ছাউনির দিকে এগোবার চেষ্টা করেছিল।
(সঙ্গে সঙ্গে মোহনলাল বন্দির কাছে এগিয়ে এসে নবাবকে একটু যেন আড়াল করে দাঁড়াল। নবাব দুপা এগিয়ে এলেন। অপর দিক দিয়ে মিরমর্দান বন্দির আর এক পাশে দাঁড়াল)
- বন্দি : (সকাতর ক্রন্দনে) আমি পলাশি গ্রামের লোক হুজুর। রৌশনি দেখতে এখানে এসেছি।
- মোহনলাল : (প্রহরীকে) তল্লাশি করো।
(প্রহরী তল্লাশি করে কিছুই পেল না)
- কিন্তু একে সাধারণ গ্রামবাসী বলে মনে হচ্ছে না জাঁহাপনা।
- মিরমর্দান : (প্রহরীকে) বাইরে নিয়ে যাও। কথা আদায় করো। (হঠাৎ দেখি দেখি। এ তো কমর বেগ জমাদার। মিরজাফরের গুপ্তচর উমর বেগের ভাই। এ ও গুপ্তচর।
- কমর : (সহসা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে) জাঁহাপনার কাছে বিচারের জন্যে এসেছি। আমাকে আসতে দেয় না, তাই চুরি করে হুজুরের কদম মোবারকে ফরিয়াদ জানাতে আসছিলাম।
- সিরাজ : (কাছে এগিয়ে এসে) কী হয়েছে তোমার?
- কমর : আমার ভাইকে সেনাপতি মোহনলালের হুকুমে খুন করা হয়েছে হুজুর।
- সিরাজ : মোহনলাল।
- মোহনলাল : গুপ্তচর উমর বেগ জমাদার হাতেনাতে ধরা পড়েছিল জাঁহাপনা। ক্লাইভের চিঠি ছিল তার কাছে। প্রহরীদের হাতে ধরা পড়বার পর সে পালাবার চেষ্টা করে। ফলে প্রহরীদের তলোয়ারের ঘায়ে সে মারা পড়েছে।
(সিরাজ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মোহনলালের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন)



- মোহনলাল : (যেন দোষ ঢাকার চেষ্টায়) সে চিঠি জাঁহাপনার কাছে আগেই দাখিল করা হয়েছে।
- সিরাজ : (মোহনলালের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একটু পায়চারি করে চিন্তিতভাবে) কথায় কথায় মৃত্যুবিধান করাটাই শাসকের সবচাইতে যোগ্যতার পরিচয় কিনা সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই মোহনলাল।
- কমর : জাঁহাপনা মেহেরবান।
- সিরাজ : (প্রহরীদের) একে নিয়ে যাও। কাল যুদ্ধ শেষ হবার পর একে মুক্তি দেবে।
- কমর : (রুদ্ধস্বরে) এই কি জাঁহাপনার বিচার?
- সিরাজ : আমি জানি, এখানে এই অবস্থায় শুধু ফরিয়াদ জানাতেই আসবে এতটা নির্বোধ তুমি নও। (কঠোর স্বরে প্রহরীদের) নিয়ে যাও।

(বন্দি নিয়ে প্রহরীদের প্রস্থান) শৃগালের প্রহর ঘোষণা)

- সিরাজ : তোমরাও এখন যেতে পারো। আজ রাতে তোমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন। রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো। (মোহনলাল ও মিরমর্দান বেরিয়ে গেল। সিরাজ পায়চারি করতে লাগলেন। সোরাহি থেকে পানি ঢেলে খেলেন। কোথায় একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। সিরাজ উৎকর্ষ হয়ে তা শুনলেন। কী যেন ভেবে রেহেলে রাখা কোরান শরিফের কাছে গিয়ে জায়নামাজে বসলেন। কোরান শরিফ তুলে ওষ্ঠে ঠেকিয়ে রেহেলের ওপর রেখে পড়তে লাগলেন। দূর থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে এলো। সিরাজ কোরান শরিফ মুড়ে রাখলেন। “আসসালাতো খায়রুম মিনান্নাওম”- এর পর মোনাজাত করলেন। আন্তে আন্তে পাখির ডাক জেগে উঠতে লাগল। হঠাৎ সূত্র তর্যনাদ নিস্তন্ধতা ভেঙে খান খান করে দিল।)

[দৃশ্যান্তর]

তৃতীয় অংক : তৃতীয় দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ২৩ জুন। স্থান : পলাশির যুদ্ধক্ষেত্র।

[চরিত্রবৃন্দ : মঞ্চ প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- সিরাজ, প্রহরী, সৈনিক, দ্বিতীয় সৈনিক, তৃতীয় সৈনিক, সাঁফে, মোহনলাল, রাইসুল জুহালা, ক্লাইভ, রাজবল্লভ, মিরজাফর, ইংরেজ সৈনিকগণ]

(গোলাগুলির শব্দ, যুদ্ধ কোলাহল। সিরাজ নিজের তাঁবুতে অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন। সৈনিকের প্রবেশ।)

- সিরাজ : (উৎকর্ষিত) কী খবর সৈনিক?
- সৈনিক : যুদ্ধের প্রথম মহড়ায় কোম্পানির ফৌজ পিছু হটে গিয়ে লক্ষবাগে আশ্রয় নিয়েছে। সিপাহসালার, সেনাপতি রায়দুর্লভ এবং ইয়ার লুৎফ খাঁর সৈন্য যুদ্ধে যোগ দেয়নি।
- সিরাজ : মিরমর্দান, মোহনলাল?
- সৈনিক : ওরা শত্রুদের পিছু হটিয়ে লক্ষবাগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।
- সিরাজ : আচ্ছা যাও।

(সৈনিকের প্রস্থান। কোলাহল প্রবল হয়ে উঠল। দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ।)

- ২য় সৈনিক : দুঃসংবাদ জাঁহাপনা। সেনাপতি নৌবে সিং হাজারি ঘায়েল হয়েছেন।

- সিরাজ : (কঠোর স্বরে) যাও।

(প্রস্থান। একটু পরে তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

- ৩য় সৈনিক : সেনাপতি মিরমর্দান তাই কামানের অপেক্ষা না করে হাতাহাতি লড়াবার জন্যে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন।

- সিরাজ : আর কোম্পানির ফৌজ যখন কামান ছুঁড়বে?

- ৩য় সৈনিক : শত্রুদের সময় দিতে চান না বলেই সেনাপতি মিরমর্দান শুধু তলোয়ার নিয়েই সামনে এগোচ্ছেন।

(দ্রুত প্রথম সৈনিকের প্রবেশ)

- ১ম সৈনিক : সেনাপতি বদ্রি আলি খাঁ নিহত জাঁহাপনা। যুদ্ধের অবস্থা খারাপ?

- সিরাজ : না! যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হয় না বদ্রি আলি ঘায়েল হলে। মিরমর্দান, মোহনলাল আছে। কোনো ভয় নেই, যাও।

(প্রথম ও তৃতীয় সৈনিকের প্রস্থান। হঠাৎ যুদ্ধ কোলাহল কেমন যেন আর্তচিৎকারে পরিণত হলো।)

- সিরাজ : কী হলো? (টুলের ওপর দাঁড়িয়ে দূরবিন দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দেখবার চেষ্টা)



- সিরাজ : (দ্রুত এগিয়ে এসে) কী খবর সাঁফে? আমাদের পরাজয় হয়েছে?
- সাঁফে : (কুর্নিশ করে) এখনও হয়নি You Excellency. কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা খারাপ হয়ে উঠেছে।
- সিরাজ : শক্তিমান বীর সেনাপতি, তোমরা থাকতে যুদ্ধে হারতে হবে কেন? যাও, যুদ্ধে যাও সাঁফে। জয়লাভ করো।
- সাঁফে : আমি তো ফ্রান্সের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই জাঁহাপনা। দরকার হলে যুদ্ধক্ষেত্রে আমি প্রাণ দেব। কিন্তু আপনার বিরাট সেনাবাহিনী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে standing like pillars.
- সিরাজ : মিরজাফর, রায়দুর্লভকে বাদ দিয়েও তোমরা লড়াইয়ে জিতবে। আমি জানি তোমরা জিতবেই।
- সাঁফে : আমাদের গোলার আঘাতে কোম্পানির ফৌজ পিছু হটে লক্ষবাগে আশ্রয় নিচ্ছিল। এমন সময়ে এলো বৃষ্টি। হঠাৎ জাফর আলি খান আদেশ দিলেন এখন যুদ্ধ হবে না। মোহনলাল যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইলেন না। কিন্তু সিপাহসালারের আদেশ পেয়ে tired soldiers যুদ্ধ বন্ধ করে শিবিরে ফিরতে লাগল। সুযোগ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিলপ্যাট্রিক আমাদের আক্রমণ করেছে। মিরমর্দান তাদের বাধা দিচ্ছেন। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে বারুদ একেজো হয়ে গেছে। তাঁকে এগোতে হচ্ছে কামান ছাড়া। And that is dangerous.
- (২য় সৈনিকের প্রবেশ। কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল)
- সিরাজ : কী সংবাদ?
- (কিছু বলবার চেষ্টা করেও পারল না)
- সিরাজ : (অধৈর্য হয়ে কাছে এসে প্রহরীকে ঝাঁকুনি দিয়ে) কী খবর, বলো কী খবর?
- ২য় সৈনিক : সেনাপতি মিরমর্দানের পতন হয়েছে জাঁহাপনা।
- সাঁফে : What? Mir Mardan killed?
- সিরাজ : (যেন আচ্ছন্ন) মিরমর্দান শহীদ হয়েছে?
- সাঁফে : The bravest soldier is dead.
- আমি যাই your excellency। আপনাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, ফরাসিরা প্রাণপণে লড়বে। (প্রস্থান)
- সিরাজ : ঠিক বলেছো সাঁফে, শ্রেষ্ঠ বাঙালি বীর যুদ্ধে শহীদ হয়েছে এখন তাহলে কী করতে হবে? সাঁফে, মোহনলাল...
- ২য় সৈনিক : সেনাপতি মোহনলালকে খবর দিতে হবে জাঁহাপনা?
- সিরাজ : মোহনলাল? না। নৌবে সিং বদ্রি আলি, মিরমর্দান সবাই নিহত। এখন কী করতে হবে? (পায়চারি করতে করতে হঠাৎ) হ্যাঁ আলিবর্দির সঙ্গে যুদ্ধ থেকে যুদ্ধে আমিই তো ঘুরেছি। বাংলার সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ বীর সৈনিক সে তো আমি। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি উপস্থিত নেই বলেই পরাজয় গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। (সৈনিককে লক্ষ করে) আমার হাতিয়ার নিয়ে এসো। আমি যুদ্ধে যাবো। আমার এতদিনের ভুল সংশোধন করার এই শেষ সুযোগ আমাকে নিতে হবে।
- (মোহনলালের প্রবেশ)
- মোহনলাল : না জাঁহাপনা।
- (সৈনিক বেরিয়ে গেল)
- সিরাজ : মোহনলাল!
- মোহনলাল : পলাশিতে যুদ্ধ শেষ হয়েছে জাঁহাপনা। এখন আর আত্মাভিমানের সময় নেই। আপনাকে অবিলম্বে রাজধানীতে ফিরে যেতে হবে।
- সিরাজ : মিরজাফরের কাছে একবার কৈফিয়ৎ চাইব না?
- মোহনলাল : মিরজাফর ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দিল বলে। আর একটি মুহূর্তও নষ্ট করবেন না জাঁহাপনা। মুর্শিদাবাদে ফিরে আপনাকে নতুন করে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে।
- সিরাজ : আমি একাই ফিরে যাবো?
- মোহনলাল : আমার শেষ যুদ্ধ পলাশিতেই। আমি যাই জাঁহাপনা। সাঁফে আর আমার যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। (নতজানু হয়ে নবাবের পরামর্শ করল। তারপর দ্বিতীয় কথা না বলে বেরিয়ে গেল।)
- সিরাজ : (আত্মগতভাবে) যাও মোহনলাল। আর দেখা হবে না। আর কেউ রইল না। শুধু আমি রইলাম নতুন করে প্রস্তুতি নিতে হবে, মোহনলাল বলে গেল।



(২য় সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক : দেহরক্ষী অশ্বারোহীরা প্রস্তুত, জাঁহাপনা। আপনার হাতিও তৈরি।
সিরাজ : চলো।

(যেতে যেতে কী মনে করে দাঁড়ালেন)

সিরাজ : কে আছ এখানে?

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

সিরাজ : সেনাপতি মোহনলালকে খবর পাঠাও কয়েকজন ঘোড়সওয়ারের হেফাজতে মিরমর্দানের লাশ যেন এক্ষুণি মুর্শিদাবাদে পাঠানো হয়। উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে মিরমর্দানের লাশ দাফন করতে হবে।

(বেরিয়ে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুজন প্রহরী নবাব শিবিরের জিনিসপত্র গোছাতে লাগলো। রাইসুল জুহালার প্রবেশ)

রাইস : জাঁহাপনা তা হলে চলে গেছেন? রক্ষা।

প্রহরী : আমরা সবাই চলে যাচ্ছি।

রাইস : তার বোধ হয় সময় হবে না।

(বাইরে তুমুল কোলাহল)

রাইস : মিরজাফর ক্লাইভের দলবল এসে পড়ল বলে।

প্রহরী : তা হলে আর দেরি নয়, চলো সরে পড়া যাক।

(বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই সশস্ত্র সৈন্যদের হাতে তারা বন্দি হল। সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে এলো ক্লাইভ, মিরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ)

ক্লাইভ : He has fled away. আগেই পালিয়েছে। (বন্দিদের কাছে এসে) কোথায় গেছে নবাব?

(বন্দিরা নিরুত্তর)

ক্লাইভ : (রাইসুল জুহালাকে বুটের লাথি মারল) কোথায় গেছে নবাব? Say quickly if you want to live. বাঁচতে হলে জলদি করে বল।

রাইস : (হেসে উঠে মিরজাফরকে দেখিয়ে) ইনি বুঝি বাংলার সিপাহসালার? যুদ্ধে বাংলাদেশের জয় হয়েছে তো হুজুর?

রাজবল্লভ : যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে লোকটাকে?

ক্লাইভ : No time for fun, Come on, say, where is shiraj?

(আবার লাথি মারল)

রাইস : নবাব সিরাজউদ্দৌলা এখনও জীবিত। এর বেশি আর কিছু জানিনে।

রাজবল্লভ : চিনেছি, এ তো সেই রাইসুল জুহালা।

ক্লাইভ : He must be a spy.

(টান মেরে পরচুলা খুলে ফেললো)

মিরজাফর : নারানসিং। সিরাজউদ্দৌলার প্রধান গুপ্তচর।

ক্লাইভ : গুলি করো ওকে— here and now.

(দুজন গোরা সৈন্য নবাবের পরিত্যক্ত আসনের সঙ্গে পিঠমোড়া করে নারান সিংকে বাঁধতে লাগলো)

ক্লাইভ : (মিরজাফরকে) এখনই মুর্শিদাবাদের দিকে মার্চ করুন। বিশ্রাম করা চলবে না। সিরাজউদ্দৌলা যেন শক্তি সঞ্চয়ের সময় না পায়।

(ক্লাইভ কথা বলছে, পিছনে গোরা সৈন্য দুজন নারান সিংকে গুলি করল। মিরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ নিদারুণ শঙ্কিত। ক্লাইভ অবিচল। গুলিবিদ্ধ নারান সিংয়ের দিকে তাকিয়ে সহজ কণ্ঠে বললো)

ক্লাইভ : গুপ্তচরকে এই ভাবেই সাজা দিতে হয়।

নারান : (মৃত্যুস্তিমিত কণ্ঠে) এ দেশে থেকে এ দেশকে ভালোবেসেছি। গুপ্তচরের কাজ করেছি দেশের স্বাধীনতার খাতিরে। সে কি বেইমানির চেয়ে খারাপ? মোনাফেকির চেয়ে খারাপ? (ঝিমিয়ে যেতে লাগলো। হঠাৎ একটু সতেজ হয়ে) তবু ভয় নেই, সিরাজউদ্দৌলা বেঁচে আছে।



ক্লাইভ : (গোরা সৈন্য দুটিকে) How do you kill? Idiots যখন মারবে shoot straight into the heart.
এমন মারবে যেন সঙ্গে সঙ্গে মরে।

(পিষ্টল বার করল)

নারান : ভগবান সিরাজউদ্দৌলাকে রক্ষা...

(ক্লাইভ নিজে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে নারান সিংয়ের মৃত্যু হলো)

[দৃশ্যান্তর]

তৃতীয় অংক : চতুর্থ দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল ২৫ জুন। স্থান : মুর্শিদাবাদ নবাব দরবার।

[চরিত্রবৃন্দ : মঞ্চ প্রবেশের পর্যায় অনুসারে— সিরাজ, ব্যক্তি, সৈনিক, অপর সৈনিক, বার্তাবাহক, দ্বিতীয় বার্তাবাহক, জনতা ও লুৎফা।]
(দরবারে গণ্যমান্য লোকের সংখ্যা কম। বিভিন্ন শ্রেণির সাধারণ মানুষের সংখ্যাই বেশি। স্তিমিত আলোয় সিরাজ বস্তুত করছেন। ধীরে ধীরে আলো উজ্জ্বল হবে।)

সিরাজ : পলাশির যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে, সে কথা গোপন করে এখন আর কোনো লাভ নেই। কিন্তু—

ব্যক্তি : প্রাণের ভয়ে কে না পালায় হুজুর?

সিরাজ : আপনাদের কি তাই বিশ্বাস যে, প্রাণের ভয়ে আমি পালিয়ে এসেছি?

(জনতা নীরব)

সিরাজ : না, প্রাণের ভয়ে আমি পালাইনি। সেনাপতিদের পরামর্শে যুদ্ধের বিধি অনুসারেই আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বিজয়ী শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করিনি। ফিরে এসেছি রাজধানীতে স্বাধীনতা বজায় রাখবার শেষ চেষ্টা করবো বলে।

ব্যক্তি : কিন্তু রাজধানী খালি করে তো সবাই পালিয়েছে জাঁহাপনা!

সিরাজ : আমি অনুরোধ করছি, কেউ যেন তা না করেন। এখনও আশা আছে। এখনও আমরা একত্রে রুখে দাঁড়াতে পারলে শত্রু মুর্শিদাবাদের ঢুকতে পারবে না।

ব্যক্তি : তা কী করে হবে হুজুর? অতবড় সেনাবাহিনী যখন ছারখার হয়ে গেল।

সিরাজ : তারা যুদ্ধ করে নি। তারা দেশবাসীর সঙ্গে, দেশের মাটির সঙ্গে প্রতারণা করেছে। কিন্তু যারা নিজের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ বড় করে দেখতে শিখেছিল, মুষ্টিমেয় সেই কজনই শুধু যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়ে গেছে। এই প্রাণদান আমরা ব্যর্থ হতে দেবো না।

ব্যক্তি : পরাজয়ের খবর বাতাসের বেগে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে জাঁহাপনা। ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠেছে। বিজয়ী সৈন্যের অত্যাচার এবং লুণ্ঠতরাজের ভয়ে নগরের অধিকাংশ লোকজন তাদের দামি জিনিসপত্রগুলো সঙ্গে নিয়ে যে-কোনো দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

সিরাজ : আপনারা ওদের বাধা দিন। ওদের অভয় দিন। শত্রু সৈন্যদের হাতে পড়বার আগেই সাধারণ চোর-ডাকাত ওদের সর্বস্ব কেড়ে নেবে।

ব্যক্তি : কেউ মানে না হুজুর। সবাই প্রাণের ভয়ে পালিয়েছে।

সিরাজ : কোথায় পালাবে? পেছনে থেকে আক্রমণ করার সুযোগ দিলে মৃত্যুর হাত থেকে পালানো যায় না। আপনারা কেউ অধৈর্য হবেন না। সবাইকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে বলুন। এই আমাদের শেষ সুযোগ, এ কথা বার বার করে বলছি। ক্লাইভের হাতে রাজধানীর পতন হলে এ দেশের স্বাধীনতা চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে যাবে।

ব্যক্তি : জাঁহাপনা, কোথায় বা পাওয়া যাবে তত বেশি সৈন্য আর কোথায় বা তার ব্যয় ব্যবস্থা!

সিরাজ : দুএক দিনের ভেতরেই বিভিন্ন জমিদারের কাছ থেকে যথেষ্ট সৈন্য আসবে। নাটোরের মহারাণীর কাছ থেকেও সৈন্য সাহায্য আসবে। অর্থের অভাব নেই। সেনাবাহিনীর খরচের জন্যে রাজকোষ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আপনারা বলুন কার কী প্রয়োজন।



- সৈনিক : ইয়ার লুৎফ খাঁর সৈন্যদলে রোজ বেতনে আমি জমাদারের কাজ করি জাঁহাপনা। আমার অধীনে দুশ সিপাই। আমরা হুজুরের জন্যে প্রাণপণে লড়তে প্রস্তুত।
- সিরাজ : বেশ, খাজাঞ্চির কাছ থেকে টাকা নিয়ে যান। আপনার সিপাইদের তৈরি হতে আদেশ দিন। মুর্শিদাবাদে এই মুহূর্তে অন্তত দশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ হবে। জমিদারদের কাছ থেকে সাহায্য আসবার আগে এই বাহিনী নিয়েই আমরা শত্রুর মোকাবেলা করতে পারবো।
- অপর সৈনিক : আমি রাজা রাজবল্লভের অস্থারোহী বাহিনীতে ঠিকা হারে কাজ করি। আমার মতো এমন আরও শতাধিক লোক রাজবল্লভের বাহিনীতে কাজ করে। জাঁহাপনার হুকুম হলে আমরা একটা ফৌজ অল্প সময়ের ভেতরে খাড়া করতে পারি।
- সিরাজ : এখুনি চলে যান। খাজাঞ্চির কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিন, যত দরকার।

(বার্তাবাহকের প্রবেশ)

- বার্তাবাহক : শহরে আরও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে জাঁহাপনা। মুহম্মদ ইরিচ খাঁ সাহেব এইমাত্র সপরিবারে শহর ছেড়ে চলে গেলেন।
- সিরাজ : (বিম্ময় বিমূঢ়) ইরিচ খাঁ পালিয়ে গেলেন। সিরাজউদ্দৌলার শ্বশুর ইরিচ খাঁ।
- বার্তাবাহক : জাঁহাপনা।
- সিরাজ : আশ্চর্য! এই কিছুক্ষণ আগে তিনি আমার কাছ থেকে অজস্র টাকা নিয়ে গেলেন সেনাবাহিনী সংগঠনের জন্যে।
- ব্যক্তি : তাহলে আর আশা কোথায়?
- সিরাজ : তা হলেও আশা আছে।

(দ্বিতীয় বার্তাবাহকের প্রবেশ)

- ২য় বার্তাবাহক : জাঁহাপনার কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহের জন্যে যারা টাকা নিয়েছে তাদের অনেকেই নিজেদের লোকজন নিয়ে শহর থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।
- সিরাজ : তাহলেও আশা। ভীরা প্রতারকের দল চিরকালই পালায়। কিন্তু তাতে বীরের মনোবল ক্ষুণ্ণ হয় না। এমনি করে পালাতে পারতেন মিরমর্দান, মোহনলাল, বদ্রি আলি, নৌবেসিং। তার বদলে তাঁরা পেতেন শত্রুর অনুগ্রহ, প্রভূত সম্পদ এবং সম্মান। কিন্তু তা তাঁরা করেননি। দেশের স্বাধীনতার জন্যে, দেশবাসীর মর্যাদার জন্যে, তাঁরা জীবন দিয়ে গেছেন। স্বার্থান্ধ প্রতারকের কাপুরুষতা বীরের সংকল্প টলাতে পারেনি। এই আদর্শ যেন লাঞ্ছিত না হয়। দেশপ্রেমিকের রক্ত যেন আবর্জনার স্তুপে চাপা না পড়ে।
- (জনতা নীরব। সিরাজের অস্থির পদচারণা)
- সিরাজ : সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে আপনারা ভেবে দেখুন, কে বেশি শক্তিমান? একদিকে দেশের সমস্ত সাধারণ মানুষ— অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদ্রোহী। তাদের হাতে অস্ত্র আছে, আর আছে ছলনা এবং শাঠ্য। অস্ত্র আমাদেরও আছে, আর আমাদের আছে সেই দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প। এই অস্ত্র দিয়ে আমরা কাপুরুষ দেশদ্রোহীদের অবশ্যই দমন করতে পারব।
- ব্যক্তি : সাধারণ মানুষ তো যুদ্ধ কৌশল জানে না হুজুর।
- সিরাজ : তবু তাদের সংঘবদ্ধ হতে হবে। হাজার হাজার মানুষ একযোগে রুখে দাঁড়াতে পারলে কৌশলের প্রয়োজন হবে না। বিক্রম দিয়েই আমরা শত্রুকে হতবল করতে পারব। তা না হলে, ভবিষ্যতে বছরের পর বছর, দেশের সাধারণ মানুষ দেশদ্রোহী এবং বিদেশি দস্যুর হাতে যেভাবে উৎপীড়িত হবে তা অনুমান করাও কষ্টকর। আপনারা ভেবে দেখুন, কেন এই যুদ্ধ? মুসলমান মিরজাফর, ব্রাহ্মণ রাজবল্লভ, কায়স্থ রায়দুর্লভ, জৈন মহাতাব চাঁদ শেঠ, শিখ উমিচাঁদ, ফিরিঙ্গি খৃষ্টান ওয়াটসন, ক্লাইভ আজ একজোট হয়েছে কিসের জন্যে? সিরাজউদ্দৌলাকে ধ্বংস করবার প্রয়োজন তাদের কেন এত বেশি? তারা চায় মসনদের অধিকার। কারণ, তা না হলে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা হয় না। দেশের ওপরে অবাধ লুণ্ঠতরাজের একচেটিয়া অধিকার তারা পেতে পারে না সিরাজউদ্দৌলা বর্তমান থাকতে। একবার সে সুযোগ পেলে তাদের আসল চেহারা আপনারা দেখতে পাবেন। বাংলার ঘরে ঘরে হাহাকারের বন্যা বইয়ে দেবে মিরজাফর ক্লাইভের



লুণ্ঠন অত্যাচার। কিন্তু তখন আর কোনো উপায় থাকবে না। তাই সময় থাকতে একযোগে মাথা তুলে দাঁড়ান। আপনারা অবশ্যই জয়লাভ করবেন।

ব্যক্তি : কিন্তু জাঁহাপনা, সৈন্য পরিচালনার যোগ্য সেনাপতিও তো আমাদের নেই।
সিরাজ : আছে। সেনাপতি মোহনলাল বন্দি হননি। তিনি অবিলম্বে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। তাছাড়া আমি আছি। মরহুম আলিবর্দির আমল থেকে এ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধে আমি শরিক হইনি? পরাজিত হয়েছি একমাত্র পলাশিতে। কারণ সেখানে যুদ্ধ হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়। আবার যুদ্ধ হবে, আর সৈন্য পরিচালনা করবো আমি নিজে। আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন বিহার থেকে রামনারায়ণ, পাটনা থেকে ফরাসি বীর মসিয়েল।

(বার্তাবাহকের প্রবেশ)

বার্তাবাহক : সেনাপতি মোহনলাল বন্দি হয়েছেন জাঁহাপনা।
সিরাজ : (কিছুটা হতাশ) মোহনলাল বন্দি হয়েছে?
জনতা : তাহলে আর কোনো আশা নেই। কোনো আশা নেই।

(জনতা দরবার কক্ষ ত্যাগ করতে লাগলো)

সিরাজ : মোহনলাল বন্দি? (কতকটা যেন আত্মসংবরণ করে) তা হলেও কোনো ভয় নেই। আপনারা হাল ছেড়ে দেবেন না।

(সিরাজ হাত তুলে পলায়নপর জনতাকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। জনতা তাতে কান না দিয়েই পালাতেই লাগলো)

সিরাজ : আমার পাশে এসে দাঁড়ান। আমরা শত্রুকে অবশ্যই রুখবো।
(সবাই বেরিয়ে গেল। অবসন্ন সিরাজ আসনে বসে পড়লেন। দুহাতে মুখ ঢাকলেন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলো।
লুৎফার প্রবেশ। মাথায় হাত রেখে ডাকলেন)

লুৎফা : নবাব।
সিরাজ : (চমকে উঠে) লুৎফা! তুমি এই প্রকাশ্য দরবারে কেন লুৎফা?
লুৎফা : অন্ধকারে ফাঁকা দরবারে বসে থেকে কোনো লাভ নেই নবাব।
সিরাজ : (রুদ্ধ কণ্ঠে) কেউ নেই, কেউ আমার সঙ্গে দাঁড়াল না লুৎফা, দরবার ফাঁকা হয়ে গেল।
লুৎফা : (কাঁধে হাত রেখে) তবু ভেঙে পড়া চলবে না জাঁহাপনা। এখান থেকে যখন হলো না তখন যেখানে আপনার বন্ধুরা আছেন, সেখানে থেকেই বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার আয়োজন করতে হবে।
সিরাজ : যেখানে আমার বন্ধুরা আছেন? হ্যাঁ, আপাতত পাটনায় যেতে পারলে একটা কিছু করা যাবে।
লুৎফা : তা হলে আর বিলম্ব নয় জাঁহাপনা। এখনি প্রাসাদ ত্যাগ করা দরকার।
সিরাজ : হ্যাঁ, তাই যাই।
লুৎফা : আমি তার আয়োজন করে ফেলেছি।
সিরাজ : কী আর আয়োজন লুৎফা। দুতিন জন বিশ্বাসী খাদেম সঙ্গে থাকলেই যথেষ্ট। তোমরা প্রাসাদেই থাকো আবার যদি ফিরি, দেখা হবে।
লুৎফা : না, আমি যাবো আপনার সঙ্গে।
সিরাজ : মানুষের দৃষ্টি থেকে চোরের মতো পালিয়ে পালিয়ে আমাকে পথ চলতে হবে। সে কষ্ট তুমি সহ্যে পারবে না লুৎফা।
লুৎফা : পারবো। আমাকে পারতেই হবে। বাংলার নবাব যখন পরের সাহায্যের আশায় লালায়িত তখন আমার কিসের অহঙ্কার? মৃত্যু যখন আমার স্বামীকে কুকুরের মতো তাড়া করে ফিরছে তখন আমার কিসের কষ্ট? আমি যাবো, আমি সঙ্গে যাবো। (কান্নায় ভেঙে পড়লেন। সিরাজ তাঁকে দুহাতে গ্রহণ করলেন)

[দৃশ্যান্তর]



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

উইটনেস (Witness)- সাক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শী। কমবখৎ- হতভাগ্য। খাজাঞ্চি- কোষাধ্যক্ষ, খাজনার বা রাজকরের অধ্যক্ষ।
জানালা- নারী, অঙ্গুরাসিনী বা পর্দানশীল নারী। তাকিয়া- ঠেসান দেবার উপযোগী মোটা বালিকা। দেওয়ান- রাজস্ব



বিভাগের মন্ত্রী। **ধড়িবাজ**- ধূর্ত, ফন্দিবাজ, প্রতারণা। **ফরমান**- আদেশ। **ফরাস**- মেঝেতে পাতবার জন্য কাপড়ের আস্তরণ। **সওয়ারী**- যানবাহনে আরোহী। **Compensate**- ক্ষতিপূরণ করা। **অভয়**- আশ্বাস; সাহস। **অস্তিত্ব**- সত্তা। **আক্রোশ**- বিদ্বেষ, ক্রোধ। **আত্মাভিমান**- নিজের উপর নিজের অভিমান। **উৎকর্ষিত**- দুর্ভিক্ষগ্রস্ত, চিত্তিত। **উদগার**- বমন। **উৎকর্ষ**- শুনবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র। **কামিয়াবী**- সফলতা, কৃতকার্যতা। **কুর্নিশ**- নবাবকে সম্মান দেখাবার জন্য পিছনে হটে গিয়ে অবনত মস্তকে সালাম। **ক্ষমতাভিলাসী**- ক্ষমতা লাভ করা যার ইচ্ছা। **খাজাঞ্চী**- কোষাধ্যক্ষ। **খাদেম**- সেবক, ভৃত্য। **গড়বন্দী**- এখানে পরিখা অর্থে। **গোরা**- ইংরেজ অর্থে, গৌরবর্ণ সৈনিক। **ঘায়েল**- নিহত অর্থে। **ঘোড়সওয়ার**- অশ্বারোহী। **চাঁদের হাট**- শিশুদের বা সুন্দরীদের একত্র সবাবেশ, সুখ সম্পদপূর্ণ সংসার। **ছাউনী**- শিবির। **জমাদার**- ইংরেজ আমলে উচ্চপদস্থ ভারতীয় সৈনিক বিশেষ হেড কনস্টেবল। **জৈন**- মহাবীর-প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়। **ঠিকা**- অল্প সময়ের জন্য নিযুক্ত, নির্ধারিত শর্তযুক্ত। **টিপি**- উঁচু স্থান। **তুর্য়নাদ**- বর্ণবাদ্যের শব্দ। **দূরবীণ**- দূরের বস্তু স্পষ্ট রূপে দেখার যন্ত্র। **দেহরক্ষী**- অশ্বারোহী- দেহ রক্ষায় নিযুক্ত অশ্ব আরোহনকারী সৈনিক। **দেয়াল**- বাধা, প্রতিবন্ধক অর্থে এখানে প্রযুক্ত। **পরিহাস**- ঠাট্টা, তামাশা। **পিঠমোড়া**- দুই হাত পিঠের দিকে নিয়ে বাঁধা হয়েছে এমন। **প্রবৃত্তি**- অভিরুচি। **প্রহর**- তিন ঘণ্টা কাল; দিন রাতের আটভাগের একভাগ সময়। **ফিরিঙ্গি**- ভারতীয় ও ইউরোপীয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণশঙ্কর জাতি। **ফরিয়াদ**- নালিশ। **ফৌজ**- সৈন্য। **বরদাস্ত**- সহ্য করা, সহ্যকরণ। **বারুদ**- বিস্ফোরক চূর্ণ যা দিয়ে কামান বন্দুক ইত্যাদির গুলি প্রস্তুত হয়। **বেঙ্গিমানী**- বিশ্বাসঘাতকতা। **ভূতপূর্ব নবাব**- প্রাক্তন নবাব, এখানে নবাব মির্জা মুহম্মদ আলিবর্দি খাঁ। **মতলব**- অভিসন্ধি, উদ্দেশ্য। **মসনদ**- সিংহাসন, রাজাসন। **মহড়া**- আড়ম্বরের সঙ্গে প্রদর্শন। **মেহেরবান**- দয়ালু। **মৃত্যুবিধান**- মৃত্যুর আদেশ। **মহাপরাক্রমশালী**- মহাশক্তিশালী। **মাতৃস্থানীয়া**- মাতৃসম, মায়ের মত। **মোনাফেকি**- প্রতারণা, শঠতা। **রসলীলা**- প্রেমলীলা। **রাজকোষ**- রাজার বা রাষ্ট্রের ধনভাণ্ডার। **রাজদ্রোহ**- রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দ্রোহ। **রাজমাতা**- রাজার মা। **রেহেল**- যার উপর পবিত্র কুরআন শরিফ বা যে কোন বই রেখে পড়া হয়। **রৌশনি**- আলোক সজ্জা। **লালায়িত**- লোলুপ, অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। **শাঠ্য**- শঠতা, ধূর্ততা। **শাহজাদী**- বাদশাহর কন্যা। **সংঘবদ্ধ**- দলবদ্ধ। **সাপিনী**- স্ত্রী-সাপ। এখানে সাপিনী স্বভাবের নারী অর্থে ব্যবহৃত। **সোরাহী**- জলের কুঁজো। **স্তিমিত**- অনুজ্জ্বল। **হতবল**- বলহীন। **হেফাজত**- জিম্মাদারি, রক্ষণাবেক্ষণ। **হারেম**- অন্দরমহল, অন্তঃপুর। **হাসিল**- বুদ্ধি ও কৌশলে কার্য উদ্ধার। **হস্তক্ষেপ**- হাত দেওয়া, কোনো কাজে বাধা দেওয়া। **Excellency**- সম্রাট, গভর্নর, রাষ্ট্রদূত প্রমুখের পদবি। **Idiot**-নির্বোধ। **Standing like pollar**- স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছে, স্থানুর মতো দাঁড়ানো অর্থে। **The bravest soldier**- বীরশ্রেষ্ঠ সৈনিক।

টীকা

আমিনা বেগম-বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার গর্ভধারিণী এবং প্রাক্তন নবাব আলিবর্দি খাঁর কনিষ্ঠ কন্যা। আলিবর্দির ভ্রাতৃপুত্র জয়েনউদ্দিনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। জয়েনউদ্দিন যখন বিহারের সুবেদার তখন ১৭৪৮ সালে আফগান নৃপতি আহমদ শাহ দুররানী পাঞ্জাব আক্রমণ করলে বাংলার নবাবের বিদ্রোহী আফগান সেনাদল পাটনা অধিকার করে নেয়। এই বিদ্রোহীদের হাতেই আলিবর্দির জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজী আহম্মদ ও তার পুত্র জয়েনউদ্দিনের মৃত্যু হয়। আমিনা বেগম বাংলার নবাব পরিবারের এক ভাগ্যহীনা নারী। তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র এক্রামউদ্দৌলা পলাশির যুদ্ধের পূর্বেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। জ্যেষ্ঠপুত্র নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার পর তার কনিষ্ঠপুত্র মির্জা মাহদিকেও মীরনের আজ্ঞাবাহী সৈন্যরা কাঠের পাটাতনে পিষ্ট করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। আমেনা বেগমের হত্যাকাণ্ডও মিরজাফরের নৃশংসতার দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। মিরজাফরের নির্দেশে হাত-পা বেঁধে মাঝানদীতে নিক্ষেপ করে বন্দিণী আমিনা বেগমের জীবন্ত সমাধি রচনা করা হয়।

আলিনগর- কলকাতা শহরের নতুন নাম। ১৭৫৬ সালের জুন মাসে কলকাতা দখল করে নবাব সিরাজউদ্দৌলা মাতামহের নামানুসারে শহরটির নামকরণ করেন আলিনগর। মানিকচাঁদ ছিলেন আলিনগরের নবাবনিযুক্ত প্রথম গভর্নর।

ইয়ার লুৎফ খাঁ- পলাশির যুদ্ধে মিরজাফরের সহযোগী সেনাপতি।

উমর বেগ জমাদার- মিরজাফরের বিশ্বস্ত গুপ্তচর।

এ্যাডমিরাল ওয়াটসন- এ্যাডমিরাল চার্লস ওয়াটসন। ইংরেজ পক্ষের নৌবাহিনী প্রধান ওয়াটসন ছিলেন ইংল্যান্ডের রাজকীয় নৌবাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত এ্যাডমিরাল। সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলকাতা দখলের পর পাঁচটি যুদ্ধ জাহাজের বহর নিয়ে ওয়াটসন কলকাতা পৌঁছান এবং ক্লাইভের বাহিনীর সঙ্গে যোগদেন। ধূর্ত ক্লাইভের তুলনায় ওয়াটসন ছিলেন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন।



নাটকে উমিচাঁদকে অর্থ ফাঁকি দেয়ার জন্য যে জাল দলিল প্রস্তুতের প্রসঙ্গ আছে, সেই জাল দলিলে ওয়াটসন স্বাক্ষরদান করেননি। ক্লাইভ লুমিংটনকে নিয়ে ওয়াটসনের স্বাক্ষর নকল করান। ওয়াটসন পলাশি যুদ্ধের পর দু'মাস যেতে না যেতেই রোগভোগে মৃত্যুবরণ করেন। সেন্ট জোনা গোরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

মিরন- পরলোকগত নবাব আলিবর্দি খাঁর ভগ্নিপতি ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি মিরজাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মিরন। ইনিও তার পিতার মতই ছিলেন বিশ্বাসঘাতক, ষড়যন্ত্রকারী ও নিষ্ঠুর। ভোগবিলাসে মত্ত ব্যভিচারী জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন মিরন। মিরজাফরের পক্ষে অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেন তিনি। তারই উদ্যোগ ও নির্দেশে মোহাম্মদি বেগ নিষ্ঠুরভাবে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করে। অকালে বজ্রাঘাতে মিরনের মৃত্যু হয়।

রবার্ট ক্লাইভ, কর্নেল- মাত্র সতেরো বছর বয়সে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন রবার্ট ক্লাইভ। সামান্য চাকুরীর ছকবাঁধা জীবনে হতাশগ্রস্ত ক্লাইভ আত্মহত্যার চেষ্টা সফল হয়নি। ভারতে ফরাসিদের সঙ্গে ইংরাজ বণিকদের যুদ্ধে ক্লাইভ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এরপর মারাঠা জলদস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করে তিনি কর্নেল উপাধি লাভ করেন। পলাশি যুদ্ধের শেষে ইনি নবাবের দখল করা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন। তারই ষড়যন্ত্রে পলাশির যুদ্ধ এক প্রহসনে রূপান্তরিত হয়। ইনি নবাবের প্রধান সেনাপতি এবং প্রধান প্রধান অমাত্য বা মন্ত্রণাদাতাদের প্রলুব্ধ করে ইংরেজদের পক্ষাবলম্বনে রাজি করান। ফলে নবাবের প্রধান সেনাপতি মিরজাফরের পূর্ব পরিকল্পিত উদাসীনতা ও অপারগতার কারণে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন হয় এবং বাংলায় স্বাধীন নবাবি শাসনের অবসান ঘটে।



সারসংক্ষেপ :

নবাবের কাছে স্পষ্ট যে, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যুগিয়েছেন খালা ঘসেটি বেগম। ফলে তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে গুপ্তচর বাহিনী। এতেই ঘসেটি বেগম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। ঘসেটি বেগম নবাবকে ‘শয়তান’ অভিহিত করেন। সহধর্মিণী লুৎফা অন্তঃপুরে নবাবকে কিছুদিন বিশ্রামের অনুরোধ করেন। মোহনলালের কাছে থেকে পাওয়া জরুরি সংবাদের সূত্রে নবাবকে চলে যেতে হয়। পলাশির প্রান্তরের আসন্ন যুদ্ধে বিপর্যয়ের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন নবাব নিদ্রাহীন সময় অতিবাহিত করেন। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে সেনাপতি মোহনলাল আসেন নবাবের কাছে। বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ প্রমুখ সেনাপতি নবাবের পক্ষ হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করবেন— এমন বিশ্বাস সিরাজের নেই। লর্ড ক্লাইভ ও মিরজাফরের একাধিক গোপন চিঠি ইতোমধ্যে মোহনলালের হস্তগত হয়েছে, ধরা পড়েছে বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচরের দল। এ সময়েই সিরাজের শিবিরে আসেন নবাবের অন্যতম বিশ্বাসভাজন সেনাপতি মিরমর্দান। মিরমর্দান পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রে নবাব পক্ষের কৌশল প্রণয়ন করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকদের না রাখার পক্ষে মোহনলাল অভিমত ব্যক্ত করলে সিরাজ এদের চোখে চোখে রাখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। তাঁর সর্বশেষ ভরসা আগামীকাল পলাশির ‘যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলার স্বাধীনতা মুছে যাবার সূচনা দেখে মিরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফদের মনে যদি দেশপ্রীতি জেগে ওঠে সেই সম্ভাবনাটুকু’।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশির প্রান্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলার নবাবের অনুগত বাহিনী মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে পড়ে। মিরমর্দান ও মোহনলালের নেতৃত্বে পরিচালিত বাহিনীর আক্রমণে বাধ্য হয়ে প্রথমে পিছু হটে। যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি মিরজাফর এবং সেনাপতি রায়দুর্লভ ও ইয়ার লুৎফ খাঁর সৈন্য যোগ দেয়নি। কিন্তু যুদ্ধে নৌবেসিং হাজারী নিহত হয় এবং বৃষ্টিতে নবাব পক্ষের বারুদ অকেজো হয়ে পড়ে। শঙ্কিত নবাব সৈনিকদের অভয় দেন। অনুগত ফরাসি সেনাপতি সাঁফে নবাবের কাছে হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির বর্ণনা দেন। মিরমর্দানের মৃত্যু সংবাদ আসে। পরাজয় নিশ্চিত জেনে সেনাপতি মোহনলাল নবাবকে দ্রুত মুর্শিদাবাদে যাওয়ার পরামর্শ দেন। পলাশির যুদ্ধে পরাজিত নবাব রাজধানী রক্ষার্থে মুর্শিদাবাদ আসেন। মুষ্টিমেয় কিছু নাগরিকদের নবাব বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, পলাশিতে যুদ্ধ সংঘটিতে হয়নি, হয়েছে যুদ্ধের অভিনয়। এখনও যদি সশস্ত্র প্রতিরোধ বর্ণনা করা যায় তাহলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব। এ-সময় মোহনলালের বন্দী হওয়ার দুঃসংবাদ শুনে জনতা দরবার কক্ষ পরিত্যাগ করতে শুরু করে। এই বিপর্যয় মুহূর্তে বেগম লুৎফুনিসা নবাবকে পরামর্শ দেন মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার। হিতৈষি বন্ধুবর্গের আশ্রয়ে থেকে তাদের সহায়তায় বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করতে নবাবকে অনুরোধ জানান লুৎফা।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৩. মিরজাফরের গুপ্তচর কে?

ক. উমর বেগ

খ. জগৎ শেঠ

গ. মোহন লাল

ঘ. শওকত জঙ্গ

১৪. সিরাজ কোনটিকে তাঁর চারপাশের ‘দেয়াল’ বলেছেন?

ক. অমাত্যদের ষড়যন্ত্রকে

খ. লবণ বিক্রেতাদের

গ. ঘসেটি বেগমকে

ঘ. লবণ উৎপাদনকারীদেরকে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বাঙালি শুধু লাঠি দিয়েই দেড়শত বছর আগেও তার স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখতে চেষ্টা করেছে। আজ বাংলার ছেলেরা স্বাধীনতার জন্য যে আত্মদান করেছে, ইতিহাসে তা স্বর্ণ-লেখায় লিখিত থাকবে।

১৫. ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাটকের সঙ্গে উদ্দীপকের কোন দিকটির মিল রয়েছে?

ক. বাঙালির স্বপ্নভঙ্গ

খ. আত্মত্যাগের মহিমা

গ. ইংরেজদের পরাজয়

ঘ. বাঙালির স্বাধীনতা লাভ

১৬. উদ্দীপক ও ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাটকে মিল রয়েছে যে বিষয়ে—

i. বাঙালির ত্যাগে

ii. বাঙালির প্রতিশোধ স্পৃহায়

iii. অমাত্যদের বিশ্বাসঘাতকতায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও iii

পাঠ-৫



পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি-

- মিরজাফরের ক্ষমতারোহণের কথা জানবেন।
- নবাব সিরাজের পরিণতির কথা জানবেন।



মূলপাঠ

চতুর্থ অংক : প্রথম দৃশ্য

সময় : ১৭৫৭ সাল, ২৯ জুন। স্থান : মিরজাফরের দরবার।

[চরিত্রবৃন্দ : মঞ্চ প্রবেশের পর্যায় অনুসারে- রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, নকিব, মিরজাফর, ক্লাইভ, ওয়াটস, কিলপ্যাট্রিক, উমিচাঁদ, প্রহরী, মিরন, মোহাম্মদি বেগ]

(রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভসহ অন্যান্য আমির ওমরাহরা দরবারে আসীন। দরবার কক্ষ এমন আনন্দ কোলাহলে মুখর যে সেটা রাজ দরবারের পরিবর্তে নাচ গানের মজলিস বলেও ভেবে নেওয়া যেতে পারে।

- রাজবল্লভ : কই আসর জুড়িয়ে গেল যে। নতুন নবাব সাহেবের দরবারে আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন?
- জগৎশেঠ : ঢাল তলোয়ার ছেড়ে নবাবি লেবাস নিচ্ছেন খাঁ সাহেব, একটু দেরি তো হবেই। তা ছাড়া চুলে নতুন খেজাব, চোখে সুর্মা, দাড়িতে আতর, এ সব তাড়াহুড়ার কাজ নয়।
- রাজবল্লভ : দর্জি নতুন পোশাকটা নিয়ে ঠিক সময়ে পৌঁছেছে কি না কে জানে।
- জগৎশেঠ : না না, সে ভাবনা নেই। নবাব আলিবর্দি ইন্তেকাল করার আগের দিন থেকেই পোশাকটা তৈরি। আমি ভাবছি সিংহাসনে বসবার আগেই খাঁ সাহেব সিরাজউদ্দৌলার হারেমে ঢুকে পড়লেন কি না।
- রাজবল্লভ : তবেই হয়েছে। বেগমার হর গেলমানদের বিচিত্র ওড়নার গোলক ধাঁধা এড়িয়ে বার হয়ে আসতে খাঁ সাহেবের বাকি জীবনটাই না খতম হয়ে যায়।
- (নকিবের ঘোষণা)
- নকিব : সুবে বাংলার নবাব, দেশবাসীর ধন দণ্ডলত, জান সালামতের জিম্মাদার মির মুহম্মদ জাফর আলি খান দরবারে তশরিফ আনছেন। হুঁশিয়ার ...
- (মিরজাফরের প্রবেশ, সঙ্গে মিরন। সবাই সসম্মমে উঠে দাঁড়ালো। মিরজাফর ধীরে ধীরে সিংহাসনের কাছে গেলেন। একবার আড়াআড়িভাবে সিংহাসনটা প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর একপাশে গিয়ে একটা হাতল ধরে দাঁড়ালেন। দরবারের সবাই কিছুটা বিস্মিত।)
- রাজবল্লভ : (সিংহাসনের দিকে ইঙ্গিত করে) আসন গ্রহণ করুন সুবে বাংলার নবাব। দরবার আপনাকে কুর্নিশ করার জন্যে অর্ধৈর্ঘ্য হয়ে অপেক্ষা করছে।
- মিরজাফর : (চারিদিকে তাকিয়ে) কর্নেল সাহেব এসে পড়লেন বলে।
- জগৎশেঠ : কর্নেল সাহেব এসে কোম্পানির পক্ষ থেকে নজরানা দেবেন সে তো দরবারের নিয়ম।
- মিরজাফর : হ্যাঁ, উনি এখুনি আসবেন।
- রাজবল্লভ : (ঈষৎ অসহিষ্ণু) কর্নেল ক্লাইভ আসা অবধি দেশের নবাব সিংহাসনের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি?
- (নকিবের ঘোষণা)
- নকিব : মহামান্য কোম্পানির প্রতিনিধি কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ বাহাদুর দরবার হুঁশিয়ার...
- (ক্লাইভের প্রবেশ। সঙ্গে ওয়াটস, কিলপ্যাট্রিক। গোটা দরবার সন্ত্রস্ত। মিরজাফরের মুখ আনন্দে ভরে উঠল।)



- ক্লাইভ : Long live Nabab Jafar Ali Khan. But what is this? নবাব মসনদের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ইনি কি নবাব না ফকির?
- মিরজাফর : (বিনয়ের সঙ্গে) কর্নেল সাহেব হাত ধরে তুলে না দিলে আমি মসনদে বসবো না।
- ক্লাইভ : (প্রচণ্ড বিস্ময়ে) What? This is fantastic I must say. আপনি নবাব, এ মসনদ আপনার। আমি তো আপনার রাইয়াৎ- আপনাকে নজরানা দেবো।
- মিরজাফর : মিরজাফর বেইমান নয় কর্নেল ক্লাইভ। বাংলার মসনদের জন্যে আমি আপনার কাছে ঋণী। সে মসনদে বসতে হলে আপনার হাত ধরেই বসবো, তা না হলে নয়।
- ক্লাইভ : (ওয়াটসকে নিচু স্বরে) No clown will ever beat him. (দরবারের উদ্দেশ্যে) আমাকে লজ্জায় ফেলেছেন নবাব জাফর আলিখান। I am completely overwhelmed. বুঝতে পারছি নে কী করা দরকার। (এগিয়ে গিয়ে মিরজাফরের হাত ধরলো। তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিতে দিতে Gentlemen, I present you the new Nabab His excellence Jafar Ali Khan. আপনাদের নতুন নবাব জাফর আলি খানকে আমি মসনদে বসিয়ে দিলাম। May God help him and help you as well.
- ওয়াটস : Hip Hip Hurry.
- (মিরজাফর মসনদে বসলেন। দরবারের সবাই কুর্নিশ করল)
- ক্লাইভ : আপনাদের দেশে আবার শান্তি আসলো।
- (কিলপ্যাট্রিকের কাছ থেকে একটি সুদৃশ্য তোড়া নিয়ে নবাবের পায়ের কাছে রাখলো।)
- ক্লাইভ : কোম্পানির তরফ থেকে আমি নবাবের নজরানা দিলাম।
- ওয়াটস ও
- কিলপ্যাট্রিক : Long live Nabab Jafar Ali Khan.
- (একে একে অন্যেরা নজরানা দিয়ে কুর্নিশ করতে লাগলো। পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে উমিচাঁদের প্রবেশ। দৌড়ে ক্লাইভের কাছে গিয়ে।)
- উমিচাঁদ : আমাকে খুন করে ফেলো- আমাকে খুন করে ফেলো। (ক্লাইভের তলোয়ারের খাপ টেনে নিয়ে নিজের বুকে ঠুকতে ঠুকতে) খুন কর, আমাকে খুন কর।
- মিরজাফর : কী হয়েছে? ব্যাপার কী?
- উমিচাঁদ : ওহ্ সব বেঈমান- বেঈমান! না আমি আত্মহত্যা করব। (নিজের গলা সবলে চেপে ধরলো। গলা দিয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরুতে লাগলো। ক্লাইভ সবলে তার হাত ছাড়িয়ে ঝাঁকুনি দিতে দিতে)
- ক্লাইভ : Have you gone mad?
- উমিচাঁদ : ম্যাড বানিয়েছ। এখন খুন করে ফেল। দয়া করে খুন কর কর্নেল সাহেব।
- ক্লাইভ : Don't be silly. কী হয়েছে তা তো বলবে?
- উমিচাঁদ : আমার টাকা কোথায়?
- ক্লাইভ : কিসের টাকা?
- উমিচাঁদ : দলিলে সই করে দিয়েছিলে, সিরাজউদ্দৌলা হেরে গেলে আমাকে বিশলক্ষ টাকা দেওয়া হবে।
- ক্লাইভ : কোথায় সে দলিল?
- উমিচাঁদ : তোমরা জাল করেছ। (দৌড়ে সিংহাসনের কাছে গিয়ে) আপনি বিচার করুন। আপনি নবাব, সুবিচার করুন।
- ক্লাইভ : আমি এর কিছুই জানিনে।
- উমিচাঁদ : তা জানবে কেন সাহেব। নবাবের রাজকোষ বাটোয়ারা করে তোমার ভাগে পড়েছে একুশ লাখ টাকা। সকলের ভাগেই অংশ মতো কিছু না কিছু পড়েছে। শুধু আমার বেলাতে ...
- (দ্রব্ধন)
- ক্লাইভ : (সবলে উমিচাঁদের বাহু আকর্ষণ করে) You are dreaming Omichand. তুমি খোয়াব দেখছো।
- উমিচাঁদ : খোয়াব দেখছি? দলিলে পরিষ্কার লেখা বিশ লক্ষ টাকা পাবো। তুমি নিজেই সই করেছো।



- ক্লাইভ : আমি সই করলে আমার মনে থাকতো। তোমার বয়স হয়েছে— মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। এখন তুমি কিছুদিন তীর্থ করো— ঈশ্বরকে ডাকো। মন ভালো হবে। (উমিচাঁদকে কিলপ্যাট্রিকের হাতে দিয়ে দিল। সে তাকে বাইরে টেনে নিয়ে গেলো। উমিচাঁদ চিৎকার করতে লাগলো (আমার টাকা, আমার টাকা))
- ক্লাইভ : উমিচাঁদের মাথা খারাপ হয়েছে। Your Excellency may forgive us.
- জগৎশেষ্ঠ : এমন শুভ দিনটা থমথমে করে দিয়ে গেলো।
- ক্লাইভ : ভুলে যান। ও কিছু নয়। নবাবের কিছু বলা উচিত।
- রাজবল্লভ : নিশ্চয়ই। প্রজাসাধারণ আশ্বাসে আবার নতুন করে বুক বাঁধবে। রাজকার্য পরিচালনায় কাকে কী দায়িত্ব দেওয়া হবে তাও মোটামুটি তাদের জানানো দরকার।
- মিরজাফর : (ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে পাগড়ি ঠিক করে) আজকের এই দরবারে আমরা সরকারি কাজ আরম্ভ করার আগে কর্নেল ক্লাইভকে শুকরিয়া জানাচ্ছি তাঁর আন্তরিক সহায়তার জন্যে। বিনিময়ে আমি তাঁকে ইনাম দিচ্ছি বার্ষিক চার লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারি ও ২৪ পরগণার স্থায়ী মালিকানা।
(ওয়াটস ও কিলপ্যাট্রিক এক সঙ্গে হুঁরে। ক্লাইভ হাসিমুখে মাথা নোয়ালো।)
- মিরজাফর : দেশবাসীকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে, তাঁদের দুর্ভোগের অবসান হয়েছে। সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচারের হাত থেকে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছেন। এখন থেকে কারও শাস্তিতে আর কোনো রকম বিপ্লব ঘটবে না।
(প্রহরীর প্রবেশ)
- প্রহরী : সেনাপতি মির কাসেমের দূত।
- মিরজাফর : হাজির করো।
(বসলেন। দূতের প্রবেশ। মিরন দ্রুত তার কাছে এগিয়ে এলো। মিরনের হাতে পত্র প্রদান। মিরন খুলেই উল্লসিত হয়ে উঠলো।)
- মিরন : পলাতক সিরাজউদ্দৌলা মির কাসেমের সৈন্যদের হাতে ভগবানগোলায় বন্দি হয়েছে। তাঁকে রাজধানীতে নিয়ে আসা হচ্ছে।
(মিরজাফরের হাতে পত্র প্রদান)
- ক্লাইভ : ভালো খবর। You can feel really safe now.
- মিরজাফর : কিন্তু তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসবার কী দরকার? বাইরে যে-কোনো জায়গায় আটকে রাখলেই তো চলতো।
- ক্লাইভ : (রুখে উঠলো) No Your Honour এখন আপনাকে শক্ত হতে হবে। শাসন চালাতে হলে মনে দুর্বলতা রাখলে চলবে না। আপনি যে শাসন করতে পারেন, শাস্তি দিতে পারেন, দেশের লোকের মনে সে কথা জাগিয়ে রাখতে হবে every moment. কাজেই সিরাজউদ্দৌলা শিকল বাঁধা অবস্থায় পায়ে হেঁটে সবার চোখের সামনে দিয়ে আসবে জাফরাগঞ্জের কয়েদখানায়। কোনো লোক তার জন্যে এতটুকু দয়া দেখালে তার গর্দান যাবে। এখন মসনদের মালিক নবাব জাফর আলি খান। সিরাজউদ্দৌলা এখন কয়েদি, ওয়ার ক্রিমিন্যাল। তার জন্যে যে Sympathy দেখাবে সে traitor। আর আইনে traitor এর শাস্তি মৃত্যু। And that is how you must rule.
- মিরজাফর : আপনারা সবাই শুনেছেন আশা করি। সিরাজকে বন্দি করা হয়েছে। যথাসময়ে তার বিচার হবে। আমি আশা করি কেউ তার জন্যে সহানুভূতি দেখিয়ে নিজের বিপদ টেনে আনবেন না।
- ক্লাইভ : Yes। তা ছাড়া মুর্শিদাবাদের রাজপথ দিয়ে যখন তাকে soldier রা টানতে টানতে নিয়ে যাবে তখন রাস্তার দুধার থেকে ordinary public তার মুখে থুথু দেবে— they must spit on his face.।
- মিরজাফর : অতটা কেন?
- ক্লাইভ : আমি জানি He is a dead horse। কিন্তু না করলে লোকে আপনার ক্ষমতা দেখে ভয় পাবে কেন? Public এর মনে terror জাগিয়ে রাখতে পারাটাই শাসন ক্ষমতার granite foundation.
(মিরজাফর মসনদ থেকে নেমে দাঁড়াতেই দরবারের কাজ শেষ হলো। নবাব দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রধান অমাত্যরা এবং তার পেছনে অন্য সকলে। মঞ্চের আলো আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে গেলো; কিন্তু



প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার। ধীরে ধীরে মঞ্চে অনুজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠলো। কথা বলতে বলতে ক্লাইভ এবং মিরনের প্রবেশ।)

- ক্লাইভ : আজ রাত্রেই কাজ সারতে হবে। এ সব ব্যাপারে chance নেওয়া চলে না।
 মিরন : কিন্তু হুকুম দেবে কে? আব্বা রাজি হলেন না।
 ক্লাইভ : রাজবল্লভকে বলো।
 মিরন : তিনি নাকি অসুস্থ। তাঁর সঙ্গে দেখাই করা গেলো না।
 ক্লাইভ : Then?
 মিরন : রায়দুর্লভ, ইয়ার লুৎফ খাঁ- ওরাও রাজি হলেন না।
 ক্লাইভ : তা হলে তোমাকেই সেটা করতে হবে।
 মিরন : প্রহরীরা আমার হুকুম শুনবে কেন?
 ক্লাইভ : তোমার নিজের হাতেই সিরাজউদ্দৌলাকে মারতে হবে, in your own interest সে বেঁচে থাকতে তোমার কোনো আশা নেই। নবাবি মসনদ তো পরের কথা, আপাতত what about the lovely princess? লুৎফুল্লিসা তোমার কাছে ধরা দেবে কেন সিরাজউদ্দৌলা জীবিত থাকতে।
 মিরন : আমি একজন লোকের ব্যবস্থা করেছি। সে কাজ করবে, কিন্তু তোমার হুকুম চাই।
 ক্লাইভ : What pity, Hired kiler রা পর্যন্ত তোমার কথায় বিশ্বাস করে না। any way ডাকো তাকে।
 (মিরন বেরিয়ে গেল এবং মোহাম্মদি বেগকে নিয়ে ফিরে এলো।)
 ক্লাইভ : এ কে? looks like a real butcher.
 মিরন : মোহাম্মদি বেগ।
 ক্লাইভ : তুমি রাজি আছো?
 মোহাম্মদি বেগ : দশ হাজার টাকা দিতে হবে। পাঁচ হাজার অগ্রিম।
 ক্লাইভ : Agreed. (মিরনকে) ওকে টাকাটা এখনি দিয়ে দাও।
 (মিরন এবং মোহাম্মদি বেগ বেরুবার উপক্রম করলো)
 ক্লাইভ : There may be trouble, অবস্থা বুঝে কাজ করো। Be careful কাজ ফতে হলেই আমাকে খবর দেবে, যাও। (ওরা বেরিয়ে গেলো। ক্লাইভের মুখটা কঠিন হয়ে উঠলো। বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের মুঠো দিয়ে আঘাত করে বললো) it is must।

[দৃশ্যান্তর]

চতুর্থ অংক : দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় : ২ জুলাই। স্থান : জাফরাগঞ্জের কয়েদখানা।

[চরিত্রবৃন্দ : মঞ্চে প্রবেশের পর্যায়ে অনুসারে- কারাপ্রহরী, সিরাজ, মিরন, মোহাম্মদি বেগ।]

(প্রায়-অন্ধকার কারাকক্ষে সিরাজউদ্দৌলা। এক কোণে একটি নিরাবরণ দড়ির খাটিয়া। অন্যপ্রান্তে একটি সোরাহি এবং পাত্র। সিরাজ অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন আর বসছেন। কারাকক্ষের বাইরে প্রহরারত শাব্তী। মিরন এবং তার পেছনে মোহাম্মদি বেগের প্রবেশ। তার দুহাত বুকে বাঁধা। ডান হাতে নাতিদীর্ঘ মোটা লাঠি। প্রহরী দরজা খুলতেই কামরায় একটু খানি আলো প্রতিফলিত হলো।)

- সিরাজ : (খাটিয়ায় উপবিষ্ট, আলো দেখে চমকে উঠে) কোথা থেকে আলো আসছে। বুঝি প্রভাত হয়ে এলো।
 (খাটিয়া থেকে উঠে মঞ্চের সামনে এগিয়ে এলো। মঞ্চের মাঝামাঝি এসে দাঁড়ালো মিরন এবং তার পেছনে মোহাম্মদি বেগ।)
 সিরাজ : (মোনাজাতের ভঙ্গিতে হাত তুলে) এ প্রভাত শুভ হোক তোমার জন্যে লুৎফা। শুভ হোক আমার বাংলার জন্যে। নিশ্চিত হোক বাংলার প্রত্যেকটি নরনারী। আলহামদুলিল্লাহ।
 মিরন : আল্লার কাছে মাফ চেয়ে নাও শয়তান।
 সিরাজ (চমকে উঠে) মিরন। তুমি এ সময়ে এখানে? আমাকে অনুগ্রহ দেখাতে এসেছো, না পীড়ন করতে?



- মিরন : তোমার অপরাধের জন্যে দণ্ডাজ্ঞা শোনাতে এসেছি।
- সিরাজ : নবাবের দণ্ডাজ্ঞা?
- মিরন : বাংলার প্রজাসাধারণকে পীড়নের জন্যে দরবারের পদস্থ আমির ওমরাহদের মর্যাদা হানির জন্যে বাংলাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আইনসম্মত বাণিজ্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ করার জন্যে, অশান্তি এবং বিপ্লব সৃষ্টির জন্যে তুমি অপরাধী। নবাব জাফর আলি খান এই অপরাধের জন্যে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।
- সিরাজ : মৃত্যুদণ্ড? জাফর আলি খান স্বাক্ষর করেছেন? কই দেখি।
- মিরন : আসামির সে অধিকার থাকে নাকি? (পেছনে ফিরে মোহাম্মদি বেগ)
- মোহাম্মদি বেগ : জনাব।
- মিরন : নবাবের হুকুম তামিল করো।
(সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল। মোহাম্মদি বেগ লাঠিটা মুঠো করে ধরে সিরাজের দিকে এগোতে লাগলো।)
- সিরাজ : প্রথমে মিরন তারপর মোহাম্মদি বেগ। মিরন তবু মির জাফরের পুত্র, কিন্তু তুমি মোহাম্মদি বেগ, তুমি আসছো আমাকে খুন করতে?
(মোহাম্মদি বেগ তেমনি এগোতে লাগলো। সিরাজ হঠাৎ ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে যেতে)
- সিরাজ : আমি মৃত্যুর জন্যে তৈরি। কিন্তু, তুমি এ কাজ করো না মোহাম্মদি বেগ।
(মোহাম্মদি বেগ তবু এগোচ্ছে। সিরাজ আরও ভীত)
- সিরাজ : তুমি এ কাজ করো না মোহাম্মদি বেগ। অতীতের দিকে চেয়ে দেখো, চেয়ে দেখো। আমার আব্বা-আম্মা পুত্রপ্নেহে তোমাকে পালন করেছেন। তাঁদেরই সন্তানের রক্তে সে-প্নেহের ঋণ আঃ...
(লাঠি দিয়ে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করলো। সিরাজ লুটিয়ে পড়লো। মোহাম্মদি বেগ স্থির দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বার হচ্ছে। ডান হাতের কনুই এবং বাঁ হাতের তালুতে ভর দিয়ে সিরাজ কিছুটা মাথা তুললেন।)
- সিরাজ : (স্থলিত কণ্ঠে) লুৎফা, খোদার কাছে শুকরিয়া এ পীড়ন তুমি দেখলে না।
(মোহাম্মদি বেগ লাঠি ফেলে খাপ থেকে ছোরা খুলে সিরাজের লুষ্ঠিত দেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তার পিছে পরপর কয়েকবার ছোরার আঘাত করলো। সিরাজের দেহে মৃত্যুর আকুঞ্জন। মোহাম্মদি বেগ উঠে দাঁড়ালো।)
- সিরাজ : (ঈষৎ মাথা নাড়বার চেষ্টা করতে করতে মৃত্যু নিশ্বেজ কণ্ঠে)
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ...
(মোহাম্মদি বেগ লাঠি মারলো। সঙ্গে সঙ্গে সিরাজের জীবন শেষ হলো। শুধু মৃত্যুর আক্ষেপে তার হাত দুটো মাটি আঁকড়ে ধরবার চেষ্টায় মুষ্টিবদ্ধ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিরকালের তো নিষ্পন্দ হয়ে গেলো।)
- মোহাম্মদি বেগ : (উল্লাসের সঙ্গে) হা হা হা ...
(যবনিকা)



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

আকুঞ্জন- সঙ্কোচন। আক্ষেপ- হাত পা খিঁচুনি, মনস্তাপ। আমীর ওমরাহ- বাদশাহি দরবারের সভাসদ। আড়াআড়ি- কোনাকুনি। ইনাম- পুরস্কার। উল্লসিত- আনন্দিত, উৎফুল্ল। ওয়ার ক্রিমিন্যাল- যুদ্ধাপরাধী। কয়েদখানা- জেলখানা; ফাটক। কুর্নিশ- মুসলমানি কায়দায় অভিবাদন, বাদশাহ ও আমিরকে সম্মান দেখাবার জন্য পেছনে হটে গিয়ে অবনত মস্তকে সালাম। খাটিয়া- ক্ষুদ্রখাট, সাধারণত দড়ি দিয়ে ছাওয়া। খাপ- চামড়ার তৈরি তলোয়ার রাখার পাত্র। খেজাতপ- কলম, সাদা চুল লাল বা কালো করার রং। খোয়াব- স্বপ্ন। গর্দান- ঘাড়সহ মাথা। জিম্মাদার- হেফাজতকারী, তত্ত্বাবধানকারী। ঢাল- অস্ত্রের আঘাত নিবারক চর্ম। তশরীফ- উপস্থিত, পদার্পণ; হাজির। তামিল- মান্য, পালন। তীর্থ- পুণ্যস্থান। তোড়া- মোড়ক। দণ্ডাজ্ঞা- শাস্তির আদেশ। নজরানা- উপটোকন, উপহার; ভেট। নকীব- এখানে ঘোষক অর্থে। নাতিদীর্ঘ- অনতি দীর্ঘ। নিরাবরণ- আবরণহীন। নিষ্পন্দ- স্পন্দ শূন্য, স্থির, নিঃসাড়। নিষ্কৃতি- মুক্তি। পদস্থ- উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। প্রেক্ষাগৃহ- রঙ্গালয়, নাট্য-মিলনায়তন। ফিনকি- বেগে নির্গত সূক্ষ্ম রক্তধারা। বাটোয়ারা- বন্টন, ভাগ। বিঘ্ন- ব্যাঘাত, বাধা। বে-



শুমার- অসংখ্য। মজলিস- সভা, বৈঠক। রাইয়াৎ- প্রজা, যে প্রজা জমি নিজে চাষ করার জন্য ভূমিস্বত্ব লাভ করে। লুণ্ঠিত- ভূমিতলে পতিত। লেবাস- পোশাক। শাস্ত্রী- সশস্ত্র প্রহরী। শুকরিয়া- কৃতজ্ঞতা। সসম্মানে- সম্মানে। সুবে- বাদশাহি আমলে দেশের রাজনৈতিক বিভাগ। সন্তুষ্ট- অতিশয় ভীত। সালামত- নিরাপত্তা, শান্তি। স্থলিত কঠে- নিস্তেজ কঠে। হুর গেলমান- ইসলামি বিশ্বাস মতে বেহেশতের সেবক সেবিকাবৃন্দ। হুঁশিয়ার- সাবধান।

butcher- কশাই। clown- বিদূষক। fantestic- এখানে উদ্ভট অর্থে প্রযুক্ত। forgive- ক্ষমা; মার্জনা। granite foundation- কঠিন পাথরে তৈরি ভিত্তি; সুদৃঢ় ভিত্তি। Hired killer- ভাড়াটে খুনী। mad- পাগল, উন্মাদ। ordinemy public- সাধারণ জনতা। overwhlmed- অভিভূত। princess- বেগম। silly- বোকাটে, দুর্বলচেতা। soldier- সৈনিক। spit- থুতু ফেলা। sympathy- সহানুভূতি। terror- ভীতি। traitor- বিশ্বাসঘাতক। trouble- অসুবিধা, ঝামেলা বা ঝগড়াটে ফেলা।

টীকা :

নাটোরের মহারানী- জন্ম ১১২১-১২০০(?) বঙ্গাব্দ। নাটোরের জমিদার রাজা রামকান্ত রায়ের স্ত্রী। দীনদুঃখীর দুর্দশা মোচন ও সমাজকল্যাণের জন্য নাটোরের মহারানী ভবানী স্বনামধন্য। ১১৫৩ বঙ্গাব্দে স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন। নাটোর জমিদারীর বাৎসরিক আয় ছিল দেড় কোটি টাকা। নবাব সরকারের কোষাগারে রানী ভবানী বাৎসরিক ৭০ লক্ষ টাকা রাজস্ব জমা দিতেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে গদীচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে ইংরেজ পক্ষে ষড়যন্ত্রকারীদের ভরসনা করেছিলেন।

নৌবেসিং হাজারী- নবাব পক্ষের অন্যতম সেনাপতি।

পলাশি- এ গ্রামেরই প্রান্তরে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন তারিখে ঐতিহাসিক পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

বদী আলী খাঁ- পলাশির যুদ্ধে নবাব পক্ষের অন্যতম যোদ্ধা ও সেনাপতি, মীর মর্দান এর জামাতা।

মুহম্মদ ইরিচ খাঁ- মীর্জা ইরাজ খান নামেও পরিচিত। লুৎফুল্লিসার পিতা এবং বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার শ্বশুর। ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি তার বালিকা কন্যা লুৎফুল্লিসাকে বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁ দৌহিত্র সিরাজের সঙ্গে বিয়ে দেন।

লুৎফুল্লিসা- নবাব সিরাজউদ্দৌলার পত্নী। তার পিতার নাম মীর্জা ইরাজ খান। ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে এদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের সময় সিরাজের বয়স ছিল তের বছর আর লুৎফুল্লিসা ছিলেন নিতান্ত বালিকা। জাঁকজমকপূর্ণ এই বিয়ের স্মৃতি দীর্ঘদিন বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ ছিল। লুৎফুল্লিসা রাজনীতির কুটিল পরিমণ্ডল থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। সুখ-দুখকাতর সাধারণ নারীর মতই ছিল তার জীবন। ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারীর মতোই তার জীবনের পরিণতি। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন নবাব সিরাজের পলায়ন মুহূর্তের সঙ্গী ছিলেন লুৎফুল্লিসা। গন্তব্যহীন ঐ পলায়ন পথেই স্বামীসঙ্গ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। সিরাজ বন্দী হলে তাকে শত্রুরা মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করে, কিন্তু লুৎফুল্লিসাকে পাটিয়ে দেওয়া হয় ঢাকায়। সিরাজের মৃত্যুর পর ইংরেজরা তাকে মুর্শিদাবাদে পুনরায় নিয়ে এসেছিল। তিনি মিরজাফর পুত্র মিরনের বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নবাব সিরাজের স্মৃতিকে নিষ্ঠার সঙ্গে অন্তরে ধরে রেখেছিলেন।

শওকতজঙ্গ- নবাব সিরাজউদ্দৌলার খালাত ভাই ও রাজনৈতিক শত্রু। আলিবর্দি খাঁর দ্বিতীয় কন্যা শাহ বেগম এর পুত্র। শওকতজঙ্গের পিতার নাম সৈয়দ আহমদ। ইনি আলিবর্দির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি মোহাম্মদের দ্বিতীয় পুত্র। শওকতজঙ্গের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন কাশ্মীরের হিন্দু যুবক মোহনলাল।

সাঁফ্রে- পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে অংশগ্রহণকারী অন্যতম বিশৃঙ্খল ফরাসি সেনাপতি।

মোহাম্মদি বেগ- বাংলার ইতিহাসের এক ঘণ্য চরিত্র মোহাম্মদি বেগ। কৃতঘ্ন এবং অতিশয় হিংস্র চরিত্রের মানুষ হিসেবে ইতিহাসের আঁতাকুঁড়ে মোহাম্মদি বেগের স্থান। ক্লাইভ কারারুদ্ধ সিরাজকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিলে সিরাজের প্রাণহরণে একে একে সবাই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে মিরজাফর পুত্র মীরনের মধ্যস্থতায় মোহাম্মদী বেগ রাজি হয় সিরাজকে হত্যা করতে। তার এই সম্মতির পেছনে কোন রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিলো না, নিতান্তই অর্থের লোভে মোহাম্মদী বেগ সিরাজ হত্যার মত নৃশংস কাজের দায়িত্ব সাহসে গ্রহণ করে নেয়। সিরাজের পিতা জয়েনউদ্দিন আহমদ অনাথ মোহাম্মদি বেগকে স্নেহের সাথে লালন পালন করেছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সিরাজ জননী আমেনা বেগম তার বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন



করেছিলেন। নিহত হওয়ার পূর্বে সিরাজ তাকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন কিন্তু কৃতঘ্ন মোহাম্মদী বেগ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২রা জুলাই সিরাজকে শেষ প্রার্থনার সময় পর্যন্ত না দিয়ে নিষ্ঠুর জল্লাদের মত নৃশংসভাবে হত্যা করে।



সারসংক্ষেপ

পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ করে ১৭৫৭ সনের ২৯ জুন তারিখে সপরিষদ দরবারের আয়োজন করেছেন মিরজাফর। মির জাফর স্পষ্টতই জানিয়ে দেন যে, ক্লাইভ সাহেব হাত ধরে তুলে না দিলে তিনি সিংহাসনে আসন গ্রহণ করবেন না। ক্লাইভ অবশেষে তার হাত ধরে তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দেন এবং কোম্পানির পক্ষ থেকে লোকদেখানো নজরানাও প্রদান করেন। তখন দরবার কক্ষে আসে টাকার লোভে উন্মাদগ্রস্ত উমিচাঁদ। চুক্তিপত্র অনুযায়ী সিরাজের পতন হলে ক্লাইভ উমিচাঁদকে বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করবেন। কিন্তু পূর্বেই আসল চুক্তিপত্র নষ্ট করে নকল চুক্তিপত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল ধূর্ত ক্লাইভ। উমিচাঁদ এই প্রতারণার শিকার হয়েই এখন উন্মাদ।

ক্লাইভের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মিরজাফর এবং তার আন্তরিক সহায়তার জন্য পুরস্কার হিসেবে বার্ষিক চার লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারি ও ২৪ পরগনার স্থায়ী মালিকানা দান করেন। এ-সময় মির কাসেমের সৈন্যদের হাতে ভগবান গোলায় সিরাজউদ্দৌলার বন্দী এবং দ্রুত রাজধানীতে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণের খবর আসে। ক্লাইভ ও মিরন সিরাজ হত্যা পরিকল্পনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ক্লাইভ চান দ্রুত সিরাজ হত্যার বাস্তবায়ন। কিন্তু সিরাজ হত্যার আদেশ দিতে সকলেই কুণ্ঠিত। ক্লাইভ ভবিষ্যৎ মসনদ এবং পরাভূত নবাবের বেগম লুৎফুনিসার লোভ দেখিয়ে মিরনকে মোহের ফাঁদে আটকে ফেলেন। ক্লাইভের নির্দেশে মিরন অগ্রিম দশ হাজার টাকা প্রাপ্তির শর্তে মোহাম্মদি বেগকে সিরাজ হত্যাকাণ্ডে রাজি করায়। জাফরাগঞ্জের কয়েদ খানার প্রায়াক্কার কক্ষে সিরাজকে মিরন শয়তান আখ্যায়িত করে শেষবারের মত সৃষ্টিকর্তার কাছে মাফ চাইতে নির্দেশ দেয়। কুচক্রী মিরন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলে প্রজাপীড়নের জন্য, পদস্থ অমাত্যবর্গের মর্যাদাহানির জন্য ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের বৈধ অধিকার ক্ষুণ্ণ করার জন্য এবং দেশে বিপ্লব সৃষ্টি করার জন্য নবাব জাফর আলী খান সিরাজের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন। সিরাজ নবাবের স্বাক্ষর করা ফরমান দেখতে চাইলে মিরন আসামীর অধিকারের অজুহাত তুলে এবং সঙ্গী মোহাম্মদি বেগকে নবাবের আদেশ কার্যকর করার আহ্বান জানিয়ে দ্রুত কারাকক্ষ থেকে প্রস্থান করে। ঘাতক মোহাম্মদি বেগ সিরাজের মাথায় লাঠির প্রচণ্ড আঘাত করে। সিরাজের মৃত্যু নিশ্চিত করতে পাশও ঘাতক মোহাম্মদি বেগ খাপ থেকে ছোরা বের করে সিরাজের ভূমিতলে পতিত দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্রমান্বয়ে কয়েকবার ছুরিকাঘাত করে। সিরাজের দেহে মৃত্যুর লক্ষণ ফুটে উঠলে মোহাম্মদি বেগ উঠে দাঁড়ায়। ‘আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই’ এটি বলতে বলতে বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা জীবনাবসান ঘটে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৭. নবাব সিরাজউদ্দৌলার হত্যাকারী কে?

ক. মিরজাফর

খ. মিরন

গ. মোহাম্মদি বেগ

ঘ. জগৎশেঠ

১৮. ঘসেটি বেগমের প্রকৃতি হল—

i. সন্তানবৎসল

ii. স্বার্থপরায়ণ

iii. ক্ষমতালিপ্সু

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i ও ii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

অন্যায়ের কাছে নত নয় শির

ভয়ে কাঁপে কাপুরুষ, লড়ে যায় বীর।



১৯. উদ্দীপকের কোন দিকটি ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে প্রকাশিত হয়েছে?

- ক. নবাবের অনুগত সৈন্যবাহিনীর বীরত্ব খ. বাণিজ্য বিস্তারে ইংরেজদের কূটকৌশল
গ. নবাবের দরবারের আমলাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঘ. মিরজাফরের কাপুরুষোচিত আচরণ

২০. উদ্দীপক ও ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে ফুটে উঠেছে—

- i. বীরযোদ্ধারা বীরের মত লড়াই করে
ii. নবাব বাহিনী অন্যায়ের কাছে নত হয়নি
iii. দেশপ্রেমিক সৈনিকরা ষড়যন্ত্রকারী নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

২১. বাংলা নাটক সর্বপ্রথম কত তারিখে অভিনীত হয়?

- ক. ২৯ নভেম্বর, ১৯৯৫ খ. ২৭ ডিসেম্বর, ১৮৯৫
গ. ২৯ ডিসেম্বর, ১৬৯৫ ঘ. ২৭ নভেম্বর, ১৭৯৫

২২. ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটক কয়টি অঙ্কে বিভক্ত?

- ক. দুইটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

২৩. নবাব সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য কে ডাচ ও ফরাসিদের নিকট সাহায্য চেয়েছিল?

- ক. লর্ড ক্লাইভ খ. ক্লেটন
গ. ওয়ার্টসন ঘ. হলওয়েল

২৪. ঘসেটি বেগমের সাজ কেমন ছিল?

- ক. নরালংকার সাদামাটা সাজ খ. রাজমাতার গম্ভীর সাজ
গ. দীনহীন নিরাভরণ সাজ ঘ. জাঁকজমকপূর্ণ জলসার সাজ

২৫. ‘সিরাজের পতন কে না চায়?’- উক্তিটি করেছিলেন?

- ক. মিরজাফর খ. ঘসেটি বেগম
গ. উমিচাঁদ ঘ. লর্ড ক্লাইভ

২৬. মিরনের কাছে ছদ্মবেশে কে এসেছিলেন?

- ক. মিরজাফর খ. রায়দুলর্ভ
গ. জগৎশেঠ ঘ. উমিচাঁদ

২৭. ‘ওরা বেনিয়ার জাত।’ –কাদের বলা হয়েছে?

- ক. ওলন্দাজদের খ. ইংরেজদের
গ. ডাচদের ঘ. ফরাসিদের

২৮. পলাশির যুদ্ধে সিরাজের পতন হলে—

- i. ক্লাইভ পাবে দশ লক্ষ টাকা
ii. কলকাতার লোকেরা পাবে সত্তর লক্ষ টাকা
iii. কোম্পানি পাবে এক কোটি টাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii



২৯. 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান কোনটি?

ক. মিরজাফরের দরবার	খ. মুর্শিদাবাদের দরবার
গ. নবাবের দরবার	ঘ. জাফরাগঞ্জের কয়েদখানা

৩০. গঙ্গাজল ছুঁয়ে কে শপথ করেছিল?

ক. জগৎশেঠ	খ. মিরজাফর
গ. মিরন	ঘ. রাজবল্লভ

৩১. 'তা বলে বাঙালি কাপুরুষ নয়' উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে বাঙালির—

- সাহসিকতা
- কাপুরুষতা
- বীরত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. i ও iii

৩২. সাদা নিশান কিসের প্রতীক?

ক. পরাজয়ের	খ. বিজয়ের
গ. যুদ্ধবিরতির	ঘ. সন্ধির

৩৩. 'আমরা আপনার কর্তৃত্ব মানব না।' —এখানে 'আপনি' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

ক. লর্ড ক্লাইভ	খ. গভর্নর ড্রেক
গ. নবাব সিরাজ	ঘ. মিরজাফর আলি খাঁ

৩৪. 'যুদ্ধ কর, প্রাণপণে যুদ্ধ কর।' উক্তিটি করা হয়েছে যে কারণে—

ক. যুদ্ধযাত্রার অভিপ্রায়ে	খ. দুর্গ জয়ের জন্য
গ. সেনাদের মনোবল বাড়াতে	ঘ. পরাজয়ের শোধ নিতে

৩৫. নবাব সিরাজের মতে ইংরেজরা যে কারণে সভ্য জাতি—

- ইংরেজরা বাণিজ্য শর্ত মেনে চলে
- তারা নিয়ম ও শৃঙ্খলা জানে
- ইংরেজদের শাসন মানার অভ্যাস রয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. i, ii ও iii

৩৬. সিরাজ পলায়নপর জনতাকে আশ্বাস দিলেন যেভাবে—

- বিহারের রাম নারায়ণ সহযোগিতা করবে
- আপনারা হাল ছেড়ে দেবেন না
- আমার পাশে এসে দাঁড়ান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩৭ ও ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

কলিমদ্দি দফাদার ইউনিয়ন বোর্ডের চাকুরে। চাকুরিগত কারণে তাকে সব সময় পাক-বাহিনীর সঙ্গে থাকতে হয়। তবে সে পাক-বাহিনীর সঙ্গে থাকলেও অন্তরালে মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য দিয়ে সহায়তা করে।



৩৭. উদ্দীপকের কলিমদ্দি দফাদারের বিপরীত পরিচয় ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের যে চরিত্রে ফুটে উঠেছে—

ক. মিরমর্দান	খ. মোহনলাল
গ. উমিচাঁদ	ঘ. গভর্নর ড্রেক

৩৮. উদ্দীপকের কলিমদ্দি দফাদার ও নাটকের রাইসুল জুহালা চরিত্রে প্রকাশিত হয়েছে—

ক. প্রাসাদ ষড়যন্ত্র	খ. দেশপ্রেম
গ. কুটকৌশল	ঘ. হিংসা-বিদ্বেষ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

বেশ সুখেই ছিল রামশীলের জনসাধারণ। কিন্তু দেশপ্রেমিক ও প্রজাদরদী রাজার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে রাজ্যের সেনাপতি। তিনি রাজাকে হটিয়ে দিয়ে সিংহাসনে বসতে আহ্বান। রাজাও কোন অবস্থাতেই সিংহাসন ছাড়তে নারাজ।

৩৯. উদ্দীপকের সেনাপতির সঙ্গে ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে যে চরিত্রের মিল রয়েছে—

ক. কর্নেল ক্লাইভ	খ. মিরজাফর
গ. উমিচাঁদ	ঘ. জগৎশেঠ

৪০. এ ধরনের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়—

- বিশ্বাসঘাতকতায়
- বর্বরতায়
- প্রজা নির্যাতনে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i	খ. ii
গ. iii	ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই আর সবই গেছে ঋণে
বাবু কহিলেন, বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।
কহিলাম আমি, তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই।
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো- জোর মরিবার মতো ঠাঁই।
শুনি রাজা কহে, বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থ ও দিঘে সমান হইবে টানা—

ক. ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে কয়টি অঙ্ক আছে?

খ. ‘ব্রিটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড় লজ্জার কথা।’ —কে, কেন কথাটি বলেছে?

গ. ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে ইংরেজদের কোন বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকের উপেন চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে?— ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. ‘উদ্দীপকের বাবু ও ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে ইংরেজদের মানসিকতা একই সূত্রে গাঁথা।’ —মূল্যায়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :

রামের আক্রমণে সোনার লক্ষা ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে গেছে। যেভাবেই হোক তাঁর আশ্রাসন হতে লক্ষাপুরিকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু কোনমতেই কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। এগিয়ে এলেন লক্ষার বীর সন্তান মেঘনাদ। তাঁর চাচা বিভীষণ আবার রামচন্দ্রের দোসর। ধর্মের নামে তিনি রামচন্দ্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। তবুও মেঘনাদ দমলেন না। তিনি নিকুন্ডীলা যজ্ঞঘরে গেলেন যজ্ঞের আয়োজনে। মেঘনাদের শেষ রক্ষা হয় নি। যুদ্ধের এক পর্যায়ে বিভীষণের সহযোগিতায় লক্ষণ মেঘনাদকে হত্যা করে। এভাবে লক্ষার স্বাধীনতা- সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ে।

ক. সিকান্দার আবু জাফর কোন সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?

খ. কী কারণে পলাশির যুদ্ধে নবাব পক্ষের পরাজয় ঘটে?

গ. মেঘনাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের কোন চরিত্রে ফুটে উঠেছে? —আলোচনা করুন।

ঘ. ‘উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ও ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটক উভয়ই পরিণতির দিক থেকে করুণ রসাত্মক।’ —মূল্যায়ন করুন।



সৃজনশীল প্রশ্ন-৩ :

খালাত বোনের মৃত্যুর পর তার একমাত্র সন্তান শুভকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন আরশাদ করিম। তিনি শুভকে নিজপুত্র আশিকের মতো লালন-পালন করেন। বড় হয়ে শুভ একদিন সম্পত্তির লোভে মামাতো ভাই আশিকের বুকে অস্ত্র ধরে। মৃত্যুভয়ে ভীত আশিক শুভর নিকট অনেক অনুনয়-বিনয় করে। কিন্তু বিধি বাম। এক পর্যায়ে আশিক শুভর উদ্দেশ্যে বলে, “আমার বাবা-মা তোমাকে পুত্রবৎ লালন-পালন করেছেন। তোমাকে পরম স্নেহে বুক জড়িয়ে ধরেছেন। আজ তুমি আমায় হত্যা করবে?” শুভর পাষণ্ড হৃদয় গলেনি। আশিকের নিখর দেহ মুহূর্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

ক. পলাশি কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

খ. ‘ইনি কি নবাব না ফকির।’-কে, কোন প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছিল?

গ. উদ্দীপকের আশিক ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের কোন চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে? -আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপকে ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের একটি বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটেছে।”-মূল্যায়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৪ :

বাংলাদেশের ইতিহাসে তাজউদ্দিন আহমেদ গভীর দেশপ্রেম ও কর্তব্যবোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রিয় নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে তাঁর প্রতি গভীর আনুগত্য প্রকাশ করে তিনি দেশমাতৃকার সেবা করেছিলেন। কোনো লোভ বা লালসা তাঁকে কর্তব্যবোধ থেকে টলাতে পারেনি। জীবনকে বাজি রেখে তিনি নেতার আদর্শ বাস্তবায়ন করেছেন। নেতার স্বপ্নের উৎসারণ ঘটিয়েছেন বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি দৃঢ়ভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন বাঙালির মুক্তিসমরে। তাই আজ তিনি সকলের নিকট নন্দিত। বাংলার ইতিহাসে তার নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

ক. ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে কাকে ইংরেজদের চিরকালীন বন্ধু বলা হয়েছে?

খ. ‘ভীরু প্রতারকের দল চিরকালই পালায়’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের তাজউদ্দিন আহমেদ ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের কোন চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? -আলোচনা করুন।

ঘ. “মোহনলাল ও তাজউদ্দিন আহমেদের দেশপ্রেম বাঙালির জাতীয়তাবোধে চিরকালীন প্রেরণার উৎস।”
-উদ্দীপক ও ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের আলোকে মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।

🔑 নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ এর নমুনা উত্তর :

ক.

সিকান্দার আবুজাফর রচিত ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে পাঁচটি অঙ্ক রয়েছে।

খ.

‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে উমিচাঁদ প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আলোচ্য উক্তিটি করেছে।

বাণিজ্য করার নাম করে এসে এক সময় ইংরেজদের লোলুপ দৃষ্টি বাংলার শাসন ক্ষমতার উপর নিপতিত হয়। ফলে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের দমন করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। নবাবের সেনারা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ আক্রমণ করলে ইংরেজ সৈন্যরা বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। ইংরেজ বাহিনীর চতুর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ নিজেদের সৈন্যদের আসন্ন পরাজয় কিংবা পরাজয়ের দৃশ্য দেখবার আগে পালিয়ে যায়। নবাবের দরবারের একজন আমলা উমিচাঁদ এই দৃশ্য দেখে ফেলে। তাই দুর্গ ছেড়ে ইংরেজরা পালিয়ে যাওয়ায় সুযোগ বুঝে উমিচাঁদ এই উক্তিটি করেছিল।

গ.

উদ্দীপকের উপেন চরিত্রে ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে ইংরেজদের শোষণের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকটি পলাশির যুদ্ধের কাহিনি অবলম্বনে রচনা করা হয়েছে। ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে। বাংলার রাজনীতির দুর্বলতার সুযোগে তারা এদেশের মানুষকে শোষণ করাও আরম্ভ করে। নিজেদের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারা বাংলার অসহায় মানুষের উপর নির্মম অত্যাচার চালাত। ইংরেজদের নিকট উৎপাদিত পণ্য-দ্রব্য



বিক্রি করা না হলে তারা জনগণকে নির্যাতন করত। দেশের নির্যাতিত মানুষ নবাবের কাছে এসব অত্যাচারের প্রতিকার চাইতে আসত।

উদ্দীপকে উপেন প্রচলিত সমাজের শোষণের শিকার হয়েছে। সে তার সককিছু হারিয়ে আজ নিঃস্ব। এখন তার বাকী আছে শুধু দুই বিঘা জমি। এটুকুও জমিদার গ্রাস করতে অতি আগ্রহী। মরণের পর ঠাইয়ের কথা বলেও উপেন জমিদারের নিকট থেকে নিস্তার পায়নি। অপরদিকে নবাব সিরাজের আমলে বাংলার এক লবণ চাষি ইংরেজদের নিমর্মতার শিকার হয়েছে। সে ইংরেজদের কাছে লবণ বিক্রি করতে চায়নি। তাই তারা লবণচাষির ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। তার পরিবারের মানুষগুলোর উপর চালিয়েছে অমানবিক নির্যাতন। ইংরেজদের অত্যাচারের কবল থেকে বাঁচার জন্য সাধারণ মানুষ কখনো কখনো নবাবের দরবারে প্রতিকার চাইতে আসতো। বস্তুত উপেনের চরিত্রের মধ্যে নাটকের ইংরেজদের শোষণের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ.

উদ্দীপকে বাবু এবং সিরাজউদ্দৌলা নাটকে ইংরেজদের মানসিকতা একই সূত্রে গাঁথা, কেননা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে উভয়েই শোষণক শ্রেণির।

ইংরেজরা সাত-সাগর তের নদীর ওপার থেকে বাংলাদেশে এসেছিল বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। পরবর্তীতে তারা এদেশের রাজনীতির দিকে নজর দেয়। একসময় তারা অন্যায়ভাবে কৌশলের আশ্রয় নিয়ে বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করে। আর শাসন-শোষণের উদ্দেশ্যে বাংলার মানুষের উপর নির্যাতন চালায়। বাংলার টাকায় ভরে ওঠে ইংরেজের গোলা। এভাবে তারা সুদীর্ঘ একশত নব্বই বৎসর এদেশের মানুষকে রক্তচোষা জোঁকের মত শোষণ করেছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বাবু একজন জমিদার। অধীনস্থ প্রজাদের শোষণ করে অর্থ-বিত্তে স্ফীত হওয়াই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নিজের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য সে উপেনের উপর অত্যাচার করেছে। এছাড়া নিজের বিলাসিতাকে পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে সে উপেনের শেষ সম্বল দুইবিঘা জমিটুকুও দখল করে নিতে চায়। পক্ষান্তরে সিরাজউদ্দৌলা নাটকে দেখা যায়, এক লবণচাষি ইংরেজ বণিকদের নিকট লবণ বিক্রি করেনি বলে ইংরেজরা তার উপর নিমর্ম নির্যাতন চালায়। তার বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়। ইংরেজরা লবণচাষির পরিবারের লোকদেরকেও নির্যাতন থেকে রেহাই দেয় না। এদিক থেকে উদ্দীপকের বাবু চরিত্রের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলা নাটকের ইংরেজদের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকের বাবু চরিত্রটি আমাদের সামন্ত-সমাজের জীবন্ত প্রতীক। বাবু চরিত্রটি ক্ষমতার দাপটে সাধারণ মানুষের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। আর নাটকেও রয়েছে এদেশকে দখল করার জন্য ইংরেজদের কূটকৌশল প্রয়োগের বর্ণনা। ইংরেজরা এদেশ দখল করে দস্যুর মত লুট করেছিল বাংলার মানুষের সর্বস্ব। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বাবু এবং নাটকে ইংরেজদের চরিত্র একই সূত্রে গাঁথা।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ এর নমুনা উত্তর :

ক.

সিকান্দার আবুজাফর ‘সমকাল’ নামক মাসিক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

খ.

মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পলাশির যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন। এদিন পলাশির আশ্রয়স্থানে নবাব বাহিনী ও ইংরেজ সেনাবাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়। যুদ্ধে আত্মবলে বলীয়ান নবাব জয়ের ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর সেনাপতি মিরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বার্থের মোহে ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দেন। তিনি নবাব বাহিনীকে অসময়ে যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দেন। এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে ইংরেজ বাহিনী নবাবের সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ফলে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হন।

গ.

মেঘনাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের সিরাজ চরিত্রে ফুটে উঠেছে।



উদ্দীপকে মেঘনাদ চরিত্রটি একটি বীর চরিত্র। মেঘনাদ চরিত্রে দেশপ্রেম রয়েছে। স্বদেশের জন্য মেঘনাদ অপরিমেয় মমত্ববোধ অনুভব করে। সে তার নিজের দেশকে বাইরের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছে। জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু তার চাচা বিভীষণের জন্য সে শেষ পর্যন্ত কুলিয়ে উঠতে পারেনি। পক্ষান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন সিরাজউদ্দৌলা। তিনিও দেশকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন। দেশকে ভালোবাসার কারণে তিনি এখান থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন। তিনি পলাশির যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শক্তিকে উচিত শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেননি তাঁরই সেনাপতি মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়। সর্বোপরি সিরাজ চরিত্রে দেশপ্রেমের সঙ্গে বীরধর্মও মিশ্রিত হয়েছিল। ফলে দেখা যায়, মেঘনাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের সিরাজ চরিত্রে ফুটে উঠেছে।

ঘ.

উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ও ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটক উভয়টিই পরিণতির দিক থেকে করুণ রসাত্মক হয়েছে।

‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে রাজনীতির নানা সংকট মোকাবেলা করতে হয়েছে। স্বাধীন দেশের নবাব হয়েও তিনি স্বাধীনভাবে দেশ পরিচালনা করতে পারেননি। রাষ্ট্রের ভেতর-বাহির দুদিক থেকেই তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। একদিকে ইংরেজদের ছল-চাতুরি অন্যদিকে ঘসেটি বেগম-মিরজাফরের ষড়যন্ত্র তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। ফলে রাজনীতিতে তিনি বিভ্রান্তির শিকার হন। শেষ পর্যন্ত পলাশির যুদ্ধে তার ভুল নীতির জন্যই তাকে পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে।

উদ্দীপকে বিভীষণ একটি বিশ্বাসঘাতক চরিত্র। সে মেঘনাদের সম্পর্কে চাচা। কিন্তু স্বার্থের মোহে প্রতিপক্ষ রামের সঙ্গে সে সন্ধি করে। মেঘনাদকে হত্যার জন্য গোপনে রামের বাহিনীকে সহায়তা করে। বিভীষণের মত হীন লোকের কারণেই লঙ্কার দেশপ্রেমিক সন্তান মেঘনাদের মতো বীরকে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে। পক্ষান্তরে ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে মিরজাফরও একজন বিশ্বাসঘাতক চরিত্র। সে স্বার্থপর ও লোভী। নিজের দেশ কিংবা মানুষ কারও জন্য তার মমত্ববোধ নেই। সে নবাব পক্ষের সেনাপতি এবং বাংলার প্রধান সেনাপতি। তবুও গোপনে হাত মেলায় ইংরেজদের সঙ্গে। অর্থের মোহে বাঙালি হয়েও নিজের দেশকে তুলে দেয় ইংরেজদের হাতে। তার বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই সুদীর্ঘ দুই শতাব্দী বাঙালি জাতিকে ইংরেজদের পদানত থাকতে হয়েছে।

উদ্দীপকের বিভীষণ দেশ ও জাতির সঙ্গে প্রতারণা করে হাত মিলিয়েছে রামের সঙ্গে। এর পরবর্তী ফল হচ্ছে সোনার লঙ্কার পরাধীনতা। অপর দিকে মিরজাফরও স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারে ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। যার অনিবার্য পরিণতি দুইশত বৎসরকাল যাবৎ বাংলার পরাধীনতা। তাই বলা যায়, উদ্দীপক এবং ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটক উভয়ের পরিণতি করুণ রসাত্মক।



অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন :নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন-৫

লেডিস এ্যান্ড জেন্টলম্যান, লর্ড কর্নওয়ালিশের খুব বুদ্ধি ছিল। তিনি পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট দ্বারা জমিদার করিলেন আর জমিদারগণ লেজ নাড়িতে লাগিল। আপনারা বলেন, কর্নেল ক্লাইভ যুদ্ধ করিয়া বঙ্গদেশ জয় করিলেন। নো, নেভার। আই মাস্ট নট টক লাইক এ্যান ইডিয়ট। ইতিহাসকে মিথ্যা করিতে পারিব না। বাংলাদেশের মেরাজ আলি সকল আপন হস্তে ক্লাইভের পকেটে বাংলাদেশ ঘুষড়াইয়া দিলেন। সো লগ লিভ মেরাজ আলি, লগ লিভ জমিদার জাতি।

ক. ‘সিরাজউদ্দৌলা’ কোন ধরনের নাটক?

খ. ‘কেউ নেই, কেউ আমার সঙ্গে দাঁড়াল না লুৎফা।’-উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে বলুন।

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে ‘বাঙালি শ্রেণিটি’র কোন বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে?—আলোচনা করুন।

ঘ. “পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের বিজয় ছিল এক গভীর ষড়যন্ত্রের ফসল।” —উদ্দীপক ও ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের আলোকে মন্তব্যটি মূল্যায়ন করুন।



উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

০১. গ ০২. ঘ ০৩. খ ০৪. ক ০৫. ক ০৬. ঘ ০৭. ঘ ০৮. ঘ ০৯. ক ১০. ক ১১. ক ১২. ক
১৩. ক ১৪. ক ১৫. খ ১৬. ক ১৭. গ ১৮. গ ১৯. ক ২০. ঘ ২১. গ ২২. ঘ ২৩. ঘ ২৪. ঘ
২৫. খ ২৬. খ ২৭. খ ২৮. ঘ ২৯. ঘ ৩০. ঘ ৩১. ঘ ৩২. ঘ ৩৩. খ ৩৪. গ ৩৫. ঘ ৩৬. ঘ
৩৭. গ ৩৮. খ ৩৯. খ ৪০. ক ৪১. ক ৪২. গ



নমুনা প্রশ্ন

এইচএসসি পরীক্ষা-

বাংলা (আবশ্যিক) প্রথম পত্র

কোর্স কোড : HSC-1851

সৃজনশীল প্রশ্ন

সময় : ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট

পূর্ণমান : ৬০

দ্রষ্টব্য: প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। ‘ক’ বিভাগ থেকে দুইটি, ‘খ’ বিভাগ থেকে দুইটি, ‘গ’ বিভাগ থেকে একটি ও ‘ঘ’ বিভাগ থেকে একটি করে মোট ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলতি ভাষারীতির মিশ্রণ দুঃসহ্য।

‘ক’ বিভাগ : গদ্য

(যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিন)

- নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সৃজিত চক্রবর্তীর পুত্র সঞ্জীব পোস্টমাস্টারের চাকরি নিয়ে আসে কমলদহ গ্রামে। কিছুদিন পর নিঃসঙ্গ সঞ্জীব ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে অচেতন হয়ে পড়ে। পাশের বাড়ির নিম্নবর্ণের মেয়ে, স্কুল শিক্ষিকা শিউলী ডাক্তার ডেকে তার চিকিৎসা করায় এবং সেবায়ত্নের জন্য গ্রামের এক দরিদ্র মাসিকে নিয়োগ করে। শিউলীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সেবা ও উপযুক্ত চিকিৎসা পেয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে সঞ্জীব। শিউলীর মার্জিত রুচি, ব্যক্তিত্ব, মানবতাবোধে মুগ্ধ হয়ে জাতভেদ ভুলে বাবার অমতে তাকে বিয়ে করে সঞ্জীব। প্রথাগত সংস্কারের বিপরীতে জয় হলো মনুষ্যত্বের।
ক. ‘বিলাসী’ গল্পের মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল শুধু গ্রামের এক প্রান্তে একটা ... বাগান।’ –কীসের বাগান?
খ. ‘ইহা আর একটা শক্তি, যাহা বহু স্বামী-স্ত্রী একশ বৎসর একত্রে ঘর করার পরেও হয়তো তাহার কোনো সন্ধান পায় না।’ –উক্তিটির মর্মার্থ লিখুন।
গ. ‘বিলাসী’ গল্পের বিলাসী চরিত্রের সঙ্গে উদ্দীপকের শিউলী চরিত্রের বৈসাদৃশ্য আলোচনা করুন।
ঘ. ‘উদ্দীপকটিতে ‘বিলাসী’ গল্পের সমাজ বাস্তবতার আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।’ –মন্তব্যটি বিচার করুন।
- পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল কিছু নিয়ম- কানুন, বাঁধন- শৃঙ্খল, মানা- নিষেধের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহ করতে হলে সকলের আগে আপনারা চিনতে হবে, বুক ফুলিয়ে বলতে হবে- ‘আমি আপনারা ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।’
ক. মানুষের মধ্যে কখন নির্ভরতা আসে?
খ. ‘আমার কর্ণধার আমি।’ –উক্তিটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
গ. উদ্দীপকের ভাবনা ‘আমার পথ’ প্রবন্ধের সঙ্গে কীভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. “আত্মশক্তির জাগরণই স্বাধীনতা অর্জনের পাথর।” –উদ্দীপক ও ‘আমার পথ’ প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিচার করুন।
- বিষ পিঁপড়ার পা ছেঁড়ার চেষ্টা করা নেহায়েতই বোকামির কাজ, কারণ তখন সেটা টিটনের বুড়ো আঙ্গুলে আবার কামড়ে ধরল। টিটন বলল, “আউ! আউ!” এবং কিছু বোঝার আগে সেই পিঁপড়া তার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে প্রথমে গাছের ডালে তারপর পাতার আড়ালে গিয়ে অন্য পিঁপড়াদের মাঝে গা ঢাকা দিয়ে ফেলল। সেটাকে আলাদা করে আর খুঁজে পাওয়ার কোনো উপায় নেই। টিটন ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, “দেখেছিস? দেখেছিস বদমাইশ পিঁপড়াটা কী করল?”
ক. সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহের নাম কি?
খ. ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পে কাকে ‘অত্যন্ত সুবিবেচক’ বলা হয়েছে?
গ. উদ্দীপকটি ‘মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? –আলোচনা করুন।
ঘ. “মহাজাগতিক কিউরেটর’ গল্পের পিঁপড়া ও উদ্দীপকের পিঁপড়ার চেতনাগত ভিন্নতা রয়েছে।” –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।



‘খ’ বিভাগ : কবিতা
(যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিন)

৪. “আমায় নহে গো, ভালোবাস শুধু ভালোবাস মোর গান
বনের পাখিরে কে চিনে রাখে গান হলে অবসান
চাঁদেরে কে চায়, জোছনা সবাই যাচে
গীত-শেষে বীণা পড়ে থাকে ধূলি-মাঝে।”
ক. ‘সোনার তরী’ কবিতায় কৃষকের ছোটো খেতের চারদিকে কী খেলা করছে?
খ. সোনার তরীতে কৃষকের ঠাই হলো না কেন?
গ. সোনার তরী’ কবিতার ধানের সঙ্গে উদ্দীপকের গান ও গীতের তুলনা করুন।
ঘ. “উদ্দীপক এবং সোনার তরী’ কবিতার মূলভাব অভিন্ন।” –আপনার মতামত দিন।
৫. তিতুমির বাংলার একজন অকুতোভয় বীর। তিনি ভারতবর্ষে অন্যান্য, নিপীড়ন আর শোষণবিরোধী সংগ্রামের ছবি। ঔপনিবেশিক শক্তি ইংরেজ আর স্থানীয় জমিদারদের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই এখনও এ মাটির সন্তানদের বুকে শিহরণ জাগায়। এদেশ এখনও নানা সংকট ও সংগ্রামে তাকে স্মরণ করে। তিতুমির আমাদের জাতীয় চেতনার প্রতীক।
ক. ‘নিষ্কম্’ শব্দের অর্থ কী?
খ. নূরুলদীন ইতিহাসে বিখ্যাত কেন?
গ. উদ্দীপকটি ‘নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার সঙ্গে কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ? –তুলে ধরুন।
ঘ. “উদ্দীপকে ‘নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়’ কবিতার পূর্ণ অনুরণন ঘটেনি।” –আলোচনা করুন।
৬. মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’ রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ নিকুন্ঠিলা যজ্ঞাগারে নিরস্ত্র মেঘনাদকে বধ করে। মেঘনাদের মৃত্যুতে শোকার্ত পিতা লঙ্কার রাজা রাবণের হাহাকার, আর্তনাদ :
“ছিল আশা মেঘনাদ, মুদিব অস্ত্রিমে
এ নয়নদ্বয়, আমি তোমার সম্মুখে-
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র তোমায়, করিব মহাযাত্রা।”
ক. ‘কবর’ কবিতায় নাতির ছোট ফুপুর মৃত্যুর কারণ কী?
খ. ‘কবর’ কবিতায় ‘জোড়মানিকেরা’ কারা? কেন?
গ. উদ্দীপকের মেঘনাদ ‘কবর’ কবিতার কার প্রতিনিধিত্ব করে? আলোচনা করুন।
ঘ. “উদ্দীপকের রাবণ এবং ‘কবর’ কবিতার বৃদ্ধ দাদুর স্বজন হারানোর বেদনা সমভাবে হৃদয়বিদারক।” –বিশ্লেষণ করুন।

‘গ’ বিভাগ: উপন্যাস– ‘লালসালু’

৭. রসময় চকোত্তি ভবা পাগলার মন্দিরে পুরোহিত। স্থানীয় মানুষের ধারণা তিনি অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ। মন্দিরে পূজা ও ভগবানের নাম সংকীর্ণ করে তাঁর সময় কাটে। লোকে বলে ভগবানের সঙ্গে তাঁর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। ফলে দশ গ্রামের মানুষ মন্দিরে আসে তাঁকে সেবা দিতে। শত মানুষের প্রার্থনা, আবদার, অনুযোগ আর দুঃখ, কষ্টে ভরে উঠে পাষাণ প্রতিমার মন্দির। প্রতিমার দেবতাকে তুষ্ট করতে গিয়ে জনতার কড়িতে ভরে ওঠে মন্দিরের কড়িকাঠ। কালের চক্রে রসময়ের ধন বাড়ে, মান বাড়ে আর প্রতিমার প্রতি আপামর জনতার বাড়ে ভয় আর ভরসা।
ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
খ. ‘মজিদ ধরা- ছোঁয়ার বাইরে। যোগসূত্র হচ্ছে রহিমা।’ –কেন?
গ. উদ্দীপকের রসময় চকোত্তি ‘লালসালু’ উপন্যাসে কাকে ইঙ্গিত করে? –আলোচনা করুন।
ঘ. “উদ্দীপক ও ‘লালসালু’ উপন্যাসে ধর্ম ব্যবসায়ের একই চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।” –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

অথবা

৮. এলাকায় শফি কবিরাজের বেশ নাম-ডাক। যে কোন অসুখ-বিসুখে গ্রামের লোকের তিনিই একমাত্র ভরসা। নিজের গরজে তিনি প্রায়ই স্থানীয় লোকজনের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। জনদরদী কবিরাজ বলে আশ-পাশের গ্রামের লোকজনও তাকে বেশ সমীহ করে। বিশেষ করে জ্বর, পেট ব্যাথা, কলেরা, হাঁপানি ইত্যাদি রোগের চিকিৎসায় তার খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত। দেশিয়



পদ্ধতিতে তিনি গাছের পাতা, ছাল, শেকড়-বাকড় থেকে ওষুধ তৈরি করেন। সম্প্রতি তার একচেটিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় ফাটল ধরেছে। নদীর ওপারে যে নতুন এমবিবিএস পাশ করা ডাক্তার এসেছেন আজকাল লোকজন ওখানেই ছুটছে। তাই সমাজে নিজের প্রভাব হারানোর ভয়ে শঙ্কিত শফি কবিরাজ। গোপনে তিনি কৌশল আঁটেন নতুন ডাক্তারকে তাড়াতে।

ক. মতলুব খাঁ কে?

খ. ‘তোমার দাড়ি কই মিয়া’ –উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকের শফি কবিরাজের মধ্যে ‘লালসালু’ উপন্যাসের কার চেহারা ফুটে উঠেছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘লালসালু’ উপন্যাসে মানুষের অস্তিত্বের সংকট প্রকাশিত হয়েছে।” –স্বীকার করেন কি? আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করুন।

‘ঘ’ বিভাগ : নাটক– ‘সিরাজউদ্দৌলা’

৯.

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই আর সবই গেছে ঋণে
বাবু কহিলেন, বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।
কহিলাম আমি, তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই।
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো- জোর মরিবার মতো ঠাই।
শুনি রাজা কহে, বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থ ও দিঘে সমান হইবে টানা-

ক. ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে কয়টি অঙ্ক আছে?

খ. ‘ব্রিটিশ সিংহ ভয়ে লেজ গুটিয়ে নিলেন, এ বড় লজ্জার কথা।’ –কে, কেন কথাটি বলেছে?

গ. ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে ইংরেজদের কোন বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকের উপেন চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. ‘উদ্দীপকের বাবু ও ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকে ইংরেজদের মানসিকতা একই সূত্রে গাঁথা।’ –মূল্যায়ন করুন।

অথবা

১০. খালাত বোনের মৃত্যুর পর তার একমাত্র সন্তান শুভকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন আরশাদ করিম। তিনি শুভকে নিজপুত্র আশিকের মতো লালন-পালন করেন। বড় হয়ে শুভ একদিন সম্পত্তির লোভে মামাতো ভাই আশিকের বুকে অস্ত্র ধরে। মৃত্যুভয়ে ভীত আশিক শুভর নিকট অনেক অনুনয়-বিনয় করে। কিন্তু বিধি বাম। এক পর্যায়ে আশিক শুভর উদ্দেশ্যে বলে, “আমার বাবা-মা তোমাকে পুত্রবৎ লালন-পালন করেছেন। তোমাকে পরম স্নেহে বুক জড়িয়ে ধরেছেন। আজ তুমি আমায় হত্যা করবে?” শুভর পাষণ্ড হৃদয় গেলেনি। আশিকের নিখর দেহ মুহূর্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

ক. পলাশি কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

খ. ‘ইনি কী নবাব না ফকির।’ –কে, কোন প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছিল?

গ. উদ্দীপকের আশিক ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের কোন চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে? –আলোচনা করুন।

ঘ. “উদ্দীপকে ‘সিরাজউদ্দৌলা’ নাটকের একটি বিশেষ দিকের প্রতিফলন ঘটেছে।” –মূল্যায়ন করুন।



বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময় : ৪০ মিনিট

পূর্ণমান : ৪০

বিশেষ দৃষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার প্রতিটি ক্রমিক নম্বরের প্রশ্নের সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরটি খাতায় লিখুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. কমলাকান্ত ‘পাষণবৎ কঠিন’ হয়েছিল কেন?

ক. লর্ড ওয়েলিংটন আফিং চাওয়ায়

খ. বিড়ালকে সগর্বে তাড়াতে

গ. প্রসন্ন টাকা চাওয়ায়

ঘ. মঙ্গলার কষ্টে

২. কী কারণে চোর অপেক্ষা কৃপণ ধনী শতগুণে দোষী?

ক. দরিদ্রের ধন চুরি করে

খ. দরিদ্রকে কিছুই দেয় না

গ. অন্যের সম্পদ লুট করে

ঘ. সমাজের ধন কুক্ষিগত করে

৩. নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

রবীন্দ্র ছোটগল্পকে এক দিক থেকে বাঙালির জীবনভাষ্য বলা চলে। তাঁর গল্পে একদিকে যেমন পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার স্ফূরণ ঘটেছে, তেমনি একইসঙ্গে পুরুষের ভাষ্যে নারীর প্রশস্তিও কীর্তিত হয়েছে।

৩. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু কোন রচনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?

ক. অপরিচিতা

খ. আমার পথ

গ. বিলাসী

ঘ. চাষার দুস্কু

৪. উদ্দীপক ও ‘অপরিচিতা’ গল্পে মিল রয়েছে যে বিষয়ে—

i. উদাসীন মানসিকতা

ii. পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতা

iii. নারীর প্রশস্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. ii ও iii

৫. শিবিকাবাহকগণ কীসে যাতায়াত করলে সভ্যতার চূড়ান্ত হবে?

ক. ট্রামে

খ. রেলওয়েতে

গ. স্টিমারে

ঘ. মোটরে

৬. ‘আসাম সিঙ্ক’ বলা হয়েছে যে বস্তকে—

ক. এন্ডি

খ. ফ্লানেল

গ. জুট

ঘ. মসলিন

৭. নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

ছোট খালার উপর অভিমান ছিল। তাই বড় অসুখ করলেও তাকে দেখতে যাওয়া হয়নি। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবার তাকে দেখতে গেলাম। আমাকে দেখেই তিনি বিছানা থেকে ওঠে বসলেন। বললেন, “বাবারে, এতদিন পর এলি?”

৭. উদ্দীপকের খালার সঙ্গে ‘আহ্বান’ গল্পের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে?

ক. বুড়ি

খ. দিগম্বরী

গ. গোপাল

ঘ. শুকুর আলি

৮. এরূপ সাদৃশ্য রয়েছে যে বিষয়ে—

i. কষ্টবোধ

ii. অনুযোগ

iii. অভিমান

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. ii ও iii

ঘ. iii



৯. জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয় কীভাবে?

- ক. প্রকৃতির দিকে তাকালে
গ. বৃক্ষের দিকে তাকালে

- খ. নদীর দিকে তাকালে
ঘ. সমুদ্রের দিকে তাকালে

১০. মাসি-পিসির সমস্ত মন জুড়ে কোন ভাবনা কাজ করে?

- ক. নতুন সংসার রচনা
গ. আল্লাদিকে রক্ষা করা

- খ. পালিয়ে যাবার চিন্তা
ঘ. ব্যবসায়ে উন্নতি

• নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

গত শুক্রবার ওয়াজ মহফিলে বয়ান করা নিয়ে বড় হুজুরের সঙ্গে কথাকাটাকাটি হয় কয়েকজন মুসল্লির। রাতে দেখা গেল বড় হুজুরের দহলিজখানাটি ভাঙ্গা সমাপ্ত হয়েছে।

১১. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু কোন বাক্যটিতে প্রতিফলিত হয়েছে?

- ক. একদিন সৌদামিনীর বাড়ি হামলা করে বসল খ. ক্ষিপ্ত জন্তুর সামনে সে এবার বোমা ফাটাল
গ. তার ছাগল মাঠ থেকে আর ফিরল না ঘ. তাই ধর্মপুত্ররা যে যার মানে মানে বাড়ি ফিরলে

১২. উদ্দীপক ও ‘সৌদামিনী মালো’ গল্পে প্রকাশিত হয়েছে—

- i. মানুষের শ্রেণিচেতনা
ii. ধর্মীয় উদারতা
iii. ধর্মীয় গৌড়ামি

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
গ. iii

- খ. ii
ঘ. i ও ii

১৩. ‘রেডিগ্রাম’ শব্দের অর্থ কী?

- ক. স্যাটেলাইট বার্তা
গ. বেতার বার্তা

- খ. ক্ষুদ্রে বার্তা
ঘ. টেলিগ্রাম বার্তা

১৪. পিয়নকে দেখে সবাই তটস্থ থাকেন কেন?

- ক. আচরণের জন্য
গ. রাজাকার বলে

- খ. মিলিটারির কারণে
ঘ. মিলিটারির সঙ্গে সুসম্পর্কে

১৫. মহাজাগতিক কিউরেটররা কেন পৃথিবীতে এসেছিলেন?

- ক. প্রাণের অস্তিত্ব খোঁজ করতে
গ. সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণির খোঁজে

- খ. পৃথিবীতে মানুষের কর্মকাণ্ড দেখতে
ঘ. প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে

১৬. ‘বঙ্গভাষা’ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে ‘মাতৃভাষার’—

- i. সৌন্দর্য
ii. মাধুর্য
iii. মহিমা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
গ. iii

- খ. ii
ঘ. i, ii ও iii

১৭. ‘থরে বিথরে’ শব্দগুচ্ছ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

- ক. রাশি রাশি
গ. স্তরে স্তরে

- খ. বোঝা বোঝা
ঘ. সারি সারি

১৮. ‘কনফুসিয়াস’ কে?

- ক. চীনা দার্শনিক
গ. ভারতীয় কবি

- খ. হিব্রু কবি
ঘ. ইরানি দার্শনিক

১৯. কাশী-মথুরা-বৃন্দাবন-গয়া বলতে বোঝানো হয়েছে ?

- ক. পর্যটন এলাকা
গ. ধর্মীয় স্থান

- খ. ঐতিহাসিক স্থান
ঘ. প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকা



২০. 'হলুদ শাড়ি' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

ক. কাঁচা ধানের মৌসুম

গ. বাংলার পোশাক বৈচিত্র্য

খ. পাকা ধানের মৌসুম

ঘ. বাংলার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

২১. 'কবর' কবিতায় ফুটে উঠেছে –

ক. কবির শোক ও বেদনা

গ. কবির জীবনের কাহিনি

খ. বৃদ্ধ দাদুর শোক ও বেদনা

ঘ. বৃদ্ধের নাতির শোক ও বেদনা

২২. 'পুষ্পারতি' বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. পুষ্পের সৌন্দর্য

গ. পুষ্পের বন্দনা

খ. শীতের আগমন

ঘ. নবাবের উৎসব

২৩. 'জাত্যাভিমান' শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে–

ক. আভিজাত্য গর্ব

গ. জিঘাংসা প্রবৃত্তি

খ. মানবীয়তা

ঘ. ভালোবাসা

• নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার দুটি চরণ এ রকম–

'আমি দুর্বীর

আমি ভেঙে করি সব চুরমার।' এতে যৌবনের অদম্য প্রাণশক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

২৪. উদ্দীপকের কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে আপনার পঠিত কোন কবির সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. আল মাহমুদ

গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য

খ. সুফিয়া কামাল

ঘ. বিষ্ণু দে

২৫. উদ্দীপকের কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–

ক. প্রকৃতি ও জন্মভূমি প্রীতি

গ. সাহসী অভিযাত্রা

খ. নাগরিক জীবনবোধ

ঘ. অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

২৬. 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় 'মানবিক বাগান' বলতে বোঝানো হয়েছে–

ক. মানবীয় জগৎ

গ. মানুষের বাগান

খ. মনোহর বাগান

ঘ. আনন্দময় জগত

২৭. 'শ্বাপদ' বলতে বোঝায় –

ক. গৃহপালিত পশু

গ. হিংস্র মাংসাশী প্রাণী

খ. নিরীহ জন্তু

ঘ. তৃণভোজী জন্তু

২৮. কবি কেন 'বিচলিত স্নেহের' কথা বলেছেন?

ক. শঙ্কায়

গ. ভালবাসায়

খ. ভয়ে

ঘ. কল্পনায়

• নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে

রবীন্দ্রনাথের মতো দৃষ্ট পায় হেঁটে

অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।

২৯. উদ্দীপকের কবির সঙ্গে 'নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় কার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. নূরুলদীন

গ. মাহমুদ দীন

খ. রবীন্দ্রনাথ

ঘ. নূরুলদীন

৩০. উদ্দীপক ও 'নূরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে বাঙালির–

ক. ধর্মীয় চেতনা

গ. ভাষার সংগ্রাম

খ. মুক্তির প্রত্যাশা

ঘ. সংস্কৃতির লড়াই

৩১. 'সালু' শব্দের অর্থ কী?

ক. কালো রঙের কাপড়

গ. মাজারের আবরণ

খ. লাল রঙের কাপড়

ঘ. কবরস্থানের আবরণ



এইচএসসি প্রোগ্রাম
বাংলা প্রথম পত্র :HSC-1851

মানবন্টন : পূর্ণমান : ১০০

১. সৃজনশীল প্রশ্ন (কাঠামোবদ্ধ) :	৬০ নম্বর	(৬×১০ = ৬০)
২. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :	৪০ নম্বর	(৪০×১ = ৪০)
		সর্বমোট = ১০০

১. সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন : ৬০ নম্বর (৬×১০ = ৬০)

- ক. গদ্য থেকে ৩টি উদ্দীপক থাকবে, ২টির উত্তর দিতে হবে- (২×১০ = ২০)।
 খ. কবিতা থেকে ৩টি উদ্দীপক থাকবে, ২টির উত্তর দিতে হবে- (২×১০ = ২০)।
 গ. উপন্যাস থেকে ২টি উদ্দীপক থাকবে, ১টির উত্তর দিতে হবে- (১×১০ = ১০)।
 ঘ. নাটক থেকে ২টি উদ্দীপক থাকবে, ১টির উত্তর দিতে হবে- (১×১০ = ১০)।

২. সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন : ৪০ নম্বর (৪০×১ = ৪০)

বহুনির্বাচনি অংশে দক্ষতার স্তর ঠিক রেখে মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকবে।

সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নের মান ১ নম্বর।

- ক. গদ্য থেকে ১৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে, সব কয়টির উত্তর দিতে হবে- (১৫×১ = ১৫)।
 খ. কবিতা থেকে ১৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে, সব কয়টির উত্তর দিতে হবে- (১৫×১ = ১৫)।
 গ. উপন্যাস থেকে ৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে, সব কয়টির উত্তর দিতে হবে- (০৫×১ = ০৫)।
 ঘ. নাটক থেকে ৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে, সব কয়টির উত্তর দিতে হবে- (০৫×১ = ০৫)।
 সর্বমোট = ১০০

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্নের শুরুর দিকে একটি দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপক (Stem) থাকবে, যা হতে পারে একটি সাধারণ সূচনা বক্তব্য, চার্ট, সমীকরণ, চিত্র, গ্রাফ ইত্যাদি। দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপকের শেষে ৪টি প্রশ্ন থাকবে।

প্রশ্ন ৪টির নম্বর বন্টন হবে নিম্নরূপ:

- ক. জ্ঞান স্তর- ১
 খ. অনুধাবন স্তর- ২
 গ. প্রয়োগ দক্ষতা স্তর- ৩
 ঘ. উচ্চতর দক্ষতা স্তর- ৪

প্রতিটি প্রশ্নের এই ৪টি অংশের মোট নম্বর হবে (১+২+৩+৪)= ১০।

সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন- আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটর	
	ড. মো. চেঙ্গীশ খান অধ্যাপক (বাংলা) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ইমেইল : chenggish@bou.ac.bd
	মেহেরীন মুন্জারীন রহা সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ইমেইল : meherin2010@bou.ac.bd